# পরিচয়

২৫শে বৈশাখ ১৪০৭

অলোককুমার ঘোষ সম্পাদিত

CENTRAL LIBRARY

একবিংশ শতকের প্রথম বই মেলায় অকিঞ্চ প্রকাশনী থেকে
প্রকাশিত হয়েছে আকর্ষণীয় ১২টি বই

P
০৫১০৫৭৭১
P 10,489

কাব্যগ্রন্থ

রাণা চট্টোপাধ্যায়
বিকেলের আলোর ভিতরে

অলোককুমার ঘোষ
•বজনে বিজনে

সুভদ্রা ভট্টাচার্য
তাপকলের মেয়ে

প্রসেনজিৎ কুমার বক্সী
জটায়ুর প্রতীক্ষা

প্রদোষ দত্ত
কার্গিল ভালোবাসা ভিনটেজকার

শান্তনু প্রামাণিক
শিকড় বাকড়

দীপক মুখোপাধ্যায়
ওক্টাভিয়ো পাজ ( অনুবাদ )

কাব্যগ্রন্থ

শ্যামল কুমার নাইয়া
নদী ঝরিয়েছে ঘাম

সুব্রত রুদ্র ( সম্পাদিত )
•বর্ণকুমারী দেবীর
প্রেমের গান আর কবিতা

অলোককুমার ঘোষ ( সম্পাদিত )
এ সময়ের নির্বাচিত দীর্ঘ কবিতা

উপন্যাস

মিহির ভট্টাচার্য
ঘূর্ণিকাল

প্রবন্ধ

মুরারি ঘোষ
কবি মধুসূদন ও বাঙালী
বুদ্ধিজীবী সমাজ

CENTRAL LIBRARY

শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ত্রয়োবিংশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
২৫ শে বৈশাখ ১৪০৭

সম্পাদক
অলোককুমার ঘোষ

প্রচ্ছদ
নিখিলেশ দাশ

প্রকাশিকা
ছবি ঘোষ

প্রকাশস্থল
২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে, সাহাপুর
কলকাতা-সাত লক্ষ আটত্রিশ
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

মুদ্রক
ছবি ঘোষ

মুদ্রণস্থল
জি. ডি. এন্টারপ্রাইজ
২৯, শীতলাতলা রোড, সাহাপুর
কলকাতা-সাত লক্ষ আটত্রিশ

পনের টাকা

# সূচীপত্র

**প্রবন্ধ**

নোবেল কমিটিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন
গজেন্দ্র কুমার ঘোষ ১

রবীন্দ্র চিন্তায় সামাজিক অর্থনীতি
মুরারি ঘোষ ১৫

পরশুরামের চাটুজ্যেমশায়
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৮

কবিতার ফ্ল্যাট বাড়ি
বাসুদেব দেব ৫৮

**গল্প**

সেই ছেলেটা আর সেই মেয়েটার গল্প
চুনীলাল রায় ৪১

দূরের মানুষ
সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ৫০

**পুস্তক আলোচনা**

জানকীবল্লভ পট্টনায়কের প্রবন্ধ সংকলন ঃ কিছু প্রশ্ন
কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞা ৭৩

ভাগ হয়নিকো নজরুল
রাণা চট্টোপাধ্যায় ৭৭

খুনীর শাস্তি চাই ও অন্যান্য
সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৩

CENTRAL LIBRARY


**পুস্তক আলোচনা**

স্বজনে বিজনে
বাসুদেব দেব ৮৬

বিভিন্ন স্বাদ ও বর্ণের কাব্যনিচয়
অনন্ত দাশ ৮৯

এক আবিষ্কৃত মানসভূমি
বৃন্দাবন দাস ১০০

**কবিতা**

সুদেব সাহা ৩৯
প্রণব চট্টোপাধ্যায় ৩৯
মতি মুখোপাধ্যায় ৪০
রাণা চট্টোপাধ্যায় ১০২
চন্দন সেন ১০৩
অনন্ত দাশ ১০৪
পিনাকী রায় ১০৪
শিবচন্দ্র লাহিড়ী ১০৫
অশোক চক্রবর্তী ১০৬
গণেশ ভট্টাচার্য ১০৬
মিহির সরকার ১০৭
তারক চট্টোপাধ্যায় ১০৭
চন্দন চট্টোপাধ্যায় ১০৮
অশোক কুমার দত্ত ১০৮
সুভদ্রা ভট্টাচার্য ১০৯
অশোক কুমার রায় ১০৯
কাশীনাথ মণ্ডল ১১০
রামপ্রসাদ দাস ১১০
পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত ১১১
রবি রায় ১১২
প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় ১১৩
শংকর চক্রবর্তী ১১৩
অমূল্যকুমার চক্রবর্তী ১১৪
সংবর্ত রায় ১১৫
রাজকুমার রায়চৌধুরী ১১৬
প্রদোষ দত্ত ১১৭
সৌমিত বসু ১১৭
শ্যামল কুমার নাইয়া ১১৮
বৃন্দাবন দাস ১১৮
শামসুল ইসলাম ১১৯
অলোককুমার ঘোষ ১২০

# নোবেল কমিটিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন

গজেন্দ্র কুমার ঘোষ

১৯১৩ সালে লণ্ডন রয়েল সোসাইটির সদস্য টমাস ষ্টার্জ ( Thomas Sturge moore ) মুর রবীন্দ্রনাথের নামটি নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য সুইডিশ অকাদেমির কাছে সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন।

এই সুপারিশ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালিন সুইডিশ অকাদেমির সভাপতি হারাল্ড য়েয়ার্নে ( Harald Hjaørne ) রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ হন। তা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রার্থী পদের স্বপক্ষে এক প্রশ্নবোধক রিপোর্ট অকাদেমির কাছে প্রদান করেন। তাঁর রিপোর্টের আংশিক অনুবাদ এইরূপ :

..."ঐতিহাসিক যোগসূত্রগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না সুস্পষ্টভাবে সনাক্তকরণ করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয়বাদ ও গীতিকাব্যের মধ্যে কোনটি মৌলিক ও ঐতিহাসিক তার পার্থক্য করা সম্ভব কি ? রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ ও কাব্য পাশ্চাত্য পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় প্লেটোর আদর্শ প্রেমবাদ এবং সোলেমনের সংগীতের রূপক বিশ্লেষণ থেকে সেন্ট বার্নাডের, সেন্ট ফ্রানসিসের এবং কাউন্ট জিগেনর্ডফ ও তাঁর "হার্নহার্ট" এর কথা।"

আসলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও যে সব প্রার্থীর নাম সে বছর নোবেল সাহিত্য পুরস্কারটির জন্য সুপারিশ হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে ফরাসী সাহিত্য বিশারদ ও নীতিবাদী পণ্ডিত এমিল ফগ ( E'mil Foguet ) এর নামটির ওপরেই তাঁরা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ তখন পর্যন্ত একজন ইউরোপীয়ই নোবেল পুরস্কার পাবেন, এটাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। রবীন্দ্রনাথই প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী যিনি আলফ্রেড নোবেলের উইলের শর্ত অনুযায়ী নোবেল পুরস্কারকে দিলেন এক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ১৯শে অক্টোবর ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ব্যাখ্যা করে অকাদেমি সদস্য প্যার হালস্তরম নোবেল কমিটির কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন

প্রসঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত করেন, অনুমতিক্রমে ) তাঁর বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো ।

নোবেল কমিটিতে এই আলোচনাপত্র ( রিপোর্ট ) পাঠের পর সুইডিশ সাহিত্য অকাদেমির স্থায়ী সম্পাদক ( পরবর্তীকালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ) ভার্নার ফন হাইডেনষ্টাম ( Verner Von Heldenstam ) রবীন্দ্র-নাথের পুরস্কার প্রার্থীপদের সমর্থনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা পুরস্কার প্রাপ্তির স্বপক্ষে তাঁর প্রার্থীপদকে সুনিশ্চিত করে তোলে । হাইডেনষ্টামের ভাষণের আংশিক উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ :

..."আমি গভীর আগ্রহে এবং আবেগপূর্ণ মন নিয়ে গীতাঞ্জলির কবিতা-গুলো পাঠের পর স্মরণ করতে পারি না যে, কয়েক দশকের মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যে এই রকম গীতিকবিতার সৃষ্টি হয়েছে । এই কবিতাগুলো পাঠের পর যে বিরল অভিজ্ঞতা হলো, তা শুধু স্বচ্ছ নির্মল ঝরণার জল পান করার পরম তৃপ্তির সঙ্গে তুলনীয় । তাঁর চিন্তা ও আবেগে ছড়িয়ে রয়েছে এক সূক্ষ্ম আন্তরিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং হৃদয়ের পবিত্রতা । তাঁর শৈলীর মাহাত্ম্য ও জাতীয় মর্যাদা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে এক অবিমিশ্র এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য । তাঁর কবিতায় কোন বিতর্ক বা বিক্ষোভের স্থান নেই । তেমনি স্থান নেই কোন ব্যর্থতা বা পার্থিব তুচ্ছতার । যদি কখনো কোন কবির মাঝে এইসব বিশেষ গুণের সমাবেশ দেখে নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সেই ব্যক্তি । যে সুউচ্চ মর্যাদার মহান লেখককে আমরা অবশেষে আবিষ্কার করেছি কোন মতেই তাঁকে আর উপেক্ষা করা উচিত হবে না । দৈনিক পত্রিকার সংবাদ কলামের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বছরের পর বছর নামটি প্রকাশিত হবার আগেই এবং সম্ভবতঃ অনাগত বহু বছরের মধ্যে একটি মহান ব্যক্তির নাম খুঁজে নেওয়ার সুযোগ আমাদের হয়েছে । এই আবিষ্কারকে যদি কাজে লাগাতে চাই তবে আমাদের আর একটি বছর দেরী করে করে সুযোগটি হারানো উচিত হবে না ।"...

হাইডেনষ্টামের এই বক্তৃতার পর অকাদেমির সভারা সর্বসম্মতিক্রমে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারটির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থীপদকে সমর্থন করেন । এখানে অকাডেমি সদস্য প্যার হালষ্ট্রয়মের ( Per Hallstroem ) টাগোর এবং নোবেল পুরস্কার রিপোর্টটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো ।

[ ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির স্বপক্ষে

সুইডিশ অকাদেমিতে কি আলোচনা হয়েছিল এ বিষয়ে গত ১৯৯২ সালে ১৪মে তারিখে নোবেল গ্রন্থাগারের প্রধান, গ্রন্থাগারিক ও নোবেল কমিটির সম্পাদক আণ্ডেঁস রুইব্যার্গের ( Anders Ryberg ) কাছে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি কিছু তথ্য দিয়ে সেদিন আমাকে সহায়তা করেন। এবিষয়ে ইতিপূর্বেও তাঁর সাহায্য পেয়েছি বলে আমি কৃতজ্ঞ। ]

# রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নের জন্য নোবেল কমিটির কাছে পঠিত রিপোর্ট ঃ

নোবেল পুরস্কারের জন্য ভারতীয় কবিটির ( রবীন্দ্রনাথের ) প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং রচনার কোন তথ্য সংযোজিত হয় নি। আর আমার পক্ষে ডব্লু. বি. ইয়েটসের ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভূমিকাটি ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই বইটিতে আরো উল্লেখিত যে, এই সঞ্চয়নটি বাংলা মূল তিনটি বই থেকে নেওয়া হয়েছে. যথা. নৈবেদ্য. খেয়া এবং গীতাঞ্জলি।

যেহেতু আমি এই ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং ভারতীয় সাহিত্যও আমার কাছে অপরিজ্ঞাত, এ অবস্থায় একজন বিশেষজ্ঞের মত বিবরণ তৈরী করার ভান করতে পারিনা। আমার মতামত হিসাবে এইটুকু প্রকাশ করতে পারি যে, স্বয়ং কবি কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত ক্ষুদ্র কবিতা সংগ্রহটি বিস্ময়কর ভাবে সমৃদ্ধ এবং শুদ্ধ কাব্য অনুভূতি সঞ্জাত। কবির এই সৃষ্টিকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাবটি কোনক্রমেই অযৌক্তিক নয়—তেমনি অযৌক্তিক হবে না তাঁকে পুরস্কৃত করার প্রসঙ্গটি। আমার বিবেচনায়, দেশের কিংবা বিদেশের সুদক্ষ কোন ব্যক্তির সহায়তায় মূল রচনাগুলো মূল্যায়ন করা শ্রেয়। আশা করি কমিটি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

নিঃসন্দেহে এ প্রশ্ন এখানে জাগে যে, বর্তমান ইউরোপীয় কবিতা যা দিতে পারে. তার চেয়েও আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ কাব্যগুণে সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতাগুলোর স্বরূপ সম্পূর্ণ আলাদা. কারণ আমাদের কাছে অপরিচিত সেই দেশ, যে দেশে এই কাব্যধারা উদ্ভূত হয়েছে।

কোন সুস্পষ্ট প্রামাণিক তথ্য ও গবেষণা ছাড়া এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া যথার্থ ধর্মীয় কবিতাকে আর্থিক পুরস্কারে সম্মানিত করাটা রীতি বিরুদ্ধ। এ যেন ডেভিডের অথবা সেন্ট ফ্রানসিসের ধর্মীয় গানের জন্য আর্থিক মূল্য দান করা।

আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য প্রসঙ্গে এই ধরণের যুক্তি হাস্যকর, সে কবিতা যতই মহান হোক না কেন। কিন্তু গীতাঞ্জলির বেলায় এ তুলনা মোটেই অবাস্তব নয়। আর সামগ্রিকভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করা শ্রেয়। অবশ্য এইভাবেই যে সঠিক মূল্যায়ন হবে তার কোন স্থিরতা নেই।

ইয়েটসের বাঙ্গালা তথাদাতা রবীন্দ্রনাথকে ভারতের ঋষি বলে আখ্যায়িত করেন। কবি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। স্বদেশে কাব্য-শিল্পের গুরু হিসাবে তিনি আজ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কোন ইউরোপীয় কবিকে এই আসনে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর এবং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছেন তা আমাদের মধ্যে বিরল। সন্ন্যাসী বা ঋষি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের মিল খুব কম। জন্মভূমিতে তিনি নতুন কিছু কিনা জানি না. কিন্তু আমাদের কাছে তিনি ধর্মীয় উদ্দীপনা ও অধ্যাত্মিক পুনরোভ্যুদয়, যাঁর প্রতিরূপ রোমান ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়তাবাদে দেখতে পাই।

ধর্মীয় প্রার্থনা সংগীতের সঙ্গে তুলনা করলে, কবির সত্বা পুরোপুরি খ্রীস্টিয়। সর্বপরি তাঁর চিত্তের আশ্চর্যরকম নম্রতাবশতঃ তিনি তাঁর প্রার্থনা সংগীত গাইতে পারেন অনাড়ম্বর নবীন সৌন্দর্যে। সেন্ট ফ্রান্সিসের ঈশ্বরের প্রতি আবিষ্টতা ও মনোভাবের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর প্রীতিতে সাদৃশ্য বর্তমান। কবির সত্বা জুড়ে যে প্রেম তা সম্পূর্ণভাবে জীবনদেবতার প্রতি নিবেদিত। তাঁর গীতি কবিতার প্রথম দু'তিনটি কবিতা পাঠেই এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না। কারণ এ জিনিস অনুকরণ করা যায় না। নিঃসন্দেহে এই কাব্য-সুষমা বিরল, যার প্রকাশ ভঙ্গীতে রয়েছে এক ধ্রুপদী সারল্য।

তাঁর চিত্রকল্পগুলো এক স্বতস্ফূর্ত চিন্তার ভাষা যা জোর করে ঢালাই করার প্রয়োজন হয় না. শুধুমাত্র শব্দের সংযোজনেই তা অর্থবহ হয়ে ওঠে। মনে করুন গ্যাটের কবিতায় সেই ব্রাহ্মণ দুহিতা যে দু'হাত দিয়ে স্রোতস্বিনী নদীর জলে হাত দিয়ে গর্ত করে যাচ্ছিল, আর জল তার হাতে জড় পদার্থের মত, কিন্তু নরম হয়ে লেগে যাচ্ছিল।

সর্বদাই তাঁর রচনাশৈলীর এই সৌন্দর্যবোধ সত্যি বিস্ময়কর। এ কথা ঠিক যে. পার্থিব বা ঐহিক কবিতার বিষয়বস্তুতে যে সব বৈচিত্র থাকা বাঞ্ছনীয় এসব কবিতায় তা অনুপস্থিত। প্রতিটি কবিতাই একটি প্রার্থনা এবং ঐক্য

আর সমস্বয়ের সুরে বাঁধা. হয়তো কখনো একঘেঁয়েমি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের কবিতার ক্ষেত্রে তা পরিত্যাগ করা শ্রেয়. কারণ এই কবিতা-গুলো ঈশ্বরের প্রতি নতুন কোন আর্তি ঢেলে দিয়ে তার চিত্রকল্প খোঁজার প্রচেষ্টা নয়।

যে জিনিসের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন সে বিষয়ে অযথা বাক্য ব্যয় অর্থহীন। আমি কবির কয়েকটি আকর্ষণীয় গীতিকবিতার ক্রমিক সংখ্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি. যথা. ১. ৩. ৫. ৬. ৭. ১৩. ১৯ এবং ২৬ কিন্তু কেউ যখন কবিতাগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করবেন এবং পুনঃপাঠের পরও দেখতে পাবেন যে প্রতিটি কবিতাই সমসৌন্দর্যে একক। আমি ৯০ এবং ৯৫ ক্রমিক সংখ্যার কবিতা দুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করছি। উক্ত কিছু কবিতা সোলেমনের ধর্মগীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা অবশ্য প্রভাবের প্রশ্ন যার ফলে কবিতাগুলোর মান কিছুটা খর্ব হতে পরে। কিন্তু. যা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি. কবির রচনাকে বুঝতে হলে তাঁর মূল রচনাকে বুঝতে হবে। এবং গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মিক ধারাটি জানা থাকলেই বিচার করা সম্ভব হবে কেন তা আশ্চর্যজনক ভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার এতো নিকটে আসতে পেরেছে।

এই নিবন্ধ লেখার পর. দি টাইমস, দি ফোর্টনাইটলি রিভিউ এবং নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির তিনটি আলোচনা আমার হাতে এসেছে।

তার প্রতিটি আলোচনার মধ্যেই কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি যে. কবির প্রতি পূর্ণ স্বীকৃতি ও প্রাচীন স্তবগানের সঙ্গে তাঁর কবিতার তুলনা করা হয়েছে। আর শেষ আলোচনা দু'টিতে কবির মূলকবিতা ও তার আঙ্গিক সম্বন্ধে তার মূল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে — যা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজন আছে বলে যতদূর আমার মনে হয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন কবি নন. তিনি গায়ক, সুরকার এবং গীতিকার। তিনি গান গেয়ে থাকেন তানপুরার সুর-মূর্চ্ছনায়. যা খানিকটা বীণার (Lyre) মতন দেখতে। এভাবেই তিনি তাঁর গানগুলো চারণ গায়কদের কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন। ঘুরে ফিরে সেই গানের মর্মবাণী পৌঁছেছে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। এই সংগীত আমাদের সংগীতের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিন্তু সংগীতের মাধুর্য একজন ইউরোপীয়র কাছেও সম্পূর্ণ উপভোগ্য।

সংগীতের রাগরাগিনীর সূচনার সঙ্গে সংযোগ আছে প্রাকৃতিক

পরিবেশের, যেমন সন্ধ্যায়, সূর্যোদয়ে বা বর্ষায় কোন ইন্দ্রিয়স্পর্শী নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা হিসাবে যা মূল প্রেরণার আলো হয়ে গানগুলোর জন্ম দেয়। তাঁর কবিতার আঙ্গিক অত্যন্ত শিল্পসম্মত এবং আবেগপ্রবণ কিন্তু প্রাসঙ্গিক ভাষা অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ। কবিতার ছন্দ ফরাসী প্রাদেশিক কানজোন (canzone) এবং চতুর্দশপদী কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কবিতার ছন্দে চার বিভক্তির শব্দ চয়নে ফরাসী কবিতার মুক্ত ছন্দের এক দুঃসাহসিক নিরীক্ষার প্রচেষ্টা বলে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংস্কৃত কবিতার মাপ পরিমাপ তাঁর কবিতার নির্ধারক নয় কিন্তু উচ্চারণের বেলায় তা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কথিত আছে যে, বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং ( শব্দের চরিত্র ) নমনীয়। এই ভাষাকে এমন একটি বাক্য বিভাগে ফেলা যায়, যার মেজাজ যে কোন আধুনিক ভাষার তুলনায় বহুলাংশে গ্রীক। আর এই ভাষা সংস্কৃত ভাষার অতি কাছাকাছি যেমন ইতালিয়ান ভাষার সঙ্গে ল্যাটিনের সম্পর্ক বর্তমান।

শুধুমাত্র ধর্মীয় মেজাজের আধ্যাত্মিক কবিতাই রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়বস্তু নয়। শুরুতে তিনি লিখেছেন প্রেমের কবিতা। সেগুলো সেই বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের গুণে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর নাটকগুলো তাঁর স্বদেশে অভিনীত হয়েছে আর তাঁর কবিতা বাংলার জাতীয় সংগীত হিসাবে আমাদের সময়েই পেয়েছে স্বীকৃতি।

প্রত্যেক ইংরেজ সমালোচক নিজেদের সত্যিকারের যুগ সৃষ্টিকারী কর্মের সাক্ষীরূপে অভিহিত করে, তাঁদের মত ব্যক্ত করেন যে, ( রবীন্দ্রকাব্যের ) এই নবচেতনাবোধ শুধু প্রাচ্যকে জানার সুযোগ নয় পরন্তু ইউরোপীয় শিল্পের ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাব বিস্তারের সূচনা করবে বলে তাঁরা তাঁদের মত প্রকাশ করেন।

॥ দুই ॥

দি গার্ডেনার কবিতা সংকলনটির সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লেখক আমাদের বলেন যে, বইটির বেশির ভাগ কবিতাই গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মিক গীতি কবিতাগুলোর অনেক আগে লিখিত। প্রত্যেক পাঠকেই হয়তো এই সত্যটি বুঝতে পারতেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভবতঃ তাঁর আগের গীতিকবিতাগুলো সম্বন্ধে একটু আভাসের অধিকার পাওয়া গেলো। যদিও কবির মতে কবিতাগুলোর মান ( গীতাঞ্জলির সঙ্গে ) তুলামানে নিকৃষ্ট। ( গীতাঞ্জলির ) গীতিকবিতার মূল্য পরিপক্ক ফলের সঙ্গে তুলনীয়, যা তাঁর পবিত্র এবং পার্থিব জগৎসীমা অতিক্রান্ত জীবন উপলব্ধি, আর যা নিয়ে তিনি আজ পাশ্চাত্য জগতের সামনে উপস্থিত হয়েছেন।

এটা সহজবোধ্য যে, ( দি গার্ডেনার প্রসঙ্গে ) এটা ছিল কবির নিজস্ব মত। বরং দি গার্ডেনার প্রকাশিত হওয়ার পর গীতাঞ্জলির প্রতি উচ্চ প্রশংসা তাঁকে তাঁর আসন থেকে একচুল বিচ্যুত করতে পারে নি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার গুণমুগ্ধ পাঠক সমাজে। উপরন্তু কবির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত উষ্ণতা সঞ্চিত হয়েছিল মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলো সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে সহজ এবং সাধারণভাবে নাড়া দিয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর আকর্ষণীয় পার্থিব কবিতার মত এই গীতিকবিতাগুলো বিষয় বৈচিত্রে ঐশ্বর্যশালী এবং গঠন রীতির জন্য আরো সমাদৃত।

যদিও দুটি জগতের মধ্যে ধারালো তেমন কোন ব্যবধান নেই। একই সহজ সরল এবং প্রগাঢ় আবেগপূর্ণ আত্মপরিপূর্ণতা উভয় জগতেই আছে। জগৎকে বিনম্র এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পরিদর্শন করা হয়েছে।

পৃথিবীর সুন্দর জিনিসগুলো যে যৌবনোচিত আনন্দের কারণ ঘটায় তা তার কবিতায় উপলব্ধি করা সহজ।

আর রহস্যময় দূরকম্পী শান্তি যা বয়স্ক মানুষটির মধ্যে দ্রবীভূত তা জাগতিক উপাদানকে স্থান দেয়, দেবত্বের সীমাহীনতায়।

এক নং কবিতা ঃ "ওরে কবি
সন্ধ্যা হয়ে এলো
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।"

দুটি যুগের মধ্যবর্তী পরিবর্তন কালটিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজের উত্তরেই ধরতে পারি, কি করে তিনি পরবর্তী জগতের বার্তাকে দূরে সরিয়ে পার্থিব বস্তুকে গানের উপজীব্য করে তুলেছিলেন। এমন কি অন্ধকারে প্রেমিক প্রেমিকা ছাড়াও একটি মানুষ অন্য মানুষের কথা শুনতে চায়। কবিতার শেষ স্তবকে ফুটে ওঠে কবির নিজস্ব স্বীকৃতি ঃ

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি সমবয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে।
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়,

কারো অশ্রু লুকায় মনে মনে,
কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে।
জগৎ মাঝে কেউ বা হারায় রথ,—
কেউবা মরে একলা ঘরে শোকে,
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।
সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমান বয়সী যে,
চুলে আমার যতই ধরুক পাক।" ( কবির বয়স )

একজন মহান কবির প্রেমপূর্ণ আত্মানুভূতির জন্য যে তিনি জাতীয় গায়ক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারেন এ সত্য পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে অপরিজ্ঞাত।

যদি কেউ "দি গার্ডেনার" বইটি পড়ে সে সহজেই বুঝে নেবেন যে, তাঁর সরল এবং দরিদ্র দেশবাসী তাঁর কথা ও সুর প্রাত্যহিক কর্মজীবনে বহন করে নিয়েছে।

আমার মনে হয়, এগুলো এক বিশেষ ধরনের প্রেমের কবিতা যা এই সঞ্চয়নে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কবিতাগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। অনেক কবিতা আছে যা সাধারণের সম্পত্তি বলে গণ্য করা যায় না। সম্পূর্ণ উন্নত মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের অনুভূতিতে ভরপুর সেই সব কবিতাগুচ্ছ। এখানেও প্রতিটি কবিতায় দেখতে পাই আশ্চর্যরকম সরলতা ও সচ্ছতা। তাছাড়া অনুভূতির অকৃত্রিম নম্রতা ও বিশুদ্ধতা স্পর্শ করে প্রতিটি মানুষের মন। একমাত্র গ্যাটের মধ্যেই মানুষ আধুনিক কবিতার সাযুজ্য খুঁজে পায়। তার অর্থ এই নয় যে এই দুটি মহৎ ব্যক্তিত্বে কোন বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলে আমি মনে করছি। সত্য বলতে কি, এই প্রেমানুভূতির মধ্যে কিছুই অনধিগম্য বা অচেনা নয়, তবে এর একটি বিশেষ পরিবেশ আছে যা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আমাদের কাছে ভারতীয়রা আবেগ উচ্ছ্বাসে নিষ্ক্রিয়, তাঁরা মধুর এবং মহান ভাবাচ্ছন্নতায় এমন এক জায়গায় হারিয়ে যায় যে, সেখানে দুশ্চিন্তা বা আত্মবিশ্লনকারী কঠোরতর পথে পৌঁছানো যায় না। স্থূলতা ও বর্বরতা বর্জিত এই জগৎ। এটাই বুঝি সর্বাধুনিকতার বর্তমান ঝোঁক। দুর্লভ বিচক্ষণতার মধ্যে কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর হয়তো কোন নারীর বিনম্র স্বভাবে পরিশীলিত হতে পারে। কিন্তু তাঁর আভিজাত্য ও সৌষ্ঠবে

আমরা স্তম্ভিত। কবির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, সম্ভবতঃ এটাই তাঁর জাতীয় চরিত্রের প্রতীক। আত্মস্বীকৃতির এক বিশেষ সীমারেখা করা উচিত নয়, আগুনের সাথে খেলতে হলে সতর্কতা রক্ষা অবশ্য প্রয়োজন যখন প্রাকৃতিক ঔদাসিন্য রক্তকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়।

প্রায়ই তাঁর গান কোন নারীর মুখে তুলে দেওয়া হয়। এখানে সেই সুরের একটি উপমা উদ্ধৃত করা হলো ( ৭ নং ) ঃ

"ওগো মা
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে
আজি প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কি মতে।
বলে দে আমায় কী করিব সাজ
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব আজ কেমন ওরে
কোন বরণের বাস।
মাগো, কী হলো তোমার, অবাক নয়নে
মুখ পানে কেন চাস।
আমি দাঁড়াবো যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে—
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ।
যাবে সে সুদূর পারে
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বল কি মতে।

( শুভক্ষণ / খেয়া )

এই কবিতাটি আমার কাছে 'সুলেমনের' গানের মতই অপূর্ব অনুভূত হয়। কিন্তু মেয়ে দুটির মধ্যে কত তফাৎ দেখুন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট মেয়েটির অবয়বে গ্রীক মাধুর্য ধরা পড়ে ; সে যেন এক নিরব ভাস্কর, যাঁর কাছে দর্শকের

গানের জন্য এক স্বপ্নময় প্রতীক্ষা বহুকাল যাবত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে আর ডুবে গিয়েছে মৃত্যুর গহ্বরে। ৫নং কবিতা থেকে মেয়েটির পুরুষ প্রতিমূর্তিটিকে ধরা যায়।

"আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী"—

কবিতার ছন্দ ও সুর দ্রুত অনুবাদের মাধ্যমে অক্ষুন্ন রাখা যায় না। (৩ নং) কবিতাটিও আর একটি উদাহরণ।

"গাঁথিতে ছিলাম জাল বসিয়া তীরে
বারেক অতল পানে চাহিনু ধীরে
শুনিনু কাহার বাণী
পরাণ লইল টানি
যতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে ॥

নাহি জানি কত কী যে উঠিল জালে
কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনোটা বা টলটল
কঠিন নয়ন জল,
কোনটা শরম ছিল
বধূর গালে
সে দিন সাগর তীরে প্রভাত কালে ॥···"

"সে তখন গৃহ কাজ সমাধা করি
কাননে বসিয়াছিল মালাটি পরি।
কুসুম একটি দুটি
তরু হতে পড়ে টুটি
সে করিছে কুটি কুটি
নখেতে ধরি
আসনে আপন মনে সময় হরি ॥"
"বারেক এগিয়ে যাই বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, নয়ন নিচু।

যা ছিল চরণে রেখে
ভূমিতল দিনু ঢেকে ;
"চিনি নে কিছু ॥"
শুনি রহিলাম শির করিয়া নিচু
... ...
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা
বুঝি নাই খুঁজি নাই হাটের মাঝে
এখন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে
... ... ...
সারাটি রজনী বসি দুয়ার দেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে।
সুখহীন ধনহীন
চলে গেনু উদাসীন
প্রভাতে পরের দিন
পথিক এসে
সব তুলে নিয়ে গেলে আপন দেশে।"

( অনাদৃত / সোনার তরী )

কবির ভাগ্য এবং তার কবিতাকে কেন্দ্র করে এটি যথার্থই একটি ব্যক্তিগত কবিতা। কিন্তু এখানেও আমরা দেখতে পাই কবিতার বাহ্যিক নক্সা ও সুশৃঙ্খল গঠন রীতি সমানভাবেই ফুটে উঠেছে. যা রবীন্দ্রকাব্যের বিশ্বচেতনাকে চিহ্নিত করে। অনেক সময় বহু ব্যবহৃত কিছু বিষয় প্রায়ই কবিতার শিল্পরীতিতে কৃত্রিম বাহুল্যের কারণ ঘটায়, যেমন অহেতুক ভাবোদ্রেক ও অকারণ কাব্য উচ্ছ্বাস। কিন্তু কবির কলমে ক্ষয়িত বিষয়েও প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ৬ নং কবিতাটি পাঠকের পড়া উচিত।

"খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে"...

( দুটি পাখি / সোনার তরী )

পাঠকের লক্ষ্য করা উচিত, কবির কবিতার সচ্ছতা. সাবলিলতা এবং আঙ্গিকের মাহাত্ম্য। প্রাত্যহিক জীবন থেকে তুলে নেওয়া চিত্রকল্পগুলো করুণার রঙের মত রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

স্থানাভাবে এবং সময় সংকুলার বসতঃ আমি উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়াতে

পারলাম না। তবে আমার পক্ষে পাঁচটি কবিতার ক্ষেত্রে অন্ততঃ সাতটি কবিতার উদ্ধৃতি দিতে পারলে ভাল হতো। এই কাব্য সঞ্চয়নের প্রথম দিকের কবিতা-গুলো খুবই সুন্দর এবং সমৃদ্ধ। যদিও বইটির সবগুলো কবিতাই উৎকর্ষতার মানে সমমর্যাদার অধিকারী নয়। কিছু গীতিকবিতা অন্ততঃ অনুবাদের মাধ্যমে তার ছন্দ, সুর ও অনুপ্রাসের দুর্বলতা হেতু মাধুর্যচ্যুত হয়েছে। তাছাড়া বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে সব কবিতাই সমানভাবে আমাদের বিদেশীকে আকর্ষণ করে না। কবিতাগুলোর মধ্যে কিছু কবিতা আছে যাকে বলা চলে "প্রতিফলিত কবিতা" (Reflective Poetry)। যে প্রসঙ্গে আমি আগেও বলেছি তা আবার পুনরাবৃত্তি করছি, কবির কবিতার প্রতিটি ছত্র বিশুদ্ধ এবং কবিতার প্রতিটি উপাদান নিখুঁত শিল্পসম্মত সৃষ্টি হিসাবে সত্য। কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কার নির্বাচনে নুন্যতম ত্রুটির অবকাশ রাখে নি। যে অলঙ্কার কবিতার গায়ে যথার্থ মিশে গিয়েছে তাই তিনি গ্রহণ করেছেন. অবাঞ্ছিত অলঙ্কারে কবিতার দেহকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি। কবিতায় রূপক চয়নেও কবির দক্ষতা অতুলনীয়। কবির কবিতায় স্থান পেয়েছে আদি প্রেমের মাহাত্ম্য। তাঁর সুদূরপ্রসারী কল্পনা সৃষ্টি করেছে অনেক পুরাণ কাহিনী-কেন্দ্রিক অতুলনীয় কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রেমের কবিতার মধ্যে মুষ্টিমেয় উদাহরণেই এখানে পর্যাপ্ত বলে মনে করে নিতে হবে। আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সংক্ষেপে কবির অভূতপূর্ব কাব্যমূল্য বিচার করে এই আলোচনা পত্র নোবেল পুরস্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার কমিটির কাছে রাখছি। এই সংকলনের শেষের দিকের কবিতাগুলো শুধু প্রেম নয়, অন্যান্য মানবিক দিককেও তুলে ধরা হয়েছে।

একটি সরল, প্রগাঢ় এবং কৌতূহল উদ্দীপক চলতি রূপক, যে অনাদি আত্মার খোঁজে ঘুরে মরছে, হঠাৎ একদিন সে পেল একটি পরশ পাথর (৬৬ নং কবিতা)। কিন্তু সে যখন তা ছুড়ে ফেলে দিল তখনই বুঝল কি অমূল্য রত্ন এসেছিল তাঁর হাতে। একটি গীতিকবিতায় আত্মার অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে ; যা নির্বানের স্বপ্নে যে মুক্তি. তারই অভ্যন্তরে তা মিলিয়ে যায়। পক্ষান্তরে এই উন্নতি সাধনই ঐহিক উপলব্ধির চরম ধাপ।

৬২ নং কবিতাতেও অতীতের বিষাদময় প্রেমের সমীক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যাঁরা এখন ইহলোকে নেই। কবিতাটি খুবই সুন্দর। কবির লেখা এই বিষাদময় কবিতা আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার কাছাকাছি। মইটারলিঙ্কের কবিতাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। অবশ্য তুলনা-

মূলকভাবে কবির যে কোন কবিতা সারল্যে ও বাহুল্যবর্জিত কবিতা হিসাবে শৈল্পিক উৎকর্ষে উচ্চমানের কবিতা হিসাবে স্বীকার্য। উপরন্তু গীতাঞ্জলির পর্যায়ে মিশে গিয়েছে কিছু পার্থিব কবিতা কিন্তু সেগুলো পবিত্র এবং শিশুর সারল্যে আর মহৎ ভাবাবেগে পরিপূর্ণ।

অবশেষে উপসংহারে উদ্ধৃত কবিতাটি নিজেই নিজের কথা বলবে ঃ

"আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতা খানি
কৌতূহল ভরে —
আজি হতে শতবর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশ মাত্র ভাগ
আজিকের কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান
আজিকের কোন রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের পরে
আজি হ'তে শতবর্ষ পরে।
তবু আমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্ত চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখ মনে
একদিন শতবর্ষ আগে।

আমরা অবগত আছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশবাসী মনে করে যে, কবির আবির্ভাবে সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই অধ্যায়কে বৃহত্তম বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলা ভাষার সঙ্গে অপরিচিত কোন ব্যক্তি অনুবাদ থেকে যতটুকু মর্ম উদ্ধার করতে পারবে, তারই ভিত্তিতে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীর এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। এ কথা ঠিক যে, ১৮৩২ সালে গ্যাটের মৃত্যুর পর আর কোন ইউরোপীয় কবি বা মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাঁটি ঔদার্য ও ধ্রুপদী সৌম্যতার বিচারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব।

স্টোর গ্যাটান, ২৯শে অক্টোবর, ১৯১৩।

CENTRAL LIBRARY

## তথ্যপঞ্জী

মূলতঃ সুইডেনের যে সব পত্র পত্রিকা থেকে প্রতি বছরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর তথ্য ও নিবন্ধের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছি : দৈনিক পত্রিকা যোটেবোর্গ পোষ্ট (G. P.), যোটেবোর্গ টিডনিং (G. T.), আফটন ব্লড, সুইড সেভনস্কা ডগ ব্লড, ডগেন্ নিহেটর (D. N.) সেভনস্ক ভগব্লড (S. V.) সুইডিশ টেলিভিশন, সুইডিশ রেডিও, নোবেল কমিটির বিভিন্ন তথ্য পুস্তিকা। Det literara Nobel priest by Kjell Espmark, The literary prize by Anders Osterling Nobel Prize — Lars Gyllensten.

# রবীন্দ্র চিন্তায় সামাজিক অর্থনীতি

মুরারি ঘোষ

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কে অর্থনৈতিক দায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে — এই উপলব্ধি আমরা নানাভাবে পাবো রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধেই। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজের দিকে — তার অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব কোনপথে চলে তার বিচারে।

"আমি জানি এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করে। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম তোমার আয়ের অনুপাতে তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম নির্বাহ করো না কেন। সে বলিল, 'তাহার কোনো উপায় নাই — গ্রামের লোক ও আত্মীয় কুটুম্ব মণ্ডলীকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ ঘটিবে।'

সমাজমনস্কতা থেকে যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি এই জাতীয় ভাবনায় পীড়িত হতে পারেন। এ জিনিস এখনও আমাদের সমাজে রয়েছে। কিন্তু অন্য সকলের ভাবনার চেয়ে রবীন্দ্রভাবনার বিশেষত্ব এই যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের গোটা সম্পর্কটি টেনে এনেছেন। তিনি বলছেন, "এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবি সম্পূর্ণই রহিয়াছে অথচ সমাজের ক্ষুধা পড়িয়া গিয়াছে"।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় বক্তব্য আমাদের সচেতন কোরে তোলে এই কারণে যে, ব্যক্তির প্রতি সমাজের দাবি বজায় থাকবে অথচ ব্যক্তির ন্যায্য দাবিকে সমাজ আমল দেবেনা। সমাজের এমন একপেশে নিয়মকানুনে ও চাল চলনের ব্যাখ্যায় সমাজকে চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে — কবি সচেতন ভাবেই তা পালন করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক অর্থনৈতিক দায় দায়িত্বের মধ্যে যে ফাঁক রয়ে গেছে তাতে কিন্তু একশ্রেণীর ব্যক্তি মানুষ উপেক্ষিত যে মানুষের সম্পদ-সহায় নেই। কবির দৃষ্টান্তে তা চিহ্নিত হয়েছে।

চলতি সমাজতন্ত্রের বিধানে ও ব্যবস্থায় যে সব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় ব্যক্তি মানুষকে পথে নামিয়ে তার চালক শক্তি নিঃসন্দেহে চলতি অর্থনীতি এবং চলতি সমাজ সেই নির্দেশিত পথেই চালু রয়েছে। মনীষী কার্লমার্কসও এই সমাজকে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় চিনিয়েছেন। এই সমাজকেই

রবীন্দ্রনাথ অনুরূপভাবে চিনিয়েছেন ঐ প্রবন্ধেই ( বিলাসের ফাঁস ) — "বণিক জাতি রাজ সিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধন দাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।"

আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসীয় আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যায় মূল তথ্যটি আমরা জানি। সেই সামাজিক শ্রেণী অর্থনীতির চেহারা রবীন্দ্রনাথ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে মোটামুটি ভাবে সঠিক চিনে নিয়েছিলেন। রচনাটি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লেখা।

প্রথম মহাযুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি মাত্র এক বছর হলো কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সেই সময়কার রচনা 'লোকহিত'। এই প্রবন্ধে তিনি সংক্ষিপ্ত হলেও দেখাতে চেয়েছেন সামাজিক অর্থনীতি ও তার বৈষম্য সৃষ্টিকে — যে দৃষ্টান্তে ও বিশ্লেষণে সেটি আমাদের চোখের সামনে এনেছেন। অন্তত সে যুগে আমাদের দেশে কোনো সমাজ উন্নয়নকামীর রচনায় বা চিন্তায় পাওয়া যাবে না। তিনি বলছেন — "ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

সমাজে দারিদ্র্য সৃষ্টির মূলে গরজকার রবীন্দ্র ভাষায় ও তত্ত্বে বুঝতে অসুবিধে নেই। অন্তত দারিদ্র্য সৃষ্টির মূলে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাখ্যা যুগিয়েছেন তার মূলে এই তত্ত্বই রয়েছে — সমাজে ধনোৎপাদন সীমিত। কিন্তু বণ্টনে রয়েছে অসাম্য। একজনে বেশি পাবে অন্যজনে কম। ধন সীমিত বলে একজনের ভাগে বেশি এলে অন্যজনের প্রাপ্যে ঘাটতি থাকে। সুতরাং রবীন্দ্র-ভাষায় যা বলা হয়েছে — 'পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া' ধনের সঞ্চয় তৈরী হয়। তা হলে যে ব্যক্তি শোষণের জালে বাঁধা পড়ে দারিদ্র্যই তার সঙ্গী — এটাই চলতি সমাজের নিয়ম। ধনী ও দারিদ্র্যের ফারাক তৈরী হয় উৎপাদিত ধনের বণ্টনে অসাম্য থাকে বলে শোষণজাত কর্ম থেকে। চালু সামাজিক অর্থনীতির এই ব্যাখ্যা — ধনসম্পদ বণ্টনেই সামাজিক বৈষম্য থাকে — এটি সমাজ পদ্ধতির দায় — ভাগ্য বা ঈশ্বরের রোষ নয় রবীন্দ্রনাথের আগে এদেশে এমন কোনো চিন্তাবিদ বা কোনো অর্থনীতিবিদ বলতে পেরেছিলেন কি এই কথা ?

প্রচলিত সমাজে সম্পদ-সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির এই ব্যাখ্যায় অন্তত আমাদের দেশে তিনিই প্রথম মনীষী অর্থনীতিবিদ না হয়েও। দুটি তত্ত্ব এই বক্তব্য থেকে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথমতঃ, পাঁচজনকে শোষণ না করলে

ব্যক্তিগত ধনের সঞ্চয় হয় না, অর্থাৎ পাঁচজনকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ শোষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়।

সমাজের দারিদ্র্যকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে উপলব্ধি করেছেন। হেমবালা দেবীকে লিখিত এক পত্রে ( চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪ ) 'আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে আমি ঠাকুর ঘর থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয় — মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলেই আমার নালিশ·····মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে দেখানো হোলো তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।'

রবীন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ উক্তি। ধর্মীয় মাহাত্ম্যের সঙ্গে দারিদ্র্যের সমঝোতা। সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের স্থায়িত্ব বিধানে শাস্ত্রবিহিত ধনাড়ম্বতার অনিবার্য্য যোগাযোগ ঐ মঠ মন্দিরে অতুল বৈভবের মধ্যেই পাওয়া যায়। কবির এই উক্তির পাশাপাশি রাখা যাবে মনীষী কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তি — 'ধর্ম হচ্ছে বিশ্বের আফিম — পীড়িতের করুণ আর্তনাদ'। কতো লক্ষ মানুষের শোষণ ও অশ্রুজলের জমাট বাঁধা বস্তু পিণ্ড মঠ মন্দিরের গুহায় নিহিত রয়েছে। ধর্মের নামে এই অবিরাম বৈষয়িক বঞ্চনায় আর্থিক শোষণও স্থায়িত্ব পেয়েছে।

ধনবণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নজর আরো দূর বিস্তৃত হয়েছে। বলেছেন, "ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়ে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। তাই, ও দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে তাহাদিগকে অল্প-স্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে 'উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও', কেহ বলে 'যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো', কেহ বা তাহাদের বাড়িতে গিয়া মিষ্টি মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহ বা আপন উদ্‌বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়" ( লোকহিত )।

উদ্ধৃতি অনেক বড়ো হয়ে গেল। কিন্তু বর্তমান ধনবাদী অর্থনীতির এই পরিচয় রবীন্দ্রনাথ যথাযথই উপলব্ধির মধ্যে এনেছিলেন। ১৯১৩ সনে রচিত এই প্রবন্ধ। তখনো ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়নি।

'চলতি অর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত আচরণ কোন পর্যায়ে চলে এসেছে তার ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথ করেছেন একই নিবন্ধে — "আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের. মহাজনের রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্র সাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ কেবল মার্কসীয় পরিভাষায় আদৃত বুর্জোয়া শব্দটি ব্যবহার করেন নি।

এই যে সমাজে ধনোৎপাদন ও ধনের বৃদ্ধি ও সেই কারণেই দারিদ্রের আবির্ভাব এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধি — এই তত্ত্বের সহজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেই আমরা প্রথম শুনলাম! যথেষ্ট অনায়াস ভঙ্গীতে সাদামাটা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সামাজিক অর্থ-বিজ্ঞানের এই তথ্য ব্যক্ত করেছেন। সে যুগে কোনো ভারতীয় রাজনীতি-বিদ্ বা ধনবিজ্ঞানী ওই ব্যাখ্যা আমাদের শোনাতে পারেন নি।

অথচ এই যন্ত্রযুগে ধন ও উৎপাদিত সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্রোর প্রসার ঘটে চলেছে এমন তত্ত্বের বাস্তব ব্যাখ্যার উপর দাঁড়িয়ে লেনিনের রুশ দেশে বৈপ্লবিক উত্থান ঘটে গেল ১৯১৭ সালে বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক সচেতন তত্ত্বর কথা শোনার কয়েক বছর বাদেই। যে ধনবৈষম্যের নির্মম অভিশাপ চূর্ণ করে ঐ বিপ্লব ঘটে যায় তার কানাঘুসো খবর নানা অপব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে পৌঁছোতে শুরু করে সেই কালেই তিনি আমাদের দারিদ্রোর আরেক অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন — শোনাচ্ছেন দারিদ্র্য পীড়িত অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট মূক পল্লী জীবনের কথা — অভিশাপ ও বঞ্চনার করুণ তথ্য। এই তথ্যের সামাজিক ইতিহাস — যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয় তার যথার্থ বিবরণ সঠিক ভাবেই প্রকাশ করেছেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন দেখিয়ে। মানুষের জীবিকার মূলস্রোতের পরিবর্তন ঘটে গেছে। রবীন্দ্রভাষায় "আধুনিক কালে যন্ত্রের সহযোগে কর্মের শক্তি যেমন বহুগুণিত হয়েছে. তেমনিভাবে লাভ বহু অঙ্কের আর সেই সঙ্গে তার লোভ। এতে করেই ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সমাজ স্বার্থের সামঞ্জস্য টলমল করে উঠছে·····এই রকম অবস্থায় গ্রামের সঙ্গে শহরের একান্নবর্তিতা চলে যায়, শহর গ্রামকে কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।" ( পল্লীপ্রকৃতি )।

তাহলে কি যন্ত্রের ব্যবহারই যতো অনর্থের মূল? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন না। তাঁর ভাবনায় — "এখনকার কলের সাধনা লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দে, শহরে গ্রামে

মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা" ( পল্লীপ্রকৃতি )। কিন্তু সম্পূর্ণতায় পৌঁছানো যাবে কল বা যন্ত্রকে বাদ দিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ঐ যে কলের কথা বলছিলুম—তাকে দিয়ে আমরা বিস্তর অকার্য করছি বলেই যে তাকে বাদ দেওয়া চলে এ কথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের প্রাণশক্তির অঙ্গ" ( পল্লী-প্রকৃতি )।

আধুনিক কালে মনে হতে পারে এবং অনেকের কাছেও তা মনে হয়েছে যে যন্ত্রই সকল বৈষয়িক সমস্যার মূলে। রবীন্দ্রনাথ আদৌ মনে করেন নি। যন্ত্রের ব্যবহারে অসামঞ্জস্য দেখিয়ে সমাজের আর্থিক বা বৈষয়িক অবস্থায় তারতম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে এসেছেন — সামাজিক অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক প্রসঙ্গে চলে এসেছেন এইভাবে — "আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক ধনী আর হাজার লোক তার ভৃত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে যন্ত্রের দ্বারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা অর্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্যানের চেয়ে। এস্থলে আমাদের এই কথাই বলতে হবে — যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্ব সাধারণে ব্যাপ্ত হয়" ( পল্লীপ্রকৃতি )

যন্ত্রকে নিয়ে মানুষের যে বহুগুণিত শক্তি — তার কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই" ( পল্লীপ্রকৃতি )।

গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক বিভেদ ঘোচাতে যন্ত্রের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। অতএব আধুনিক যুগের অর্থনীতির চিন্তায় 'উপনিষদের কবি' রবীন্দ্রনাথ উপ-নিষদের যুগে ছিলেন না আদৌ। কিন্তু যন্ত্র ব্যবহারের অত্যাবশ্যকতায় কোনো সমাজ বিপ্লবের প্রচেষ্টাকে আহ্বান করেন নি তবে উপনিষদের বানী ব্যবহার করেছেন উপনিষদের একটি শ্লোকের শেষ বাক্য স্মরণ করে —"সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু — তিনি আমাদের সকলকে সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি দ্বারা যোগযুক্ত করুন" ( পল্লীপ্রকৃতি )।

যন্ত্র ব্যবহারের সীমাবদ্ধতায় শিল্পায়নের সীমিত প্রসারে গ্রামও শহরের দ্বন্দ্ব বেড়ে উঠেছে বলে রবীন্দ্রনাথ সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আরো বলেছেন সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটিকেও প্রসারিত করে দিয়েছে — সম্পদ ও সম্পদ-হীনতার দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত সঞ্চয় কিংবা পুঁজির সঙ্গে দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব এড়াতে রবীন্দ্রনাথ

উপনিষদের বানীর সাহায্য নিয়েছেন — আহ্বান করেছেন শুভ বুদ্ধির।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন বর্তমান যুগে আমাদের সগৌরবে টিকে থাকা বেঁচে থাকার সঙ্গে শিল্পায়নের যোগ নিবিড়। আরো পরিষ্কারভাবে বৈষয়িক উন্নয়নের সার্বিক সমস্যাটিকে লক্ষ্য রেখে বলেছেন : "আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্তভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিকতে পারবো" ( লোকহিত )।

এই তত্ত্বটুকু প্রচলিত সমাজে শিল্পায়ন ব্যবস্থার অব্যবস্থাকে জেনেও রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রযুগের জয় ঘোষণা করে গেছেন। যন্ত্রযুগের অন্তর্নিহিত বিষাদটুকু এড়ানো যে দরকার — এমন পরামর্শ দিতে ভোলেন নি। যন্ত্রব্যবহারের বিপদ কে যে এড়ানো যায় এটি তিনি রাশিয়ায় গিয়ে দেখে এসেছেন এই নিবন্ধটি ( পল্লীপ্রকৃতি ) লেখার মাত্র কয়েক বছর আগে।

যান্ত্রিকতার বা শিল্পায়নের ক্ষতিকর দিকটি কী বা কোথায়, 'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। যে যন্ত্র মানুষের সম্পদ বহুগুনিত করে সেই যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয় মানুষকে জব্দ করার জন্যই — এমন একটি প্রতীকী সামাজিক ঘটনার উপস্থাপন করে নাটকটি রচিত।

শেষপর্যন্ত উৎপীড়িত মানুষগুলির বিক্ষোভের পরিণামে যন্ত্র ঘটিত দুর্দশার অবসান ঘটেছে। এই ঘটনা উপস্থাপনের মধ্যে বর্তমান যন্ত্রযুগের অভিশাপ এবং মনুষ্যসৃষ্ট ঐ অভিশাপের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষের সংগ্রাম, এবং পরিণামে যান্ত্রিকতার অপব্যবহারের অবসান ঘটলো। এমন এক কাহিনী কবি উপহার দিয়েছেন। যন্ত্র যে মানুষের কল্যাণমূলক ও বৈষয়িক উন্নয়নমূলক কর্মেই ব্যবহার যোগ্য এবং মানুষের আর্থিক সম্পদ তৈরীর উপাদান কবি সেটাই বিবৃত করেছেন।

'মুক্তধারা' নাটকে যে যন্ত্রের উপস্থাপনা করা হয়েছে সেটি কুমোর-কামারের হস্তচালিত যন্ত্রণায় — 'অভ্রভেদী লৌহযন্ত্র' — বৃহৎ শিল্পের যন্ত্র, 'চক্রমুখরমণ্ডিত' — যার মধ্যে রয়েছে 'লৌহগলন শৈলদলন অচল চলন মন্ত্র।' নাটকটির রচনাকাল ১৯২১ সন। ১৯১৭ সনে শ্রমশক্তির নেতৃত্বে সফল বিপ্লবের পরিণতিতে সোভিয়েত রাশিয়ায় বৃহৎ যন্ত্রের অপব্যবহার দমিত হয়েছে।

যন্ত্র যদি সত্যই অচল চলন মন্ত্রের জন্ম না দিয়ে সমাজ সংসারের অতি-প্রয়োজনে বাধার সৃষ্টি করে — জীবন ও জীবিকার অগ্রগতি রুদ্ধ করে দেয়, তাহলে সে যন্ত্র সবচেয়ে বড় অভিশাপ রূপে দেখা দেয়। প্রচলিত ধনতান্ত্রিক

সমাজে এটাই ঘটে থাকে।

শিল্পায়নের যন্ত্রের অপব্যবহার বন্দী করে রাখে বর্তমানে আকাঙ্ক্ষিত মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে। রুদ্ধ করে রাখে মানুষের প্রত্যাশিত মহত্তর উত্তরণের পথ। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি পেলেও দু'বেলা ক্ষুধার অন্ন এখনো বিশ্বের সকল মানুষের সামর্থে জোটে না।

এর জন্য আপাত দৃষ্টিতে দায়ী করা হয় যন্ত্রকে। যন্ত্রবিরোধী, অগ্রসর-মান সভ্যতা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা হয়।

যন্ত্র যখন মানুষের বহুগুণিত শক্তি সেই শক্তির অধিকারে ভেদাভেদ থাকা দরকার। সেই শক্তির দখল যখন কেবল সীমিত সংখ্যক মানুষের ভোগে নিয়োজিত এবং অন্য সব মানুষের অধিকার ও দাবিকে নস্যাৎ করে দেয় সেইটাই অন্যায়।

মুক্তধারা নাটকের বিদ্রোহী মানুষেরা বিশাল যন্ত্রদ্বারা রচিত জলাশয়ের বাঁধটিকে ভেঙ্গে দিয়েছে — যে বাঁধ মানুষের তৃষ্ণার জল. প্রাণ বাঁচানোর জল, শস্য ফলনের জল আটকে রেখে দেয় — সকল মানুষের ব্যবহারে আসে না — সেই সর্বনাশা বাঁধটি চূর্ণ করেছে বিদ্রোহী মানুষেরা।

এই বিদ্রোহকেও রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিলেন। বিদ্রোহী মানুষ যন্ত্রটি ভাঙ্গেনি — ভেঙ্গেছে যান্ত্রিক অপব্যবহারের নমুনাটি।

এই বিদ্রোহের সমর্থনে 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ বলছেন.

একথা মানি যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের মতো সে বিষও উদগার করে। ...কিন্তু এজন্য প্রকৃতি দত্ত শক্তি সম্পদকে দোষ দেব না. দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুর গাছ. তাল গাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তাল গাছকে মারলে নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে শুদ্ধ টান মারেনি। উল্টে যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সুগম করে দিয়ে লোকের কারণটাকে সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।"

এই রচনা ১৯২১ সালের। ১৯২১ সালে লেখা 'মুক্তধারা' নাটকের বিদ্রোহী চরিত্ররা যন্ত্রকৃত অপকর্মের বিনাশ ঘটাচ্ছে যন্ত্রকে অটুট রেখে। তখন সোভিয়েত বিপ্লব হয়ে গেছে। সভ্যতার সম্ভাবনাময় নতুন এক স্তরের উদ্ভব ঘটেছে। সভ্যতার এই পরিবর্তিত স্তরে শিল্প ও যন্ত্রকে অক্ষুন্ন রেখে যন্ত্রায়ন

P 10,489

বা শিল্পায়নের বিপদকে ঘুচিয়ে দেওয়ার অবিরাম সাধনা চলছে। এটি তারই উল্লেখ।

শিল্পায়ন প্রয়োজন ও শিল্পায়ন অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গদেশে শিল্পায়ন ব্যাহত হতে চলেছে — এই খেদ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। তাই, সে যুগে বঙ্গভূমির শিল্পায়ন সমস্যা নিয়েও তাঁকে ভাবনা চিন্তায় রত হতে দেখা গেছে — কেন না শিল্পায়নে অন্য অনেক বিপদ থাকলেও তার প্রসারে বহুগুণিত সৃষ্টি মানুষের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগানো সম্ভব হয় — শিল্পায়নকে এড়িয়ে তা হয় না।

সমাজে আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পায়নের অবধারিত যোগসূত্র রয়েছে। আধুনিক অর্থনীতির প্রগতি পথে শিল্পায়নকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। অর্থনীতি চিন্তার এই বিশেষ দিক — অর্থনৈতিক শিল্পায়ন চিন্তার গুরুত্ব তার উপলব্ধির বাইরে নেই।

বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদায় 'বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত' শিরোনামের প্রবন্ধে বঙ্গদেশের ব্যাহত শিল্পায়নের প্রসঙ্গটি তিনি এনেছেন। শিল্পায়নের বাধাপ্রাপ্ত পরিবেশে তাঁর উচ্চারিত ক্ষোভ — 'এদেশে ধনের কেবল ভাগ হয়, গুণ হয় না'। এ-কথার অর্থ হলো ধন বহুগুণিত হতে পারে কিন্তু বহুগণিত হবার পরেই তার ভাগ বা বণ্টন হওয়া উচিত। ধনের ভাগ যেটি বণ্টিত হয় সেটি সামাজিক ধন। সামাজিক ধন বহুগুণিত হয় না। 'ধনের গুণ হয় না' — বলে যে আক্ষেপ করেছেন এটি সামাজিক সম্পদ — সর্ব সাধারণের জন্য বণ্টিত সম্পদ। এই সম্পদের বৃদ্ধির পথে বাধা রয়েছে। প্রচলিত অর্থনীতি ব্যবস্থায় এই ফাঁক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কলঙ্ক বলেই তিনি মনে করেন। প্রসংগত তিনি আরো বলেছেন :

"আজকের দিনে পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা আপন অঙ্গের বহু বিস্তার ঘটেছে। তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহু দেহ···যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগণিত করেছে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিকলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।"

উপরের প্রসঙ্গটি অবশ্যই বঙ্গভূমির আর্থিক দুর্দশা — বিশেষ করে যন্ত্রসহায়ক অর্থনীতির বিকাশের অভাব নিয়ে আক্ষেপ। এই আক্ষেপ প্রায় সত্তর বছর আগের প্রসঙ্গ। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির যে দায় সেদিন ছিল, আজ রবীন্দ্রনাথ নেই কিন্তু সেই পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে নি।

তবে এক্ষেত্রে সঙ্গত ভাবেই আলোচনা উঠতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেভাবে বঙ্গভূমির শিল্পায়নজনিত আর্থিক বিকাশের বিশ্লেষণ করেন তার বৃহৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপেক্ষিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে চলমান অতীতের ধারাটিকে তিনি নিশ্চিত ভাবে এখনও চিহ্নিত করতে পারতেন। সেদিনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐক্য ব্যাহত হতে পারে সম্ভবত এই আশঙ্কায় বঙ্গের আঞ্চলিক শিল্পায়নগত প্রতিযোগিতাসঙ্গত উন্নয়ন পথে এগুনো সম্ভব হয়নি — প্রয়োজনমত আর্থিক বিকাশও ঘটেনি বলে কবির আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে। পরাধীন ভারতে প্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করে ব্যবস্থা নিলেন সেদিনকার দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র। তাঁর সহযোগী ছিলেন ডঃ সাহা। তিনিই তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। সুভাষ চন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তাঁরই অনুরোধে পণ্ডিত জওহরলাল হলেন পরিকল্পনা সমিতির পুরোধা। এই উদ্যোগে নামার আগে বিজ্ঞানী মনীষি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন ১৯৩৮ সনে। সে আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন।

বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ছিল, এই ব্যাপারটি নেহাৎ কোনো ভাববাদী ব্যাখ্যার অন্তর্গত নয়। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এক দৃঢ় অর্থনৈতিক আদর্শের অনুগামী ছিলেন। সেটি সমবায় ব্যবস্থার অর্থনীতি। সার্বিক সামাজিক অর্থনীতির এক চরম দৃষ্টান্ত সমবায় ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতির ভাবনা সামগ্রিক ভাবে সামাজিক গুণান্বিত। প্রচলিত অর্থনীতির নিয়মে সমাজে উৎপাদিত ধনের সামাজিক বণ্টনে বৈষম্য রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।

সমবায় নীতিতে সম্পদভাগে বৈষম্য হয় না। তাই সমবায় রীতিনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে কলম সে যুগেও অন্যপ্রদেশের তুলনায় বাংলায় নিজস্ব শিল্পায়ন চেষ্টা ব্যার্থ্য বলে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় রাজনৈতিক উদ্যোগে চরকা-সম্বল অর্থনীতির বাহুল্যকে তিরস্কার করেছেন। এমনকি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সঙ্গে বিতর্কেও নেমেছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ রয়েছে। বঙ্গের শিল্পায়নে এই বিরোধের প্রসঙ্গটিও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গটি বৃহৎ শিল্পায়ন এড়িয়ে চরকা সম্বল অর্থনীতির। বলেছিলেন ঃ

"বোম্বাই প্রদেশে একথা বললে ক্ষতি হয়না যে চরকা ধরো। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরকা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে, বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে ঐ কলের চরকা.....বাংলাদেশের হাজার চরকাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তাহলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বায়ের কলের চরকার পায়ে। তাতে বাঙলার দৈন্যও বাড়বে।"

অন্তত এই বঙ্গভূমিতে সেদিন বৃহৎ শিল্পায়ন এড়িয়ে কেবল কুটির শিল্পের সীমিত সামর্থ্য গড়ে তোলায় আর্থিক শক্তি নিঃশেষ করে ফেলায় কবির আপত্তি ছিল।

রবীন্দনাথকে যথার্থই চিনেছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য ধরেছিলেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এবং গুরুত্ব দিয়ে / বিভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ভাষণগুলি মুদ্রিত হয়েছে। এবাদে অনেক প্রাসঙ্গিক নিবন্ধে সমবায়ের মূলতত্ত্ব দেশ ও সমাজের আর্থিক উন্নতির উপায় হিসাবে তিনি সুপারিশ করেছেন। এমনকি পারিবারিক জমিদারীতেও এবং পরে বিশ্বভারতীর কর্মপ্রয়াসে নানা ধারায় সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োগে সক্রিয় হয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমবায়ের তত্ত্ব ও তার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যক্তি মুনাফাকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রে সেই চেষ্টা সার্বিকভাবে সাফল্য লাভ করেনি। তবু তাঁর অনুসৃত কর্মধারায় ঐতিহাসিক ও তত্ত্বগত মূল্য রয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'তে কবিগুরুর এই সব প্রয়াসের বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক সূত্র ধরে জানিয়েছেন :

"রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে সমবায় শক্তি জাগরুক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই।"

এই হিসাবে কবিগুরুই আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত।

'বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতির' প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় এবং সমবায় সমিতি রূপে পরিকল্পিত 'হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানি' প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গী সমবায় সংগঠন সমিতির মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকার একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেম। এই পত্রিকায় সমবায় সংক্রান্ত রচনাও প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শন কালে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সমবায় ব্যবস্থার পরিচালনা দেখতে কৌতূহলী ও উৎসুক ছিলেন। সে দেশে সমবায়ের সাফল্য কবিকে যথেষ্ট উৎসাহিত করে — 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে। এই সূত্রেই তিনি ভারতে সমবায় ব্যবস্থার সাফল্য কামনা করে বলেন : "আমাদের দেশে পল্লীতে পল্লীতে ধনউৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায় নীতির জয় হোক — এই আমি কামনা করি।"

রবীন্দ্র মানসে সমবায় আদর্শের প্রেরণা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শোনা যাক : "আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায় তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময়ে আয়ার্লণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E. রচিত National Being বইখানি আমার হাতে পড়লো। সমবায় জীবিকার এক বৃহৎ বাস্তবরূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবন যাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।" ( সমবায়নীতি-পরিশিষ্ট )।

বিশ্ব ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় সমবায় নীতির প্রসঙ্গে কেন ওঠে ? আসলে অর্থনীতির এই পথে আর্থিক সংকট ও ভারসাম্যহীনতা সমাজ জীবনকে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে অভিশাপ ও বঞ্চনার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কবিগুরুর দৃষ্টিতে তা এড়ায় নি।

আজকের কথা নয়, ১৯১৯ সালেই রবীন্দ্রনাথ সমবায় সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যক্ত করেছিলেন :

"যন্ত্র সহায় পুঞ্জীভূত ধন আর সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে, সাধারণ মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে। এই অসামঞ্জস্যের সুযোগটা যাদের পক্ষে তারাই অপর পক্ষকে একেবারে অন্তিমযাত্রা পর্যন্ত দলন করে নিজের অতিপুষ্টি সাধন করে এবং ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠে সমাজদেহের ভার-সামঞ্জস্যকে নষ্ট করতে থাকে।" ( সমবায় নীতি—২ )

এই যে ভারসাম্যহীনতার সংকট রবীন্দ্রনাথ যা অনুভব করেছিলেন এবং বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার জানিয়ে ছিলেন সেই সংকটে আবর্তিত ধনবাদী অর্থনীতিকে ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় বিভিন্ন ধনবিজ্ঞানী বিভিন্ন সূত্র ও আংশিক সমীকরণের সন্ধান দিয়েছেন।

অ্যাডাম স্মিথের পর থেকে অন্তত আটজন ধনবিজ্ঞানীর নাম করা যায়

(কার্লমার্কস বাদে) যাঁরা চলতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ভারসাম্যে জীইয়ে রাখার ভাবনায় নানান আংশিকসূত্র ও সমীকরণ রচনায় বিস্তর মাথা খাটিয়েছেন। এঁরা হলেন উইলিয়ম জীভনস, কার্ল লেংগার, লিঁয়ো ওয়ালরাস, ভিলফ্রেডো পারেটো, ক্লুট উইকসেল, আলফ্রেড মার্শাল, জন মেনার্ড কেইন্‌স এবং সর্বশেষ আবির্ভাব রবার্ট লুকাস, বছর দুই আগে যিনি অর্থনীতি শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

একটার পর একটা সূত্র রচিত হয়েছে, কিন্তু ধনবাদী অর্থনীতির রবীন্দ্রকথিত বা চিহ্নিত অর্থনীতিতে ভার সামঞ্জস্যহীনতার অবসান ঘটেনি। নানান আংশিক সূত্র রচনা করে এঁরা সকলেই বলতে চেয়েছে চলতি ধনবাদী অর্থনীতি ভারসাম্যহীন নয় — তাঁরা গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ধারণমত অর্থনীতি ব্যবস্থায় ভারসাম্যের তত্ত্ব ( থিয়োরী অফ ইকুইলিব্রিয়াম )। কিন্তু ১৯১৯ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের লেখা — "এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে সাধারণ মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে।"

শতাব্দী পেরিয়ে গেল নতুন সহস্রাব্দে এসে আমরা কি এখন বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে ?

সামাজিক দুঃখের মৌল কারণ প্রচলিত অর্থনীতির মধ্যেই রয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ সেই বিরোধ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে সামাজিক সংকট। পণ্যের উৎপাদন বাড়লে ধনবৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ধনের বণ্টনে রয়েছে প্রচণ্ড অসাম্য। মানুষের যথোপযুক্ত শ্রম মূল্যের পাওনা ফাঁকি পড়ে। আসে ক্রয়ক্ষমতাহীনতা। এরই পাশাপাশি ধনের পুঞ্জীভূত দাপট রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি।

মার্কসীয় পরিভাষায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো উৎপাদন ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ। শ্রমিক তার মালিকের কাছ থেকে যথার্থ শ্রম মূল্য পায় না। শ্রম শক্তির পাওনা অনেকখানি ফাঁকি পড়ে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ধন বণ্টনে অসাম্য। এই অসাম্য দূর হতে পারে সমবায় ব্যবস্থায়।

এবার রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতি নজর দেওয়া যায় : আজকালকার দিনে অর্থ শক্তি বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্ম শ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি

নিয়ে আছে ( সমবায় নীতি—১৩৩৫ )

এই বক্তব্যের শেষ লাইনেই কিন্তু বলা হয়েছে শ্রমিকের পাওনা ফাঁকি দিয়ে যে সম্পদ তৈরী হয় তার মধ্যে রয়েছে 'বহু লোকের কর্ম শ্রম'।

মণীষি কার্ল মার্কসের 'লেবার থিওরী অফ ভ্যালু' তত্ত্বের মৌল বক্তব্য কি রবীন্দ্র ভাষায় ব্যক্ত হলো না ?

"সমবায়' নামক প্রবন্ধে ( ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হলো : 'ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায় — ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না।"

এই সব উক্তি ও সিদ্ধান্ত থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো সমাজে আর্থিক অসাম্য, ধনের পুঞ্জীভবন, সম্পদ শক্তির জোরে উৎপাদনের হাতিয়ার দখল করে বহু মানুষের শ্রমকে কিনে নেওয়া হয় এবং বহু মানুষের শ্রমকে বঞ্চনা মারফৎ ব্যক্তিগত মূলধনের উৎপত্তি।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতে রয়েছে :

"অতিকায় ধনের শক্তি বহু কায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে — এমন দিন এসেছে।" ( সমবায়—১ )।

বলা বাহুল্য সমাজ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই তা সম্ভব যেখানে শ্রমমূল্য থেকে শ্রমজীবী মানুষ বঞ্চিত হয় না।

সেদিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথের নজরে এসেছিল এই তথ্য।

# পরশুরামের চাটুজ্যেমশায়

## রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অনেক আজব চরিত্র তৈরি করেছিলেন পরশুরাম। তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় বোধহয় চাটুজ্যেমশায়। এঁর পিতৃদত্ত নাম কেদার ( চাটুজ্যে অবশ্য খাঁটি ঘটি কায়দায় উচ্চারণ করেন 'ক্যাদার' )। বংশলোচনবাবু বৈঠকখানায় সকলেই তাঁকে বলেন 'চাটুজ্যেমশায়'। মানিনী দেবীও রাগ করে তাঁকে 'চাটুজ্যে মিনসে' ছাড়া আর কিছু বলেন না।

বেলেঘাটার ঐ আড্ডায় চাটুজ্যে কী করে জুটলেন তা কখনোই বলা হয় নি।[১] বয়সে তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক বড়। বংশলোচনবাবু তাঁকে 'বিচক্ষণ' বলে সম্মান করেন ; বাকিরাও খাতির করেন খুব। ছটি মাত্র গল্পে তাঁকে দেখা যায়। তার মধ্যে দুটিতে — "লম্বকর্ণ" আর "গুরুবিদায়" — তাঁর ভূমিক' তেমন কিছু নয়। "রাতারাতি" গল্পেও তাঁর খুব একটা কিছু করার নেই — যা করার তা করে কার্তিক আর তার বন্ধুরা।

তার মানে, তিনটি মাত্র গল্পে চাটুজ্যেমশায় আছেন প্রধান ভূমিকায়। সে-ভূমিকা কথকের, গল্প-বলিয়ের। এ আড্ডায় ছেলেমানুষ কেউ নেই, তবু গল্প শোনার নেশা আছে সবারই। আড্ডায় নানা বিষয়ে কথা হয় বটে, তবে আসল টান গল্পের — তা সে যত আজগুবিই হোক। মায় বিনোদ উকিলের মতো 'তীক্ষ্ণবুদ্ধি' লোকও গল্পের ফরমাশ করেন চাটুজ্যেমশায়ের কাছে। ( তবে অন্যদের মতো অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক গল্পে একমাত্র বিনোদ উকিলেরই রুচি নেই )।[২]

সার্থক কথক, গল্প বলার শিল্পে সাক্ষাৎ তানসেন — এইটেই চাটুজ্যে-মশায়ের একমাত্র বিশেষত্ব। বেলেঘাটায় বাস করলেও তাঁর দেশ মজিলপুরে ( এখনকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় )। অতীতে কোনোদিন চাকরি-বাকরি বা অন্য ধরণের কাজকর্ম করেছেন কিনা তা জানা যায় না। মনে হয়, এখন তাঁর অবসর জীবন চলছে। কিন্তু তার আগে কী করতেন তা জানার কোনো উপায় পরশুরাম রাখেন নি। তবে মাস্টারি বা কলম পেষার কাজে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত। মানুষটি মনেপ্রাণে রক্ষণশীল ; দেশাচার লোকাচারের বাইরে কোথাও যান না। পাঁজি দেখে বলেন, 'রাত্রি ন'টা সাতান্ন মিনিট গতে

অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না' ( "স্বয়ম্বরা" )। শীতের সকালে ট্রেনের কামরায় এক মেম যখন বলেন, 'চ্যাটার্জি, তুমি [ চা, রুটি, মাখন ] খাবে ? আপত্তি নেই তো ?' তখন চাটুজ্যেমশায়ের প্রতিক্রিয়া হয় এইরকম :

> মহা ফাঁপরে পড়া গেল। ম্লেচ্ছ নারীর স্বহস্তে মিশ্রিত, কিন্তু ভুরভুরে খোশবায়, শীতটাও খুব পড়েছে। শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই। তা ছাড়া রেলগাড়ির মতন বৃহৎ কাষ্ঠে ব'সে শীত নিবারণের জন্যে ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয়ই দোষ ন স্তি।[৩] বললুম — ম্যাডাম লক্ষ্মী, তুমি যখন নিজ হাতে চা দিচ্ছ, তখন কেন খাব না। তবে রুটিটা থাক। ( "স্বয়ম্বরা" )

নিজের ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে তিনি খুব সচেতন। মেম যখন জানতে চান, 'তুম কোন্ হ্যায় বাবু ?', তাঁর আত্মমর্যাদার ঘা পড়ে। মনে হয় : তিনি কি সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু। তাই বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া করে বলেন, 'আই কেদার চাটুজ্যে . নো জু-গার্ডেন।' মেম আবার জানতে চান, 'বেঙ্গলী ?' সগর্বে তিনি উত্তর দেন, 'ইয়েস সার, হাই কাস্ট বেঙ্গলী ব্রাহ্মণ'। তারপরে প্রমাণ হিসেবে পৈতেটা টেনে বার করে বলেন, 'সী ?' ( বাঙালিত্বের আবেগে মেমকে 'সার' বলে ফেলা — এও দেখবার )।

চাটুজ্যেমেশায় যখন বকুলালের মনের ( "দক্ষিণরায়" ) কথা গড়গড় করে বলে চলেন, বিনোদ উকিল জিগেস করেন তিনি সেসব জানলেন কী করে। চাটুজ্যের উত্তর :

> 'সে তোমরা বুঝবে না। কলিকাল, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ দু-চারটি এখনও আছেন। গরিব বটি, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানতে পারি, মনের কথা তো কোন্ ছার।'[৪]

গড়পড়তা আর দশজন কাঙালির মতো চাটুজ্যেমশায়ও ভূত ভগবান ইত্যাদি সব মানেন। খানিক বিরক্ত হয়েই তিনি বলেন, 'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত-পেত্নী — এঁরাও আছেন। বেহ্মদত্যি, কঙ্ককাটা — এরাঁরাও আছেন'। ( ক্রিয়াপদের শেষে সম্ভ্রমসূচক 'ন'গুলো লক্ষ্য করার মতো )।

CENTRAL LIBRARY

এইরকম একটি হাস্যকর চরিত্রকে দিয়ে চারটি গল্প বলিয়েছেন পরশুরাম। তার তিনটি অলৌকিক ( দুটি বাঘ ও একটি ভূত নিয়ে ), আর একটি লৌকিক ( যথাক্রমে "লম্বকর্ণ", "দক্ষিণরায়", "মহেশের মহাযাত্রা", আর "স্বয়ম্বরা" )।

এর মধ্যে "স্বয়ম্বরা" গল্পটি বিশেষ করে দেখার মতো। ভূত বা বাঘের বেলায় চাটুজ্যেমশায় অন্যের 'অভিজ্ঞতা'র কথা বলেন। ফ্রেম-গল্পের ভেতরে যে মূল কাহিনীটি থাকে সেখানে চাটুজ্যেমশায়ের কোনো ভূমিকা নেই — তিনি সর্বজ্ঞ বিবরণদাতা। "স্বয়ম্বরা"-য় কিন্তু তিনি নিজেই মূল কাহিনীর চরিত্র : এক সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল — তার বিবরণ শোনা যায় তাঁর নিজের মুখ থেকেই। গল্পটি লৌকিক হলেও তার মধ্যে মজার অভাব নেই। জোন জিল্‌টার ( নামটি খাসা, কেননা এক-একজন পাণি-প্রার্থীকে 'জিল্‌ট্', jilt অর্থাৎ হঠাৎ ত্যাগ করাই যার স্বভাব )-এর এক প্রেমিক, ক্রিস্টফার কলম্বাস ব্রটো হামবড়াই করে চাটুজ্যেমশায়কে বলে, 'আমার দশ কোটি ডলার আছে, প্রতি মিনিটে আমার আয় — '। চাটুজ্যে আর তাকে কথা শেষ করতে দেন না। মাতালকে ঘাঁটাবেন না বলে সবিনয়ে নিবেদন করেন, 'হজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি।' জোন-এর আর-এক পাণিপ্রার্থী, টিমি টোপার ( toper মানে পাঁড় মাতাল ) বলে, 'আমার অগাধ সম্পত্তি, পাঁচটা হোটেল, দশটা জাহাজ কোম্পানি, পঁচিশটি শুঁটকি শুওরের কারখানা। ব্রটোর কি আছে ? একটা মদের চোরা ভাঁটি, তাও আমার টাকায়।' ( 'চোরা ভাঁটি' বলতে আমেরিকায় Prohibition, মদ তৈরি বন্ধের দিনগুলো ( ১৯২০-৩৩ ) বোঝাচ্ছে )।

লৌকিক বিষয়ে গল্প হলে, আজগুবির অভাব নেই "স্বয়ম্বরা-"য়। বিল বাউণ্ডার ( চলতি ইংরিজিতে bounder বলতে বোঝায় অশিষ্ট, অসম্মানীয় লোক ) নিজের সম্পত্তির হিসেব দাখিল করে ; তার আয় 'মিনিটে দশ হাজার [ ডলার ], ঘণ্টায় ছ'লাখ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমার মাসী মারা গেলে আয় আর একটু বাড়বে। তার পঁচিশটি বড় বড় পুকুর আছে, নোনা জলে ভরতি, তাতে তিমি মাছ কিলবিল করছে।' এসব চরিত্র চাটুজ্যেমশায়ের কপালেই জোটে ! অবশ্য যাঁকে 'সাপে তাড়া করেছে, বাঘে পেছু নিয়েছে, ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিশ কোর্টের উকিল জেরা করেছে', তাঁর পক্ষে এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

অলস মেজাজের আড্ডা, উদ্ভট সব গল্প, অবিশ্বাস্য ব্যাপারেও প্রশ্নহীন

আগ্রহ — এমন সব ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে রাজশেখর বসুকে যুক্ত করা শক্ত। তিনি নিজে আড্ডাবাজ ছিলেন না, পার্শিবাগান লেনে উৎকেন্দ্র সমিতি-র বৈঠকে তিনি বড় জোর শ্রোতা হিসেবে হাজির থাকতেন।[৫] বংশলোচনবাবুর আড্ডাধারীদের মধ্যে একমাত্র বিনোদ উকিলের সঙ্গে তাঁর স্বভাবের মিল দেখা যায়। বাকি সকলেই অপরিণত, অন্ধবিশ্বাসী, সব দিক দিয়েই পাঠকের মজার খোরাক। বাঘের গল্প শুনতে শুনতে কেউ এমন মজে যায় যে রোমাঞ্চিত হয়ে বলে ফেলে 'দক্ষিণরায়', কেউ বা যে-কোনো প্রসঙ্গে নিজের বউ-এর রূপগুণের কথা টেনে আনে। আর আড্ডার কেন্দ্র, বংশলোচনবাবু তো দাম্পত্য-সম্পর্ক বিষয়ে সদা চিন্তিত। অথচ এঁদের নিয়ে ( বা এঁদের মতো অন্যদের নিয়ে ) পরশুরাম বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন। সেসব গল্পের সত্যিমিথ্যে নিয়ে প্রশ্ন তোলা বেরসিকের কাজ। বিনোদ উকিল মাঝে মাঝে দু-একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেন বটে, তবে তিনিও সর্বদিন চাটুজ্যেমশায়কে বেশি ঘাঁটান না। কেননা : বাধা দিলে ব্রাহ্মণ চটে যাবে। "স্বয়ম্বরা" গল্পে বুটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে পারে, 'আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতক পক্ষী আর এই মেম ছিল একটি রূপসী পানকৌড়ি'। কেউ জানতে চায় না চাতক আর পানকৌড়ির ইংরিজি নাম কী ? চাটুজ্যেমশায় নিজেই বলেছিলেন, 'ইংরিজী ভাল জানি না', তবু সায়েব-মেমদের অত কথা তিনি বুঝলেন কী করে ? এমন প্রশ্ন তোলা বেরসিকের লক্ষণ।

এসবই অবশ্য গল্পের খাতিরে মেনে নেওয়ার ব্যাপার, নইলে রসভঙ্গ হবে। এর জন্যে একধরণের 'স্বেচ্ছায় অবিশ্বাস চেপে রাখা' ( উইলিং সাসপেন্‌শন অফ ডিসবিলিফ )-এর দরকার পড়ে।[৬] গল্পের মজাটাই আসল — অস্বস্তিকর প্রশ্ন না তোলাই তাই নিয়ম। বোধহয় তার জন্যেই পরশুরাম বেছে নিয়েছিলেন এমন এক বক্তা আর শ্রোতার দল, যাঁদের কিছুই মানতে বাধে না ; অলৌকিকে আপত্তি তো নেই-ই, বরং আগ্রহ আছে বিলক্ষণ। তবু মাঝে মাঝে একটু উল্‌টো সুর লাগান বিনোদ উকিল ফলে অতিপ্রকৃত ব্যাপার-স্যাপার পাঠকের কাছে যদি অবিশ্বাস্যও হয়, তবু গল্পের মজাটা পাওয়া যায় ষোলো আনা ছেড়ে আঠেরো আনা। ( বক্তা বা শ্রোতা — কেউই যদি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস না করেন, তবে গল্প জমবে কী করে ? ) তার জন্যেই পরশুরামকে তৈরি করতে হয় চাটুজ্যেমশায়ের পাশাপাশি বংশলোচনবাবু, নগেন আর উদয়কে ( নামসংক্ষেপে 'উদো' )।

শুধু এইটুকু বললেই কিন্তু সব বলা হয় না। গল্প বলানো ছাড়াও

চাটুজ্যেমশায়কে দিয়ে আরও কিছু কাজ করিয়ে নেন পরশুরাম। সেগুলো যে-কাউকে দিয়ে করানো সম্ভব ছিল না — চাটুজ্যেমশায়ের মতো একজন আধা-গ্রাম্য-আধা শহুরে আধা বিচক্ষণ-আধা অবোধ লোকের দরকার পড়ত। তার ফলেই চাটুজ্যে হয়ে ওঠেন তিন মাত্রার এক আস্ত মানুষ।

মানিনী দেবীর মন্ত্র নেওয়ার শখ হয়েছে। বংশলোচনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'আমি চাটুজ্যেমশায়ের সঙ্গে এখনই পরামর্শ করছি।' শুনে চাটুজ্যেমশায়ও বলেন, 'বউমার সংকল্প অত্যন্ত সাধু. তবে একটি সদ্‌গুরু দরকার।' সদ্‌গুরুর নমুনা হিসেবে তিনি হাজির করেন তাঁর কুলের গুরুপুত্তুরকে : 'সেকেলে মানুষ, শাস্ত্রটাস্ত্র জানেন না বটে, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসাকে বজায় রেখেছেন।' পৈতে পরা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ হলেও চাটুজ্যেমশায় ব্যবসাকে ব্যবসা বলে মেনে নেন। তাঁর এই সরল স্বীকারোক্তি পরশুরামের কাছে পুঁজিবিশেষ। গুরুগিরিকে তিনি এই ভাবে খেলো করে দেখাতে পারেন।

আবার মানিনীদেবী যখন তাঁর হবু গুরুর এঁটো আখের ছিবড়ে 'পরম ভক্তি সহকারে' চুষতে শুরু করেন তাতে বংশলোচনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্যেমশায়ও বিচলিত হন : 'তাই তো বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে।' খল্বিদং স্বামীর বিদায়ের মুহূর্তে তিনিই তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'যা বলেছ দাদা। এই নির্বান্ধব-পুরে দুশমনের হাতে কেন প্রাণটা খোয়াবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, বেঁচে থাকলে অনেক শিষ্য জুটবে। এস, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।' এমন ভঙ্গিতে কথা বলে, সূক্ষ্ম বিদ্রূপের এমন সুচারু প্রয়োগে চাটুজ্যেমশায় এসে দাঁড়ান অবিশ্বাসী বিনোদ উকিলেরই পাশে।

পরাধীন জাতির আত্মগ্লানিও ফুটে ওঠে চাটুজ্যেমশায়ের কথায়। জোন জিল্‌টার-কে আশীর্বাদ করে তিনি বলেন, 'মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক। বীরপ্রসবিনী হয়ে কাজ নেই মা — ও আশীর্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যেই তোলা থাক। তুমি আর গরিব কালা আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না, — গুটিকতক শান্ত শিষ্ট বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।'

১৮৯০—১৯০০ নাগাদ দেশের হাল সম্পর্কে তিনি বলেন :

> 'তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয় নি,' দু-একটা পাশ করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচু দরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত — বউ

ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত — ভগবান আছেন কি নেই।' ( "মহেশের মহাযাত্রা" )

বউ/ভগবান, ভালোবাসা/ভক্তি প্রেমতত্ত্ব/ধর্মতত্ত্ব — এমন গুরুচণ্ডালী সমাবেশ হাসির এক চমৎকার উপাদান। পরশুরামের কৃতিত্ব এই যে এমন বিপরীতধর্মী ভূমিকায় ( একই সঙ্গে অবোধ আর বিচক্ষণ ) চাটুজ্যেমশায়কে হাজির করেও তাঁর চরিত্রের সঙ্গতি কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেন নি। সব মিলিয়েই চাটুজ্যেমশায়কে ধরা যায়, চেনা যায়। বিশেষ করে রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলে — আজকের নয়, ১৯২৩—৩০-এর যুগের — বিদূষকের প্রধান বাহন হয়ে ওঠেন চাটুজ্যেই। ধরা যাক, "দক্ষিণরায়"-এর বকুবাবুর কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে 'একই মাল পাঁচবার চালান দিয়ে' তিনি বড়লোক হলেন। ধুলো-মুঠো সোনা-মুঠো হতে লাগল।' তিনি যেদিন 'পঞ্চান্ন বৎসরে পড়লেন, সেই রাত্রে বঙ্গমাতা তাঁকে বললেন — বৎস বকু, বয়স তো ঢের হ'ল, টাকাও বিস্তর জমিয়েছ। কিন্তু দেশের কাজ কি করলে ? বকুলাল জবাব দিলেন—মা, আমি অধম সন্তান, বক্তৃতা দেওয়া আসে না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যেতে পারি না, খদ্দর আমার সয় না — সুখের শরীর — দেশী মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর — বোমা দূরে থাক, — একটা ভুঁই-পটকা ছোঁড়বার সাহসও আমার নেই। কি কর্তব্য তুমিই বাতলে দাও। খাটুনির কাজ আর এ বয়সে পেরে উঠব না, সোজা যদি কিছু থাকে তাই ব'লে দাও মা। বঙ্গমাতা বললেন — কাউনসিলে ঢুকে পড়।' [৯]

মনে রাখতে হবে, এসব কথা আসছে বাঘ নিয়ে এক অলৌকিক গল্পের ভেতরে। যাই হোক, বকুবাবু এবার এক 'মাতব্বর সায়েব'কে পাকড়ালেন, তাঁকে জানালেন, 'তিন হাজার টাকা [ তিনি ] ড্রানকেন সেলার্স হোমে দিতে রাজী আছেন যদি গবরমেণ্ট তাঁকে কাউনসিলে নমিনেট করে। সায়েব বললেন — টাকা তিনি গ্রাডলি নেবেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না, কারণ গবরমেণ্ট যার-তার কাছে ঘুষ নেয় না।' ( মানে : বকুবাবু এমনই তুচ্ছ লোক যে তাঁর কাছ থেকে ঘুষ নিলে ব্রিটিশ সরকারের জাত যায়, আরও উচ্চলোকের কাছ থেকে অবশ্য ঘুষ নিতে বাধা নেই )। বংশলোচনবাবুর এখানে হাঁই হাঁই করে ওঠার কথা, কেননা গল্পের গোড়াতেই তিনি চাটুজ্যেমশায়কে বলে রেখেছিলেন, 'বেশী সিডিশস [ = রাজদ্রোহী ] কথাগুলো বাদ দিয়ে বলবেন।' কিন্তু গল্পে মজে যাওয়ার দরুনই বোধহয় এমন সিডিশস মন্তব্যও তিনি আর খেয়াল করেন নি।

একইভাবে তখনকার দেশনেতাদের নিয়ে পরশুরামের বিদ্রূপ চলতে থাকে। প্রথমে আসেন 'একজন রাজনীতিক চাঁই'। নিখিল-বঙ্গীয়-সর্পনাশক ফাণ্ড-এর জন্যে বকুবাবুর কাছে তিনি লাখ টাকা দাবি করেন। ইলেকশনে (১৯২৩-এর কাউনসিল নির্বাচন) দাঁড়ানোর জন্যে বকুবাবু যে-কোনো দলে ঢুকতে রাজি ছিলেন; তার ক্রীড-এ কী লেখা আছে তা না দেখেই সই করতেও তৈরি। কিন্তু 'চাঁই মশাই'-এর মুখে 'দুত্তোর ক্রীড, আগে লাখ টাকা…' শুনে তিনি মর্মাহত হন 'ছি ছি, দেশের কাজ করব তার জন্যে টাকা? ঘুষ আমি দিই না।' (কাউনসিলে মনোনীত সদস্য হওয়ার জন্যে অবশ্য তিন হাজার অবধি খরচ করতে তিনি রাজি ছিলেন — ব্রিটিশ সরকারই তাঁর ঘুষ নিতে রাজি হয় নি, এই যা)।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় না। 'কলকাতায় সুবিধে করতে না পেরে বকুবাবু ঠিক করলেন, সাউথ-সুন্দরবন-কন্‌স্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়াবেন। সেখানে সম্প্রতি কিছু জমিদারী কিনেছিলেন, সেজন্য ভোট আদায় করা সোজা হবে।…

'তারপর হঠাৎ একদিন খবর এল যে বকুলালের পুরনো শত্রু রামযাদুবাবু রাতারাতি খদ্দরের সুট বানিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। তিনিও ঐ সৌদরবন থেকে দাঁড়াবেন। বকুবাবুর দ্বিগুণ রোখ চেপে গেল — তিনি টেরিটি বাজার থেকে একটি তিন নম্বরের টিকি কিনে ফেললেন, দেউড়িতে গোটা দুই ষাঁড় বাঁধলেন আর বাড়ির রেলিং-এর ওপর ঘুঁটে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।'

এরপর শুরু হয় দুই প্রার্থীর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেউড়। বকুবাবু কিন্তু রামযাদুর প্রচারের (= কুৎসিত ব্যক্তিগত আক্রমণের) জুতসই জবাব দিতে পারলেন না, 'কারণ তাঁর তরফে তেমন জোরালো সাহিত্যিক-গুণ্ডা ছিল না!' (এখানে গুণ্ডা বলতে bully বোঝাচ্ছে)।

১৯২০-র দশকে বাঙলার রাজনীতির অবস্থা কী ছিল তার এক নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে এই বিবরণে। অতীতের মাহাত্ম্য নিয়ে যাঁরা গৌরব করতে ভালবাসেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখের সময়কে স্বর্ণযুগ বলে মনে করেন, "দক্ষিণরায়" পড়লে হয়তো তাঁদের চোখ খুলবে।

আগেই বলা হয়েছে, চাটুজ্যেমশায় একই সঙ্গে আধাগ্রাম্য-আধা শহুরে। মূলে রক্ষণশীল হলেও তাঁর বন্ধু, চরণ ঘোষের সঙ্গে তাঁকে কিছুতেই এক করা

যায় না। কলকাতার অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে ছেলে আর তার বন্ধুদের খেতে দেখে চরণ ঘোষ নাক টিপে ধরেন ; চাটুজ্যেমশায় কিন্তু বলেন, 'বেচারাদের অপরাধ নেই, হাজার বছর ধরে শুনে এসেছে এটা খেয়ো না ওটা খেয়ো না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েছেন তখন জন্মজন্মান্তরের অতৃপ্তি চটপট মিটিয়ে নিতে হবে। আহা, এদের ভোজন সার্থক হ'ক। এই যে এরা বাঘের মত গবগব করে খাচ্ছে সেই সঙ্গে যেন বাঘের সদ্‌গুণও কিছু পায়। এদের গায়ে গত্তি লাগুক, মনে সাহস হ'ক, খোঁচা দিলে যেন খ্যাঁক করে নির্ভয়ে তেড়ে যেতে পারে। ( খুবই সরল দাওয়াই, বাঙালির মানুষ হওয়ার দাওয়াই )।

শুধু তা-ই নয়, চরণ ঘোষকে তিনি পুরনো কথা মনে করিয়ে লজ্জা দেন : 'নিজের ছেলেবেলার কীর্তিকলাপ সব ভুলে গেলে ? সেই যে কাব বের ঠোঙা নিয়ে গাব গাছে চড়ে খেতে আর কোকিল ডাকতে তা কি মনে নেই ? এখন না-হয় গোঁসাই মহারাজের কাছে মন্তর নিয়ে কণ্ঠিধারণ করেছ মাংসের গন্ধে কানে আঙ্গুল দাও।'

চাটুজ্যেমশায় এখানে সত্যিই যথার্থ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেন। তাছাড়া এই গল্পেই দেখা যায়, ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে তাঁর বেশ ভালোই বনে। বাবার ধমক খেয়ে কার্তিক আত্মহত্যা করতে চায়, কিন্তু কেরোসিন খেতে আপত্তি ( '...বড্ড জ্বালা করবে যে ?' )। চাটুজ্যেমশায় তখন তার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন, 'ছিঃ বাবা কার্তিক, দুঃখু করো না ! একে বাপ তায় বয়সে বড়, বললেই বা একটু কড়া কথা ...'। জিগীষাদেবীর কাছে যাওয়ার সময়ে চাটুজ্যেও ঘনেনদের সঙ্গে চলেন। অনায়াসেই বলতে পারেন, 'বড়োদের রাজত্ব শেষ হয়েছে, এখন ছোকরাদের পিছু পিছু দৌড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।' তাঁকে সঙ্গে নিতে ঘনেনের আপত্তি ছিল, কিন্তু বাঁটলো বলে, 'চলুন না উনিও, একজন মুরুব্বি লোক ডেপুটেশনে থাকা ভাল।' জিগীষাদেবী দেখা দেওয়ার আগে বাঁটলোই প্রস্তাব করে, 'চাটুজ্যেমশায়, আপনি আমাদের ডেপুটেশনের মুখপাত্র, আমাদের বক্তব্যটা আপনিই বেশ গুছিয়ে বলবেন। ঘাবড়ে যাবেন না তো ?' যদিও চাটুজ্যে কোনোদিন জিগীষাদেবীকে চোখে দেখেন নি, তিনি কী বাণী দেবেন তা-ও তাঁর জানা নেই, তবু বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলে দেন, 'ঘাবড়াবার ছেলে কেদার চাটুজ্যে নয়।' ( 'ছেলে' শব্দটি লক্ষ্য করার মতো )।

আজকাল যাকে বলা হয় 'প্রজন্ম ব্যবধান,' 'জেনারেশন গ্যাপ', চাটুজ্যেমশায় তার অনেক ঊর্ধ্বে। জিগীষাদেবী যখন ভুরু কুঁচকে জানতে চান,

'তরুণদের দলে আপনি কেন ?', একটু চিন্তা করে চাটুজ্যে বলেন, 'সে একটা সমস্যা বটে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, আমি একজন প্রবীণ তরুণ।' বাঁটুলোও যোগ করে, 'ওঁর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মনটি একদম কাঁচা।' তাতেও জিগীষাদেবী খুশি হলেন না দেখে, বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যে চাটুজ্যে বললেন, 'কি রকম জানেন ? এই গুজরাটী ডাব আর কি, ওপরটা ঝুনো, ভেতরটা নেয়াপাতি।'

চাটুজ্যের চরিত্রে এমন দুটি দিক আছে বলেই তিনি একই সঙ্গে হাসির খোরাক, আবার অন্যদেরও হাসির খোরাক করার হাতিয়ার, tool। তিনি নিজেও ব্যঙ্গের পাত্র, অন্যদিকে নানা বিষয় ও চরিত্র নিয়ে ব্যঙ্গের বাহন। পরশুরাম যেমন তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করেন তেমনি তাঁকে দিয়েও অনেককিছুকে বিদ্রূপ করান। সেখানে তিনি পরশুরামেরই প্রতিনিধি। একই সঙ্গে অলৌকিক গল্প বলার ক্ষেত্রে, আবার ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রয়োজনেও চাটুজ্যেমশায়ের বয়স ও অভিজ্ঞতা, মেজাজ ও বাক্‌পটুতা বেশ কাজে দেয়।

"জয়রাম জয়ন্তী" প্রসঙ্গে এক আলোচনায় [১০] দেখানো হয়েছে : কাহিনীপ্রধান গল্পে বিবরণের ভাগ থাকে বেশি, সংলাপ সে-তুলনায় কম ; আর বক্তব্যপ্রধান গল্পে দু-এর অনুপাত হয় উল্‌টো — সংলাপ বেশি, বিবরণ কম। বংশলোচন গল্পগুচ্ছ মূলত কাহিনীপ্রধান, ছ'টির মধ্যে পাঁচটিই তা-ই ( "গুরুবিদায়"-এ গুরুকরণ নিয়ে ব্যঙ্গই আসল লক্ষ্য )। হাসির ব্যাপার আছে সব গল্পেই। কখনও সচেতন, কখনও অচেতন হাস্যরসিক হিসেবে চাটুজ্যেমশায় তার প্রধান জোগানদার। গল্প বলার পাশাপাশি চলতে থাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের স্রোত — অলৌকিক গল্পকেও যেটি লৌকিক তাৎপর্য দেয়। বংশলোচন-বাবুর আড্ডায় চাটুজ্যেমশায় নামক 'প্রবীণ তরুণ'টি তাই ন্যায্যতই মধ্যমণি হওয়ার অধিকারী।

টীকা

১. বংশলোচনবাবুর আড্ডা ও তার সভ্যদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে "পরশুরামের বিনোদ উকিল, "অর্কিড", বৈশাখ ১৪০৩, পৃ ২৯-৩৫-এ।

২. বিনোদ উকিল যে অনেকটাই পরশুরামের নিজের ছায়া — আগের একটি প্রবন্ধে ( সূত্র ১ ) তা দেখানো হয়েছে।

৩. কোনো শাস্ত্রে নিশ্চয়ই বলা নেই, তবে হিন্দু সংস্কারে এমন একটি কথা চালু আছে ; 'বৃহৎকাষ্ঠে দোষো নাস্তি'। এটি না বাঙলা না সংস্কৃত।

বলতে চাওয়া হয়েছে ; বড় কাঠের ওপর (নৌকোয় বা জাহাজে) থাকলে ছোঁয়াছুঁয়ি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বেশি বাছবিচার না করলেও চলে। 'শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই' — খাঁটি কথা, কেননা চা যে কী জিনিস তা শাস্ত্রকারকের জানা ছিল না।

৪. "স্বয়ম্বরা"-য় চাটুজ্যেমশায় জাতিগর্বকে আরও ছোটো করে চাটুজ্যেগর্বে, ও সেই সূত্রে আত্মগর্বে নামিয়ে আনেন : 'বর্ণের শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ, দর্শন বল, কাব্য বল, প্রেমতত্ত্ব বল, সমস্ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে,। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুজ্যে, যথা বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে।' একটু উসকে দেওয়ার জন্যে বিনোদ উকিল বলেন, 'আর ?' চাটুজ্যে উত্তর দেন, 'আর এই ক্যাদার চাটুজ্যে, কেন বলব না ? তোমাদের ভয় করব না কি ?

৫. ব্যক্তিগত জীবনে রাজশেখর বসু ছিলেন রাশভারী লোক ; কেউ তাঁকে কোনোদিন 'দাদা' বলে ডাকতে সাহস পান নি। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন ; রাজশেখর বসুই ছিলেন পার্শীবয়গানের আড্ডার 'মধ্যমণি' (ভূমিকা, 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী', 'পরশুরাম গল্পসমগ্র', দীপঙ্কর বসু সম্পা., কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৯২-এ পুনরমুদ্রিত, পৃ. ১৭)। দীপঙ্কর বসু অবশ্য জানিয়েছেন ; 'এখানে কিঞ্চিৎ তথ্য-ভ্রান্তি ঘটেছে। 'মধ্যমণি' দূরে থাক এই আড্ডায় রাজশেখর বসতেনই কদাচিৎ ! তবে আড্ডা চালানোর খরচে ঘাটতি পড়লেই একমাত্র গতি তিনি। এ জন্যেই এই আড্ডায় তাঁর নামই প্রচলিত হয়ে গেছল — গৌরী সেন !' ( ঐ, পৃ. ১৭ টীকা )

৬. '[I]t was agreed that my endeavours should be directed to persons and characters supernatural, or at least romantic ; yet so as to transfer from our inward nature a human interest and a semblence of truth sufficient to procure for these shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moments which constitutes poetic faith.' S. T. Coleridge, 'Biographia Literaria' Chapter-xiv, London : Everyman's Library, 1982 reprint, pp 168-169.

৭. তুলনীয় ; সুকুমার রায়, 'চলচিত্তচঞ্চরি,' দ্বিতীয় দৃশ্য ; সোমপ্রকাশ। আপনি হার্বার্ট সেন্সারকে জানেন [ মানেন ] তো ?

ভবদুলাল। হ্যাঁ··· হার্বার্ট, সেন্সার, হাঁচি, টিকটিকি, ভূত-প্রেত সব মানি।

'সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী', খণ্ড ১, কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৭৫ পৃ. ৩৯৭।

৮. বাঙলায় একটি প্রবাদ আছে 'কালিদাস কয় আত্মহারা, অন্নচিন্তা চমৎকারা'। এর পেছনে একটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক অনুমান করা হয় : দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ। অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ ॥ তাঁর হাত থেকে কবিতা বেরচ্ছে না — এই অভিযোগ শুনে কালিদাস নাকি বলেছিলেন : গরিবের সব গুণই ছাই-এ ঢাকা আগুনের মতো। ভাতের ভাবনা এমনই চমৎকার যে তাতে কাতর হয়ে থাকলে কবিতা আর কোথা থেকে আসবে ?

৯. এই 'বঙ্গমাতা' সম্পর্কে চাটুজ্যেমশায় আরও বলেন : 'শুধু বঙ্গমাতার ওপর নির্ভর করা চলবে না, কারণ তিনি তো আর সত্যিকারের দেবতা নন — বঙ্কিম চাটুজ্যের হাতে গড়া। তাঁর কোনও যোগ্যতা নেই, কেবল লোককে খেপিয়ে দিতে পারেন।' স্পষ্টতই ইঙ্গিত করা হচ্ছে 'আনন্দ-মঠ'-এর দিকে।

১০. 'ডুলুং', চৈত্র, ১৪০৫ — বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৬, পৃ. ৮-১৫দ্র.।

---

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : সিদ্ধার্থ দত্ত, রিঙ্কু চৌধুরি, সঞ্জীবন সরকার, অমিতাভ ভট্টাচার্য

## প্রণব চট্টোপাধ্যায়

### বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হবে

চোখ মেলেছি আকাশ ভরে
মন বলে দেয় মেঘ করেছে…
মেঘ করেছে বুকের ভিতর
মেঘ দাঁড়িয়ে দরজা ধরে
ঘরের দাওয়ায়
বাতাস নিথর ;
ঘর মুখো তাই পাখ-পাখালি
বুক দুরদুর গাছ গাছালী
বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হবে
বৃষ্টি সাথে দৃষ্টি ভিজে
সৃষ্টি হবে গেরস্থালী
উৎসবের গান পাখ-পাখালি !

## সুদেব সাহা

### শিল্প চিন্তা

চোখের সামনে যা দেখি সুন্দর ছবি
মনের আয়নায় দেখি তারও চেয়ে বেশী
আরও বেশী ভাল জীবনের রঙ
সারারাত ঘুমের ঘোরে জীবন স্বপ্ন ময় ।
সবকিছু নিয়ে যা কিছু ভাল
তাই নিয়ে যদি হয় শিল্পের প্রকাশ
সেই শিল্প হয়ে উঠবেই জীবন্ত
চড়াতে হবেনা তাতে কল্পনার রঙ ।
সবকিছু চিন্তার অবসান হলে
প্রকৃতির কোলেই মাথা রাখি
শিল্প চিন্তা নিয়ে ।

CENTRAL LIBRARY

# মতি মুখোপাধ্যায়

## ড্রাম

মাটি ফুঁড়ে শব্দ উঠছে গুমগুম
কাঁপছে রাস্তা ঘরবাড়ি
দু'পাশে খাড়া
শ্রীহীন গাছেরা ভাঙা ডালপালা
সবাই ভাবছে এবার
এবার কিছু একটা হতে পারে
ভীষণ
অথবা ভয়ংকর।

ড্রাম বাজাতে বাজাতে বিজয় মিছিল
দীর্ঘাকার ময়ালের ফণায়
প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন
লেজের ঝাপটায় ঝাপটায়
আগুনে শ্লোগান
দিতে দিতে দিতে দিতে
অজগরটা মিলিয়ে গেল বাঁকে
পড়ে রইল রাস্তা
ভাঙাচোরা থানাখন্দ পথ
দুদিকের শ্রীহীন গাছেরা ভাঙা ডালপালা
আর গাঢ় নীরবতার
পর্দা-ছেঁড়া ফিসফিস হাওয়া
নিরীহ বাতাস।

গল্প

# সেই ছেলেটা আর সেই মেয়েটার গল্প

## চুনীলাল রায়

সকালে বলতে গেলে কোনও দিনই সময় হ'ত না। অফিস থেকে ফিরে ঐ সন্ধের দিকে তাই প্রতিদিনই একবার করে বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম। এখান থেকে স্পষ্ট করে আকাশ আকাশের তারা আকাশের চাঁদ সবই দেখা যায়। আমি আকাশ দেখতাম। আমি আকাশ দেখতে ভালোবাসি।

তবে মাঝে মধ্যে আমি নিচের দিকেও তাকাই। আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় মানে বাড়ির উঠোনটা পেরিয়ে গেলেই লোহার গেট। আমার রায়বাহাদুর ঠাকুর্দা লাগিয়েছিলেন। বাড়ির আভিজাত্য বোঝাতে। বাড়ির লোকের আলাদা মানসিকতা বোঝাতে। আমার ঠাকুমা ঠিক গেটের বাইরে একদিকে একটা বকুল গাছ লাগিয়েছিলেন। বকুলফুল বকুলফুলের গন্ধ ঠাকুমার খুব প্রিয় ছিল। ঠাকুমা তাঁর লোকেদের দিয়ে বকুলফুলের মালাও গাঁথাতেন। কোনও ফুলই পড়ে থাকত না। অবশ্য এসবই আমার শোনা কথা।

কিন্তু এখন ফুল পড়ে থাকে। সকাল সন্ধেয়। তবে ঐ ফুল দিয়ে এখন বোধহয় আর মালা গাঁথা যায় না। কেননা সব ফুল কখনও এক এক করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে আবার কখনও বা হাত দিয়ে দিয়ে ঠেলে ঠেলে এক জায়গায় জড়ো করে রাখে একটা ছেলে। আধপাগলা গোছের। জামা কাপড়েরও ছিরি ছাঁদ নেই। শুধু নোংরাই নয় ছেঁড়া ফাটা তাপ্পি দেওয়াও। অথচ তবুও দূর থেকেও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই ছেলেটা হাসছে। ফুল-গুলোকে খুব যত্ন করে খুব আদর করে করে সাজিয়ে রাখছে। কখনও বা গাছটাকেই জড়িয়ে ধরছে। ব্যাস ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকছে। অনেকক্ষণ। আবার ছোঁড়াটাকে কখনও দেখি আমারই মতো আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। আমারই মতো আকাশ, চাঁদ, তারা দেখছে।

ঐ রাস্তার সেই ছোঁড়ার এসব কাণ্ড দেখে আমার রাগ হ'ত। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিতাম।

অথচ তাকাব কোন্‌দিকে? মুখ ঘোরালেই চোখ চলে যাবে ভৈরব-বাবুর বস্তিটার দিকে। সেখানের টালির চাল দেওয়া বেড়ার ঘরেও দেখা যাবে কালার টিভি চলেছে। আসলে বস্তি মানে আমার ছোটবেলায় আমি ঐ

বস্তির যে হাল যে মারামারি গালাগালি শুনেছি এখন আর তা' নেই। এখন বস্তিতেও পাকা রাস্তা পাকা ড্রেন বিজলি বাতি সবই রয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও স্কুল যাচ্ছে।

তবে এসব আর কাঁহাতক দেখা যায়? নতুন কিছু না হলে মানুষের ভালো লাগে? না মানুষ আনন্দ পায়?

তা' সেদিক্ থেকে দেখতে গেলে ঐ ছোঁড়াটার কাণ্ডকারখানা আমাকে অবাক করত।

আসলে আজকাল সকালেও মাঝে মধ্যে একবার এক আধদিন বাজার সেরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি কাটার চেষ্টা করেছি। তখনও দেখেছি ঐ বদখত ছোড়াটাকে। তেমনই গাছটাকে কত আদর করে কত ভালোবেসে জড়িয়ে ধরেছে। কখনও আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। আবার এক এক সময় মনে হয়েছে ছেলেটা যেন বাতাসের গন্ধ শুঁকছে। বাতাসকে বুকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে।

এসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার খুব অবাক লাগত। আমি খুব বিরক্তির ভাব নিয়ে নাক মুখ কুঁচকে ঐ আধপাগলা ছেলেটার হাবভাব রকম-সকম দেখতাম।

দেখতাম। দেখতাম আর খুব অবাক হতাম। একদিন তো নয়। একমাস এক বছরওতো নয়। ছেলেটাকে আমি তো প্রায় পাঁচ ছ'বছর ধরেই দেখছি। ঠিক ঐ একই ভাব। একই কাণ্ডকারখানা।

কখন খায়? কোথায় খায়? কি করে? কোথায় থাকে? কে যে ওর মা বাপ? তার কোনও খবরই আমি রাখিনি। হয় তো আমার অজ্ঞাতে অগোচরেই ঘটে গেছে ঐ ছেলেটার জীবনের অনেক কিছু।

তা' এক রোববার আমার মনে হল আজ তাসের আড্ডায় না বসে আজই ঐ ছোড়াটার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর করতে হবে। তাছাড়া বাইরে থেকে পাগল মনে হলেও বোধহয় ঠিক পাগল নয়। পাগলামিতো ওর ভানও হতে পারে। কেন না ওর হাবভাব চালচলন বুঝিয়ে দেয় ওর অন্য এক পরিচয় আছে। কিন্তু ভালোমন্দ যাই হোক্ না কেন সে খবরটুকুও জানা দরকার। তাছাড়া পাড়ার মধ্যে মানে আমাদের বাড়ির কাছে দিনের পর দিন অমন এক উট্‌কো মগনে সন্দেহভাজন লোক ঘোরাফেরা করবে আর আমরা এমন উদাসীন হয়ে থাকবো তাও কি ঠিক? কে জানে বাবা কখন যে কী কাণ্ড ঘটে যায়। এতোদিন হয়নি। অতএব হবে না। এ ধারণা ঠিক নয়।

কিন্তু মজা এই রোববার সকালের সব কাজ সেরে আমার সে দিনের অভিযানে বের হয়ে দেখি সে ছোড়া লোপাট। কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। আমি তখন বকুলফুল কুড়িয়ে এনে নিজেই ছোটবেলার মতো মালা গাঁথতে বসে গেলাম। ভাগ্যি ভালো যে তখন ছেলে মেয়ে বা তাদের মা টিভি দেখতে ব্যস্ত।

তবে এই ঘটনার পর ঐ ছোঁড়ার ওপর আমার সন্দেহ আরো বাড়তে থাকল। আমি মনে মনে ভাবলাম তুমি যতই ওস্তাদ হও না কেন আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমার ঐ লোক দেখানো পাগলামি ভণ্ডামি আমি বের করে তবে ছাড়ব।

এই মনে করে আমি বারান্দাতে ইজিচেয়ারটা টেনে বসে পড়লাম। তবে মনটা আমার খুব চঞ্চল হয়ে রয়েছে। একবার উঠলাম ঘরে গিয়ে এক গ্লাস জল খেলাম। আবার এসে বসলাম। কাগজটার ওপর চোখ বোলাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু কিছুতেই চঞ্চল মনটাকে আর ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না। তখন চোখটাকে অন্যদিকে সরাবার চেষ্টা শুরু হ'ল আমার।

এবার চোখ গেল ভৈরববাবুর বস্তিটার দিকে। বস্তির হাল বদলে গ্যাছে এখন। সেখানেও টিভি। ছেলেমেয়েদের হৈ হট্টগোল। বড়ো মানুষদের কর্ম ব্যস্ততা। কিন্তু এসবের মধ্যেও আমার চোখ পড়ল আমাদের বাড়ির কাজের লোক উষার মেয়ে চম্পার সেই বন্ধুটার ওপর।

চম্পার সঙ্গে তার বন্ধুও কতবার আমাদের বাড়িতে এসেছে। তখন কতই না ছোট ছিল। তখন বস্তির গলিতে ওরা এক্কাদোক্কা খেলেছে। আর এখন সেই মেয়েই দেখতে না দেখতে ধকধক্ করে বেড়ে উঠেছে কলাগাছের মতো। কলাগাছের মতোই বাড়বাড়ন্ত।

ঐ মেয়েটার দিকে আমারও আগে তেমন করে নজর পড়েনি। কিন্তু আজ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আরে এরা সবাই যে বড় হয়ে গেল। কখন বড় হ'ল? কি করে এতো বড়ো হ'ল? আগে পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে কাজের লোক সাপ্লাই দিত এইসব বস্তি! পাড়ার গণ্ডগোলের আখড়া ছিল বস্তি। আবার কোনও কোনও সময় বস্তির উঠতি মেয়েদের বে-পাড়ায় রঙ মেখে দাঁড়াতেও দেখা যেতো। কিন্তু এখন বস্তির ছেলেমেয়েরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখছে। তাদের ধান্দা অন্য। তাদের কাজ কারবারই আলাদা।

কিন্তু কি করে এসব হল ? ঐ সেয়ানা পাগলার মতো এসবেরও রহস্য আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে ।

কিন্তু যাচ্চলে সেখানেও বাধা । ঐ ধিঙ্গি মেয়েটা তখন দেখি হাতকাটা পেটকাটা ব্লাউজ পরে একটা সবুজ রঙের ছাপাশাড়ি আঁটোশাটো করে পরে টিভির কোন্ প্রোগ্রামের সঙ্গে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে ।

ফলে আমার মতো লোকের পরে ওদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা শোভনও নয় সুন্দরও নয় । তাছাড়া সোজা কথা আমার ওসব দেখতে একদমই পছন্দ নয় । আমার ঘেন্না করে গা ঘিন্ ঘিন্ করে ।

আমি ওখান থেকে সরে সরাসরি ঘরের মধ্যে চলে আসি । আমার ঘর থেকে বকুল গাছের মাথার দিকটা বেশ ভালোই দেখা যায় । আমি বকুল ফুল দেখতে পাই । আমি বকুলের গন্ধ আমার নিঃশ্বাসে অনুভব করতে পারি । আমি বেশ আরাম পাই ।

কিন্তু পরদিনই আবার সেই সেয়ানা পাগলাকে দেখি সে বকুল গাছকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে । অনেকটা সেই সুন্দরলাল বহুগুণার চিপকো আন্দোলনের মতো । গাছকে ধরে থাকা । আঁকড়ে থাকা ।

অথচ এই ভালো কাজেইবা ছোকরার অবদান কতটা ? এরারইতো সে সোজা বাতাসের সঙ্গে কথা বলবে । আকাশের দিকে তাকাবে । হাসবে । নাচবে । গান করবে । কথা বলবে । হাত পা ছুঁড়বে । ওঃ অসহ্য ।

আর শুধু কি তাই ? সে বদ্ ছোকরা মাঝে মাঝে ভৈরব বস্তির উঠতি বয়সের মেয়েদের দিকেও তাকাবে । তাকাবে আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলবে । সেই দীর্ঘশ্বাসে অনেক দূর থেকে আমিও শিউরে উঠতাম । বস্তির বাইরের খোলশটাই কি বদল হয়েছে শুধু ? ভেতরে রয়েছে অতীতের শরীর ?

সেই ছেলেটাকে কেন্দ্র করে আমি এসব কথা ভাবতাম । অথচ মজা এই যে পরপর কদিন ঐ আধপাগলা ক্ষেপাটে উদাসী ছেলেটার দেখাই পেলাম না । তাছাড়া আমারও অফিসে যাবার তাড়া ছিল ।

কিন্তু সেদিন পাড়ার চা-পান-বিড়ির দোকানেই খবর পেলাম যে পাড়ায় আজ কদিন হ'ল ক'টা বেপাড়ার মাস্তান ছেলেছোকরা এসে নাকী খুব রঙ দেখিয়ে গিয়েছে । তবে পাড়ার ভদ্ররানির দিকে তাদের চোখ গিয়েছে এখনও তেমন খবর নেই । কেননা তারা ঐ ভৈরব বস্তির দিকেই খুব বেশি ঘুরঘুর করছিল ।

অন্যদিন অফিস থেকে ফেরার পথে আমি ভবেশদার ঐ দোকানে মাঝেমধ্যে বসতাম। চা খেতাম। পাড়ার দু-চারজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারতাম। কিছুটা সময় কাটত। কিন্তু সেদিন ঐরকম আজে বাজে খবর পাবার পর আর দোকানে বসার ইচ্ছে হ'ল না। পুলিশে যে খবর দেওয়া হয়েছে এমন খবরও কেউ দিতে পারলনা।

আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমার ছেলেমেয়ে বড়ো হচ্ছে। তাছাড়া সারাদিন গিন্নি একাই বাড়ি সামলান। এদের ওপর যদি কখনও ঐ মাস্তান পার্টি হামলা চালায় তবে তাদের বাঁচাবে কে ?

আমি বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ছেলেমেয়ে দৌড়ে এল। মেয়ে বলল "বাপী আজ যা কাণ্ড হয়েছে না বলার নয়। কটা বদমাশ ছোকরা ঐ বস্তির দিকে গিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আমি বারান্দায় বের হলাম কী ব্যাপার দেখতে। ব্যাস্ তাই দেখে আমাকেও খুব শাসিয়েছে।"

আমি মেয়েকে কিছু বলতে পারিনা। গম্ভীর হয়ে যাই। বুক কাঁপে আমার। ওর মুখের দিকে তাকাই। বলি. "বাইরে বের হবে না। তুমি বড়ো হচ্ছ। লেখাপড়া করছ। এখন কেন অকারণে উটকো ঝামেলায় জড়াবে ? ক্যারিয়ার তৈরির সময় আজেবাজে ব্যাপারে জড়ায় কেউ ? ঝড়ের সময় উটের মতো বালির নিরাপদ আশ্রয়ে মাথাগুঁজে থাকো।"

আমার ছেলে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে। তাকেও একই কথা বলি। ওরা চুপচাপ আমার কথা শোনে। ওরা চলে যায়।

কিন্তু ওরা চলে যেতেই একটা কথা মনে পড়ে যায় আমার। আমি ডাকি "খোকন। শোনো।"

আমার ডাক শুনে খোকন কাছে আসে। বলে "বাবা কিছু বলবে ?"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আচ্ছা তুমি কি জানো যখন ঐ ছেলেরা পাড়ায় ঢুকল তখন ঐ পাগলা ছেলেটা কোথায় ছিল ?"

খোকন আমার কথা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে তাকাল। পরে গলা নামিয়ে বলল. "ওকে তো কোথাও দেখতে পাইনি।"

আমি ওর জবাব শুনে বললাম, "ওঃ আচ্ছা। ঠিক আছে। এখন তুমি যাও।"

কিন্তু ওকে চলে যেতে বলেও আমার মন ঠিক ঠাণ্ডা হল না। মনে হল ওর কাছ থেকে আরো কিছু খবর জানার ছিল। জানার দরকার ছিল

যে ওই রঙবাজ ছেলেরা ঠিক কোন সময়ে এসেছিল ? আর জানা প্রয়োজন ছিল ঐ ছেলেরা ভৈরববাবুর বস্তির সব বাড়িতেই গণ্ডগোল করেছে নাকি কোনও বিশেষ বিশেষ বাড়িতে ? ওঁরা ঠিক আছে তো ?

তবে এই সময়ে আমার গিন্নি এসে পড়লেন চা জলখাবার নিয়ে। বললেন "কি ব্যাপার ? এখনও হাতমুখ ধোওনি ? জামাকাপড় ছাড়োনি ?

আমি বললাম "দাঁড়াও। দাঁড়াও। সব হবে। আগে বলোতো ওই বদ ছোকরারা ঠিক কখন এসেছিল ? আর কোন্ কোন্ বিশেষ বাড়ির দিকে নজর ছিল ওদের ?"

আমার গিন্নি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন "আসবে আবার কখন ? ওরা এসেছিল দুপুরের দিকে। যখন পাড়ায় জোয়ান মর্দ কেউ থাকেনা। আর রাস্তায় হৈ হট্টগোল শুনেই আমি জানলা দরজা বন্ধ করে দি। আমি আর কিছু জানিনে বাপু। নাও এখন খাবার খাও। সব যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

আমি গিন্নির মুখের দিকে তাকাই। তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। আমি আর কথা বাড়াই না। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুতে যাই। ভাবি আরে তাইতো। বস্তির কোন্ বাড়িতে হামলা হয়েছে এতো জানবে কেবল রাস্তার লোকই।

আমি তাই এবার খাবার খেয়ে রাস্তায় নামি। ভবেশদার চায়ের দোকানে চলে আসি। কিন্তু হতাশ হই। খদ্দের নেই বলে ভবেশদা দোকানের ঝাঁপ অর্দ্ধেক বন্ধ করে চুপচাপ বসে সেদিনের খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছেন।

তবে সেই খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই ভবেশদার থেকে আসল খবরটা পেয়ে গেলাম আমি। ভৈরব বস্তির কিছু উঠতি ছুকরীর দিকেই ওদের নজর। যেমন দেবা তেমন দেবী। বেপাড়ায় ওই মেয়েদের সঙ্গে এই বদ্ ছোড়ারা নাকী ঘুরেও বেড়িয়েছে। দোকানে খেয়েছে। এখন কোনও কারণে সেই পিতলা পীরিতে নাকি চোট খেয়েছে। ব্যাস্ আর কি ? এইসব ছোট লোকেদের যা হয় চিরকাল এখনও তাই হয়েছে। টাকা কড়ির লেনদেনও হয়ে থাকতে পারে। তারই বদলা। তাই ভদ্রপাড়ায় এইসব ঝুটঝামেলা। ভবেশদাও দুঃখ করেন।

ভবেশদার কাছ থেকে সব খবর পেয়ে আমি বেশ আরাম পাই। ভবেশদাকে বলি "দাদা একটু কড়া চা করুনতো। খাই।"

তখনকার মতো আমার সমস্যা মিটল। মনের মেঘও কেটে গেল।

কিন্তু তবুও মনে একটা খট্‌কা রয়ে গেল। ঐ আকাশ দেখা বাতাসের গন্ধ শুঁকে বেড়ানো গাছের সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলা গাছকে জড়িয়ে ধরা ঐ আধপাগলা ছোকরা ঐ সময়ে কোথায় ছিল ? নাকি ঐ ছেলেটা জানতে পেরেছিল কোনও একটা হামলা হবেই এ পাড়ায় তাই সে আগে থাকতেই কেটে পড়েছিল ? বাতাসে বিপদের গন্ধ সে কি তবে শুঁকতে পেরেছিল ?

এসব কথা মনে হতেই আমার বুকের ধুকপুকুনি আরো বেড়ে যায়। তাই রাতে ঘুমও হয় না ভালো।

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে আমি তাই প্রথমেই আমার সাধের বারান্দায় এসে দাঁড়াই। আর অবাক হয়ে দেখি যে সেই ছোকরা সেই আকাশ দেখা বাতাসের সঙ্গে কথা বলা শ্রীমান বকুলগাছকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে কী সব কথা যেন বলছে।

এসব দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ছেলেটার এসব পাগলামো লোক দেখানো। ভড়ং। ওর কোনও খারাপ উদ্দেশ্য বদ্ মতলব রয়েছেই।

আমি বাড়ির সবাইকে এ ব্যাপারে জানাই। সাবধান করে দেই তাদের।

এবার মনে বেশ শান্তি পাই। অফিস বাড়ি অফিস বাড়ি চলে। দিনকাটে সপ্তাহ মাস নিজেদের খেয়াল খুশিতেই চলে।

কিন্তু মাসখানেক বাদে অফিস থেকে ফেরার পথে ভবেশদার চায়ের দোকানের সামনে এক জটলা দেখে আমি থমকে দাঁড়াই। নানান জনের নানান টুকরো টাকরা কথা কানে ভেসে আসে। আমি ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকাই দেখি ক'জন বন্দুকধারি পুলিশ টহল দিচ্ছে আমাদের পাড়াতেই।

লোকজন এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। জটলা করছে তারা। ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা বলছে তারা কেমন যে এক ভয় ভয় ভাব। সবার রকম সকম দেখে আমি কাঁপতে থাকি। আমি আর দাঁড়াই না। আমি বলতে গেলে এক ছুটেই বাড়ি চলে আসি।

বাড়িতে এসে ছেলেমেয়ে বৌয়ের কাছে যা শুনলাম তাতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল আরো।

শুনলাম বকুলগাছ ধরে বসে থাকা ঐ উদাসী ছোকরা আজ মার খেয়েছে বাইরের ঐ মাস্তান ছেলেদের হাতে। ছোরা চপার পাইপগান সবই নাকি

চলেছে তার ওপর। কেউ বলছে তিরিশ জায়গায় কেউ জানিছে শরীরের পঞ্চাশ ষাট জায়গায় ওকে নাকী তারা কুপিয়েছে। পাইপগানের গুলি লেগেছে বুকে।

এসব কাণ্ডকারখানা শুনে আমি আঁতকে উঠি। আরে অমন গোবেচারা ছোঁড়ার ওপর এমন আক্রোশের কারণ কি? কি করেছে সে?

গিন্নির কাছে এসব কথার জবাব শুনে আমার আক্কেলতো গুড়ুম। তিনি কানে কানে বললেন, ঊষার মেয়ে চম্পার ঐ বন্ধুর সঙ্গে ঐ বদ্ ছেলেদের কারো কারো নাকী এক সম্পর্ক ছিল। টাকা পয়সাও নিয়েছে। কিন্তু সে ওদের থেকে ক'মাস হল সরে আসবার চেষ্টা করছিল। ব্যাস্ তাতেই ওরা আজ ট্যাক্সিতে করে দলবল নিয়ে এসে হাজির। তুলে নিয়ে যাবে।

গিন্নির মুখে এসব কথা শুনে আমি বললাম "বলো কি? এসবতো ভালো কথা নয়। কিন্তু ঊষা তো একবারও এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানায়নি।"

আমার কথার জবাবে গিন্নি বললেন "সে সব পরে হবে। এখন শোনো তারপর কি হ'ল? ওরাতো চম্পার সেই বন্ধুকে জোর জবরদস্তি করে ট্যাক্সিতে তুলবেই। এখন এসব দেখে দৌড়ে এল ঐ পাগলা। এসেই কিল চড় ঘুষি লাথি চালিয়ে দিল। ওরা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। ব্যাস্ তারপরই চেন ছুরি চপার দিয়ে কোপাতে শুরু করল। সেই সুযোগে মেয়েটা দৌড় লাগাল। বাড়ির দিকে নয়। অন্য পথে।"

আমি বললাম "এতো সব কাণ্ডের পর ঊষাকেতো আর রাখা যাবে না। আমাদের বাড়িতেও যে একদিন হামলা হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? চম্পার বন্ধু তো আমাদের বাড়িতেও চলে আসতে পারত?"

কিন্তু কাজের লোককে ছাড়িয়ে দেব বললেই তো আর ভাগানো যায় না। নতুন লোক জোগাড় করতে হয় আগে। আমরাও তাই লোক খুঁজছি। খুঁজেই চলেছি।

এমনিভাবে দিন চলে। কিন্তু সেই একদিন যেন অন্যভাবে চলা শুরু করল। সকালে বারান্দায় এসে দেখি সেই আধপাগলা খেপাটে ছেলেটা কোথা থেকে আজ এতদিন পর আবার এসে হাজির হয়েছে আর বকুলগাছকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে সেই আগের মতোই কী সব যেন বলছে। বলছেতো বলেই চলেছে।

আমি আর থাকতে পারলাম না সেদিন। বলতে গেলে দৌড়েই নেমে

এলাম তার কাছে। বললাম "আচ্ছা তুমি কি চম্পার বন্ধু মানে সেদিনের সেই মেয়েটাকে ভালোবাসো ? সেই যে সেই মেয়েটা ? এই বস্তির। তোমার কে আছে ? মা বাবা ভাই বোন ? তুমি সেদিন কেন ওর ইজ্জৎ বাঁচাতে গেলে ?"

ছেলেটা আমার কথা শুনে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। মাথা থেকে পা অবধি দেখল। শেষে একটু হেসে বলল "এত কথার কি আছে ? আমার মা বাবা ভাই বোন সবই আছে ঐ মেয়েটাকে আমি অনেকদিন থেকেই দেখেছি। অন্যদের যেমন দেখি। কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে ভালোবাসাবাসির কি আছে ?"

আমি বললাম "তোমার কথা শুনলাম। তোমাকেওতো আমি এখানে বহুদিন ধরেই দেখছি। কিন্তু তোমার খাওয়া দাওয়া হয় কি করে ? জামা কাপড় ? টাকা আসে কোথা থেকে ? কে দেয় ? বলি ছোকরা তোমায় মায়া করে কে ?"

শেষের দিকে আমি একটু রেগে বলি কথাগুলো। কিন্তু ছেলেটা উত্তেজিত হয় না। আমার এসব প্রশ্ন শুনে ছেলেটা আবারও আমার মুখের দিকে তাকায়। শেষে শান্ত স্বরে বলে "আমি তো গাড়ি চালাই। মিনিবাস।"

জবাব শুনে আমি বললাম "আরে এতো দারুণ খবর। তবে তোমার তো ঐ মেয়েকে বিয়ে করা উচিত। তুমি ওকে ভালোবাস। না হ'লে ওভাবে কেউ লাইফ রিস্ক নেয় ?"

আমার কথা শুনে ছেলেটা হাসে। আমি বলে চলি "আরে তুমি বুজছ না ওর ওপর আবার তো হামলা হতে পারে। তুমি ওকে বিয়ে করলেই সব দিকে বাঁচোয়া।"

আমার এসব কথা শুনে ছেলেটা আবারও হাসে। হাসতেই থাকে। সে হাসি কেমন যেন ! তবে ও আর কথা বাড়ায় না। চলে যায়।

আমি আর কোনওদিনই ওই ছেলেটিকে দেখিনি। আর সেই মেয়েটিকেও।

# দূরের মানুষ

## সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে নিজের বিয়ে প্রায় ঠিক করে এল বিনয়। নেমন্তন্ন খেতে মহা আনন্দ বিনয়ের। এমনিতে ডালভাতের সাথে ভাজা জোগাড় করতে দম বেরিয়ে যায়। তবু মাঝে মাঝে সাধ হয় একটু মাছ কখনো সখনো দুটুকরো মাংস খেতে। বিনয় অনেক চিন্তা ভাবনা করে বুঝতে পেরেছে তার নিজের লোভ নেই যত গণ্ডগোল জিভটাকে নিয়ে। সপ্তাহের শেষ দিকে মাছ, মাছের গরম ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার জন্য বড় আকুলি বিকুলি তার এক ও একমাত্র জিভটার। সে না হয় চারাপোনা দিয়ে কাজ চলে যায় যত গণ্ডগোল মাংস নিয়ে। বড়জোর দিন দশেক এক নাগাড়ে সহ্য করে তার জিভ, তারপরেই সেকি উথাল পাথাল। কোন কিছুতেই মন লাগাতে পারে না বিনয়। যখন আর সইতে পারে না মাংসের গন্ধে পাগল পাগল লাগে নিজেকে, রেলব্রীজের নীচে মাংসের দোকানে যায় বিনয়। সে জানে হরেক খারাপ আর বেআইনী কাজের আড্ডা ঐ রেলব্রীজের নীচের অন্ধকার তবু কম দামে মাংস সেওতো ওখানেই পাওয়া যায়। এক কোয়ার্টার মাংস ছোট ছোট তিন টুকরো। দুটুকরো মাংস একটা হাড়। কপাল খারাপ হলে মাংস এক টুকরো হাড় দুটো।

ভাল নাম দেবু বন্ধুরা দেবা বলে ডাকে। সেই দেবার বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে আহ্লাদে আটখানা বিনয়। মা আর বিপু, দুজনের সংসার। দেবার বিয়ের কথা শুনে অনেক রাতে দরজা বন্ধ করে ফিস ফিস করে মা বলছিল, হ্যাঁরে বিপু, তুইতো নেমন্তন্ন খাবি, আমার কি হবে? তার বন্ধুর বিয়ে, সেখানে মায়ের কি হতে পারে ভেবে পায়না বিনু।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বলল, হ্যাঁরে, আমার জন্য খানকয়েক লুচি আর দুটো মিষ্টি আনবি?

দেখবো, বলে এড়িয়ে গেল বিনু, কোন কথা দিল না মাকে।

দেবা বড় কাজের বন্ধু। তার বিয়েতে শুধু খাওয়ার জন্য গেলে হয়না। কোমরে গামছা বেঁধে কাজে নেমে পড়ল বিনু। পরিবেশনের কাজে সে খুব একটা পাকা না আবার বাঁচাও না। ম্যানেজ হয়ে যায়। খাবারের লাইনে

মালতীর সঙ্গে দেখা মানে বিনুই দেখল মালতীকে। খাবার দিতে জল দিতে কতবার যে গেল ওদিকে। বেশী রাতে দেবার বোন খুকু কাছে এসে বলল, কিগো বিনুদা আমার বন্ধুকে কেমন লাগল ?

খুকুর পাশে সে দাঁড়িয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে। দেবার বোনটা যেন কী, ঐটুকু মেয়ে হাটা করে দিল বিনুকে। বিনুর বুকে বড় ভয়, লজ্জাও। কিছু বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারল না সে।

ক'দিন পরে বাড়ি বয়ে এসে খুকু ঘুরিয়ে শুনিয়ে গেল, মালতী রাজী তবে গিয়ে কথা বলতে হবে। পাশের বাড়ি রুনু মাসিকে সঙ্গে নিয়ে মালতীকে ডেকে এসে মা বলল, হ্যাঁরে বিনু তুই কি মালতীকে চিনিস নাকি ?

চমকে উঠে বিনু বলল, কই নাও, অমিত ওকে কখনো কেজানে কি বুঝল মা বলল, তাই বল, তবে মেয়ে ভারী মিষ্টি, গালে টোল পড়ে দেখেছিস।

কারোকে বলেনি বিনু, বিয়ে করবে বলে দুশো সাতাশি টাকা জমিয়েছিল। এদিক সেদিক থেকে কুড়িয়ে কাছিয়ে আরো শ'দুয়েক। আঠারো জনের নেমন্তন্ন ছিল। সুরেশ আসেনি তার বাড়ির সামনে পেটো পড়েছে তাই নিয়ে হুজ্জুতি, দিয়ে আসেনি পাড়ার সাট্টার এক পেনসিলার দিঘের বোনের পেট করে দিয়ে এখন বলছে বিয়ে করবেনা তার হাঙ্গামায় ব্যস্ত বলে। বৌ-ভাতের রাতে মা বারান্দায় শুনো, বিনু বৌ নিয়ে ঘরে। অনেক রাতে শুতে গিয়ে মালতীর গালের টোল পড়া দেখতে দেখতে খুব তাড়াতাড়ি মরে গেল বিনয় বেঁচে উঠল যখন তখন অনেক বেলা। বিনুর মায়ের বাসন মাজা প্রায় শেষ এমন বেলায় ঘুম ভাঙল বিনুর এমন বোঝা সে।

বিনুর পাড়া প্রতিবেশী জানে সে বড় সরল। তারা একটু দূরের আছে তাই হয়ত জানে না কিন্তু তার বন্ধুরা, যদিও তারা সংখ্যায় খুবই কম, তারা সকলেই জানে সে বড় ভাল। একবাক্যে তারা এও মানে বিনু চেষ্টা করে বিপদ আপদ প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করতে। বাজারের বাইরে যারা লংকা ধনেপাতা শাক বড়জেরা মোচা এইসব নিয়ে বসে যারা ফালতু দোকানদার তাদের কেউ কেউ মনে প্রাণে জানে বিনুদা তাদের বড় উপকারে লাগে। এমন দিন যায় যখন বিশ পঁচিশ টাকার পুঁজি তাও জোগাড় করা যায় না মাল তুলতে তখন এই বিনু তাদের গোপনে দশ বিশ টাকা দিয়ে মান বাঁচায়। বিনু জানে বাজারের সরকারবাবু এদের যে স্লিপ কেটে দেয় রোজ সেগুলো জালি। দোকান-ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে লোকটা এই কাজ করে।

মাঝেমাঝেই মনে হয় বিনয়ের শালাদের গুঁতো খাওয়া দরকার। একথা ভাবার পরই অবশ্য সে ভারী ধন্দে পড়ে যায়। সে যখন ছোট ছিল তখন গুঁতো বলতে চড় চাপড় লাথি বোঝাত। কয়েকবছর বাদে সেটা দাঁড়াল ছুরির খোঁচা এখন অবশ্য পাইপগান পেছনে ফেলে পিস্তলের গুলি।

বিপু জানে সে বোকা নয় একদমই নয়। তবে কিনা সময় বড় শন্‌শন্। ভুলভ্রান্তি হলে আর সুযোগ দেবে না কেউ। সে জানে যে ঝাঁপাতে পারবে সেই কাঁপাবে। আর ঝাঁপানোর ইচ্ছা তার একটুও নেই। ঘরে মা, তার উপর পচা লাশ হয়ে হেথা হোথা পড়ে থাকতে তার সায় নেই। যাই করো থেকে খেয়ে করো। বাপ মরার পর মা তাকে আগলে রেখেছে। চেষ্টা করেছে ঠিকঠাক ইস্কুল পাঠাতে। তবে কিনা মা বড় সাদাসিধে, বোকাও বটে। তাই আর বিনুর হল না। ক্লাশ এইটের পর মই ভেঙে পড়ল হুড়মুড়। তখন সবে আয়নায় গোঁফের রেখা দেখতে পেয়েছে বিনু। পড়াশুনো নাই বা হল, শিক্ষার আবার শেষ আছে নাকি। পাড়ার সুবোধদার কিছু কিছু পার্টি-অফিসে যাওয়া শুরু করল সে। অফিসের টেবিলে বই কাগজপত্র পড়তেও লাগল। মনে হয় অনেক কিছু জানার আছে জানতেও হবে। বাইরে থেকে ধারনা ছিল ছোট অফিসের চারদেয়ালের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক ভারী ব্যাপার স্যাপার হয়। আলাপ আলোচনা দেশের কথা দেশের মানুষের ভালোমন্দ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা হয়। কিছুদিন যাওয়া আসা করে সেতো অবাক। কোথায় কি। একই লোকজন একই আলোচনা। বেশীটাই এর তার নিন্দা। আর একটা ব্যাপার বিনুকে বড় আঘাত দিয়েছে। ঐ টুকু অফিস, ঐ কটা লোকের আসা যাওয়া, তারই মধ্যে দুটো তিনটে দল। মুখে মিষ্টি মনে চাকু। বিনুর মনে হল সারাদিনে তাকে দিয়ে বার পঁচিশেক চা-বিস্কুট আনানো ছাড়া তার জন্য আর কোন কাজ নেই। এদিকে তো মায়ের হাত-পা ধরে কমদামের এক জোড়া পাজামা পাঞ্জাবী কিনেছে বিনয়। তাই পরে পার্টি-অফিসে যাতায়াত। মাস দুয়েক পরে মনে হল, টাকাগুলো জলে গেছে। ভুল জায়গায় এসে পড়েছে সে।

চাকরীর জন্য কারো দরজায় যায় নি কোনদিন, হাত-পা ধরে নি কারো। এতাল ওতাল করে দেখেছে সমস্যায় ভরা সবদিক। বাপের প্রতি কৃতজ্ঞ সে। সংসারে তারা দুজন মানুষ। লোভ কম। কলোনীর বাড়ি হলেও গত বছর দলিল দিয়েছে কমিটির লোকজন। তার মাথার উপরে চাল পায়ের নীচে মাটি, এসবের মালিক তো সে নিজেই। এখন অবশ্য সংসারে

তিনজন। মালতী এসেছে। এই ক'দিনেই বুঝে নিয়েছে বিনয় চলে যাবে, খুব একটা অসুবিধা হবে না বোধ হয়। মালতীর বড়লোকি কিংবা দরকার নেই বললেই চলে। তবে কিনা সমস্যা অন্য জায়গায়। তার যা কাজ মালতী যদি অবুঝের মতো রাতে তার পথ আটকায় তবে তো বড় বিপদের কথা। রাত দশটার পর শুরু হয় তার কাজ। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে পোস্টারে আঠা মাখিয়ে দেয়ালে সাঁটানো তার কাজ। গত ক'বছর এই করে চালাচ্ছে বিনয়। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার কাজ। ভালোই লাগে বিনয়ের। রাতের আলাদা রূপ। রাত যত বাড়ে লোকজন কমতে থাকে পথে, বাসস্টপে, দোকানে, রেস্টুরেন্টে। একে একে শেষ বাস মিনিবাস চলে যায়। অটো রিক্সা থাকে আর একটু বেশী রাতে। দু চারজন রিক্সা আর ঠ্যালাওয়ালা এদিক থেকে সে দিক যায় তারপর সব ফাঁকা সবাই বাড়ি চলে যায় শুধু কয়েকটা কুকুর শুয়ে থাকে এখানে ওখানে।

কে যে নিয়ে গিয়েছিল তপেশ্বর বাবুর অফিসে আজ আর তা মনে নেই। বিরাট অফিস। ঘরময় বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিজ্ঞাপনের পোস্টার। সিনেমা, নাটক, যাত্রা, তেল, ফিনাইল, ধর্ম-সম্মেলন কিসের পোস্টার নেই। পোস্টারের পাহাড়, বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত লাইন দিয়ে বসে। প্রত্যেককে এক বালতি আঠা, এক বাণ্ডিল পোস্টার। সবার এলাকা ভাগ করা আছে। এক একজন বেরিয়ে যায় লাইন এগোয়। পোস্টার মারার এই কাজ বিনয় গত সাত বছর ধরে এক নাগাড়ে করছে। তপেশ্বরবাবু মানুষ ভালো। পেমেন্টে এক কথা। সপ্তাহে একবার পেমেন্ট। আড়াইশো পোস্টার লাগালে পঞ্চাশ টাকা। প্রথম যখন এই কাজে ঢোকে বিনয় রেট ছিল কুড়ি টাকা। এখন পঞ্চাশ। গত ক'দিন ধরে তপেশ্বর বাবুর খুশি খুশি মুখ দেখে বিনয়ের আশা, রেট আবার বাড়বে। বিনয়ের এলাকা গড়িয়াহাট থেকে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যাণ্ড। কোন্ পজিশানে লাগালে বেশি পাবলিকের চোখে পড়বে সে সব স্পষ্ট ঠিক করা আছে বিনয়ের। আজ অফিসে ঢুকতেই তপেশ্বর বাবু বললেন, আজ তোকে শেষে ছাড়বো, বড় কাজ। একটু বোস। চা বিস্কুট খা।

তপেশ্বরের পছন্দের লোক বিনয়। নামে কাজে দুটোতেই বিনয়। এই এতগুলো বছর তো হল। কোন কমপ্লেন নেই। আর সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর ভেতরের ঘর থেকে কাগজে মোড়া একটা বাণ্ডিল এনে সযত্নে বিনয়ের সামনে টেবিলে রেখে তপেশ্বর বলল, সাবধানে লাগাবি, একটা স্পটও

মিস করবি না। দেখিস চেনা লোকের মুখোমুখি পড়িস না। ভালো কাজ পুষিয়ে দেবো।

একথা কেন বলল তপেশ্বরবাবু. সে তো লাগাবে বিজ্ঞাপনের পোস্টার। তো চেনা লোক দেখলে কি না দেখলেই বা কি। তারা তো আর খেতে দেবেনা. খেটে খায় সে। কে কি মনে করে তা নিয়ে থোড়াই মাথাব্যথা বিনয়ের। ঘরে তার এই সেদিন বিয়ে করা বউ। সে কি চায় বিনু রোজ রাত হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাক। মুখে বলে না. তারো তো সাধ আহ্লাদ আছে। এই শীতের রাতে তারো ইচ্ছে জাগে বরের বুকে মুখ রেখে তার দুহাতের চাপে ভেঙে যেতে. ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে. গলে জল হয়ে যেতে। সব বোঝে বিনু। এও সে মানে আর দশ জনের জীবনের সাথে তার জীবনের মিল নেই। তবু মাঝে মাঝে এমন এক একটা অবস্থা আসে যখন সে. তার মতো সবকিছু মেনে নেওয়া মানুষও ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে ওঠে। নইলে আজ যখন জামার উপর পুরনো সবুজ ফুল-হাত সোয়েটার চাপিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করছে তার বউ সামনে দাঁড়িয়ে গেল। হতাশা আর উত্তাপ মেশানো গলায় বলল, আজ তোমাকে আমি এই রাতে বেরোতে দেবো না।

সন্ধ্যা নেমে এলে এই ভয় রোজ বিনুকে একটু একটু করে ঘিরে ধরে। উপায় নেই তার তবু সে বোঝে কাজটা একেবারেই ঠিক না মালতীর প্রতি বড় অবিচার হয়ে যাচ্ছে রোজ। মাঝরাতে যখন সে পোস্টার লাগানো শেষ করে বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ আগে শুকিয়ে যাওয়া আঠা ধুতে থাকে মাঝরাতে যখন কোথাও কোন শব্দ নেই ভাঙা পাথরের টুকরোর চাতালে আছড়ে জলের ভেঙে পড়ার শব্দে সে যে কত বিরক্ত হয় তা কারোকে বোঝানো যাবে না। রাস্তার মোড়ে সারা শরীরে ঘা নিয়ে যে আধমরা বেঁয়ো কুকুরটা শুয়ে থাকে আসা যাওয়ার মানুষের লাথি খেয়ে অসহায় সে যেমন ভিতরে ভিতরে গজরায় বিনুও মাঝরাতে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে. ভিতরে অথর্ব-গর্জনের আঁচ নিজের চোখে মুখে আর বুকে অনুভব করে। রাগে গর গর করতে করতে নিজের মুখে উচ্চারণ করে শুয়ারের বাচ্চা পলিটিক্স শুয়ারের বাচ্চা ভাত. শুয়ারের বাচ্চা চাকরী। এই কথা ক'টির আদৌ কোন অর্থ হয় কিনা কখনো ভেবে দেখেনি বিনয় কিন্তু একথাও সে ভুলে যায় না যথেষ্ট টাকা হলে সে নিশ্চয়ই একটা পিস্তল কিনবে আর দেখে নেবে সব শালাকে। যদিও কাকে দেখবে বা দের দেখে নেওয়া উচিত সে ব্যাপারে এখনো সে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি।

ভর দুপুরেও খাটের নীচে গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকার আরো কালো হয়ে

থাকে হাজার হাজার মশার জন্য। ম্যালেরিয়া এখন পুরনো. আর এক রকমের ভয়ানক ম্যালেরিয়া এসেছে ছু'লেই নাকি শেষ। মা বলছিল বটে, বিনু, ঘরে ঘরে জ্বর। তুই বাবা ওষুধ পত্তর দে। মশারা থাকবে না।

বিনু সাফ বলে দিয়েছে মাকে, দ্যাখো মা, মশা তাড়াতে গেলে দিন রাত ওষুধ দিতে হয়। ও আমাদের কম্মো নয়। তুমি বরং লোকনাথ ঠাকুরকে বলো আমাদের যেন একটু দেখে।

শুধু কি খাটের নীচে, ঝু'কে পড়া দরমার ঘরটা ঝু'কে এসেছে সামনের দিকে। অনেকদিন হল। কাহিল হয়ে প'ড়ছে, ভার রাখতে পারছে না। সারাদিন অন্ধকার ঘরে থেকে থেকে বিনু বড় মনমরা হয়ে যায়। রাত্তিরে পোস্টার লাগাবার সময় মনটা তার বড় খুশীতে নাচে। আজ রাত আরো বেশি। রাস্তা এক্কেবারে ফাঁকা। কি এক নতুন লাইট লাগিয়েছে। হলুদ আলোয় ভরা সবদিক। দূরের দিকে চেয়ে দেখে বিনু। এইট বি বাসের টার্মিনাস থেকে যোধপুর পার্ক এক দৃষ্টিতে দেখে বিনু। ভারী মজা লাগে তার। চেয়ে দেখে আর দেখে বিনু। সোনার মতো আলোর সমুদ্র দেখতে দেখতে তার বাড়ির কথা মনে পড়ে। মায়ের কথা, ঘরের মশা আর অন্ধকারের কথা মনে পড়ে। মালতীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, মালতী আজ প্রথম তার হাত টেনে ধরেছিল, আসতে দেবে না। মনে পড়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া আঠা তোলার কথা, মনে পড়ে তার স্বপ্নের কথা, পিস্তল কেনার কথা! আর ক'টা পোস্টার লাগানো হয়ে গেলেই সে বাড়ি যাবে। বৌ-এর বুকে মুখ রেখে অনেক অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবে। সে জানে মালতীকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে।

কম্বলে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে বিকেল পড়ে এল। শীতের বিকেল। গাছপালার গা থেকে আঁধার উঠোন রাস্তায় নেমে আসছে একটু একটু করে। কে যেন ডাকল দরজায়, বিনু, বিনু কম্বল থেকে মুখ বের করে বিনু বলল, মালতী, দেখোতো কে। দরজা থেকে ফিরে এসে মালতী বলল, কে একজন ডাকছে, চিনতে পারলাম না।

লুঙ্গী, পাতলা চাদর আর গোড়ালী খয়ে যাওয়া হাওয়াই চটি পরে বিনু বলল, তুই যা আমি আসছি।

নরেনের ছোট ভাই শম্ভু। মিছিলে দেখেছে বিনু দু'এক দিন। নরেন, সেই নরেন। কলোনীর ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে এক সাথে পড়েছে তারা। নরেন

এখন সরকারী চাকরী করে। মটরবাইক হাঁকিয়ে দোকান-বাড়ি-অফিস করে। গ্রাজুয়েট। আগে মিছিলে থাকত। এখন ফিটফাট। বিনুর চেয়ে অনেক ছোট শম্ভু। তবু তাকে নাম ধরে ডাকল। তার তো আর বয়স বাড়ে নি। সেতো চাকুরে বাবু না। মিছিলেও যায় না। চায়ের দোকানের সামনে ভিড়। একটু অন্যরকম। হাওয়া গরম মনে হয়। অমরদা মেজাজ নিয়ে বলল, পোস্টার তুই লাগিয়েছিস? পাড়ায় সে কখনো পোস্টার লাগায় না। কাল রাতে খানদুয়েক বেশি ছিল। ফেলে দেওয়া ঠিক না। গুনে গুনে আড়াইশো পোস্টার লাগানোর কথা। কি আর করে সে। চায়ের দোকানের উল্টোদিকের দেয়ালে লাগিয়ে বাড়ি ঢুকে পড়েছে সে।

হ্যাঁ, আমি লাগিয়েছি, সরল বিশ্বাসে সাদাসিধে বিনু বলল।

এই সব নোংরা পোস্টার পাড়ার মধ্যে, কী ভেবেছিস তুই, চড়া গলায় বলল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা শম্ভুর দাদা নরেন।

বাড়ি ফেরার টানে একবারও দেখা হয়নি কিসের পোস্টার। এতক্ষণে মনে পড়ল বিনুর।

দূর থেকে পোস্টারের দিকে তাকাল বিনু। বোঝা গেল না। তবে সে বুঝল হাওয়া খারাপ।

লাগানোর সময় দেখিনি। আগে দেখলে লাগাতাম না, কাঁপা গলায় বলল বিনয়।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চেনা গলায় বলল, ছেড়ে দাও নরেন বুঝতে পারেনি। আর যেন না লাগায়।

কি বলছেন, দেখেছেন কি লেখা, যৌনশক্তি বর্ধক। ছেলেমেয়েরা কি শিখছে বলুনতো, আরো গরম নরেনের গলা।

— সে কথা যদি বল, এইসব বিক্রি হয় কেন। সরকার কী করে। তাদেরতো দেখা উচিত।

— চুপ করুনতো, সব ব্যাপারে সরকারের দোষ ধরা আপনাদের অভ্যাস। অপসংস্কৃতি বন্ধ করা কি একা সরকারের দায়িত্ব?

— কেন সরকারের দোষ নেই? সেল ট্যাক্স নেয় না সরকার, তবে? অমরদা নরেনের সাথে আরো অনেকে প্রায় পুরো ভিড়টাই ক্ষেপে উঠল। পরের প্রায় একটা ঘণ্টা কে যে কোথা থেকে লাথি, চড়, ঘুষি, চাদর টেনে ছুঁড়ে ফেলা এইসব অতি জরুরী কাজগুলো করে গেল চোখ আর মুখটা বাঁচাও ব্যস্ত বিনয় দেখতেই পেল না। তারপর ভিড় হাল্কা হয়ে গেল ধীরে ধীরে। যে যার

CENTRAL LIBRARY

কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চায়ের দোকানের লোকেরা চায়ের দোকানে, মুখোমুখি দুটো পার্টি অফিসের লোকেরা পার্টি-অফিসে আর বিনয় উল্টোদিকের আধা অন্ধকারে ডেকরেটারের গুছিয়ে রাখা বাঁশের উপর বসে রইল, বসেই রইল কি করবে বুঝতে না পেরে। কে যেন এসে বলল, যা বিনু বাড়ি যা। আর এরকম করিস না। দিনকাল বড় খারাপ। কিন্তু বিনয় গেল না। যে কলোনীর মাঠ পথে সে বড় হয়েছে, কোনদিকেই কিছু না করতে পেরে যেখানে সে অসহায় থেকে একা, সম্পূর্ণ একাকী হয়েছে সেখানে অন্ধকারে বসে বসে সে দেখল যা সামান্য তার ছিল আজ তাও সেইসব লোকেরা টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ধুলোয় মাখামাখি করল তারা সবাই তার চেনা, কেউ ভাই-এর মতো, কেউ দাদার মতো, কেউ একদিন তার সাথে ঝোঁপে, গলিতে, পুকুর পাড়ে খেলেছে কিংবা স্কুলে তার পাশে বসে তারই সাথে বড় হয়েছে। আজ আর যাওয়ার কোন জায়গার কথা মনে পড়ল না তার, কারো কাছে মুখ দেখানোর রইল না বিনয়ের।

বিনুকে বসিয়ে রেখে রাত বাড়তে লাগল। অফিস ফেরৎ আর কেউ বাকী রইল না ঘরে ফিরতে, পার্টি-অফিস দুটোয় তালা পড়ল, চায়ের দোকানের ঝাঁপ ফেলে হরিদাও বাড়ির পথে এগিয়ে গেল। তারপর যখন রাত অনেক, মালতী আর বিনুর মা পায়ে পায়ে কাছে এল। পূর্ণিমার চাঁদের ফুটফুটে আলোয় জনশূণ্য পথের পাশে একজোড়া যুবকযুবতী, একজন বৃদ্ধা বাক্‌রুদ্ধ পাশাপাশি বসে রইল অনেক অনেকক্ষণ যেন তাদের আর কিছুই করার নেই।

CENTRAL LIBRARY



# কবিতার ফ্ল্যাট বাড়ি

বাসুদেব দেব

## এক ॥ কবিতার আত্মা

"Our lives are inlets of an Ocean's force" —শ্রী অরবিন্দ

প্রাচীন শাস্ত্রে কবিতার রস আস্বাদনকে শ্রেয় লাভ বা চতুর্বর্গ ধর্মলাভের উপায় হিশেবে বিবেচনা করা হয়েছে। "চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।/ কাব্যাদেব ততস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে ॥" কাব্য থেকে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদেরও অনায়াসে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হতে পারে। এর নিহিত অর্থ, কাব্য, রসাস্বাদন ঈশ্বর সাধনার অন্যতম একটি পথ। এই ঈশ্বরদর্শনকেই রামকৃষ্ণদেব মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলে নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করেছেন। ঈশ্বর এক এক জনের কাছে এক এক রকম ভাবে প্রতিভাত হতে পারে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ( গীতা/৪/১১ )

ঈশ্বর অর্থাৎ সেই রহস্যময় অনন্তের হাতছানি কেউ খুঁজে পেতে পারেন সমুদ্রের ঢেউয়ে বা অরণ্যের নিবিড়তায়, কেউ বা পর্বতশৃঙ্গের মন্দিরোপম স্থাপত্যে কেউ বা নক্ষত্রখচিত নীলিমায়, রৌদ্র বা জ্যোৎস্নার উদ্ভাসে, বৃষ্টির মন্ত্রে, অন্ধকারের গভীরতায়। এমনি করেই কবি খুঁজতে থাকেন এই নশ্বর জীবনে ও শরীরে অনশ্বর অনন্তের স্ফুলিঙ্গ শিশুর হাসিতে, মাতৃস্নেহে বা দয়িত প্রণয়ে। নানারূপে ছড়িয়ে আছে সেই বিস্ময় কেবল তাকে উপলব্ধি করা তাকে প্রকাশ করা। অনন্তের সঙ্গে ঈশ্বরের মিশে যাওয়া সন্ন্যাসীর ব্রত, কবির ব্রত সেই একান্ত অনুভূতিকে বর্ণনা করা, সাধক কবি পরমানন্দ সরস্বতীর ভাষায় ঃ "যে আনন্দ ঝরে না, মরে না, মৃত্যু যাকে মুছে নিতে পারে না, যা ম্লান হয় না কালের ধুলোয়, হারিয়ে যায় না কোন সুখ দুঃখের গহ্বরে প্রবৃত্তির পদাঘাতে— মহৎ কবি দেন তার সন্ধান····· কবি যেমন ফসলের গান গাইবেন, আরক্ত প্রেমের গোলাপ ফোটাবেন·····তেমনি মানুষের সুন্দর কল্পনাকে, স্বপ্নকে যে শয়তান বার বার মুছে ফেলে তাকেও শৃঙ্খলিত করার দুর্মর চেতনাকে তিনি জাগাবেন।·····আনন্দই কবিতার আত্মা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব বলেছেন, যে সাহিত্য মহৎ উদ্দেশ্যহীন, তা সাহিত্য নয়। সত্যবিহীন সমস্ত কিছুই মহৎ উদ্দেশ্যহীন। এই প্রসঙ্গে অতুল চন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্য "কাব্য জিজ্ঞাসা" বইতে বলেছেন — "কবি কীটস সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিক যুগের ( ঊনবিংশ শতাব্দী কবি-প্রতিনিধি হিসাবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। ...মানব মনের যেগুলি চিরন্তন স্থায়ী ভাব, সকল যুগের কাব্যের তারাই প্রধান অবলম্বন।"

এরিস্টল ( ৩৮৪-৩২২ খ্রি পূ ) তাঁর পোয়েটিকস গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে অনুকরণই শিল্প। শিল্পে (কবিতায়) থাকে জীবনের অনুকরণ। নানা মাধ্যমে, নানা বিষয়ে ও নানা রীতিতে এই অনুকরণ প্রক্রিয়াশীল। "যে সমস্ত লৌকিক বিষয় দেখে আমরা বেদনা পেয়ে থাকি, সেই সমস্ত বিষয়ই অতি যথাযথরূপে অনুকৃত হতে দেখে আমরা আনন্দ লাভ করি।" অর্থাৎ যে শিল্পে বাস্তব জীবনের ছায়াপাত যতো বিশ্বস্তরূপে পড়বে, সেই হবে ততোই হৃদয়গ্রাহী। এই মত নিয়ে বিভিন্ন যুগে বিতর্কও কম হয় নি। ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের দ্বৈরথ এখনও সমান তালেই চলছে এবং তারই সমীকরণে বস্তুগত ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তারাও, (objective idealism) পরিবর্তনশীল বস্তুজগতকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাঁদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে।

কবিতার যে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী রূপ তা চিরকালই থাকে। কাত্যায়নী বাস্তবকে নিয়ে, প্রত্যক্ষকে নিয়ে তুষ্ট। তাকে নইলে দৈনন্দিন জীবন চলে না। আবার মৈত্রেয়ীর যেনাহং অমৃতাস্যাম তেনাহংকিমকুর্যাম্'— তাঁকে বরণীয় করে রাখে আমাদের চেতনায়। সেই আমাদের আদর্শ। নাস্পে সুখমস্তি।

কবির মধ্যে যে সামাজিক মানুষ আছে, সে মানুষের সামাজিক ভালো-মন্দ, আশানিরাশার বিচার থেকে কাব্যকে একেবারে নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না।" (কাব্যজিজ্ঞাসা) কাব্যের কাজ যে সত্য ও সুন্দরের মূর্তি দেওয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই প্রচলিত ধারণার রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই ঘটে. বিশ্বযুদ্ধের ছায়ায় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস স্তূপেই চাপা পড়ে গিয়েছিল রবীন্দ্র হুইটম্যান ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কীটস — (সত্যই সুন্দর !) দের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার — ভিক্টোরীয় যুগের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস — রোমান্টিক সৌন্দর্য বিরহের আত্মদহনের মহিমা। বোঁদেলিয়রের ক্লেদজ কুসুম কবিতায় নিয়ে এলো পাপপুণ্যহীন ইন্দ্রিয় চেতনার

দুঃসাহসী স্পর্ধা. অসুন্দরের মধ্যেও অভিষিক্ত হলো সৌন্দর্যের নতুনতর প্রথাভাঙা এক ভিন্ন মাত্রা। বাস্তবে বা পরাবাস্তবে সেই নবীন যাত্রার যে সূচনা করেছিলেন র‍্যাঁবো বা মালার্মে, ভ্যালেরি বা এপলনিয়ের-রা তাতেই সামিল হয়েছেন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকেরা। সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসু সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা। সে যুগেরই উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি জীবনানন্দ দাস, সুন্দর ও উদ্ভটকে যিনি মিলিয়েছিলেন, মিলিয়েছিলেন নাগরিকতা ও গ্রাম্যতাকে। কিন্তু কবিতার অন্তর্নিহিত রহস্যের লণ্ঠনটি নিভতে দেন নি কেউ-ই। ( খ্রি নবম শতক ) আনন্দবর্ধন "ধ্বন্যালোক" (মূল লেখকের পরিচয় আজও অজ্ঞাত) বৃত্তি অংশের রচয়িতা। অভিনব গুপ্তের 'ধ্বন্যালোকের' লোচন নামক টীকা থেকে জানা যায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় শিল্পের পরিচয়। প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে রস। কাব্যের বিভাব অনুভাবের সংস্পর্শে নবরসের সৃষ্টি। এই রসাত্মক বাক্যই কাব্য অর্থাৎ এই মতানুসারে মনের ব্যক্তিগত ভাবকে সার্বজনীন ভাবে পরিণত করতে পারলে তা-ই হয় আনন্দময় রস। এবং রসই শিল্প। এখানে ব্যক্তিগত অনুভবকে সার্বজনীন করে তোলার সাধনার মধ্যে কবিতার সিদ্ধি।

এই ব্যক্তিক ও সার্বজনীন ভুবনের মধ্যে সেতু রচনা করেন কবি, রচনা করেন মুহূর্তকাল ও অনন্তকালের মধ্যে। কবি সব অর্থেই দ্বৈতবাদী। উপলব্ধি করেন ও প্রকাশ করেন, নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে অন্যের সংবেদনার সঙ্গে মেলান। তিনি অসীম সৃষ্টি রহস্য ও লীলাকে বুঝতে ও দেখতে চেষ্টা করেন। অনন্ত সময় ও অখণ্ড চৈতন্যের বিভাশ নিয়ে আসেন খণ্ড সময় ও আত্মচেতনায়। সেই অর্থে কবি একজন সাধক, মরমিয়া ও রহস্যবাদী। শাস্ত্রে এই জন্যেই ঈশ্বরকে কবি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর কবিতা। ম্যাথু আর্নল্ডের মতেও কবিতা বিশ্বরহস্যের আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও পাঠক মনে নতুন ও নিবিড় করে সেই আশ্চর্য অনুভবের সঞ্চারণ।

কলা কৈবল্যবাদী ব্র্যাডলির মতে একটি কবিতায় থাকে অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা, থাকে শব্দধ্বনি, চিত্রকল্প, মনন ও আবেগের বিস্তার, যার মধ্যদিয়ে আমাদের যেতে হয়, যখন আমরা যথাসম্ভব কবির সঙ্গে একাত্মবোধ করে কবিতা পাঠে নিরত হই। পাঠক ও কবির এই সহচারিতার কথা এদেশে ওদেশে অনেকেই বলেছেন। দুজনের পথ যখন দুদিকে বেঁকে যায় তখনই শুরু হতে থাকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ। পাঠকদের শিক্ষিত ও দীক্ষিত হতে হবে কবিতার ভাবনায় এ দাবিও সোচ্চার আছে নানা মহলে। আর স্রষ্টার

জন্য বুঝি কোন নিয়ম থাকতে নেই ?

কবিতা প্রসঙ্গে নয়, কিন্তু বৃহত্তর জীবনবোধ সম্পর্কে আইনস্টাইনের সেই উক্তিটি আমাদের কবিতা সম্পর্কেও সমান ভাবায়। "আমি জানতে চাই কীভাবে ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। কোন একটা বা দুটো ঘটনার ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই। আমি জানতে চাই তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর ভাবনা। আর বাদবাকি সব তারই বিশদতা।" কবির এই মননই কবিতার জন্মভূমি। কবির মনেই রামচন্দ্রের জন্মস্থান, অযোধ্যায় নয়। রবীন্দ্রনাথও এরকম কথা ভেবেছেন। কবির মন কীভাবে এই স্থাবর জঙ্গম বিশ্বজগৎ জীবনপ্রবাহকে বুঝতে চেষ্টা করে তার ওপরই নির্ভর করে তাঁর বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও অভিজ্ঞতা। আমাদের অস্তিত্বই আমাদের বিস্ময়কর সম্পদ। এই অস্তিত্বকে বুঝতে, জানতে উপলব্ধি করতেই চেষ্টা করেন কবি। পদার্থবিদ্যার কাছে কৃষ্ণগহ্বর ( Black Hole ) শব্দের স্রষ্টা জন আর্চিবল্ড হুইলার যেমনটি আশা করেন, কবিতার কাছেও আমাদের সেই একই রকম প্রত্যাশা, আমাদের অস্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত। তা হলে দেখা যাচ্ছে কবিতার মধ্যে ছড়ানো আছে এক রহস্যময় ছায়াপথ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বা অসীম বিশ্বপ্রকৃতি অথবা জীবন ও সৃষ্টির কূট দুর্জ্ঞেয় বার্তা কিংবা সময়ের দুর্বোধ্য সংকেত — এই সবের মধ্যেই কবিতার রহস্য নিহিত নয় — বেদ-পূর্ব আরণ্যক জাদুতেই মোহমেদুর নয় কবিতার জন্মইতিহাস — এই রহস্য, এই জাদু, এই দুর্জ্ঞেয় এক অনুভব বাইরের জগতেই নয় লুকিয়ে থাকে কবির, পাঠকের ও শ্রোতার মনের গভীরেও। তাই কবিতা মন্ত্রের সমান, সব শিল্পের সারাৎসার। অথচ কবিতার শরীর শব্দে ও ধ্বনিতে তৈরি। এই শব্দ ও ধ্বনির মধ্যে কোথায় বাস করে সেই অলৌকিকতা ? যদিও আধুনিকতর মানুষেরা অলৌকিকের ছাল ছাড়িয়ে রক্তমাংসের সব রহস্য লোপাট করে জীবনের আর পাঁচটা বিষয়ের মতো কবিতাকেও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার খাঁচায় বন্দী করতে চেয়েছেন, তবু খাঁচাভাঙা মুক্ত আকাশের যে হাতছানি থাকে কবিতায়, আমরা অনেকে আজও তাকে সহজে নির্বাসন দিতে যে রাজি নই। আনন্দবর্ধন ধ্বনির রহস্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। কাব্য শরীরের নানা উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন তিনি, বলছেন শব্দ ও অর্থের ছন্দস্পন্দের মাধুর্য ও ভাবনা গরিমার সুন্দর বিবাহের কথা। অনেক কাল আগে। কবিতায় শব্দের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা অনেকেই যাঁর পরীক্ষিত ভাবনাকে ও রচনাকে মূল্য দিই, মানি করি সেই মালার্মেও কবিতার রহস্য ও অলৌকিকতার কথা ঘোষণা করেছেন : "Holy things which tend to remain holy surrounds itself with mystery" ( ইংরেজি অনুবাদে ) এই রহস্যই কবিতার আত্মা। এই আত্মা

ব্যতিরেকে কবিতা কেবলই মৃৎপুতুল। সেই পুতুলেরই ছড়াছড়ি আজ আমাদের চারদিকে। পুতুল বাজারে যায়, প্রতিমা মণ্ডপে।

## দুই ॥ কবিতার শরীর

"Poetry should strike a reader as a wording of his own highest thoughts and almost a remembrance"

—John Keats

"The best words in their best order" —S.T.Coleridge.

কবিতার শরীর শব্দ দিয়ে তৈরি। ধ্বনিভূষণ এই শব্দ, এক বা একাধিক অক্ষর সমবায়ের ফল। শব্দ অভিধানের খামারে তোলা থাকে। মানুষের মুখের কথায়, হাতের লেখায় তা সচল। ব্যবহারে ব্যবহারে তার চেহারা পাল্টায়। জামাবদল হয়। ভিতরের অর্থেও ঘটে রূপান্তর — এটি একটি সামাজিক ও গতিময় প্রক্রিয়া। জীবনের স্পন্দনে চিহ্নিত। এই শব্দ ও ধ্বনি, পাত্রাধার তৈল বা তৈলাধার পাত্রের উপমায় ,কোনটি আগে বা পরে তার চুলচেরা বিচার না করেও বলা যায় শব্দ ও ধ্বনির যুগপৎ উপস্থিতি, প্রদীপ ও শিখার মতোই। এই ধ্বনি আনে স্মরণীয়তা। কালের সোপান পেরিয়ে যাবার পাথেয় থাকে স্মরণীয়তার চাবিতে। ধ্বনিময় শব্দের মধ্যে মিশে থাকে ছন্দোস্পন্দ। এই ছন্দোস্পন্দ শব্দ বা শব্দমালার স্মরণীয়তাকে করে সুন্দর ও নিশ্চিত। শব্দ নিয়ে আসে অর্থ। অর্থ ছাড়া সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা অচল। অথচ এই অর্থেরও আছে কত না রহস্য রসায়ন!

দশম শতাব্দীর অভিনবগুপ্ত কবিতার শরীর ও ভাব গঠনের ( form and content ) প্রক্রিয়া পরিস্পন্দ, গুণ এবং মাধুর্যের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। তারপর অলংকার, শব্দ ও অর্থের সমাহারে কবিতার শরীর সৌন্দর্য বিধানও ব্যক্ত করেছেন। পরিস্পন্দে শব্দকম্পন, এবং গুণে অনুভবের মাত্রা সঞ্চারিত হয়। শব্দ এবং অর্থে গীতিময়তা ও বিষয় মনন। আলেকজাণ্ডার পোপের ভাষায় 'ধ্বনিকে হতে হবে অনুভব ও চেতনার সার্থক প্রতিধ্বনি।'

রবার্ট ফ্রস্টও কবিতাকে ভেবেছেন 'a performance in words.' শব্দবাহিত ধ্বনি এবং অর্থের এই আশ্চর্য সম্পদ সম্পর্কে প্রখ্যাত অগ্রণী ভাষাতাত্ত্বিক সস্যুর বলেন শব্দ এবং অর্থের সম্পর্ক আকস্মিক কিন্তু তা অনিবার্য নয়। 'বইকে' আমরা 'বই' না বলে অন্যকিছুও বলতে পারতাম। সবাই যদি অন্য কিছু বলতো তবে সেটাই 'বই' বোঝাতো। তাঁর মতে ভাষা আগে ভাবনা

পরে। নির্মিতিবাদীদের এই মতে ভাষা কতগুলো শব্দ চিহ্ন দিয়ে তৈরি একটি বিশেষ সামাজিক প্রকাশ মাধ্যম। এবং এই চিহ্নগুলো দিয়েই আমাদের চিন্তাভাবনার জগৎ তৈরি। বিশেষ অর্থটির সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক আকস্মিক এবং সেটির ভিন্নতা অন্য শব্দ থেকে তাকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে রাখে। সস্যুরের ভাষাতত্ত্ব নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে লেভিস্ট্রসকেও প্রভাবিত করেছিল। লেভিস্ট্রস বলেন এই জগতে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা নিয়মিত ও নির্দিষ্ট। আমরা একটা গড়ে ওঠা বদ্ধমূল সংস্কারের দাস হতে থাকি ক্রমশ। এই শৃংখল ভাঙাই একটা বিপ্লব। সস্যুরের মতে তাই সাহিত্য জীবনকে সঠিক প্রতিফলিত করতে পারেনা। এ্যারিস্টোটলের মত তাতে খণ্ডিত হয় প্রতীক বা শব্দ নিরপেক্ষ। সত্য উপলব্ধির অক্ষমতাই আমাদের নিয়তি।

আমরা তো কখনো অখণ্ড ও অসীমকে দেখতে বা বুঝতে পারি না। তাই খণ্ডের, সীমিতের সাধনা আমাদের, শব্দের চৌহদ্দির মধ্যেই আমাদের আনাগোনা। যা ধরাছোঁয়া যায়, দেখা যায় তার থেকে অনেক বেশিই রয়ে যায় অধরা, অদেখা। শব্দ জগতের এই আরেক অন্তর্নিহিত রহস্যের সামনে এসে আমরা আবারও বিমূঢ় হয়ে পড়ি।

এই শব্দ মননজাত ও আবেগজাত সামাজিক ফসল কিন্তু এই শব্দের মধ্যেই থাকে প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতা ও বোধের চাবি। যা প্রয়োজন মেটায়, অর্থের ও অনুভবের শব্দ যখন সেই প্রয়োজনের লক্ষণগণ্ডী ভেঙে আরো দূরে ছুটে যায় তখন তার ঘটে মুক্তি — ভিন্নতর উদ্ভাসে ও ব্যঞ্জনায় উত্তরণ। তখন শুরু হয় শব্দের সাধারণ ব্যবহারিকতার পরিমণ্ডল পেরিয়ে রসলীলা। এই রস থেকেই আনন্দ উদ্গত হয়। তৈত্তীরিয় উপনিষদে এই ভাবকে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ' এবং তা থেকেই 'লব্ধানন্দী হয়। এই আনন্দের উৎস 'শব্দ' ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথের মতে গ্রাম্যতা স্থূলতা ও দৈনন্দিনতার গ্লানিমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা হওয়া দরকার সহজ ও আড়ম্বরহীন। ইয়েটস প্রমুখ অনেক আধুনিক কবিও এই মত পোষণ করতেন যে শব্দকে যথাসম্ভব কম অলংকার পরানো দরকার, বাহুল্যে তার নিজস্ব সৌন্দর্যের অপহ্নব ঘটে। বরং শব্দের যে প্রতিভা প্রত্যক্ষ অর্থ ছাড়িয়ে আরো দূরাভিসারী, সেই প্রতিভাই কবিতাকে ঋদ্ধ করে। টিলিয়ার্ড বা মালার্মের মতো অনেকেই মনে করেন "All poetry is oblique : there is no direct poetry". শব্দের সুইচ জ্বাললে ভিতর ঘরে বা অন্য কোন নিভৃতে যদি জ্বলে ওঠে আরেক আলো,

তবেই সে শব্দ কবিতার সম্পদ উপকরণ। এবং বাস্তবতায় বিচরণ করেও শিল্প আরো বেশি দূর নিয়ে যেতে চায় আমাদের। শব্দের সেই রহস্যই মালার্মের অন্বিষ্ট ছিল, যে রহস্য শব্দের প্রত্যক্ষ নয়, তির্যক এবং গূঢ় অবদান। ফ্রস্টের কথায় : 'Saying one thing and meaning another'

অথচ নির্মিতিবাদীদের মতে ভাষার স্ট্রাকচার আমাদের বাস্তব দৃষ্টির অর্থাৎ আমরা বাস্তবকে যে ভাবে দেখি তার নির্মাণ। সমাজ থেকে আহরণ করে শব্দ ও বাক্যকে নিজের প্রয়োজন ও আদর্শ অনুযায়ী প্রসাধিত এবং বিন্যস্ত করে কবি সাহিত্যিক তাঁদের রচনা সৃষ্টি করেন। স্রষ্টার সিংহাসনকে এখানে সাধারণ জনজীবনে নামিয়ে আনা হয়েছে। কবি যে ঈশ্বরের সমতুল্য, এই অহংকার ক্রমশ মলিনতর হচ্ছে। ফরাসী চিন্তাবিদ দেরিদা (Derrida) জানালেন ভাষার কোন স্থির বা নিশ্চিত অর্থ হয় না। আমরা যখন কোন কবিতা পড়ি এবং তা হৃদয়াঙ্গম করি, সেখানে কবিতাটিই মূলপাঠ বা text। কিন্তু যখন তা নানা মুখে, নানা সময়ে ব্যাখ্যাত হতে থাকে তখন সেই ব্যাখ্যা-গুলিই ক্রমানুসারে মূল পাঠ, পরিবর্তিত পাঠ, মূল পাঠ পরিবর্তিতের পাঠ··· এই ভাবে বদলাতে থাকে। সুতরাং কবিতার কোন নিশ্চিত অর্থ থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সত্যও বাস্তব ক্রমপরিবর্তনশীল। ফুকোর মতে ভাষার মাধ্যমে আমরা অন্যের ওপর নিজেকে চাপিয়ে দিই, আমাদের আধিপত্য বিস্তার করি। অর্থাৎ কবি পাঠককে তাঁর শব্দ বাক্য ও ভাব দিয়ে পাঠকের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। শব্দ হলো এই বৌদ্ধিক ঔপনিবেশিকতা প্রসারের অস্ত্র। অন্যের ওপর নিজের ক্ষমতা ফলানো তো একধরনের মানবিক বিচ্যুতি। কবির সেই মহান ভূমিকা ধূলিসাৎ করে দিতে চান এই বিনির্মাণবাদীরা। স্থির কিছু নেই এই গতিশীল সংসারে। কোন সত্যই স্থির নয়। আমরা যা কিছু দেখি বা শুনি তা হলো আমাদের ধারণা এবং মতামত। এবং তা হলো এক ধরনের অপ্রকৃত বাস্তব। এ কিন্তু মায়া নয়। তবুও এই দার্শনিক মত অনুযায়ী আমরা শব্দ দিয়ে কবির প্রকৃত মনোভাব জানতে পারি না। তাই শব্দ হলো সর্বজন গ্রাহ্য ভাবনাচিন্তাধারণার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের লঘিমা। এবং কবি যা অনুভব করেন তা শব্দের মাধ্যমে তিনি সর্বতোভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। পাঠক যা বোঝেন এবং ভাবেন তাও কবির নিজস্ব ভাবনা, এবং প্রকাশিত ভাবনা থেকে পৃথক হতে পারে নানা ক্ষেত্রেই। শব্দের সঠিক অর্থ আমাদের ধরা ছোঁয়ার কিছু দূরে এক বিমূর্ত কান্তারের সোনার হরিণ হয়ে খেলা করে। করুক — আমরা কিছু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করে শব্দের শক্তি ও

রহস্যের কিছু ধারণা করি বরং। কোন কবি যখন কবিতা সূত্রে একটি শব্দ-ব্যবহার করেন তখন পাঠকের মনে তা এক ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করে। সেই অভিঘাত পাঠকের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ ও শ্রেণী চরিত্র, মানসিক গঠন ও সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল। সমাজ ও শ্রেণী চরিত্রের মধ্যে পাঠকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা প্রতিফলিত হয়। কবি তাঁর একটি শব্দ ব্যবহার করলেন, যেমন ধরা যাক শব্দটি 'শিউলি' — তখন নানা পাঠকের মধ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া ও অনুভবের সঞ্চার হতে পারে। সর্বদা এক রকম হবে না হয়তো।

শিউলি — শরৎকাল / নীল আকাশ, প্রিয়মিলন, ফুলতোলা, দলবেঁধে দুর্গা পুজোর আনন্দ সমারোহ, গ্রামজীবন, আনন্দ ঋতু
— শাদা রং / পবিত্রতা / আত্মশুদ্ধি / চেতনার উৎকর্ষ ও উত্তরণ / অমলিন জীবনের জন্য আকুতি
— পবিত্রতা / পূজা, আধ্যাত্মিকতা, শান্তি, প্রার্থনা, মালাগাঁথা
— সকালবেলা / কালবোধ, বাল্যস্মৃতি, গ্রাম জীবন / হারানো দিন / দীর্ঘশ্বাস
— কোন মেয়ের নাম / প্রেম স্মৃতি বেদনা আনন্দ
— ঝরে যাওয়া / বেদনা / জীবনের সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব
— ইত্যাদি / অথবা খেজুর রস কাটার লোক / মধুরতা / কণ্টকস্মৃতি...

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অন্তত শব্দ মহিমার উদাহরণ তো পেশ করা গেল। মেদিনীপুর জেলার এক মফস্বল শহরে আজ থেকে প্রায় আঠাশ বছর আগে একজন অবিখ্যাত কবির একটি কবিতা প্রকাশিত হয় স্থানীয় একটি পত্রিকায়। তাতে একটি পংক্তি ছিল এ রকম :

'পড়ে থাকে ধুলোয় ও ঘাসে
বিনা অপরাধে আমাদের ভালোবাসা, শিউলি শুকোয়'

কবিতাটি যতোই কাঁচা বা অবহেলার হোক না কেন, সম্পাদক কবিকে একটি তীক্ষ্ণ চিঠি উপহার দিলেন। স্থানীয় হাসপাতালের এক নার্স মানহানির মামলা করবেন বলে শাসিয়েছেন। বহুবান্ধব সেই মহিলার নাম ছিল শিউলি।

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'

কেউ তো প্রশ্ন করতেই পারেন, পৃথিবীর কি অসুখ করে? করতে পারে? পৃথিবীর মানুষজন। প্রকৃতির কথা টেনে আনা হয়েছে একটি শব্দে। এই

আকর্ষণী ও বিস্তার ক্ষমতা শব্দের কাব্য সম্পদ। একজন ঔপন্যাসিক, গল্পকার বা প্রাবন্ধিক যেভাবে শব্দকে ব্যবহার করেন, কবি সেভাবে করেন না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে আছে ঃ

একো হংসো ভুবনাস্যাস্য মধ্যে / স এবাগ্নি সলিলে সন্নিবিষ্ট ঃ /···

সাধারণ অর্থ ঃ 'এই ভুবনে একটি হাঁস আছে। সে অগ্নিরূপে সলিলে সন্নিবিষ্ট।

এই কাব্যিক মন্ত্রে 'হংস' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হংস অর্থাৎ হননকারী। অবিদ্যা হননকারী পরমাত্মার উপাধি। ( পরমহংস শব্দের অর্থেও এরকম মায়া পাশ ছিন্ন করে অসদ জগৎ থেকে সৎকে সংগ্রহ করার গুণ উদ্দিষ্ট আছে ) কবিতার শব্দে থাকে গভীরতর অর্থ ও দ্যোতনা।

শব্দকে কেউ কেউ জমির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বহু ব্যবহারে এর উর্বরতা কমে যায়। সার ও সেচ দিতে হয় কবিকে। সেই যোগানও আসে সময়, সমাজ ও কবি প্রতিভা থেকে। জীবনানন্দ যখন 'প্রসব' শব্দ ব্যবহার না করে 'বিয়োবার দেরি নেই আর' লিখলেন, তখনই তিনি অনায়াসে আমদানি করলেন কবিতার সজীবতা — নিয়ে এলেন লোক জীবন ও ফসলের খেতের প্রত্যক্ষ আস্বাদ। দেশি বিদেশি গুরু চণ্ডালি প্রচলিত অপ্রচল, সব শব্দেরই কবির কাছে সমান ওজন। কবি চেনা শব্দকে নিংড়ে নতুনত্ব আনতে পারেন ব্যবহারের ও প্রয়োগের দুঃসাহসে। 'সমস্ত শব্দের শেষে শিশিরের শব্দের মতন / সন্ধ্যা আসে', লিখে জীবনানন্দ এক অন্যরকমের নিঃশব্দ নির্জনতার আয়োজন করলেন বাংলা কবিতায়। কেনা জানে, শিশিরের শব্দ হয় না. শিশির ঝরে না, জমে, ঘাসে। হয়তো বা ঝরে গাছের ওপর পাতা থেকে নিচের পাতায়। এবং শিশির পড়ে ( আমরা তো তাই বলি ) সকালবেলা. কবি সন্ধ্যার নিঃশব্দ আবির্ভাবকে সকালবেলার অনুষঙ্গে জড়িয়েছেন। এ সব বিশ্লেষণ আমাদের মনে থাকে না, কোন বিনির্মাণবাদী বা উত্তর আধুনিকের কচকচির তোয়াক্কা না করে জীবনানন্দের সন্ধ্যা আমাদের আচ্ছন্ন করতে থাকে। এরকম উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। যেকোন মনোযোগী পাঠকের কাছে সেই দায় অর্পণ করে আমরা শব্দ ছাড়িয়ে চলে যাই বরং শব্দেরই আরেক জাদু 'চিত্রকল্পে'। প্রতীক, রূপক, উপমা অলংকার দিয়ে নানাভাবেই কবিতা তৈরি করতে থাকে ছোট ছোট জগৎ, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, রূপময়, চিত্রময় আনন্দ সংকেত — যার মধ্যদিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনুভবের ওপরতলায় হেঁটে যায় কবিতা। তার কটাক্ষ ঠিকরে পড়ে ঝলসে ওঠে সেই সব উজ্জ্বল চিত্রকল্পের ফাটকে।

হার্ট ক্রেন সমুদ্রের বর্ণনা দিয়েছেন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল রূপকল্পে : 'a great wink of eternity' — অনন্তের এক মহান কটাক্ষ। সমুদ্রের নীলিমা ও তরঙ্গমালা ছাপিয়ে আরো এক ঐশ্বরিক বিরাটত্বের প্রকাশ ঘটে যায়।

ধ্বনি, চিত্র, ছন্দ, বিন্যাসের মধ্যদিয়ে শব্দ মেলে ধরে কবিতার জগৎ। প্রতিটি উপাদান নিয়ে পৃথক ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন রসিক ও পণ্ডিতেরা। কয়েকটি শব্দ এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় তৈরি করতে পারে এক একটি অভিজ্ঞতা ও বোধের পরিমণ্ডল। গ্রহণ বর্জন, পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে শব্দ নির্বাচন করেন কবি, অর্জন করেন তাঁর নিজস্ব ভাষাভঙ্গি। অলংকারের পর-নির্ভরশীলতা থেকে ক্রমশ মুক্ত হয়ে এক সাংকেতিক সংবাদ পরিবেশনে সার্থক হলেই ঘটে তাঁর সাফল্য, কালজয়ের যাত্রায়।

'তোমার নগ্ন নির্জন হাত / তোমার নগ্ন নির্জন হাত'

দুবার একই পংক্তির পুনরাবৃত্তি ও কবির ইচ্ছাকৃত প্রকরণ। একটি নিরলংকার বর্ণনা। কেবলমাত্র দুটি তৎসম বিশেষণ নগ্ন ও নির্জন — তাতেই সেই রহস্যময়ীর হাত দুর্লভের ব্যঞ্জনায় বিমূর্ত হয়ে হাতের বাইরে নিয়ে যায় আমাদের। শব্দই জানে এই উড়াল রহস্য। এবং কেবলমাত্র বর্ণনা অবশেষে রূপান্তরিত হয় আবেগ লিপ্ত অনুভবে। সুতরাং বাস্তবের হাত আর প্রধান হয়ে রইলো না, অন্য এক পরাবাস্তবে আমাদের উত্তীর্ণ করে। তাই কবিতার শব্দ আমাদের জ্ঞানে ও চেতনায় একটি প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটায় আমরা সাড়া দিই সাধারণভাবে। এই সাড়া (response) থেকে জন্মায় শব্দ জনিত চেতনাশৃংখল বা চৈতন্য প্রবাহের গতিময়তা। তখন শব্দ দ্বারা চিহ্নিত বা আলোকিত বিষয়ের একটি বিশেষ চেহারা আমাদের মনের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। একে বলা যায় পরিচয় (recognition), এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে শব্দের পরবর্তী সুষম ব্যবহারে, বা সেই শব্দেরই বিস্তারিত উন্মোচনে, তখনই ঘটে পাঠকের হৃদয়ে কবিতার প্রকাশ। (revelation) হোয়াইটহেড এই প্রক্রিয়াকেই বলেছেন পাঠকের মনে কবিতার নবজন্ম এবং নতুন অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটানো। ফ্রস্টও বলেছেন কবিতার সবচেয়ে জরুরি গুণ হলো 'saying one thing in terms of another' — কোন এক কথা বলে অন্য কোন গূঢ়তায় ও সুদূরে নিয়ে যাওয়া। কেবল বাস্তবে, প্রত্যক্ষে, শব্দের নির্দিষ্ট ( ! ) অর্থে কবিতা বন্দী থাকতে চায় না। 'তোমার নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাংশে আপাত দৃষ্টিতে শব্দগত কোন দুর্বোধ্যতা নেই — কিন্তু কান ও বুদ্ধি ছাড়িয়ে ঐ শব্দগুলি আমাদের অন্য

এক রহস্যছায়ায় নিয়ে চলে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণুদের অনেক কবিতায় আমরা লক্ষ করেছি কান দিয়ে পশে তা মর্মে নয় বুদ্ধিতে আশ্রয় ও ব্যাখ্যা চায়। শব্দের এই যে নানান দরোজায় টোকা মারার ক্ষমতা — তার মধ্যেই কবিতার সিদ্ধি ও সম্ভাবনা। বিষ্ণু দে'র জানি জানি এই অলাতচক্রে চংক্রমণ / সোৎপ্রাস পাশে বলি নাকো তাই কথা। / ক্লেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা / জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ" অথবা সুধীন্দ্রনাথের "বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে / জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সান্নিপাত" প্রভৃতি কবিতায় শব্দের যে আবেদন তা আমাদের মগজের কাছে প্রথমে। এর মধ্যে রহস্যের থেকে বেশি হয়ে উঠেছে সংবাদ। মাইকেলের কবিতায় যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাও শব্দ বাহিত। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম' তখন এই সহজের মধ্যে সুদূরের আভা ঘনায়। রূপনারান আর নদী মাত্র থাকে না, পাঠক বেশ বুঝতে পারেন, এবং জেগে ওঠা কেবলমাত্র শারীরিক ঘুম ভেঙে জৈবিক জেগে ওঠায় অবসিত নয়। কবিতার ভাব ও ভাবনা নানা রকমের তো হবেই। তবে প্রধানত তা দুরকমের — বর্ণনা প্রধান (referential) উচ্চারণ এবং আবেগময় অনুভূতির (emotional) উদ্গীতি। নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব ভিত্তিক অথবা অনভূতি সঞ্চারক। ভামহ কথিত ধ্বনি ও অনুভূতি, শব্দ ও অর্থের মিলিত মিথষ্ক্রিয়ায় রচিত সৌহিত্য-এর নিদর্শের সঙ্গে পাঠকের ও কবির মধ্যে অনুভবের সেতুবন্ধ রচনা বা "সাহিত্যের" মিল আছে। নির্মিতিবাদীদের কথা মনে রেখেও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে ভাবনাই, ( তত্ত্ব ও বিষয় ) কবিতার প্রধান উপাদান এবং তার বাহন হলো শব্দ। ভাবনা মহান কিন্তু শব্দ দুর্বল, অথবা ভাবনালঘু অথচ শব্দ রাজকীয়, এ রকম বিপর্যয় সম্পর্কে, ফর্ম ও কন্টেন্টের সাযুজ্য সম্পর্কে কবিকে তো অবহিত ও সতর্ক হতেই হয়। কবি তাই প্রতীক, রূপক, সংকেত, চিত্রকল্প তৈরি করেই ক্ষান্ত হন না, শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে হতে হয় যত্নবান। কোন শব্দ এনে দেয় স্মৃতি মেদুরতা, কোন শব্দ দেয় দ্রুত চলার বেগ। কোন শব্দ প্রগলভ, অস্থির, কোনো শব্দ প্রগাঢ়, শান্ত। বিন্যাসও প্রয়োগ নৈপুণ্যে একই শব্দ নানা রকম ভাব প্রকাশ করে। এই শব্দ, তৎসম তদ্ভব, দেশি বিদেশি, চলিত, অপ্রচল, নাগর বা গ্রাম্য যাই হোক না কেন, কবিতার ভাব ও মেজাজ অনুযায়ী কবি তা ব্যবহার করেন। বাহুল্যবর্জন ও পরিমিতি কবিতাকে তীক্ষ্ণ ও তন্বী করে। অনর্থক শব্দের অপব্যয় দুর্বলতারই লক্ষণ। শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন হোক জোরালো।

ভাবতে অবাক লাগে প্রায় সারাজীবন জীবনানন্দ লিখে গেলেন ঢালা

অক্ষর বৃত্তের দীর্ঘ পয়ারে, কখনো বা সংলাপের ঢঙে, কখনো বা একটানা বৃষ্টির ক্রমিক ধারাপাতের মতোই ( যেমন রূপসী বাংলায় )। অথচ এক অদ্ভুত মাদকতা চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে যায়, আমাদের অধিকার করে। কবি তাঁর শব্দাবলিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন ছন্দের ডালিতে। এক এক রকম ডালি। কখনও মুখের কথায় ছড়ার চালে স্বরবৃত্ত, কখনো বা মাত্রাবৃত্তের দোলাচলের স্পন্দনময়তা, কখনো বা বাংলাভাষার সহজিয়া অক্ষর বৃত্তের লতিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য। কখনো বা গদ্যছন্দ। এরই বৈচিত্র্যে ও মিশ্রণে — নানা রকমের পরিবেশনে কবিতার শব্দ আমাদের শ্রবণকে জয় করে মেধায় ও হৃদয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। কবিতার সঙ্গীতময়তা বা গীতলতা তাকে স্মরণীয় হতে সাহায্য করে। যারা না-কবিতা বা প্রতি-কবিতার কথা বলেন তাঁরাও চান কবিতা পাঠককে আক্রমণ করুক, প্রথা ভেঙে, ঐতিহ্য ভেঙে সৃষ্টি করুক নতুন পথ। নৃত্য, চিত্র ও সঙ্গীত — চারু শিল্পকলার তিন প্রাধন মাধ্যম কখন যে কবিতার শরীরে ও আত্মায় মিশে যায়, ভাবলে অবাক লাগে বাংলা কবিতার ছন্দে আরো নতুন কিছুর জন্য আমাদের মন উৎসুক হয়ে থাকে। কার হাতে বাজবে সেই নতুন পথের মঞ্জীর ? শব্দই তৈরি করতে পারে চিত্র, ছন্দ ব্যবহারে আনতে পারে নৃত্যপরতা এবং গীতিময়তা। অফুরান পৃথিবীর গান। অফুরান জীবনের ছবি। চঞ্চল জীবনের ছন্দ। এই ইন্দ্রিয়ময়তার মধ্যদিয়েই কবিতার অভিসার অতীন্দ্রিয়তার বিস্ময়ে।

### তিন ॥ কবিতার ফ্ল্যাট বাড়ি বাজারের কাছে

"দূর হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়ন তলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে" —রবীন্দ্রনাথ

কবিতার সংসারেও থাকে কয়েকখানা ঘর। বৈঠকখানায় কিছু সময় বসেন অনেকে — সে ঘরে সাজ সজ্জা আয়োজন আপ্যায়ন, কবিতার বহিরঙ্গ দেখে ফিরে যান তাঁরা। কেউ বা যান ভিতরের ঘরেও। সেখানে কবিতার সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হয়। বসবাস হয়। আমরা সরে এসেছি কবিতার সেই সচ্ছল ছড়ানো খামার বাড়ির পরিবেশ ছুটির দিনের বেড়ানোর আরাম থেকে। নদীবন বাগান জ্যোৎস্নারোদ পাখি চাঁদ তাঁরা, স্বপ্নবিলাস — গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সেই বাতাবরণ ভেঙে আধুনিক কালের শহরে পরিবেশে ফ্ল্যাট বাড়ির খাঁচায় বন্দী হতে চলেছি আমরা। কবিতারও তাই ফ্ল্যাট বাড়ি। আধুনিকতার দুটি বড় শর্ত—একটি একই ধাঁচের গড়ন ( Standardisation ). সংস্কৃতিতে ছাপ তার বেশি, অন্যটি বাজার অর্থনীতি— ( Market economy )

বাজারই যেখানে মুদ্রারাক্ষস আমাদের জীবন জীবিকা চিন্তাভাবনার ওপর তার প্রভাব বিস্তার। কবিতার সংসারেও তাই ঝকঝকে বাজারে চালু বিজ্ঞাপন ঝলকানো পণ্যমানসিকতার আমদানি হবে, সে আর বিচিত্র কি ? তবু স্রোতে গা না ভাসিয়ে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও আত্মাকে বন্ধক না রেখে লড়াই করতে শেখান কবি-ই। অনাগত যুগ তাঁরই সৃষ্টি। সে রকম কবিদেরই ক্রান্তদর্শী বলা হয়। সে রকমই কাউকে কাউকে কবিতা ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে লণ্ঠন হাতে নিয়ে যায় ঘর ছাড়িয়ে ছাতে — সংসার থেকে দূরে সেখানে আরেক রকম মিলনের আয়োজন। তাঁকে সাধকেরা পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবব্রহ্মের সংযোগ বলেও ভাবতে পারেন। সেই আধ্যাত্মিক উর্ধগামিতার বিরল দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনকে ধন্য করে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে লুকোনো আছে এরকম অনেক সিঁড়ি।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাহিত্যের গতিসম্মত বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। ...এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। আবার ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব প্রয়াসী ও কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কবিতাকে আধুনিক বলে গণ্য করতেন আবু সয়ীদ আয়ুব। আধুনিকতা কালগত অভিধা নয়, গুণগত। কবিতায় কেবল চিরকালের আবেদন থাকবে, এ যেমন আমরা চাইবো, তেমনই চাইবো কবিতায় থাকবে আমাদের জীবনের বৈচিত্র্য, স্বপ্ন ও সংগ্রাম। থাকবে আমাদের অন্তর্জগতের রক্তাক্ত ইতিহাস। সময়, সমাজ, প্রকৃতি ও নিজের সঙ্গে মানুষের যে লড়াই, বোঝাপড়া কবিতায় থাকবে তার অভিপ্রকাশ। কবিতা সামাজিক দায়িত্বও অস্বীকার করতে পারে না। আগুনে ঘেরা সংসারে কবি হতে পারেন না বেহালাবাদক নিরো। কবিতা কোন ফতোয়ারও ধার ধারেনা। এক সময় কবি অরুণ ভট্টাচার্য পাঠককে ডেকেছিলেন র‍্যাঁবো বোদলেয়ার এলুয়র মায়কভস্কি থেকে মহাজন পদাবলী অথবা রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীধর কথক নিধুবাবুর গানে। উত্তর আধুনিকতার এ-রকমই ছিল সুর। আমরা এই বিশ্বায়নের যুগে, বাজার সভ্যতার এরেনায় পারবো কি বিদেশি হাওয়াকে আটকাতে ? পারবো কি ফিরে যেতে বিজলি বাতি ছেড়ে লণ্ঠনের যুগে, বহুজাতিকদের ভোগবাদের পসরা উলটে দিয়ে সহজ সরল গ্রামীণ জীবনে ? সময়ের উজানে যাওয়া চলে না। বরং হাওয়া যখন খরতর কবিতায় জ্বেলে রাখতে হবে অনির্ভান বিশ্বাসের শিখা, আগলে রাখতে হবে মানবিক মূল্যবোধের রিকথ। উত্তর আধুনিকতা প্রসঙ্গে বরং এমন এক সর্বজনীনতার কথা বলতে চেয়েছেন অনেকে যে সর্বজনীনতা ফিরে পাবো আমরা রবীন্দ্রনাথে বা হুইটম্যানে, পাবো গীতায় বা উপনিষদে। হুইটম্যান যা বলেছেন,

অর্কিড/৭০

উপনিষদ গীতা ও রবীন্দ্রনাথে সে কথাই নানাভাবে বলা হয়েছে। 'সকলের মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাই। ( যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বংচ ময়ি পশ্যতি/ গীতা ) আমি শরীরের কবি, আমি আত্মারও কবি। ( আমি বিচিত্রের দূত ) আমি তোমাদের জিভের কাজ করি, ( তোমাদের কথাই আমি প্রকাশ করি ) আমি বিরাট, আমার মধ্যেই রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ( তুলনীয় বিশ্বরূপ দর্শন ) [ Shadow of Spirit / Post Modernism and religion ]

আমাদের কবিদের গীতা উপনিষদ বা রবীন্দ্রনাথের মতো রচনায় কুশলী হতে হবে। উত্তর আধুনিকদের এই কবি সৃষ্টিরও ইতিহাসের পুনরাবর্তন তত্ত্বের অনুসারী। কবিতা আস্বাদনের, ব্রহ্মস্বাদ সহোদরা, উপলব্ধির, উপভোগের। বিশ্লেষণ করে মাধুর্য আবিষ্কার করা যায় না। বরং এই আলোচনার প্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্তের সামনে আমরা এসে দাঁড়াই তা হলো কবিতাকে কবিতা হতে হবে। তার তকমার দরকার নেই। দরকার সজীবতার, সঞ্জীবনীর। জীবনের নতুন নতুন অভিঘাত ও উন্মোচন থেকে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারলে তাই হবে কবির দান, সময়কে সমাজকে। অথবা আমাদের ভাণ্ডারে যে শব্দ আছে তাদের ব্যবহারেও প্রয়োগে এমন কোন চমৎকারিত্ব, ও অভিনবত্ব প্রণয়ন করা যা কবিতাকে ক্লান্তি ও অভ্যাসের থেকে মুক্ত করবে, দেবে নতুন মাত্রা, নতুন গতি — জ্বালিয়ে দেবে আমাদের জীবনের অন্যতর মানে। রৈখিক প্রকাশে কবিতার শব্দ শরীরকে হয়তো এরকম ভাবে আঁকা যায়, সরলতর পরিচয়ের সহায়ক হিশেবে :

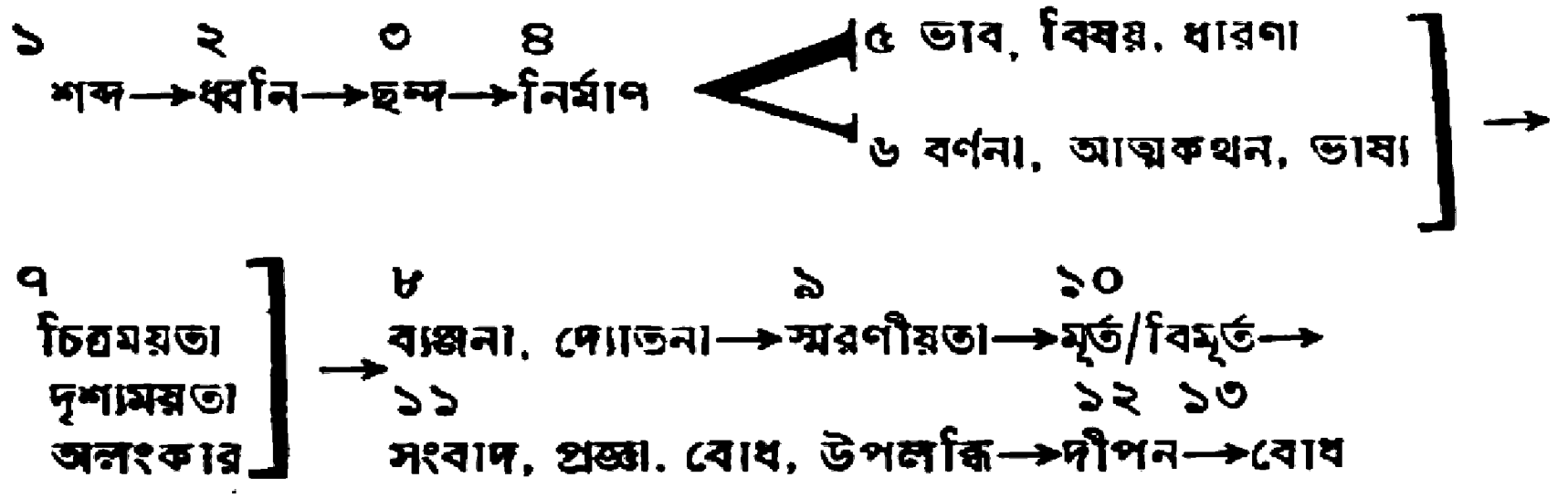


বিগত শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ( নৈবেদ্য ১৯০০ ) থেকে নয় দশকের কবিদের পর্যন্ত ধরলে অজস্র কবি বাংলাভাষায় কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে প্রত্যেক দশকেই বেশ কয়েকজন কবি তাঁদের প্রতিভার বা শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। নামের তালিকা না করেও বেশ কয়েকটি কাব্যসংকলনের সূচি-

পত্রে মনোযোগ দিলে অন্তত দুশোজন উল্লেখযোগ্য কবির নাম পাওয়া যাবে অথচ কবিতা কর্মে লিপ্ত কবির সংখ্যা এর বেশ কয়েকগুণ বেশি। কে বড় কে ছোট এ হিশেব বা যাচাই অবান্তর। অনেক কাল পরেও কোন বিস্মৃত-প্রায় কবির অভিষেক ঘটেছে সাহিত্যের ইতিহাসে. অনেক জনপ্রিয় কবিকে হারিয়ে যেতে দেখেছি কালের কুয়াশায়। তাৎক্ষণিকতার পূজারী নন কবি। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় অনন্ত কালের প্রহরায়। তবু যেহেতু কবিতা সামাজিক সম্পদ—সামাজিক আন্দোলনের মতোই কবিতায় সময়ের দাবি মেনে এসে পড়ে অনেক আন্দোলন. অনেক বাঁক। আন্দোলন সাময়িক। কবিকে সেই ঢেউ পেরিয়ে আরো গভীর ও প্রশান্ত শাশ্বতের দিকে যেতে হয়। কবিতার বড় ছোট যেমন বিবেচনার নয়. এ যুগও যেহেতু কোন এক প্রতিনিধি কবি দ্বারা চিহ্নিত নয়. তাই সমবেতমনীষার বৈচিত্র্যময় সক্রিয়তাই এ সময়ের কবিতার অবয়ব ও চরিত্র তৈরি করবে। এবং কোন কবিই অবহেলার নন। তিনি প্রচারিত হন বা না হন। কেননা এই সময়ের কবিদের সমবেত (collective) স্মৃতি চেতনার ফসলই এখনকার কবিতা! এই সমবেত জীবন সমুদ্রের গর্জনে কোন ঢেউকে তেমন আলাদা করে কি দেখা যায়? যেটুকু আলাদা করি আমরা — সময়ের গণ্ডিধরে. স্বভাবে মর্জিতে জনপ্রিয়তার. হুজুগে বা প্রচারে বিজ্ঞাপনে—তা উনিশ কবির সঙ্গে বিশ কবির ব্যবধানের মতোই। সমবেত কবিতার এই উথাল পাথাল স্পন্দনের মধ্যে অনেক নামহারা কবির সজীব অস্তিত্ব মিশে থাকে। তাঁদের আত্মবিসর্জনের করুণ অবদানেই ঘটে সংস্কৃতির প্রগতি। এদের বিশাল মিছিলকে আত্তীকরণ করে উঠে আসে কবিতার একটি উজ্জল যুগ — সেই যুগ সৃষ্টি করে তার কবিকে। নতুন শতাব্দীতে সেই রকম কোন এক বা একদল কবির জন্যেই কান পেতে আছি আমরা। ভোগবাদের বাজারে কবিতা যেন পুতুল হয় না. বিকোয়. প্রতিটি দায়িত্ববান কবিকে সে বিষয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিতে হয়। এ তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা। প্রতিমার পূজারী হবার জনই নির্দিষ্ট সে। সে প্রতিমা স্বর্গের দেবীর না হোক আক্ষেপ নেই. সে দেবী নতুন, নিষ্ঠুর নিয়তির অধিক নিয়ন্ত্রী, আমাদের ইহজীবন ও মহাজীবনের।

পুস্তক আলোচনা

# জানকীবল্লভ পট্টনায়কের প্রবন্ধ সংকলন ঃ কিছু প্রশ্ন

কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা

১৯৯৭ সালের কলিকাতা পুস্তক মেলায় একটি 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন' প্রকাশিত হয়। ওড়িআ ভাষায় বইটির লেখক ওড়িশার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী, জানকীবল্লভ পট্টনায়ক। বইটিতে ৩২টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর অনুবাদিকা, সাবর্ণী দাস এবং প্রকাশক, কলিকাতার দে'জ পাবলিশিং। বইটি 'রিলিজ' করেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শংকর। দে'জ পাবলিশিং আয়োজিত সভায় লেখক নিজে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জানকীবাবুর একটি ওড়িআ কাব্যগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম 'সিন্ধু উপত্যকা'। লেখক ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বই দুটি প্রকাশিত হয়। এর আগে নন্দিনী শতপথী যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর একটি গল্পের বই ওড়িআ থেকে বাংলায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়। ওড়িশায় সাহিত্য ও রাজনীতিতে সব্যসাচীর ভূমিকায় যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হলেন গোপবন্ধু দাস, নীলকণ্ঠ দাস, গোদাবরীশ মিশ্র, হরেকৃষ্ণ মহতাব ও সুরেন্দ্র মহান্তি। জানকীবাবু যে সব্যসাচী নন, একথা নয়। একজন রাজনীতিজ্ঞ, সাংবাদিক, বক্তা ও লেখক হিসাবে তাঁর পরিচয় আছে। কিন্তু এই নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন'টি পাঠ করে কেউ জানকীবাবুকে সব্যসাচীর সম্মান দেবেন না।

ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্য প্রাচীন ও সমৃদ্ধ একথা বাঙালী পাঠক, লেখক ও গবেষকদের অজানা নয়। রাজনৈতিক শক্তি ও পরিচয়কে পুঁজি করে যাঁরা বাংলায় বই প্রকাশ করেন অথবা ব্যক্তিগত উদ্যমে যাঁদের বই বাংলায় প্রকাশিত হয় তাঁদের অধিকাংশ বই নিম্নমানের বা প্রতিনিধিমূলক নয়। এই ধরনের বই পড়ে বাঙালী পাঠকদের ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্যের তথা লেখকদের প্রতিও বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। নিজের ভাষা থেকে যখন অন্য ভাষায় অনুবাদ করার কথা উঠবে তখন লেখকের নিজের প্রতিনিধিমূলক এবং উচ্চমানের লেখা নির্বাচন করা উচিত। যে লেখা অন্য ভাষায় প্রকাশিত হবে সেই ভাষার পাঠকের কাছে এই লেখার প্রাসঙ্গিকতা এবং আবশ্যকতা আছে কি না তা

লক্ষ্য করতে হবে। অনুবাদকের দুই-ভাষায় সমান দক্ষতা থাকা উচিত। 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলনে'র ক্ষেত্রে এ দিকে নজর দেওয়া হয়নি। 'ওড়িশার আত্ম', 'দেশ ভক্তি', 'নবকলেবরের-তাৎপর্য', 'জাতীয় চেতনার কর্ণধার শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ', প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং আর কয়েকটি প্রবন্ধ বাঙালী পাঠকদের কাছে খুব একটা প্রাসঙ্গিক মনে হবে না। কয়েকটি প্রবন্ধের নামকরণ দেখে মূল্যবান মনে হলেও পাঠ করার পরে তেমন মনে হয় না। আর কয়েকটি প্রবন্ধ খবরের কাগজে প্রকাশিত হাল্কা ধরনের প্রবন্ধের মতন মনে হয়। মাত্র অল্প কয়েকটি প্রবন্ধকে বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি কিশোর সাহিত্যের উপযুক্ত।

প্রবন্ধগুলির অনুবাদ অত্যন্ত দুর্বল। বাঙালী পাঠকদের কাছে এগুলি খ্রিস্টান মিশনারীদের অনুবাদ বলে ধারণা হবে। সংকলনের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে বানান, শব্দ, বাক্য এবং আলোচনার মধ্যে অজস্র ভুল থেকে গেছে। এমন কি যেখানে কমা, পূর্ণচ্ছেদ ও উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার কথা তা হয়নি। তার প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য জায়গায়। ভুল, শুধু ভুল, ভুলের পাহাড় আক্রান্ত পুস্তকটি। বইটি পাঠ করে বাঙালী পাঠকের ওড়িআ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালো ধারণা হবে না। লেখকের সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা হবে। বইটির বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে এর একটি সংশোধিত সংকলন প্রকাশ করা উচিত।

"শ্রী জগন্নাথ ও ওড়িশা" এই সংকলনের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ। তার একটি বাক্য এখানে উদ্ধার করা হল — "পরবর্তী যুগে স্বাধীনতার আগে যে দু'জন উত্তুঙ্গ ব্যক্তি ওড়িশার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, উৎকলমণি গোপবন্ধু ও উৎকল গৌরব মধুসূদন ওঁরা জগন্নাথের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন।" বাক্যটি ভুল এবং 'সমর্পন' শব্দের স্থানে 'সমর্থন' শব্দটি থাকার জন্য অর্থও অবোধ্য। আরও একটি কবিতার পংক্তি — 'আহে নীল শৈল প্রবল মত্ত কারণ" — শেষ শব্দটি 'কারণ নয়, 'বারন' হবে। প্রবন্ধের একাধিক স্থানে দেখা যায় 'সরলা দাস'। আসলে কবির নাম : সারলা দাস। সবাই জানেন শ্রীজগন্নাথের একজন ভক্তের নাম ছিল দাসিআ বাউরী, এখানে আছে দামিআ বাউরী। প্রবন্ধ থেকে আর একটি বাক্যের উদাহরণ — "বুদ্ধদেব সারনাথে যখন পাঁচজন সন্ধ্যাসীকে ধর্মপ্রচার করলেন, তার নাম হল ধর্মচক্র — প্রবর্তন সূত্র।" পাঠক এই বাক্য পড়ে কিছুই বুঝতে পারবে না। চোড়গঙ্গদেব হয়েছেন চেড়গঙ্গদেব, কবি রামাই পণ্ডিত হয়েছেন রসাই পণ্ডিত, চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন হয়েছেন পাংহিয়েন, কালিআ বোদা হয়েছেন কালিআ বোতা।

কবি সালবেগের সেই কবিতার ভুল ছাপা হয় অন্যত্র। "আহে জল শৈল প্রবল মত্ত বারণ।" এখানে 'নীল' না হয়ে হয় 'জল'।

প্রয়োজনে প্রবন্ধ থেকে আর দুটো বাক্য উদ্ধার করা হল। প্রথম বাক্যটি — "শ্রেষ্ঠ শিখরাজ রনজিৎ সিংহ কোহিনুর হিরে জগন্নাথকে দেওয়ার কথা ওঁর ওড়িশার ইতিহাসে লিখেছেন। "এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ঃ রনজিৎ সিংহ কি ওড়িশার ইতিহাস লিখেছিলেন ? দ্বিতীয় বাক্যটি — "এর পরবর্তী প্রধান প্রচারক হলেন শ্রীচৈতন্য, যিনি হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণ মধুর ভক্তির প্রবর্তক।" এ ধরনের অজস্র ভুল বাক্য আছে এই প্রবন্ধে এবং অন্য প্রবন্ধেও।

"জাতীয় চেতনার কর্ণধার রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ" সংকলনের আর একটি প্রবন্ধ। এতে আছে — "মহাত্মা গান্ধী বলেছে, — সে (বিবেকানন্দ) স্পষ্ট করে বলে গেছে. 'এই কি আমাদের মনীষীদের প্রতি সম্মান ? "ভাগবত স্রষ্ঠা জগন্নাথ দাস' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও এতে অজস্র ভুল পাঠকের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। এ ছাড়া অনেক ভুল বাক্য প্রবন্ধের মূল্য হ্রাস করেছে। এখানে কয়েকটি পাচ্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, "জগন্নাথ দাস ভাগবত রচনা করার আগে আদি কবি সারলা দাসের কাছে মহাভারত রচনা করে-ছিলেন। "মেদিনীপুরের গোদাবরী তীর পর্যন্ত যেখানে ওড়িআরা আছেন, সেখানেও ভাগবত পাঠ হয়।" 'জগন্নাথ দাস, তুলসী দাসের মত সেই ভুগে যাওয়া রাস্তা দেখতে এসেছিলেন, "তখন সে এক অসহায় হরিণী যায়া।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সারলা দাস ১৫শ শতকের কবি এবং জগন্নাথ দাস ১৬শ শতকের সারলা দাস মহাভারত-এর রচয়িতা এবং জগন্নাথ ভাগবত-এর রচয়িতা। তা হলে সারলা দাসের কাছে জগন্নাথ দাস কি করে মাহভারত রচনা করবেন ? গোদাবরী নদীও মেদিনীপুরের না। শেষ দুটি বাক্য থেকে কিছু বোঝা যায় না।

বাক্য গঠন ও শব্দের ব্যবহারে কিছু ভুল থাকলেও 'হিজলির মহত্ব' প্রবন্ধটি মননশীল। 'জন্মভূমি ও জাতীয়তা' এই প্রবন্ধ 'উত্তলিত', 'মনিষী', নিশ্চিন্ত প্রভৃতি বানান শুধু দৃষ্টিকটু নয় প্রবন্ধের সৌন্দর্য নষ্ট করে। লেখকের মতে — অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সমাজবাদ এবং যোজনা অনুসৃত প্রগতি প্রভৃতি হচ্ছে নেহরুর অতুলনীয় দূরদৃষ্টিই এবং দেশাত্মবোধের নিদর্শন। এটি লেখকের ব্যক্তিগত মত।

"মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, জন বিটস প্রমুখ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে ৎর্তৃহরি যা রচনা করেছেন,, তা প্রকাশ করতে হলে ইংরাজী ভাষায় তার দু'গুণ কাব্য প্রয়োগ করতে হবে। বাক্যটি 'অমর কবি ৎর্তৃহরি' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

চেষ্টা করে কিছুটা অর্থ বোঝা গেলেও লেখক যা বলতে চেয়েছেন সঠিকভাবে তা বলতে পারেননি। এতে আছে চীন পরিব্রাজক ইপ সাং। এ পরিব্রাজক কে ? 'ওড়িআ জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য আছে। তবুও এ প্রবন্ধটি দোষমুক্ত নয়। 'মহাশেখ বাহন কলিঙ্গাধিপতি খারবেল', 'ওড়িশাজাতি', 'জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা-এইতি মূর্ত্তি' এরকম প্রচুর ভুল থেকে গেছে। সংকলনের একটি উপাদেয় প্রবন্ধ 'কালিদাস' কিছুটা 'সাহিত্য ও সমাজ'। কিন্তু 'ইতিহাস ও ওড়িশা প্রবন্ধের মধ্যে অনেক ভুল থেকে গেছে। এতে অবদান 'আদান', শৈলোদ্‌ভব 'শৈলদৎব', তিব্বতীয় 'তিব্বতীয়', তিব্বত 'তিব্বত', সীতাবাঞ্জি 'সীতাবিঞ্জে' রেচাখোল 'রেঞ্জাখোল' হয়েছে। অবশ্য 'আদিকবি সারলা দাস' লেখকের একটি মননশীল প্রবন্ধ। এ সত্ত্বেও এতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়ে। 'পরিবেশ ও আমরা' 'সাহিত্য ও রাজনীতি' 'খজুরাহো' 'সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি কোনার্কের নাট্যাচার্য প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে লেখক জানকীবল্লভ পট্টনায়কের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবুও প্রবন্ধগুলি মুদ্রন একটি এবং অনুবাদজনিত ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। বাঙালী পাঠকদের কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধের নতুনত্ব কিছু নেই। প্রবন্ধগুলি পাঠকদের যতটা আনন্দ না দেয় তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয়, ভুল অনুবাদ ও ছাপার ভুলের জন্য। নব কলেবরের তাৎপর্য, প্রবন্ধের মধ্যে গীতার একটি শ্লোক কিভাবে বিকৃত হয়ে ছাপা হায়ছে তা উদ্ধার না করতো বিশ্বাস হবে না। —"বাসার ঘি জীর্ণানি যথা বিদায়, নবানি গৃহনাতি নরোহপরানি। তথা শরীরানী বিদায় জীর্ণা ন্যান্যনি সংখ্যাতি নবানি দেহী।"

সংকলনের প্রথম প্রবন 'শ্রী জগন্নাথ ও ওড়িশা থেকে শুরু করে শেষ প্রবন্ধ 'শতাব্দীর সাধনা' পর্যন্ত প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যে যতসব ভুল আছে সে অনুবাদের জন্যই হউক আর ছাপার জন্যই হউক কি লেখকের জন্য হউক, সে সব উল্লেখ করলে আলোচনার পরিসর বড় হবে। এই ভুল শেষের প্রবন্ধেও কম নয়। পাঠকদের জন্য শেষ প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধার করা হল। এই বিশাল ভারতকে এক মুদ্রজাতি যারা এত কাল ধরে শাসন করেছিল।' মহাত্মা গান্ধী সারা ভারতকে একত্রিত করে তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 'ওঁরা রনের শপথ নিলেন।' 'যুগে যুগে কংগ্রেস হল ভারতের জনসাধারণের আম নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র।' বইটি শুধু পাঠকের মনে হবে : এরকম একটি বই কেন প্রকাশিত হল ?

---

জানকীবল্লভ পট্টনায়েক, নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

# ভাগ হয়নিকো নজরুল

## রাণা চট্টোপাধ্যায়

১৯৯৯ সাল ছিল বাংলা কবিতার দুই জনপ্রিয় কবির জন্মশতবর্ষ। কবি জীবনানন্দ দাশ ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেন 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' আক্ষরিক অর্থেই। মহম্মদ শহীদুল্লাহ'র ভাষায় 'বাংলা সাহিত্যের একই বাড়ীর দুইটি কুঠুরী'। জীবনানন্দকে নিয়ে এপার বাংলা কিংবা ওপার বাংলায় অসংখ্য সংকলন প্রকাশিত। যার ভেতর গদ্য বা প্রবন্ধ যেমন আছে তেমনি নিবেদিত কবিতাও রয়েছে অজস্র। আমি মোটামুটিভাবে পশ্চিমবাংলায় বহু পত্রিকার যেমন জীবনানন্দ সংখ্যা প্রকাশিত হ'তে দেখেছি. বহু প্রামাণ্য গ্রন্থও নেড়ে চেড়ে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি। প্রায় ৬০/৬৫টি জীবনানন্দ সংখ্যা চোখে পড়েছে. কিন্তু নজরুল সংখ্যা তেমন বেরোয়নি। খুব বেশি হলে আট-দশটি পত্র-পত্রিকা বা সংকলন বেরিয়েছে নজরুল বিষয়ে। এর ভেতর খুবই শীর্ণকায় বৃন্দাবন দাসের 'আমি'র সংকলন যেমন আছে. তেমনি নজরুল পরিষদের নজরুলনামা, শতবর্ষের আলোকে শতকবির প্রণাম বা সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'ভাগ হয়নিকো নজরুল'-ও আছে। কিছু কিছু পত্রিকায় নজরুলের কবিতা. গান. ছন্দ বা জীবনী নিয়ে এ-সময়ের কবি-সাহিত্যিকরা গদ্যও লিখেছেন। অর্কিড. বঙ্গবাতায়ণ. সাহিত্য কণ্ঠস্বর বা আরো কয়েকটি পত্রিকায় জীবনানন্দ'র পাশাপাশি নজরুলকে নিয়ে সময়োচিত গদ্য লেখানো হয়েছে। বাংলাদেশের ঢাকা' শহরে ধারাবাহিকভাবে নজরুল চর্চ্চা হয়ে আসছে। সেখানে নজরুল একাডেমী. নজরুল ফাউণ্ডেশান থেকে রীতিমত ঈর্ষণীয় কাজ হয়েছে বা এখনো হ'চ্ছে। নজরুল গবেষকদের এইসব লেখা দেখতেই হবে।

এই বাংলায় তেমন ঐতিহ্যপূর্ণ কাজ চোখে পড়েনি. যদিও বেশ কয়েক-জন গবেষক নজরুল নিয়ে এখানেও কাজ করছেন। বড় বাজারী পত্রিকায়ও নজরুল নিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে. নিবেদিত কবিতা'র সংকলনগুলি বেশিরভাগই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'নজরুলনামা' বা সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'ভাগ হয়নিকো নজরুল' দুই বাংলার কবিদের নিয়ে বড় কাজ। তবে, নজরুলনামা'য় পুরোনো দিনের অনেক কবি যেমন উপস্থিত হয়েছেন, বর্তমান সময়ের অনেক উল্লেখযোগ্য কবিই বাদ পড়েছেন। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত লিখেছেন "মানবতাবাদী, সম্প্রীতি প্রার্থী

CENTRAL LIBRARY

এবং প্রতিবাদ মুখর কবিকে সব সময়ই সাহিত্য দাবি করে। পরাধীন ভারতের সংকটকালে নজরুলের কবিতা যেভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল আজ স্বাধীনতা উত্তর-কালেও সে-সব কবিতা সমান অনুবঙ্কী ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।' কথাটি খুবই সত্যি। তবে, সংকলন প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি সুব্রত রুদ্র'র মতোন গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করাতে সংকলনটি 'তাৎপর্যপূর্ণ' হয়নি এটাও সত্য। তিনি নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম ও বাঁধন সেনগুপ্ত'র ঋণস্বীকার করলেও অনেক কবিতাই সংগ্রহ করেছেন এম এ-জব্বার সম্পাদিত 'নজরুলকে নিবেদিত' সংকলন থেকে। সেখানে সুব্রত রুদ্র 'বাংলাদেশের বই আর পত্রপত্রিকা থেকে খুঁজে' পেয়েছেন "একশোর কাছাকাছি কবিতা।" তিনি জানাচ্ছেন "চেনা-জানা নামের মধ্যে ফর্‌রুখ আহমদ এর কবিতা পেয়েছি পাঁচটির বেশি। শামসুর রাহমানের তিনটি, এরকম অনেকের একাধিক চোখে পড়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের তিনটি পেয়েছি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চারটি।" আবার সম্প্রতি প্রয়াত কবি সুফিয়া কামালের তিনটি। নজরুল কে নিয়ে এ বাংলায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ১৩৭১ বঙ্গাব্দের 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' সংকলনটির কথা উভয়েই সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১১ই জ্যৈষ্ঠ নজরুল জন্মদিন. উভয়বঙ্গের কবিদের উদ্যোগে যদি রাখীবন্ধনের দিন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় "তাহলেও আজকের অসুস্থ পরিবেশকে হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত করা যায়।" প্রায় ৩৬।৩৭ বছর আগের এই প্রস্তাব আমরা আজও কার্যকরী করতে পারিনি। নজরুল ঢাকা'য় নীত হওয়ার পূর্বে ক্রিস্টোফার রোডে ১১ই জ্যৈষ্ঠ দিনটিকে নজরুল উৎসবে পরিণত হতে দেখেছি। সেসব দিনে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে যেমন অসংখ্য লিট্‌ল-ম্যাগাজিন বেরোয়, নজরুল জয়ন্তীতেও কিছু কাগজ বেরুতো। এই মুহূর্তে আমার জীবন সরকার সম্পাদিত অধুনা অবলুপ্ত "জ্যৈষ্ঠের ঝড়" বা সত্যরঞ্জন বিশ্বাসের "সাহিত্য কণ্ঠস্বর" এর নজরুল সংখ্যার কথা মনে পড়ছে। যাইহোক, সরকারী নজরুল অনুষ্ঠান ছাড়া বর্তমানে তেমনভাবে কোথাও রুচিশীল নজরুল জয়ন্তী পালিত হ'তে দেখিনা।

বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে গভীর সংকট। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে এই উপমহাদেশের মানুষকে। ধর্ম নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে, মানবতা নিয়ে যে অসূয়া, দ্বেষ তৈরি হয়েছে, তা' থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, ইকবালদের কাছে ফিরে যেতে হবে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের কাছে। নজরুল বিদ্রোহী, বা

সাম্যের কবিই ছিলেন না, ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত এক মানবতার কবি ছিলেন।

গত ৬০/৭০ বছর ধরে বাঙালী অনেক কবিই নজরুলকে যে কত ভালবেসেছেন নিবেদিত নজরুল-কবিতাগুলি পড়লে তা বোঝা যায়। 'নজরুল নামা'য় প্রত্যেকের একটি করে কবিতা আছে, 'ভাগ হয়নিকো নজরুলে,' রবীন্দ্রনাথের দুটি, সজনীকান্ত দাসের দু'টি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত'র দুটি (একটি প্রমীলা নজরুলের প্রতি) কনক মুখোপাধ্যায়ের দুটি, শামসুর রাহমানে'র তিনটি ছাড়া সকলেরই একটি করে কবিতা আছে। 'নজরুলনামায়' ওপার বাংলার কবিদের মধ্যে রয়েছেন শাহাদাৎ হোসেন, জসীমউদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, আহসান হাবিব, আ. ন. ম বজলুর রশীদ, আবুল হোসেন, আতাউর রহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আহমদ রফিক, জাহানারা আরজু, আবুবকর সিদ্দিকী, আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, কাজী আফর সিদ্দকী, আজিজুর রহমান, আশরাফ, আশরাফ আলী খান, বেলাল চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কয়েকজন আর 'ভাগ হয়নিকো নজরুলে', শেখ গুমানী দেওয়ান, জসীমউদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, কাদের নওয়াজ, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, সিকানদার আবু জাফর, ফারুখ আহমদ, আবুল হোসেন, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আবুবকর সিদ্দিক, আল মাহমুদ, আসাদ চৌধুরী, রবিউল হুসাইন, নির্মলেন্দু গুণ, রেজাউদ্দিন স্টালিন প্রমুখেরা। পাঠক বুঝবেন, নজরুল পরিষদে'র নজরুলনামার উল্লেখিত কবিদের তালিকায় অবশ্যই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'ভাগ হয়নিকো নজরুল'-এর কবিদের অন্তর্ভুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। শামসুর রাহমান, সুফিয়া কামাল, আল মাহমুদ বা নির্মলেন্দু গুণেরা বাংলা ভাষার অতি উল্লেখযোগ্য কবি, তারা কেন বাদ পড়লেন জানি না।

আমার দু'টি সংকলন পড়ে মনে হয়েছে মঞ্জুষের সংকলনের পরিপূরক বা পূর্ণতা আনার গ্রন্থ হিসেবে সুব্রত রুদ্র'র সংকলন অবশ্য দেখা উচিত নজরুল পরিষদে'র। এ বাংলার কবিদের তালিকায়ও দাদাঠাকুর, সতীশচন্দ্র ঘটক, সজনীকান্ত দাস, দয়াল কুমার, নিবারণ পণ্ডিত, কনক মুখোপাধ্যায় ও মানস রায় চৌধুরীর অন্তর্ভুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এটাও যেন নজরুলনামা'র সংযোজিত অংশ। তবে, দু'জন সম্পাদকই এ সময়ের বেশ কিছু কবির নিবেদিত কবিতাকে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেন নি দেখছি, যেমন মঙ্গলাচরণ

চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বাসুদেব দেব, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, অনন্ত দাশ, দীপেন রায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ভাস্কর চক্রবর্তী থেকে শুরু করে আলোক সরকার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, সুধেন্দু মল্লিক প্রভৃতি বেশ কিছু উজ্জ্বল কবিকে। অবশ্যই নজরুল নামা'র সম্পাদকের উচিত ছিল এ'দের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া। কারণ, তিনি যেখানে অনেক অনুজ্জ্বল কবিদের দিয়েও লিখিয়ে নিয়েছেন বলে শুনেছি, সেখানে আমার উল্লিখিত কবিরা কেন বাদ পড়লেন জানি না। আমি আরও অনেক প্রিয় কবির নামই এই তালিকায় দিতে পারতুম কিন্তু দিলাম না ইচ্ছে করেই। সুব্রত রুদ্র'র মুখে শুনেছি, উনি প্রকাশিত কবিতা থেকেই বাছাই করেছেন বলে জীবিত অনেক উল্লেখযোগ্য কবিদের দিয়ে নতুন করে লিখিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন। তবে, প্রয়াত কিরণশঙ্করের নজরুলকে নিবেদিত কবিতা আমি দেখেছি বলেই মনে পড়ছে। উনি পরিশ্রমী গবেষক, ওঁর চোখ এড়িয়ে গেল বলেই বলার প্রয়োজন মনে করছি।

"ভাগ হয় নিকো নজরুল" এর কয়েকটি নিবেদিত কবিতা'র উল্লেখ করি —

১ ) 'ধুমকেতুতে' শওয়ার হ'য়ে —

আসরে আজ নামলো কাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী!
তোর সাদা কথার আচ্ছা দাওয়াই
পাবে যারা বেইমান পাজি! ( দাদাঠাকুর )

২ ) 'জাগ ধুমকেতু ধ্বংসের হেতু
স্বাগত অশিব মহোৎসব,
শিবের শ্মশান, জীবের মশান
স্বাগত অশুভ অপ্লব।' ( কালিদাস রায় )

৩ ) 'বদ্ধ পাখীর নয়ন ভিঙ্গায়ে মুক্তির দিত ডাক
সেই মহান মন্ত্র জেগেছে কি প্রাণে, তাই তুমি নির্বাক।
আজ মানুষ কাঁদিছে দ্বারে —
নয়নের জলে খুঁজছে নাবিক দুস্তর পারাপারে।'
( শেখ গুমানী দেওয়ান )

৪ ) 'গ্লানির পাঁকে জন্ম নেওয়া নতুন মানুষ পদ্মফুল,

## আলোর তিয়াস জাগাও চোখে আঁধার ভয়ের ভাঙাও ভুল'

( দয়াল কুমার )

এই বিপ্লবী দয়াল কুমার হুগলি জেলে যখন বন্দী ছিলেন সেই সময় ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "কাজীদা" শিরোনামে উপরিউক্ত কবিতাটি লিখেছিলেন বলে সম্পাদক জানাচ্ছেন। তিনি কবিতাটির নিচে নজরুলের আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন এই ভাবে—

"কল্যাণীয় বিপ্লবী কবি
শ্রীমান দয়াল কুমার
দীর্ঘজীবেষু
আজ সন্ধ্যার গোধুলী আলোকে
বলাকা দল
শুভ্র পাখায় সচকিত করি
তিমিরতল
অন্ধ আকাশে পথ দেখা
রচি সেথা ছায়াপথ রেখা।
কল্যাণার্থী
কাজীদা"

এ'ছাড়াও তিনি সজনীকান্ত দাসের দিনলিপি থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরে নজরুলের অপ্রকাশিত কবিতা'র পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে আমাদের এক অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। সজনীকান্ত লিখছেন — "কয়েকদিন পূর্বে দীর্ঘকাল সঞ্চিত পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হাতের লেখা কয়েকটি পৃষ্ঠা আবিষ্কার করিলাম শনিবারের চিঠি'র চিঠির কাগজে বিভিন্ন হাতে লেখা কবিতার পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি — তন্মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা পাঁচটি পৃষ্ঠা। স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত হইল। মনশ্চক্ষুতে পুরাতন দিনটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ঃ—

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ — পৌষ মাস, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর। 'শনিবারের চিঠি' বৎসর কালের অজ্ঞাত বাসের শেষে ৩২/৫/১ বীডন স্ট্রীটে সদ্য স্থাপিত নিজস্ব ছাপাখানা 'শনিরঞ্জন প্রেস' হইতে আবার আত্ম প্রকাশ করিয়াছে ( আশ্বিন ১৩৩৮ ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় পাকাপাকি রকম ডেরা বাঁধিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি' আপিসে প্রত্যহ নিয়মিত আড্ডা জমিতেছে — নন্ স্টপ। তবে তেজটা সন্ধ্যার ঝোঁকেই

বেশি। দীর্ঘ বিরোধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়াছে। তিনি প্রায় আসিতেছেন এবং হাসি, গান ও পানের পিকে আসর সরগরম করিয়া তুলিতেছেন।"

সেই সময় কোনো একদিন 'পাদ পূরণ' খেলায় মেতে উঠেছিলেন নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র মৈত্র ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সজনীকান্ত জানাচ্ছেন "শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হইতে একে একে অনেকেই সরিয়া দাঁড়াইলেন। সঞ্চিত পাণ্ডুলিপি আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পর প্রমাণ দিতেছে যে কাজী নজরুল ও আমি শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিলাম।"

নজরুলের হাতের লেখা থেকে উদ্ধার করা "বেড়াজাল" কবিতাটি সম্পাদক এই সংকলনে তুলে দিয়েছেন —

"পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ
ভাগো ভাগো মীন-বৎস।
আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবার করিতে মৎস।
ফেলিয়া ঝ্যাপ্‌লা জাল জেলে-দল
ধরিয়াছে রুই-কাত্‌লা,
চুনো পুটি সব মারিবে এবার
পুকুর করিবে পাৎলা।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত'র 'নজরুলনামা'র সংযোজন হিসাবেই সুব্রত'র এই সংকলন অপরিহার্য্য নয়, আলাদা সংকলন হিসাবেও এর মূল্য অপরিসীম। সুব্রত রুদ্র সত্তরের একজন কবিই শুধু নন, তিনি গত কুড়ি বছর ধরে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমী নানা গ্রন্থ সম্পাদনা করে আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি নানা বিষয়ে ও বৈচিত্র্যে ষাটটির অধিক মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। রামমোহন, নিবেদিতা, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, জীবনানন্দ ও নজরুলের প্রতি নিবেদিত এইসব কবিতার সংকলনগুলি অনবদ্যই নয়, অনন্যই। প্রকাশক, কবি ও সম্পাদক রফিক-উল-ইসলাম অব্যবসায়িক এ রকম একটি সংকলন প্রকাশ করে বিদ্বজ্জনের কাছে শ্রদ্ধাভাজন থেকে গেলেন।

---

ভাগ হয়নিকো নজরুল। সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত। পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ। কলকাতা—৭৩। মূল্য—৩০ টাকা।

# খুনীর শাস্তি চাই ও অন্যান্য

## সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

'খুনীর শাস্তি চাই' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'খুনীর শাস্তি চাই' গল্পটিকে শ্রেষ্ঠ রচনার আসন দিয়েছেন। এই সমাজের একজন হিসেবে তাঁর এই নির্বাচন আমাকে যথেষ্টই দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে, অবস্থা কি এতটাই খারাপ যেখানে চাকরীর জন্য সন্তান তার নিজের বাবাকে হত্যা করতে পারে ? একথা মেনে নিলে আশা করার, স্বপ্ন দেখার আর কিছুই বাকী থাকে না। অবশ্য তীক্ষ্ণ নাটকীয়তার সৃষ্টি যদি এই গল্পটির লক্ষ্য হয় তা হলে কিছুই বলার থাকে না। অবশ্য গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকটি গল্প রয়েছে যা থেকে আমরা আশা করতেই পারি যে আগামী দিনে আমরা একজন সফল গল্পকারের দেখা পাবো।

গল্পকার দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় প্রায় সব গল্পেই কোথাও কোথাও কাব্যময়তা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যও পেয়েছেন।

'অসুখ' গল্পের নায়ক বিমলানন্দ প্রচুর অর্থের মালিক। কিন্তু মানুষ হিসেবে সে ভিখিরীরও অধম। প্রাচুর্য মানুষকে আন্তরিক সুখ থেকে ধীরে ধীরে অসুখের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই সর্বজনগ্রাহ্য সত্যকে তুলে ধরাই এই গল্পটির মূল কথা, 'পরমার্থের ফুল' গল্পে লেখক আমাদের জানিয়েছেন আজকের চলমান জীবনের কোন পরমার্থ নেই। সামগ্রিক মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা সবাই। লোভ, আরো লোভের উপর গড়ে ওঠা মিনার বড় ভঙ্গুর। পতন বড় সহজ। এই সত্য মেনে নিতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে এই সব সত্য ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। গল্পকারের উদ্দেশ্য কি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা নাকি অস্থির সময়, সমাজ আর তার মধ্যেকার ক্লেদ, হিংস্রতা ও স্বার্থপরতা আর নতুন কোন্ সত্য তুলে ধরতে পারে আমাদের সামনে সে ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া ? তবু দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এজন্যই যে তিনি চেষ্টা করেছেন মানুষের মধ্যে ঢুকে তাকে বোঝার। আমরা আশা করতেই পারি, আগামী দিনে আমরা তার কাছ থেকে আরো শক্তিশালী, আরো দ্যুতিময় লেখা দেখতে পাবো।

'ভাঙা সেতুর গান' একটি ছোট আকারের উপন্যাস। অবশ্য একে বড়

গল্পও বলা যেতে পারে। দেশভাগের পরে যে ঘটনা আমাদের সমাজ ও রাজনীতিকে সবচেয়ে বড় ধাক্কা দিয়েছে তা এই লেখার মূল বিষয়। এখানে পার্থ একজন তরুণ যে সরাসরি এই রাজনীতির সাথে যুক্ত না হলেও খুব কাছ থেকে দেখেছে এবং ঘটনাক্রমে তার নিজেরও কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। উগ্রপন্থী রাজনীতির ঢেউ তাকেও টেনে নিয়েছে। সত্তর দশকে সশস্ত্র আন্দোলন কত খানি সঠিক ছিল নাকি ভবিষ্যতময়, সৎ এবং আত্মত্যাগী সোনালী প্রজন্মকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এক অতি সূক্ষ্ম আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ছিল তা নিয়ে গবেষণা আরো বহুদিন চলবে এবং চলা উচিতও। যুদ্ধ ন্যায় কিংবা অন্যায় যাই হোক না কেন নিঃস্বার্থ সৈনিকের প্রাণদান তাকে শহীদের অমরত্বে নিশ্চয়ই সম্মানিত করবে। সে যাই হোক সন্ত্রাস এবং অত্যাচার, এবং শেষ পর্যায়ের ভ্রাতৃঘাতী লড়াই আমাদের আরো বহুদিন বিষণ্ন করে রাখবে।

রচনার বিষয়বস্তু যেহেতু এক মহা-ইতিহাস তাই আশা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না যে বিশ্লেষণ আরো ব্যাপক এবং বিস্তৃত হওয়া দরকার। কিন্তু লেখাটি পড়ার পর পাঠকের মনে হতেই পারে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকে পেছনে ফেলে প্রধান হয়ে উঠেছে একজন যুবকের প্রচলিত এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতাপূর্ণ প্রেম, প্রেমভাবনা ও তার ব্যর্থতা। কোন চরিত্রই এই রচনাটিতে সম্পূর্ণভাবে উঠে আসেনি। দেশভাগ নিয়ে বেশ কিছু মহৎ সাহিত্য ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ে আজ পর্যন্ত তেমন কোন মহৎ সাহিত্য রচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে এই প্রতিবেদক নিশ্চিন্ত নন। একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব যার প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার সম্ভাবনাময় যুবক হারিয়ে গেল, ভ্রাতৃঘাতী লড়াই-এর রক্তে দীর্ঘদিন ভিজে রইল পথ ঘাট, অসংখ্য মানুষের হৃদয়, যে লড়াই-এর সার্বিক সুবিধা পেল সেই শ্রেণী যারা ছিল এই লড়াই-এর প্রকৃত টার্গেট তা নিয়ে বিশ্বমানের সাহিত্য নিশ্চয়ই রচিত হওয়া সম্ভব এবং উচিতও। রঞ্জন চক্রবর্তীর সাহসী প্রচেষ্টা প্রশংসাই তার বিষয় নির্বাচনের জন্য, এও বা কম কি।

আমাদের সমাজে শ্রেণী বৈষম্য আগে ছিল এখনো আছে। সমাজের অতি বৃহৎ অংশ প্রতিদিন কত রকম ভাবে যে শোষণ এবং অত্যাচারের শিকার হয় কম বেশী আমরা তা জানি। অত্যাচারী সমাজের অঙ্গ হিসেবে নারী জাতিও নিদারুণ অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় অত্যাচারী এখানে জমিদার কিংবা মালিকই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। নিজের পরিবারে অতি নিকট আপনজনই নারী জাতির যন্ত্রণার কারণ। বেদনার বিষয় এটাই।

CENTRAL LIBRARY

সেই যন্ত্রণার মুখ বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দীপ্তি রায়চৌধুরী।

মুখবন্ধে লেখিকা জানিয়েছেন লেখাগুলি একটি দৈনিক পত্রিকার মেয়েদের পাতায় 'নির্যাতনের সহজ শিকার নারী' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে 'মেয়ের নাম যন্ত্রণা' এই নামে। এক্ষেত্রে নাম বদল কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা বেশ কঠিন। রচনাগুলি যুক্তিনিষ্ঠ এবং মর্মস্পর্শী। লেখিকা যথার্থই তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন এই রচনাগুলো সৃষ্টি করে। প্রতিটি লেখাই যেহেতু একই বার্তা নিয়ে আসে সে কারণে বিশেষ কোন লেখার নাম করা জরুরী মনে হয় না। লেখিকার ভাষা পরিচ্ছন্ন। এ বছর বিশ্ব নারী দিবস ঘোষিত হওয়ায় এরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশ যথেষ্ট অর্থবহ। সমগ্র মানব সমাজের অর্ধেক নারী জাতি। এই বিশাল অংশের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা ভোগ আমাদের ব্যথিত করে। আশা করি পাঠকের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রন্থটি সাহায্য করবে। অন্ততঃ সে কারণেও লেখিকার প্রয়াস আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

---

খুনির শাস্তি চাই ॥ দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক : বঙ্গবাতায়ন, ১৯/১২/১, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলিকাতা—৭০০ ০২৭, মূল্য : ত্রিশ টাকা।

ভাঙা সেতুর গান ॥ রঞ্জন চক্রবর্তী ॥ কালপ্রতিমা প্রকাশন ॥ পি ৭৯১ ব্লক পি নিউ আলিপুর। কলকাতা—৫৩।

মেয়ের নাম যন্ত্রণা। দীপ্তি রায়চৌধুরী। সপ্তাহ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৭০০ ০১২, দাম : ২৫ টাকা।

# স্বজনে বিজনে

## বাসুদেব দেব

সত্তরের কবিরা এখন আর ততো তরুণ নন। আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রায় সমবয়সী তাঁরা, পঞ্চাশ রেখার সামান্য কিছু ওপরে বা নিচে। তাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলন দেখেন নি। স্বাধীনতার পরবর্তী ছিন্নমূল অনিকেত মানুষের শিকড়হীন মানসিকতার শরিক হয়েছেন তবু। তাঁদের কাছে মন্বন্তর দাঙ্গা যুদ্ধ দেশভাগ ইতিহাসের বর্ণনা। তাঁদের সামনে সব আদর্শ ধূলিসাৎ পতাকার রং মুহুর্মুহু বদলাতে দেখছেন তাঁরা। মানুষের লড়াইয়ের বদলে তাদের ভণ্ডামি, ভ্রষ্টাচার, স্বার্থপরতা, ও সন্ত্রাস দেখতে দেখতে তাঁরা বড় হয়েছেন। তাদের কবিতার ভাষা, আঙ্গিক, প্রকরণ, ভাব ও ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথের সত্য সুন্দর থেকে অনেক দূর সরে এসেছে। শব্দ নির্বাচনে দুঃসাহসী। ছন্দ ব্যবহারে হয় খুবই যত্নশীল অথবা উদাসীন। মুখের কথাকে কবিতায় আনতে চান তাঁরা। অব্যবহিত পূর্ব ষাটের কবিতার বিষাদ, সংশয়, বর্ণবৈগুণ্য ও আত্মমগ্নতার ক্ষেত্র তাদের কাছে যথেষ্ট সবুজ ও পল্লবিত মনে হয় নি। বরং এক বিপুল সর্বগ্রাসী ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জীবন আবিষ্কারের অভিযানে স্বেদলাঞ্ছিত ও পরিশ্রমী ছিল সেই সময়। তাই তাঁরা অনেকেই পঞ্চাশের মুক্তকণ্ঠ, আত্মজৈবনিক আত্মখনন ও প্রসারণের চঞ্চল ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও সত্তরকে মুক্তির দশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেই দ্রোহাগ্নির দহন অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচলিত জীবন স্রোতে আত্মস্থ ও অবসিত হয়েছে, এ সময়ের কবিতা পড়ে তাই মনে হয়। আত্মবিলাসের ও প্রকাশের লীলা কলাপ নানা বর্ণে ও বৈচিত্র্যে সত্তরের কবিতাকে ভাবে ও ভাষায় করেছে বহুমুখী। এই সময়েরই একজন কবি অলোককুমার ঘোষ, স্বাধীনতার এক বছর আগে তাঁর জন্ম। তিনি জনপ্রিয় বা বহুপ্রজ নন, কিন্তু নিজস্ব বিশ্বাসে সক্রিয় নানা সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সামাজিক ভূমিকাও পালন করেন। সম্পাদক ও সংগঠকের দায়িত্ব নিয়ে তিনি যেমন গতিশীল জীবনের সঙ্গে, সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, কবি হিসেবেও তিনি সন্ধ্যাভাষার অবছায়া পরিহার করে জীবনের ও মানুষের মুখোমুখি হতে চান প্রত্যক্ষভাবে। তাঁর এই ভানহীন সরাসরি পাঠকের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে তাই কখনো বা লঙ্ঘিত হয়েছে কবিতার উত্তরণসূত্র বা রহস্যরচনার সূক্ষ্ম শৈলিরীতি। "স্বজনে বিজনে" তাঁর চতুর্থ

কাব্যগ্রন্থ। চারফর্মার বই, সুরুচিসম্পন্ন মুদ্রণে তিপ্পান্নটি কবিতার সুন্দর উপঢৌকন।

আগেই বলেছি বড় সরাসরি কথা বলেন অলোক। ফলে সাংবাদিকতায় আক্রান্ত তাঁর রচনাকে মনে হবে সমসময়ের ভাষ্য। কখনও বা শ্লেষের চাবুক, কখনও বা তীব্র ঘৃণা ধিক্কার হানা, কখনও বা শুধু মানবিক মূল্যবোধের নিদারুণ বিপর্যয়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রবণতা। এই ভাবেই তিনি তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেন। কখনো তার ফলে আমাদের বিপন্ন বিবেকের বিমূঢ়তা — কখনো বা কেবলই তা উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ। সর্বদা যে তা শ্রুতিসুখকর তাও বলা যাবে না।

এই বইয়ের প্রথম কবিতার নাম 'সভ্যতা'। "বহু আগেই সভ্যতা সমাধিস্থ হয়েছে / মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধুতীরে নালন্দায় / অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তার আবু / গোপনে লালিত আফ্রিকার আদিম / বন্য প্রকৃতি, হিংস্রতায় নখরে ছিঁড়ে ফেলে / সমাধিস্থ সেই সভ্যতা আর আবুর মাঝে / এখনো নীরো বেহালা বাজানোয় মগ্ন।" সভ্যতা নিয়ে এই শ্লেষ নতুন কিছু নয়। নানা কবিতায় অলোক সভ্যতার আবু ছিঁড়ে ফেলে আমাদের আহত রক্তাক্ত অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, মুখোস খুলে দিতে চেয়েছেন তথাকথিত নীরোদের। এই দায় তিনি স্পষ্ট করেই পালন করেছেন। কবিতার নির্মাণ কলা ও আত্মিক আলোর জন্য তিনি ততটা কাতর নন, যতটা তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালনে। তিনি "মাঝে" শব্দটিও ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না। আমার তো মনে হয় একটু বেশি বেপরোয়া।

এই বক্তব্যই আরো শাণিত "বিভেদ" নামক কবিতায়। ভাঙছে রেলসেতু। বাতিস্তম্ভ, দাউদাউ জ্বলছে সরকারি দপ্তর বাড়ি ঘর, মন্দির মসজিদ গুরুদোয়ারা প্রাচীন পুঁথি। এ পাড়ার মানুষ ও পাড়ার মানুষদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, ছুরি শানায়। একটা বিভেদের দেয়াল উঠছে মানুষের মধ্যে। মানব সম্পর্কের এই সংকট তাঁর কবিতাকে সমকালীনতার প্রয়োজনীয় মাত্রা দিয়েছে। এই কবিতাটির অন্তিম পংক্তি তবুও কাব্যগুণে আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে: "পরশুরামের কুঠারের লক্ষ্য এখন শুধু জন্মভূমি-মা।" আবার এ রকম লাইনও ছড়িয়ে দিতে পারেন অলোক: "এইখানে একদা পড়েছিল আমাদের স্মৃতি জড়ানো রুমাল / আর পাঁচটা খড়কুটোর মতো বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে" এই অনায়াস কবিত্বকে তিনি যে খুব কাজে লাগিয়েছেন তা নয়, কিন্তু সে ক্ষমতাও তাঁর আছে। তিনি এখন এক দূষণহীন পৃথিবীর

স্বপ্নে মগ্ন. বিশ্বাস বহন করে চলেন এক মানবিক মুক্তির বাতাস বইবে বিশ্বে. আবার কবিতা ডালপালা মেলে দেবে কবিতার খাতায়। এই সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাই বারবার তাঁর কবিতার ধ্রুবপদ রচনা করেছে — আজকের সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা জরুরি. কিন্তু কবিতা কেবল পিপাসার জলের সংবাদই কি এনে দেবে. ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার সামাজিক সেই গুণেই কি শেষ হবে তার দায় ? নাকি এই বহতা নদীর হাতছানিও নিয়ে আসবে আমাদের তাপিত জীবনের উত্তরণে — এক গভীরতর আশ্বাস কেবল স্পষ্ট ঘোষণার মধ্যে নয়. অনুভবের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চাইবে ? এই প্রশ্ন অলোকের কবিতার মধ্যে মাঝে মধ্যেই উঁকি মারে। অথচ অলোকের কবিতায় বেশি থাকে সেই মানুষের কথা যিনি কবিতা শুনিয়ে আলো দেখাতেন — অন্ধকারে কেমন করে আলোর ঠিকানা খুঁজে পেতে হয় / সে সব তিনি শেখাতেন ( স্মরণ ) তাঁর কবিতায় থাকে এক কালবেলার অনুষঙ্গ :

"এখন সময়টা ভালো নয়
আমরা কেউই ভালো নেই"

তবু আমরা ভালো থাকার কথা বলি। শহরময় জঙ্গলের জীবজন্তুর আনাগোনা থাকে তাঁর লেখায়. চতুর শৃগাল, লোভাতুর শার্দুল — মনুষ্যত্বের এই অবমাননার ইতিহাস বড় তীব্র ঘৃণায় তিনি হাজির করতে চান পাঠকের কাছে। প্রকৃতি ও নারীর নির্যাতন মূল্যবোধের নিদারুণ বিপর্যয়, শক্তি দাম্ভিকের আস্ফালন, বুদ্ধিজীবী এলিটদের ভণ্ডামি, রাজনীতিবিদদের ধূর্ততা — এই সব চেনা খবরের মধ্যে নিজেকে খুঁড়ে চলেন তিনি প্রতিক্ষণ — তাঁর কবিতায় এই আত্ম খনন, নিজের ভিতর শাবল চালানো যতোটা ঘোষিত, ততোটা অনুভবমেয় হয়ে ওঠে নি এখনো। তাঁর ক্রোধ ও যন্ত্রণা সোচ্চার হয়ে আমাদের আঘাত করে ঠিকই, কিন্তু আরো গভীরে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল, এ কথা অলোকের নিশ্চয়ই মনে হবে কখনও। অরূপ ঘোষের প্রচ্ছদ চমৎকার। আমরা অন্য এক অলোক-প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষায় থাকবো।

---

রজনে বিজনে ॥ অলোককুমার ঘোষ ॥ অর্কিড প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৩৮
দাম—কুড়ি টাকা

# বিভিন্ন স্বাদ ও বর্ণের কাব্যনিচয়

## অনন্ত দাশ

বইমেলা ২০০০ সালে 'অর্কিড' প্রকাশনী থেকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবীণ ও নবীন কবিদের একগুচ্ছ কবিতার বই ছাড়াও উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'অর্কিড' প্রকাশনীর প্রকাশ বৈচিত্র বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। আপাততঃ বিভিন্ন স্বাদ ও বর্ণের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রেমের গান আর কবিতা' বইটির কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী ছিলেন বহুবিধ গুণের অধিকারিনী। ঠাকুরবাড়ির উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ঔপন্যাসিক, সমাজ-সেবিকা, নাট্যকার হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পান। এছাড়া 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কিশোরদের জন্য 'বালক' নামে একটি কিশোর পত্রিকাও প্রকাশ করেন। স্বর্ণকুমারীর এইসব গুণপনার আড়ালে তাঁর অন্য একটি পরিচয় আমরা ভুলতে বসেছি। সুব্রত রুদ্রকে ধন্যবাদ তিনি স্বর্ণকুমারীকে গীতিকার হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। স্বর্ণকুমারীর রচিত গান রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহবাসরে গেয়ে তাঁর গানকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়ে গেছেন। সুব্রত রুদ্র প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটি ভূমিকায় আমাদের জানিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবাহ বাসরে স্বর্ণকুমারীর যে গানটি গেয়েছিলেন, সেটি দিয়ে সংকলন শুরু হলো'। মোট ২৬টি গান ও ৮টি প্রেমের কবিতা দিয়ে এই বইটির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। তখন ছিল কার্ডবোর্ড বাঁধাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর গান ও প্রেমের কবিতার যে বেশ জনপ্রিয়তা ও চাহিদা রয়েছে এই বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ তা প্রমাণ করে। সুব্রত রুদ্র ভূমিকায় আরও বলেছেন ঃ 'স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রেমের গানগুলি আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। এই ভেবে নিজের খুশিতেই খুঁজে, প'ড়ে নিতে চাইছিলুম আবার।' যথার্থ ভাষণ! 'নেহারি ও রূপ হায়, আঁখি না ফিরিতে চায়, / যত দেখি তত যেন নব নব মনে গণি।' — প্রেমের এই চিরন্তন আকুতি কোনদিন পুরনো হবার নয়। ভালোবাসা, প্রতীক্ষা, জ্বালা-যন্ত্রণা, সুখদুঃখ, মিলন-বিরহ, প্রেমের প্রায় সব ক'টি অবস্থা নিয়ে রচিত গান এখানে সংকলিত হয়েছে এবং সেই গানগুলি

কোন রাগে গীত হবে তাও বলা আছে।

'কবিতা' পর্যায়ে এসে দেখি সুব্রত রুদ্র এমন কিছু কবিতা সংকলিত করেছেন যার ভাষা ও আঙ্গিকে প্রাচীনত্বের ছোঁয়া লাগলেও অনুভূতির সত্যতা অনুভূত হয়। যেমন বিরহ' কবিতার কয়েকটা লাইন —

কইরে মিলন কোথা সেকি হেথা আছে আর !
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার !
তাপটুকু রেখে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল রেখে দিয়ে
ফুলটি সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটা দুটি
বিরহ কাঁদিয়ে সারা নয়নে মেলিয়া উঠি।

মিলনের পর বিরহের গরল স্পর্শ. তার আবেগ-উত্তাপে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে ; মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে অতলস্পর্শী বিরহের হাহাকার রয়েছে তার ছোঁয়া পাই। 'কবিতা' পর্যায়ে আটটি কবিতা রয়েছে। স্বর্ণকুমারী'র 'গাথা' ও 'বসন্ত উৎসব' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ আছে। এই আটটি কবিতা সেখান থেকে নির্বাচিত, না পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত তা সম্পাদক জানাননি।

সুব্রত রুদ্র সত্তরের একজন অগ্রগণ্য কবি ; তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গত শতাব্দীর অনেক উজ্জ্বল প্রতিভাকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি—এরজন্য তার যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়েছে।

ঝকঝকে ল্যামিনেশনে ছাপা প্রচ্ছদটি সুন্দর ও মনোরম। আগের মতনই পাঠকমহলে বইটি সমাদৃত হবে আশা করি।

২

'কার্গিল ভালোবাসা ভিনটেজকার' কবি প্রদোষ দত্তর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তে শুনেছি প্রপাত অথবা জলের নুপুর' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ইংরেজীতে লেখা কবিতাগুলি 'And so speaks my world' কাব্যগ্রন্থে ১৯৮৫ সালে সংকলিত হয়। এছাড়া কিশোরদের জন্য লেখা বহু গল্প. কবিতা ও ছড়াও প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণে অভ্যস্ত এই কবির বিস্তৃত অভিজ্ঞতা প্রথম দৃষ্টিপাতে আমাদের সমীহ আদায় করে।

কবির সংবেদনশীল মন খুব সহজেই সময়ের ডাকে সাড়া দেয়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি তাঁর মানসলোকে ছায়াবিস্তার করে। শুধু প্রাত্যহিক জীবন নয়, জাতীয় জীবনে কারগিল যুদ্ধ গত বছরে আমাদের চেতনার ভিত্তিমূল যেভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে কবিও কম বিচলিত হননি। তাই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাই 'কার্গিল'। এক একটা সময় আসে যখন মা ও মাতৃভূমি সমার্থক হয়ে ওঠে ; কার্গিল যুদ্ধের সময় এই রকম একটা অনুভূতি আমাদের সকলের হয়েছিল। কবি প্রদোষ দত্তও অনুভব করেছিলেন ; তাই বলেছেন — 'শুনতে পাই মায়ের কান্না / শুনতে পাই কার্গিলের কান্না / কার্গিলের মর্যাদা, কার্গিলের পবিত্রতা / আমাদেরই হাতে, আমাদেরই দায়।' আনন্দের কথা, কবি শুরুতেই 'আমাদেরই দায়' বলে দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছেন। মানুষ হিসেবে আমরা যে সমাজে বাস করছি, খাদ্যগ্রহণ করছি, উপভোগ করছি বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, পরিবর্তে আমরা সমাজকে কি দিচ্ছি ? এই দেবার সাধনাই কবিতার সাধনা। সমাজমনস্কতা এই দায়বদ্ধতা থেকেই উঠে আসে। মেহনতি মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় ভরে ওঠে প্রদোষের হৃদয়। একজন শ্রমিকের সংগ্রাম, তার বিশ্বাস ও হতাশ্বাস, রুটিরুজির প্রশ্নটা যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলেন 'কারখানা কারখানা' কবিতায় —

কারখানা কারখানা
মেশিনের শব্দ ছাড়া আর কিছু যায়না শোনা
শ্যাফ্‌ট ড্রিল লেদ —
এই বুঝি জীবনের বেদ !
দম ফেলার নেইকো সময়।
কোথাও নেহাই-এর উপর গনগনে তপ্ত লোহা
পেশী সংহত মুঠিতে হাতুড়ির ঘাই !
পেটে নেই দানা
কারখানা কারখানা।

'পেশীসংহত মুঠিতে হাতুড়ির ঘাই' — তারপরেই 'পেটে নেই দানা' বলার সঙ্গে সঙ্গে বুভুক্ষু শ্রমিকের বঞ্চনার চিত্রটি যেন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি যে কারখানার শ্রমিকের কথা বলেন, তার শরীরে ক্লান্তির গাঢ় চিহ্ন, খেটে খেটে হাড়মাস কালি, সাদাসিধে জীবন বিবর্ণ বিস্বাদ, আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে তার দিনরাতের ফারাক মুছে, স্বাচ্ছে একঘেয়ে ঘর্ঘর মেশিনের আওয়াজে।

ঋতুর আহ্বানে সে সাড়া দিতে পারেনা ; তার অস্তিত্ব ও স্বপ্নে শুধু কারখানা, সে বুঝতে পারেনা —

কখন ফুল ফোটে, ফুল ঝরে গেছে
দেখার ফুরসৎ কোথায় মাঠের সোনালী ধান
গাছের পাতায় রোদের চিকন সোনা
কারখানা কারখানা

একজন শ্রমজীবী মানুষের এমন নির্মম ছবি এর আগে বিষ্ণু দে ছাড়া আর কেউ তেমনভাবে আঁকেননি। বিষ্ণু দে'র মতনই তিনি শুধু কারখানার শ্রমিক নয়, খেতে ও খামারে, কলে-বন্দরে যারা কাজ করে তাদের সবার মধ্যে এক জাগ্রত চেতনার কথা বলেছেন। বণিকের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন ; নিপীড়িত, বন্দী মানুষ তাঁর কবিতায় মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। তিনি এক অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেছেন —

শুষ্ক মাটিতে শ্যামল পরশ লেগেছে
মরা নদী আজ ভরা কোটালেতে
নবযৌবন পেয়েছে
খেতে ও খামারে কলে-বন্দরে
জনগণ আজ জেগেছে

( জনগণ আজ জেগেছে )

জনগণের এই জাগৃতিকে, বেঁচে থাকার এই লড়াইকে প্রদোষ কোনো মহত্তর জীবনবোধে উত্তরণ ঘটাতে পারেননি, যেমন বিষ্ণু দে পেরেছেন। প্রদোষ শুধু সংগ্রামী মানুষের উজ্জীবনকে দেখেছেন। এই উজ্জীবনকে সমন্বিত করার কথা ভাবেননি। বিষ্ণু দে বলেছেন — 'জীবনে জীবন এনো দ্বন্দ্বে এনো সত্তার আভাস।' ভাবেননি ; তাতে দোষের কিছু নেই ; তার দেখার সঙ্গে বিষ্ণু দে'র দেখার সঙ্গে মিলতে হবে তেমন কিছু নয়। তবু এই মিল-অমিলের দ্বন্দ্বে আমরা উত্তরণের মাত্রাটুকু বুঝে নিতে পারি।

নাগরিক জীবনের গতি, রুদ্ধশ্বাস ছুটে চলা, প্রতিযোগিতায় ধাবমান মানুষের ছবি বাংলা কবিতায় নতুন কিছু নয় — 'নাকে-মুখে ভাতে গুঁজে এ স্টপ থেকে ও স্টপে / রোজ দাঁড়াই কয়েকশো লোকের ভিড়ে / প্যাসেঞ্জার-ঠাসা বাস ধরবার জন্যে। / কেতাদুরস্ত হয়ে নিত্য বাসে-ট্রামে ধস্তাধস্তি / গুঁতো-গুঁতি করে অফিস যাই।' বিষ্ণু দে'ও বলেছেন : বড়বাজারের উপল উপকূলে / জনগণের প্রবল স্রোত / উগারিছে ফেনা'। কিন্তু প্রদোষের কবি দৃষ্টির

অভিনবত্ব হচ্ছে তিনি সময়কে চুলচেরা বিশ্লেষণে মানুষের অবস্থানের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেন ; তিনি অনুসন্ধান করেন প্রাণের উত্তাপ ; জানতে চান ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ, ভাল-মন্দের পার্থক্য —

এখন সময়ের বিস্ফোরণ !
ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দ বিচারবোধ শূন্য ।
কোথায় প্রাণের উত্তাপ ? সুখ-স্মৃতি
স্নিগ্ধ আবাস ?
বীভৎস দূষিত পরিবেশ
বেঁচে থাকে মানুষ এখানে ছায়াকীট হয়ে

( বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে )

তিনি এলিয়টের মত এ-যুগের বন্ধ্যারূপকে পোড়োজমির রূপকে এঁকেছেন । এলিয়ট বলেছিলেন : 'Here is no water but only rock / Rock and no water and the sandy road.' প্রদোষ বলেছেন : 'এখন কিন্তু যেদিকে তাকাও নাড়া-ওঠা জমিন / চারদিকে মরাগাছ. কোথাও ধিকিধিকি দাবানল / হাড়ের জাঙাল' ( একদিন সেইদিন ) । একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই. পশ্চিমবাংলায় অসংখ্য বেকার. প্রচুর কল-কারখানা বন্ধ. এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে. রাস্তায়-ফুটপাথে হত দরিদ্র মানুষের বসবাস. আস্তাকুঁড় থেকে কাকের সঙ্গে লড়াই করে ভিখারীর ভাত খাওয়া — এসব দেখে মনে হয় না আমরা খুব একটা এগোচ্ছি । এসব দৃশ্য তিরিশের যুগের বন্ধ্যারূপকেই যেন মনে করিয়ে দেয় । কিন্তু এই বন্ধ্যাতেই কি এ-যুগের অবসান হবে ? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোনো উপায় নেই ? 'আমরাই বাঁচাতে পারি' কবিতায় কবি সেই বন্ধ্যামুক্তির কথা বলেছেন ; আভাস দিয়েছেন পুনরুজ্জীবনের । প্রাচীন নিয়ানডারথাল যুগের মানুষ থেকে আজকের মানুষের যে বিরাট প্রবাহ রয়েছে. তাদের শুভবুদ্ধি এই সমাজকে পঙ্কিল পরিবেশ ও হাওয়ার দূষণ থেকে বাঁচাতে পারে । কবি বলেছেন — 'আমরাই বাঁচাতে পারি প্রাচীন উদ্ভিদ / গাছের পাতায় সালোকসংশ্লেষ । / আমরাই জাগাতে পারি / বনমহোৎসবের সাড়া. দেশ হতে দেশ ।'

৩

কবি কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা নন, তবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ; নতুন প্রজন্মের শঙ্খধ্বনি তিনিই শুনতে পান ; দেখেন সভ্যতার অগ্রগতি এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি, মানবশৃঙ্খলে আমরা সকলে বাঁধা । কবি তাই ঔপনিষদিক হিরণ্য

সূর্যের মন্ত্রস্তবে মানবচেতনার এই অগ্রসৃতিকে ধরে রাখতে চেয়েছেন ; বলেছেন —

নতুন প্রজন্মের শঙ্খধ্বনি ওঠে ।
হিরণ্য সূর্যের কাছে আমরা নতজানু
অনেক সাধ, অনেক স্বপ্ন
প্রেমেরই বিস্ফোরণ কেবল শান্তি বারি ঢালে
মানবশৃঙ্খলে বাঁধা আমরা সকলে ।

( মানবশৃঙ্খলে বাঁধা আমরা সকলে )

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে এখানেই ছবি আঁকে, আমার দেশ ইতিহাস, শিলালিপি, প্রসঙ্গ মানুষ, দধীচির হাড়, সবুজ নক্ষত্র, জতুগৃহ, মানুষ বড় একা, কবে থেকে হারিয়ে গেছে কবিতাগুলি বিষয়গৌরবে, কাব্যত্ব ও রসধ্বনি সৃষ্টিতে অনন্য ।

দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা । এই কবিতাগুলির আপাত সরলতার অন্তরালে রয়েছে কবির রোমান্টিক চেতনা ; ভালোবাসা তার হৃদয়ের গভীরে যে সৃষ্টির বেদনা জাগায় ; তার দ্বন্দ্ব ও দহনকে নিবিষ্ট উচ্চারণে তুলে ধরেছেন ; কবির নায়িকা শরীরী হলেও রিরংসা নয়, প্রেমের হার্দ্য আবেদনে ভরপুর এই কবিতাগুলি । কবির প্রেমাস্পদ কখনো বেলা, কখনো মাধবী, কখনো অপর্ণা, কখনো শেফালি, কখনো বা শম্পা নামে ধরা দিয়েছে ; শরীরী হলেও এই প্রেম যেন প্লেটোনিক, স্থূল হস্তাবলেপে সেই রূপ ম্লান করতে চাননি ; এক রসঘন রোমান্টিক আবেশে তিনি নায়িকার অলোকসামান্য রূপটিকে তুলে ধরেন —

একাদশীর চাঁদ ছুঁয়ে থাকে তোমার কপালে
কচি ঘাসের চিকন যৌবন সারা অঙ্গে
জোনাকির আলোয় ইচ্ছার নুপুর খেলা করে ।
নিবিড় চোখের পাতায় ঠোঁট রাখি
বুকের মধ্যে সোহাগের ঘাই ।

( ছায়াছবি )

মোটামুটি নিরূপিত ছন্দে কবিতা লিখলেও, এই কবির নিখুঁত ছন্দজ্ঞান আছে । উপমা-চিত্রকল্পে এবং সমাসোক্তি নির্দেশনায় তিনি যে অন্তরঙ্গ কাব্যভাষা গড়ে তুলেছেন, তা আলোছায়ামুক্ত এবং হৃদয় সংবেদী । আমার আক্ষেপ, এই কবির কবিতা 'অর্কিড' পত্রিকা ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকায় তেমনভাবে চোখে পড়েনি । এই কাব্যগ্রন্থে তাকে নতুনভাবে পেলাম । আমার

ভালো লাগা কবির তালিকায় প্রদোষ দত্তের নাম যুক্ত হলো।

কবিতা কি ? সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেছেন : বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্। সেই বাক্য বন্ধই কাব্য, রস যার আত্মা অর্থাৎ কাব্যের শেষ পরিণতি রসে। প্রাচীন আলংকারিকেরা রস বা ধ্বনিকে যত গুরুত্বই দেন না কেন, শেষ পর্যন্ত কাব্যদেহকে তারা অস্বীকার করতে পারেননি। ধ্বন্যালোকে একটা শ্লোক আছে : আলোকার্থীকে যেমন দীপশিখা জ্বালাতে হয়, সেরকম রসের লক্ষ্য নিয়ে কবিকে প্রমাণ করতে হয় শব্দার্থময় কাব্যকথাবস্তু বা কাব্যদেহ। কবিতা নিয়ে প্রাচীন আলংকারিকদের বহুপ্রচলিত সংজ্ঞাগুলো আরেকবার উল্লেখ করতে হলো প্রসেনজিৎ কুমার বকসীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'জটায়ুর প্রতীক্ষা' হাতে আসার পর। কবি 'আত্মকথনে' জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থে 'আমার মানসলোকের চেতনার ক্রমবিকাশের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত হয়েও যেন তা সার্বজনীন হয়।'

একটা কবিতা 'ব্যক্তিগত' হয়েও তা কিভাবে 'সার্বজনীন' হয় বুঝতে হলে, রবীন্দ্রনাথ কবিতা বলতে কি বুঝিয়েছেন সেটা জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একটা গোলাপ সুগোল কিনা সেটা মেপেজুকে বোঝানো যায় কিন্তু তা সুন্দর কিনা সেটা অনুভব করাতে পারা যায় না ; তখন কবিতার সাহায্য নিতে হয়। 'গোলাপের সৌন্দর্য আমি যে উপভোগ করিতেছি তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্যভোগের উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা।'

'কবিতা' নিয়ে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'জটায়ুর প্রতীক্ষা'র সব কবিতাকে 'কবিতা' বলা যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কবির অনুভব শক্তি প্রবল ; তার ভিতরে রাগ আছে, ক্ষোভ আছে, আছে অভিমান ; কিন্তু সেই রাগদুঃখক্ষোভকে অনুভূতির রসে জারিত করে প্রকাশ করার অক্ষমতা। তিনি যা ভাবেন তাই লেখেন সেই ভাবনাকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যেতে পারেন না ; ফলে শিল্পহানি ঘটে ; যেমন —

মনে মনে ভাবি, মায়াকান্নার কবিতা
প্রেমের প্যানপ্যানানি আর লিখবো না
পেটে ভাত নেই, নেই লজ্জার বস্ত্র
মড়কের দেশে সাজেক বেহায়াপনা !
( জীবন-সত্য )

তিনি মানুষের শোষণ মুক্তির দাবিতে উত্তেজনায় জ্বলে উঠতে পারেন।

কবি যেহেতু একজন সামাজিক মানুষ, মানুষের মুক্তির দাবিতে তিনিও তো এগিয়ে আসবেন — এটাই তা স্বাভাবিক ; কিন্তু সেই কবিতাটা যদি ঘোষণার স্তরেই থেকে যায়, যা নজরুলের অনেক কবিতায় ছিল, তবে তার অকালমৃত্যুও ঘটে। তাছাড়া, নজরুলের সময়ের পরাধীন দেশের পরিস্থিতি এবং বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও বদলে গেছে। তাই এখন কবি যদি বলেন —

বন্ধু, এখনো আছে তো সময়, বুকে হাত দিয়ে চোখবুঁজে
হাতড়িয়ে দেখো রক্ত পতাকা, শাত শহীদকে পাবে খুঁজে।

সেই আহ্বান আমাদের কাছে বানানো, মেকী বলে মনে হয় ; স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিতে পারা যায় না ; কবিতার শর্তও পূরণ করে না। যেমন 'আমরা, ফলাই ধান / পেট ভরে তুমাদের। / আমরা বানাই ঘর থাকো সেই ঘরে।' ইত্যাদি এত সোজাসুজি বলা যে এগুলো স্টেটমেণ্ট। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই স্টেটমেণ্টধর্মী ; কিন্তু স্টেটমেণ্ট তো কবিতা নয় ; তা নিছক শব্দপুঞ্জ, তাকে বোধের স্তরে নিয়ে যেতে হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন : 'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotion recollected in tranquility'. অর্থাৎ কবিতা হলো প্রবল অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। ভাগাবেগ যখন শান্ত হয়ে জমাট বাঁধে তখনই এর সৃষ্টি।

এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির কবিতা এখানে যে নেই তা নয় ; কবি যে সময়ের বুকে বসে কবিতা লিখছেন তা খুব সুখের সময় নয় ; তবু তিনি আশা করেন এই পৃথিবী একদিন দূষণমুক্ত হবে, এবং সৃষ্টির উন্মাদনা দেখা দেবে আর তখনই সোনালী ধানের স্বপ্নে ভালোবাসার কোরাস শোনা যাবে —

নীলাকাশ থেকে মৃত্যুর বীজ ঝরবে না
বাতাসে বিষের ঝোড়ো হাওয়া আর বইবে না
কামান গালিয়ে বানাবো লাঙল
বন্দুক হবে সপ্ত সুরের বাঁশি
সেদিন সোনালী স্বপ্ন ধানেরা গাইবে কোরাস
'ভালোবাসি, ভালোবাসি'।
( নবান্ন )

প্রথম পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে ওপারে সবুজ বনে দেখো, ভোরের পাখি কাকলি ভোলে না, সূর্য-সন্ধানে, এখনো সূর্য, নববর্ষের ডাক, এবং সেই ছাব্বিশে জানুয়ারী ১৯৫০ এবং দ্বিতীয় পর্বের ভুলি নাই, পথে নেমে, নতুন বীজের খোঁজে

কবিতাগুলিতে তার কবিক্ষমতার পরিচয় পাই। আমাদের সময়ের নানা অসঙ্গতি, অনেক অতৃপ্তি, আনন্দ-বিষাদ সবই এই জীবন থেকে পাওয়া ; এ-সবের অভিঘাতে আমাদের অন্তর্জগৎ আলোড়িত হয় ; সেই আলোড়ন থেকে যে পংক্তি উঠে আসে তাই পেয়ে যায় স্মরণীয় উচ্চারণ। 'জটায়ুর প্রতীক্ষা' এই দীর্ঘ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে কবির সময়-লব্ধ অভিজ্ঞতার তীব্র ঝাঁঝ অমোঘ সত্যের ভাস্বরতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ; কবি এই সমাজকে মানুষের বাসযোগ্য করে যেতে চান ; কিন্তু তার ক্ষমতা সীমিত ফলে এক অসহায় আর্তিতে তিনি বলেন —

স্মৃতির ঝাঁপিতে সব জমাট পাথর হলো আজ।
হায় ছায়ামূর্তি হে স্বপ্ন-শহীদ
কী দেখতে এলে ভাঙা ঘরে ?
এখানে রয়েছি পড়ে ছিন্নপাখা জটায়ুর মতো
সীতা চুরি হয়ে যাচ্ছে
তবু বাধা দিতে পারি কই ?

'সীতা চুরি হয়ে যাচ্ছে' — এই সীতা যে রামায়ণের সীতা নয়, আমাদের দেশের সম্পদ ও মেধা — এই ইঙ্গিতটুকু বুঝে নিতে হবে। এই কবির ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা আস্থা রাখি ; আশা করি কবিতার কলাকৌশলগুলো খুব অচিরেই তিনি রপ্ত করে নেবেন।

৪

দীপক মুখোপাধ্যায় অনূদিত অক্টোভিয়া পাজের কবিতার অনুবাদ "অক্টোভিয়া পাজ" গত বইমেলায় প্রকাশিত 'অর্কিড' প্রকাশনীর আরেকটি বই। অক্টোভিয়া পাজ আমার প্রিয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৯০ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অনেক আগে থাকতেই আমি পাজের কবিতার অনুরাগী। আমি নিজেও পাজের বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করেছি।

পাজের কবিতার প্রতি আমার অনুরাগের আরও একটা কারণ তিনি বেশ কয়েকবার ভারতে আসেন এবং মেক্সিকোবাসী হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী। তিনি প্রথমবার ভারতে আসেন ১৯৫১ সালে এবং মেক্সিকোর ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে প্যারিস ঘুরে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি ভারতে আসেন। তারপর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত হিসেবে থাকেন। এই কয়েকটা বছর পাজের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে তিনি দিল্লীতে মারি হোসেকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেন এবং হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধদর্শন ও ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে

বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। হিন্দুদের কালীমূর্তির মধ্যে মেক্সিকান দেবীর ছায়া দেখতে পান এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ করে পুরাতন দিল্লীর পরিবেশ, সেখানকার মন্দির-মসজিদ তাঁর কবিতায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।

স্পানিশ ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে Savage Moon (১৯৩৩), A la orilla, del mundo ( ১৯৪২ ), Piedra de sol ( ১৯৫৭ ), La Estracion Violenta ( ১৯৫৮ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৯৬০ সালে পাজ নিজে তার কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন Liberated, bajo palabra : obra poetica (১৯৩৫-১৯৫৮)। এর পরেও তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

খুব দুঃখের বিষয় অক্টোভিয়া পাজের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ নোবেল লরিয়েট কবির কবিতার অনুবাদ নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করবার আগে কবি সম্পর্কে কোনো ধারণা পাঠকের মনে সৃষ্টি করতে পারেননি। অনূদিত কবির দেশকাল, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন পরিচয় দেওয়ারও চেষ্টা করেননি ; এমনকি, অনুবাদগুলি পাজের কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কোন্ কোন্ কবিতার অনুবাদ তা অনূদিত কবিতার শিরোনামে বা নীচে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। শুধু দায়সারা গোছের একটা কাজ করে অনুবাদকের খেতাব পাওয়াটা তার কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছে ! কিন্তু ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ হয় না।

এক ভাষার কবিতা আরেক ভাষায় অনুবাদ করার আগে আমাদের বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সমস্যাগুলিকে তিনি কিভাবে অতিক্রম করেছেন তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া, অনুবাদগুলি ভাবানুবাদ, আভিধানিক না আক্ষরিক, এ সম্পর্কে কোন সূত্রই তিনি আমাদের জানাননি।

যে পদ্ধতিই গ্রহণ করে তিনি অনুবাদ করুন না কেন, এখানে মোট ৩৮ টি কবিতার অনুবাদ আছে। অনূদিত কবিতাগুলি প্রাঞ্জল এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যকে মান্য করেছে। যেমন —

আকাশ বিশাল হয়ে আছে।
সেখানে পৃথিবীর পর পৃথিবী ছড়িয়ে গিয়েছে
একটানা অবিশ্রান্ত ডাক,
তবু বিস্ময়হীন হতবাকহীন অনেক রাত্রির অবরোধে
একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা

CENTRAL LIBRARY

যেন সব কাঠচেরাইয়ের কল

( তারারা এবং ঝিঁ ঝিঁ পোকা )

অনূদিত কবিতাগুলিকে বাংলা ভাষার কবিতা হিসেবে তিনি পাঠযোগ্য করে তুলেছেন। আর একটা কবিতা যখন কবিতা হয়ে ওঠে, আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয়, তখন কবিতাটি কতটা মূলানুগ কিংবা মূল কবিতার ভাষার স্বভাব থেকে কতটা দূরে গেছে — এ নিয়ে আর তর্ক সাজে না।

---

১। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রেমের গান আর কবিতা : সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত। অর্কিড প্রকাশনী। দাম বারো টাকা

২। কার্গিল ভালোবাসা ভিনটেজকার : প্রদোষ দত্ত : অর্কিড প্রকাশনী : দাম কুড়ি টাকা

৩। জটায়ুর প্রতীক্ষা : প্রসেনজিৎ কুমার বক্সী : অর্কিড প্রকাশনী : দাম পঁচিশ টাকা

৪। অক্টোভিয়া পাজ : অনুবাদক দীপক মুখোপাধ্যায় : অর্কিড প্রকাশনী : দাম তিরিশ টাকা।

# এক আবিষ্কৃত মানসভূমি

## বৃন্দাবন দাস

সময়ের প্রবল অস্থিরতায় আলোড়িত, স্থির লক্ষ্যে অবিচলিত কবির সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে খুবই কম। আধুনিক কালের প্রতিনিধি আর কালের প্রতিনিধি এক কথা নয়—এক সংজ্ঞায় কখনোই তা বিধৃতও নয়। আবার একজন যথার্থ প্রতিনিধিকে চিনে নিতেও অসুবিধা হয় না আবহমানকালের মানুষের। সংযত আর সংহত চিত্ত, অনুভবের স্বর্ণশিখরে আরূঢ় এক মানুষ বুঝে নিতে পারেন — কিভাবে আয়না ব্যবহার করতে হয় — কেমন করে প্রতিবিম্বে বুঝে নিতে হয় আসল রঙের শরীর, প্রত্যয়ের গভীর রেখা।

সত্তরের ( বিংশ শতকের সত্তর দশক ) এক ক্ষিপ্ত, অশান্ত, সংঘাতময়, সংগ্রামী প্রতিবাদ প্রতিরোধের মধ্যেই কবি সুভদ্রা ভট্টাচার্য কলম ধরেছেন। কলম তাঁর শৌখিন বিলাস নয় — আভিজাত্যের লক্ষণও নয় ; তাঁর কলম এক সুদূরপ্রসারী প্রভাবশালী কর্ম। তাঁকে, তাঁর 'কালের এক অমোঘ প্রতিনিধি' বলাটা কারো কারো কাছে দৃষ্টিকটু বা উষ্মা প্রকাশের কারণ হলেও — আমি অপারগ এ কথা অনুচ্চারণে।

কবি সুভদ্রা ভট্টাচার্যকে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, সংগ্রামী বা নিস্পৃহ, পুরুষ কবি বা মহিলা কবি — এবংবিধ কোনো অভিধায় চিহ্নিত করা সহজ নয়, সহজ হবেও না। তাঁর সব কবিতার বই এবং প্রায় প্রকাশিত কবিকর্ম আমার অনুধাবনে আছে বলেই, বলতে দ্বিধা নেই — তকমাধারী কবি নয়, সংজ্ঞাবাহী কবি নয়, দলভুক্ত কবি নয় — কবি সুভদ্রা এক অমোঘ কবি, কবি তাঁর কালের, কবি আমাদের কালের, কবি তরুণদের।

প্রিয় পাঠক, যাঁরা ভাববেন — আমি অযথা স্তুতি করছি, তাঁদের কাছে একান্ত বিনয়, একটু সময় করে, একটু ধৈর্য ধরে। একটু অনুশীলনে রত হয়ে সুভদ্রা ভট্টাচার্যের অর্কিড প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ( ২০০০ বইমেলায় ) 'তাপকলের মেয়ে' কাব্যগ্রন্থটি প'ড়ে দেখতে। আমরা, বিশেষত যাঁরা বিজ্ঞাপনের তোড়ে ভেসে যেতে উৎসুক এবং কখনো কখনো আপ্লুত হয়ে উঠি — তাঁরা নিশ্চিত নিরাশ তো হবোই না, বরং বেশি পাবো — বাজারের চলতি কবিতা-কবিতা খেলার থেকে।

ফলত কিছু পংক্তি এখানে উল্লেখ করছি মাত্র। "শৈশবের ঘুনসি খুঁজে

পেয়ে / ভালোবাসার দরদাম বুঝে নিল / তখন রোদ্দুর চেটে খাওয়া মেয়েটি / লজ্জায় মুখ ঢাকলো / শহরের সবকটি তাপকল বন্ধ হয়ে গেছে শুনে" (তাপকলের মেয়ে) ; "শৈশব ঘেরা জ্বলন্ত কার্ণিসে / জীবন কেমন ঝুলে আছে দেখে / নীলপাখির নীলস্বপ্ন কুড়োতে লাগলো / বড় আশায় / যন্ত্রণার নীল-রঙকে অন্য জামা পরাবে বলে" ( নীলস্বপ্ন ) ; "যে স্পর্শে প্রকৃতি জেগে ওঠে / পাখীরা গান গায় / কেবল সব রং নিয়ে ভেসে থাকা সাদা রং / চিরকাল পাহারা দেয়" ( পছন্দের রং ) ; "ভাঙ্গবো না বলেই ভাঙছি না ভাবনার দরজা / ছুঁয়ে আছি জন্মাবধি অলৌকিক ধুলো" ( ভাঙ্গবো না বলেই ) ; "মানুষের প্রেম কত সহজতর হয়ে / আছড়ে পড়ছে / আদি অন্তহীন মানুষের আবেগের কাছে।" ( ছদ্মবেশ )।

এই কবি. লগ্ন হয়ে থাকেন "হেমন্তের বিকেলের মত ঝকঝকে আকাশ / কলকাতার ফুটপাথে আড় হয়ে পড়ে থাকে / আমাদের শৈশব / যেন / বন্যা হয়ে যাওয়ার পর বাড়ী ফেরা সৈনিক"।

প্রিয় পাঠক, আপনার সঞ্চয়ের ভাঁড়ার বাড়বেই — এ আশায় বলি সুভদ্রা ভট্টাচার্যের 'তাপকলের মেয়ে' আপনার পাঠ্য সূচিতে রাখুন।

---

তাপকলের মেয়ে : সুভদ্রা ভট্টাচার্য : অর্কিড প্রকাশনী : মূল্য—২০ টাকা।

---


প্রকাশের অপেক্ষায়

অনন্ত দাশের কাব্যগ্রন্থ

# কুয়াশামঞ্চের দিকে

কবিতা নিয়ে প্রবন্ধ ও আলোচনার বই

কবিতার শব্দপ্রতিমা

অর্কিড/১০১

রাণা চট্টোপাধ্যায়

## 'জল দাও সত্তার শিকড়ে'

( চিরন্তনী বাংলা ছন্দে )

একলা-একলা থাকি একলা-একলা মাখি
তোমার দেওয়া আবীর গুলাল বুকের ভিতর রাখি।
চলে যাব যেতে হবে কে আর স্থিত ভবে ?
শিকড় আছে কোথায় আমার দেখার আশায় তবে
খুঁজছি আমি সারা জীবন পাচ্ছিনা তো খুঁজে
পূবে আছে পশ্চিমে নেই পশ্চিমে না পূবে ?
বলেছিলেন বলেছিলেন অনন্ত কোন ভোরে
বিষ্ণু বাবু, শিকড় খোঁজো 'জল দাও সত্তার শিকড়ে'।

একা-একা বিনাদোষে কষ্ট পাই কার রোষে
অপকীর্তি পূর্ণ হয় তর্কে অপযশে।
তবু নিজ মুদ্রাদোষে রাখিতে পারিনি বশে
আপন সন্তান-স্ত্রীয়ে রাক্ষসীর কোষে।
পঁচিশ বছর ধরে শ্মশানে-মশানে গোরে
চলে গেছে কত প্রাণ মৃত্যুর সাগরে।
আমি একা খুঁজে মরি বঙ্গীয় শিকড় ধরি
খসিয়ে বল্মীক স্তূপ হ'লেও সংসারি।
কেন আজো আত্মঘাতী বিশ্বময় বঙ্গ-জাতি
ভুলে গেছে কেন তারা মৃত্তিকার প্রীতি ?

যে বেশ বোঝেনা কেহ তাতে আলো কর দেহ
নীলবর্ণ শিবা নাকি ভক্ত সারমেয় ?
আধুনিক হতে গিয়ে অধুনাস্তিক হয়ে কবি
যে ভাষা বোঝেনা লোক তাকে করে বিয়ে।
আমি খুঁজি টান টান কোথায় আমার প্রাণ
কোথায় নিজস্ব মাটি করে আয়ুষ্মান
চর্ব্যচর্ব্যবিনিশ্চয় দ্বিজ রাণা চট্টোঃ কয়

চণ্ডীদাস আলাওল মায়ের প্রসাদ লয়
মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ সেন গায় গান
কৃত্তিবাস-কাশীরাম নবীবংশে মনস্কাম দান।
বিশ্ব আমার বলে চান আমাজন জলে
ফেলে দিয়ে ভাগীরথী-পদ্মা করতলে ?

তাই একা সঙ্গোপনে সুর শুনি বৃন্দাবনে
বেজেছে কৃষ্ণবাঁশী ভৈরবী আজানে।
চলে যাব যেতে পারি ভাদু. টুসু. সারি, জারি
শোনাবো শুনিব আমি বোঝে নরনারী
বিট্‌ল বা রক গানে বিকৃত হিন্দিবাণে
দূরদর্শন গেছে ভাসি
পৃথিবীর সব কিছু জেনে নেবো আগুপিছু
হবনা কারো দাস-দাসী।

আমার যা কিছু আছে ফলে আছে জ্ঞানগাছে
সংগ্রহ করিব আমি যেন প্রাণ বাঁচে।
অন্ধ হই কানা হই বধির বা মূক নই
সব জেনে হব আমি বাঙালীই সই।
শিকড় সন্ধান করি বঙ্গ ইতিহাস পড়ি
চৈতন্য জাগ্রত রাখি রেনেঁসাস করি ॥

চন্দন সেন

**চক্রান্ত**

ভোরের আজান চুপ
গির্জার রক্তের দাগ লেগে.
ভদ্র সভ্য বসবাস ফেলে
মানুষ চলেছে জঙ্গলে।
মিছিলে প্রতিজ্ঞা নেই
আছে দেখি লোভ আর ক্রোধ
মানচিত্র খুবলে খাবে বলে
উঁই-পোকা দেশে দেশে
সমাবেশ ডাকে।

## অনন্ত দাশ

### খিদে

এ-খিদে ভাতের নয়, শরীরের আঁশটে গন্ধে
নয় লোভাতুর
অ-দেখার যত তৃষ্ণা, যত জলোচ্ছ্বাস
সমর্পণে সব দাহ
নিয়ে গেছে কবেকার সমুদ্র-বাতাস

সংগ্রহ স্তিমিত প্রায়
যা কিছু রয়েছে খড়কুটো
তাই দিয়ে গড়েছি এই বাবুইয়ের বাসা —
কোনদিন আকস্মিক ঝড়ে
হয়তো বা উড়ে যাবে নদীর ওপারে
তন্তুজ নিপুণ শিল্পে
গড়া এই জীবন-প্রণালী
তেমনি কি ভেসে যাবে গাঙুরের জলে
সব কিছু হয়ে যাবে খালি !

যে রজনী যায় তাকে ফেরাতে চাই না
তবু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী
যে বিষাদ রেখেছে দেহে-মনে
আজ এই সান্ধ্য অবসরে
শুনি তার প্রবল কিঙ্কিনী —

## পিনাকী রায়

### দৌড়

লালা ঝরছে, লালা
লাল নিওনের ফ্ল্যাশে ফ্লাশ
চাটনির উৎসব,
মেরে দিয়েছে ছাপ্পা — শালা
সরকারি ঘণ্টা

কবিতায় হবে পার ?
লালা ঝরছে, লালা ।

গদারের ছবি 'শ্রমিক'
বোর করে দ্যায় আট মিনিট
আট ঘণ্টা মেশিনের এক তালে
দাঁড়া একবার দাঁড়া, সিধে
বুঝবি তখন সেমিনারে
ছিলো কতো মখমল
আমাদের সুতো বাঁধা আছে
দেড়ফুট — শুধু দেড়ফুট নন্দন ।

## শিবচন্দ্র লাহিড়ী

### এখন জীবন

এখন জীবন বলতে বোঝায় জেল্লা
সবাই খুঁজছে এই জেল্লারই ঠাট
কোণে বনে মনে সাধনা স্রেফ্ লোপাট্
এই বুদ্ধিতে মাৎ করা যাবে কেল্লা ।

ঝল্‌মল্ করি জরি জড়োয়ার বাহারে
ডেকরেটরের ভাড়া করা সাজ চাপানো
এ সবের নিচে পিষ্ট আমিটা আহা রে
ধুঁকছে, ওদিকে রবরবা পাড়া কাঁপানো ।

'আমাকে দ্যাখো হে'—ব'লে তুই যত চেল্লা
আমি চেল্লাব, তার চেয়ে গলা চড়া
শান্তি স্বস্তি ঘুলিয়েই বে-লেল্লা
মিঠে হবে নাকো, জীবনের স্বাদ কড়া ।

অন্তঃসার পিকৃপকেটেড্ জমানা
কালো মাটি পেলে গর্ত খুঁড়েই চলেছে
নশ্বর আকাশ নখে দাঁতে চেরা না মানা
গাছে গাছে তাই যে ফল ফলার ফলেছে ॥

## অশোক চক্রবর্তী

### কবিতা

আমি ভালোবাসাকে বললাম,
— বসো না একটুক্ষণ. দু দণ্ড ছাড় কথা হোক —
চঞ্চল চোখের তারা নাচিয়ে সে বললে,
— আমার ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো
সময় কোথায় ?

আমি সুন্দরকে শুধোলাম,
— বসবে নাকি আমার দাওয়ায় —
কণ্ঠে অনুনয় ছড়িয়ে দিলাম হাওয়ায় হাওয়ায়,
— সে চোখে চোখ রেখে বললে,
— সবাই তো চায়, পেয়ে যায় কেউ কেউ
তুই শব্দের পর শব্দের মালা গেঁথে যা
আমি ঠোঁট ছুঁইয়ে রেখে যাবো
ওরা সুন্দর হয়ে উঠবে ।

## গণেশ ভট্টাচার্য

### আশা

পাখির ঠোঁটে লাগিয়ে রাখ ঠোঁট
তোমার ঠোঁটে অনেক কথা আসে
পাখির কানে নিজের কথা বল
তোমার চোখে পাখির চোখ ভাসে
এমনি করেই উড়তে থাকি রোজ
এমনি করেই গাছের ডালে নামি
গাছের ডালে পিঁপড়ে যদি থাকে
তবুও তাকে আদর করি আমি
আমার মধ্যে হিংসা থাকে না
আমার মধ্যে ভর্তি ভালবাসা
পাখির মতো উড়তে পারাটাই
অপূর্ব এক স্বপ্নেরোনা আশা ।

## মিহির সরকার

### ভুল তৃষ্ণা

ভুল, এত দ্রুত হাঁটায় ভুল ছিল
জুতোর ফিতেতে লাগেনি ঠিকঠাক ফাঁস
মঞ্চ আর আলোর দিকে যেতে হয়
ধীরে চারপাশ দেখে
গোলাপকে কারা কেটে কুটে
এভাবে নিয়ে এল ? নাম জানো ?

মঞ্চে পাওয়া এ গোলাপ কি
নিয়ে যাব বাড়ি তক ?

বুক পকেটে চিঠির ভাঁজে
টিস-টিস শব্দে চুঁইয়ে পড়ে যন্ত্রণা
কথা দিয়ে হয়নি যাওয়া
মেয়েটার ঠিকানা —
রোদ লাগা সাদা বাড়ি
সামনে গোলাপ বাগান ।

ভুল, এত দ্রুত হাঁটায় ভুল ছিল
ধাবমান নদী, নির্জন অরণ্য ফেলে ।

মঞ্চ আর আলো আসলে
লোভী অন্ধকারের মায়াবী রূপ ।

## তারক চট্টোপাধ্যায়

### বন্ধু

একদিন বয়ে নিয়ে যাবে কাঁধে
বন্ধুত্ব মানে শব বাহক ।

মৃতের কোন বন্ধু নেই ।

## চন্দন চট্টোপাধ্যায়

### উদ্বেগ

১.
কালো চোখ ধুয়ে এসো ; প্রতীকী কেফনায় জেনো
প্রবাহের চোরাস্রোত নেমে আসে গালময় ।
দুহাতে পিছল নীল—মানবাধিকার যেন
মিশে যাবে উঠোনেই, ওগো ভরাট সময় ॥

২.
সাগরের ঢেউ তুমি কখন বলবে—আঁকো
পৃথিবীর লোনামুখ কাউকে ফেরায় না ।
ঝিনুক ছড়ানো পথে দুপাশেই জলসাঁকো
আমি হাঁটি তুমি হাঁটো কাউকে মানায় না ॥

## অশোক কুমার দত্ত

### স্মৃতিলিপির নায়েককে

জেদী স্বপ্ন ছুঁয়ে ছিল পাথুরে দেওয়াল—
চার বাই সাত, নির্জন কুঠুরী, প্রেসিডেন্সী জেল ।
এখন, এক একটা দিন ভীষণ অন্যমনা —
জানা নেই, স্বপ্ন সব সত্যি ছিল কি না ?
অথচ, দিনে দিনে জমে ক্রোধ, ...বাড়ে ঘৃণা ।
চতুর প্রতিবেশী সজ্জন, তুমি তা'ও না !
তোমার স্বপ্ন ছুঁয়ে ভিক্ষুক এখন হরেক কিসিম—
প্রবঞ্চক আমিও । মিথ্যাই সত্য—স্বপ্নের আক্ষিম !

## সুভদ্রা ভট্টাচার্য

### কথনে কথন

নদীকে বলার মত আমার অনেক কথাই ছিল
পাহাড়কে আঘাত করে বুঝেছি ও কাজ আমার নয়
পাখীদের বাসায় ঢিল মেরে বিবেক গুটোতে পারিনি
বাতাসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা
রোজরাতে ঘুমোতে যাবার আগে ভাবি
এইভবে বেঁচে থাকা তা না হলে গল্পগুলো হারায় না কেন
শুধু-জান্তব কিছু মানুষের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ দেখে
বুঝে নিই পৃথিবীর জন্মরহস্য
নচেৎ ভূমিকম্প হয় কেন, কেন হয় অগ্নুৎপাত
তাই সমস্তরাত পাহাড় ও নদীকে এড়িয়ে
পাখীদের বাতাসে হারিয়ে যাওয়ার গল্প লিখে
বেঁচে থাকি আনন্দে ও নিরানন্দে অদ্ভুত ভালোলাগায়
যেন সহসা দরোজা খুলে বেরিয়ে এল
পঁচিশ বছর আগের দিনগুলি পাহাড় ও নদীকে আলিঙ্গন করে

## অশোক কুমার রায়

### চেতনা

নদীর গতির মত
একটা গতি ধরে রাখে এ-বুক ।
শব্দের ঢেউ এলোমেলো হয়ে
অবশেষে টর্পেডোর ভাঙ্গা কমর তোলে চেতনা,
এপার থেকে ওপারে দেখা যায়,
স্মৃতির মৃদু হাওয়া জেগে উঠে
বাল্য বালিকা নিয়ে বধূ বধূ খেলা
অথবা আম বাগানের ওপারে আম্রাতলায়
বৈরাগ্য-বাউণ্ডুলে আড্ডায় ফরমত বেলা ।

জেঙ্গে যাওয়া জীবনের বয়স এখন
সাগর ছোঁয়ার আগে খোঁজে
ভোর ভেঙ্গে নতুন সূর্য্য সুখের চন্দ্রিমা।

নদীর গতির মতই এ-বুকে
প্রতিবিম্ব এঁকে সময়ের সাঁকো ছুঁয়ে যেন মোহনা।

## কাশীনাথ মণ্ডল

### অন্য কিছু ছুঁতে

অনেকেই দৌড়ে যায় বুড়ি ছোঁয়ার দিকে
আমি বুড়ি ছুঁইনা
আমি দৌড় মনে রাখি
অন্য কিছু ছুঁতে

আমার ছুঁট মানে
তখন বসন্তের ঘড়ি অচল
সাইটিকার হাওয়া বইছে কবিতা কবিতায়

জানি
চোর ছাড়া কেউ দৌড়ায় না
আমিও না
পাদুটো দিনে দিনে ভারী বোধহয়
কিন্তু সময় মত আসল দৌড় রেখেছি গোপনে
বুড়ি ছোঁয়ার বদলে কৌমার্য্য ছুঁতে

## রামপ্রসাদ দাস

### হাতছানি

আমরা উপদ্রুত
যেদিকে দেখি ধোঁয়া-কুয়াশায়
আচ্ছন্ন কালিমাখা প্রতিশব্দ।
তুমি কখনও বলবে না
আমরা সমব্যথী,

তুমি কখনও শুনবে না
আমরা অলীক
ঝলমলে রোদ্দুর
ঢাকা পড়ে রাতের অন্ধকারে
চাঁদের চিতা জ্বলে
মানুষ হাসে. কাঁদে. নাচে
আমরা দেখি দূরের পৃথিবী
নির্মল পবিত্রভূমি
হাতছানি দেয়

## পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

### জীবন দান করো

জীবন দান করো. ললিত মন্থর. জীবাণু কণ্টকিত দেহ.
গাছের গুঁড়ি দিয়ে নৌকো দ্রুতগামী. শিকারী পাখি ধরে আনো
চিহ্ন এঁকে দিক শিকারী পাখি ওরা লবণ শোণিতের আনো ।
জীবন দান করো, ললিত মন্থর. জীবাণু কণ্টকিত দেহ ।

গভীর জলে ডুবে যাচ্ছি চুপিসাড়ে গভীরে গতি-সম্পৃক্ত ।
অগ্রগতি তার কোথায় সংস্থান কিভাবে বাঁচি বলো. মহাকাল ।
শকুনি চারদিকে উপরে ভূয়ে গৃহে সোহাগী রীতিমতো টুকরো.
শান্তি রক্ষক অভয় দান করো, আমার পীড়াপীড়ি শোনো ।

তন্বী কৃশ দেহ স্থাপিত শোভা তার লক্ষ্মী অঙ্গণে মগ্ন
তবু সে ঊর্মিলা পত্নী চূড়ামণি আমার মনোযোগী স্বপ্ন ।
আজ সে মৃত প্রায় দ্যোতক ধ্বংসের. আমার সংসার ছাই.
জীবন দান করো. স্বপ্নলোক থেকে আসুক গঙ্গার ধারা ।

অঙ্গ কুটিকুটি চিত্রশালা ভীত স্পর্ধা সমাগম কার ?
প্রণয় অপরাধ যদি সে করে থাকে কোথায় প্রতিকার বলো ।
আমার ভালোবাসা হয়তো কিছু কম, অন্য পুরুষের বেশী,
আমার অনুমান, বসুধা কুণ্ঠিত কুসুম আভরণ পুষ্প ।

CENTRAL LIBRARY

# রবি রায়়

## অশ্বিন বিকালে

ভূগোল স্টেশন আর ইতিহাস সময়-সারণি
ধূসর অতীত স্মৃতি মেলট্রেন যেন
শব্দহীন ছুটে যায় অন্ধকার টানেলের দিকে।
মগজের কোষে কোষে মগ্ন চেতনায়
স্তব্ধতার তীব্র তীক্ষ্ণ হুইসল বাজে।
মেধা আর মননের সার্চ লাইটের
পরিব্যাপ্ত বৃত্ত ক্রমে ছোট হয়ে আসে।

হিমালয় অতিবৃদ্ধ মানচিত্রে প্রাজ্ঞ ভূমিকায়
বিন্ধ্যাচল-রামগিরি মূঢ়স্থপতির প্রশ্নশালা।
অবন্তী-বিদিশা মায়া, শ্রাবস্তী তো অস্পর্শ অধরা
কিংবদন্তী ঘিরে আছে বিম্বিসার-অশোকের স্বপ্নের জগৎ।
গঙ্গা-সিন্ধু-বেত্রবতী, ব্রহ্মপুত্র-নর্মদা-কাবেরী
মেঘনা-যমুনা-পদ্মা-শিপ্রা আর নির্বিন্ধ্যা-গোমতী
চোখ ভরা অভিমান করে ছলছল।

তখনও ঈশানকোণে মেঘ জমে, কালবোশেখির
মাতাল হাওয়ায় ওড়ে ধুলোমাখা পাতার আঁচল
বনের গভীরে শুনি গাছেদের দীর্ণ হাহাকার
দণ্ডক বিবর্ণ আর পঞ্চবটী ছেঁড়া ক্যানভাস।

ট্রেন তবু ছুটে চলে কাল থেকে অনাগত কালে
চঞ্চল চাকার ছন্দে হুইসল বেজে ওঠে অশ্বিন বিকালে।

## প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়

### ভাঙা আকাশ ও শাদা টাকা

মানুষের জট-পাকানো মাথায় আজ আকাশ ভেঙেছে।
মনের মতো আকাশ। মেঘ রঙের আকাশ।
নক্ষত্রহীন ভেঙে পড়েছে মাথায়।

টমাটোর মতো লাল আর টুসটুসে বালক-বালিকারা
কিছু না বুঝেই নেমে পড়েছে মাঠে —
হৈ-হৈ কথামালার মাঠ।

মাথার জঙ্গল টপকে জানলা গলে পালিয়ে আসা
পাখির মতো পাখিগুলি দোল খাচ্ছে দানা খাচ্ছে —
মা-বাবার রাশিফল খাচ্ছে কচর-মচর করে।

ভাঙা আকাশের শীতল ও সৌখিন টুকরোগুলি
রুমালের মতো পকেটে নিয়ে ওরা ঘরে ফিরবে —
ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের ঘরে-ঘরে জ্বলে উঠবে আলো।

শাদা টাকার মতো উড়তে থাকা টুকরোগুলি
খিলখিল করে হাসছে।
সবুজ রঙের হাসি।

জানে ছোট পকেট থেকে বড়ো পকেটে গেলেই
তারা আবার কুচকুচে কালো হবে, পাহাড় হবে।
পাহাড়ের মাথায় পতাকা হবে, ঝিলমিল গান হবে।

## শংকর চক্রবর্তী

### মিথ্যে গান

কার কথা বলি যারা জঙ্গলে ঢুকেই
অসভ্যতা করতে গিয়ে ধরা পড়ে ? দু'জনেই কিন্তু ওপাড়ার
রমেন্দ্রমল্লিক স্ট্রীটে থাকে, পাশাপাশি বাড়ি, ইচ্ছে হলেই এ ওর বাড়ি
ঢুকে রান্নাঘর থেকে ভালোমানুষের মতো চিতল মাছের পেটি খেয়ে
আসতে পারে, কিন্তু চুরি নয়, জঙ্গলেও হাত ধরাধরি, প্রকাশ্যে শিমূল

তুলো উড়তে শুরু করলে, বখাটে তরুণ লজ্জা ভেঙে
মেয়েদের স্কুল থেকে তাকে টেনে নিয়ে আসে, ঠিক নয়,
দু'জনের যুগ্ম গান এখনো টেপেই ধরা আছে, ভেবেছিল
এই ঘোরাঘুরি সাঙ্গ হলে, এক মশারির নিচে খিতু হবে,
তখনই রিমেক করে নিতে চায় নিজেরাই দুষ্ট ও মিথ্যের গানগুলি ;
তারও আগে, মাত্র শাঁখে ফু' দিতেই বিভিন্ন ঘর থেকে
উড়তে শুরু করে খই — সময় হয়েছে গঙ্গাতীরে
অন্ধ হয়ে হাতে হাত, দু'জনেই একসঙ্গে যাও, ফিরে যাও।

## অমূল্য কুমার চক্রবর্তী

### শেষ ভিয়েৎনাম

কূ-উ কান্না ডাকা পাখি দূরে কোন অন্ধকার গাছে
রাত্রির প্রহরে ডাকে ক্ষণে ক্ষণে, কেন জেগে আছে ?
সবাই কি ফিরেছে ঘরে, ঝড়োয়া বাতাস
আজ শুধু হা-হুতাশ
অজানা আতঙ্কভরা অবিশ্বাসী ত্রাস।

আবার কি পৃথিবীতে নেমেছিস্ শতাব্দীর শেষ ভিয়েৎনাম
যুগোস্লাভা চেচেন ইরাক আফগানী তিব্বত ছিন্দাম,
শ্বাসরুদ্ধ কতদিন এইসব নাম জানতাম
নক্‌শালী পাহাড় ভ্যালি অক্তরঙ্গে শ্রীকা-কুলামে !

হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয় স্তম্ভিত আকাশে
শ্মশান লজ্জায় মরে এমন উদ্ধত সর্বনাশে
অন্ধকারে অমঙ্গল কান্না ডাকা পাখি
জানে কি সে মৃত্য আজ পিছে পিছে, মিছে ডাকাডাকি !

স্বপ্নে থাক শান্ত স্বচ্ছ অবিনাশ্য নবদ্বীপ ধাম,
এখন শিয়রে যম, শতাব্দীর অন্তিম সংগ্রাম।

CENTRAL LIBRARY

# সংবর্ত রায়

## এখনও গেল না

এতবার জন্ম মৃত্যু হ'ল, তবু জন্মান্তরে
সনাক্তকরণের চিহ্ন কিছুতেই এখনও গেল না ;
যারা চেনে তারা নাকি ঠিক চিনে ফেলে
তাদের চোখেতে নাকি আজও আমি সাবেক পুরোনো।

এতবার মৃত্যু এসে তবে আর কোনটুকু সাথে নিয়ে গেল
এতবার জন্ম পার হয়ে তবে আর নূতন হয়েছি কতটুকু
আত্মার গায়ে যদি সাতবাসী পুরাতন ধুলো
অক্ষয় অমর হয়ে এ যাবৎ অটুট জড়ানো ?

চারপাশে ঘরের দেওয়ালগুলো ভেঙে ফেলে
অবারিত দরজা জানালা বসালাম,
অথচ সকল প্রতিবেশী
তবু বলে বদ্ধ হয়ে আছি।

একটা শিশির বিন্দু
একদা বুকের উপরে এসে জমা হয়েছিল,
তারপর কোনোদিনও রৌদ্রে শুকাল না।
বেদনাকে নিশ্চিত পরমায়ু দিয়ে
কি ভীষণ ফ্যাসাদে পড়েছি
সনাক্তকরণের চিহ্ন কিছুতেই এখনও গেল না।
অবারিত দরজা জানালা, তবু নাকি বদ্ধ হয়ে আছি।

# রাজকুমার রায়চৌধুরী

## পারুলবালা লেন—২

কথা শুরু হতেই
সমস্ত রাত্রি অভ্যর্থনা জানায়, একটি পাখি উড়ে বেড়ায় আকাশে।
অন্ধকার রাত্রি রচনা করে আকাশে দু'টি ডানার গোপন শাসন
ও আরব্যরজনীর বিরহ।

২
মেঘের ভেতরে উড়ে যায় অদ্ভুত আলোর ঝরাপাতা,
লাজুক কথা ও ফুলগুলি…
রাত্রি দুর্ভেদ্য ঘুমের আধারে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন।
তুমি বলো—
কোথায় রয়েছে দূরবর্তী তারার আলো ?
আর নির্জন ডালপালা, পাখির ডাকাডাকি।

৩
তোমার কথা থেকে উড়ে আসে
চৈত্র রজনীর চোখের জল আর ডানা ভাঙার স্বপ্ন
আমি আকাশে উড়ি নতুন তারার সঙ্গে
শেষ পর্যন্ত আমরা যেখানে গেলাম, সেখানে ধীরে ধীরে নামল রাত্রি,
জিগ্যেস করলাম—এ জায়গার কী নাম ? বলল সবাই—
এ পথের নাম পারুলবালা লেন !

৪
প্রথম বর্ষের পারুলদি, খুলে যায়—
তার অনুচ্চারিত ক্লান্তি ও অবসাদ
বলল—চল, আমার অগ্নিময় রূপের আগুন খুলে দেখাই তোকে আজ।
ভয় পেয়েছি
সর্বগ্রাসী ঐ খিদের আমার জিভ পুড়ে যায়।
সাবানের মধ্যে খুব গোপন, লুকিয়ে রেখেছি পাপ আর
পারুলদি'র পিপাসার ব্যাকুল জল…

## প্রদোষ দত্ত

### আগামী প্রজন্মের

মানুষের যত শ্রম দীর্ঘ রাজপথ হয়ে
আগামী প্রজন্মের ধরিত্রী হবে।
খলেরা আড়ালে দুরভিসন্ধি আঁটে,
নিষ্ঠুর ক্রূর হাতে সভ্যতাকে বিবর্ণ করে।
উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের দড়ি দিয়ে
একদল মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে।
মানুষের সংঘর্ষ চিরন্তন, পশুরা
ভয়ঙ্কর খেলায় মাতবেই।
আমার বুকের মধ্যে এক মিষ্টি
আলোর জ্যোতি!
সোহাগী হাতে হাত রেখে সময় ঘুরে বেড়ায়।
মধুমাসের কিশোরী চিকণ পাতায়
আকস্মিক আশ্লিষ্ট সবুজ!
গানের সমাধি দেবে কেমন করে?
মানুষ ছাড়া গান হয় না,
আর জয়গান শুধু মানুষেরই।

## সৌমিত বসু

### ক্ষয়

আলোরঙ। হারিয়ে যাবার আগে জেগে ওঠে সহস্র বিকেল
দু-বুক জোৎস্না নিয়ে ছুটে যায় মাঠ বরাবর, কেন যায়?
কাদের আনন্দ হাসি ক্রোধ অভিশাপ অমন স্রোতের পাড়ে
অবাধে শুকায়, শুকায় এ জলদাগ ব্যথার বালিশে

সোনাদিদি, রঙ বলে কিছু নেই, সবই কৌতুক

## শ্যামল কুমার নাইয়া

### নিতান্ত জৈবিক

চাঁদ তখনও জেগেছিল ।
শরীরে অসংখ্য নখরের দাগ
ফুটে ছিল লজ্জাহীন ।
বুকের ঐশ্বর্য্য ঘিরে থাকা
অফুরান লোভ ।
প্রায় সারারাত সে কাঁকিয়ে কেঁদেছে ।
বালিশে মুখ গুঁজে অন্ধকারে
শুধু নারীর অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে ।

কাছে-পিঠে ছিল যারা প্রতিবেশী
ভয়ে তারা কেউই আসেনি ।
পুরুষেরা সন্দিহান. পাশে শোয়া স্ত্রীর মুখে
আলো ফেলে তন্নতন্ন
স্বকীয় দাম্পত্য চিরে খুঁজতে চেয়েছে
অথচ. এই মূহূর্তে তার শিথিল পুরুষাঙ্গ
কঠিন হয়েছে কখন সে নিজেও জানে না ।

## বৃন্দাবন দাস

### পারেনি

কবিরা সব জলে গেলো
শুনেছি
দেখিনি

সাহিত্য সব জলে গেলো
শুনেছি
দেখিনি

শিল্প সব জলে গেলো
শুনেছি

CENTRAL LIBRARY

দেখিনি

এটা এমনই সময়
সব জলে যায়
জলে যেতে দিতে হয়

ওরা মাতৃভাষা জলে দেবে —
এমনই তোড়জোড়
নিয়েছিলো।
পারেনি

## শ্যামসুল ইসলাম

### ভিজছে রটোড্রাম

সারাদিন বৃষ্টি আজ. ওপাশের বাড়ির কার্নিশ
ছুঁয়ে যায় মেঘমালা. আমি বসে জানলার কাছে
কেবলি বুকের দেশে রটোড্রাম শহরকে দেখি,
কারখানার চিমনিদের ধোঁয়ায় সারাটা আকাশ
মেঘাচ্ছন্ন করে. একমেয়ে যায় রেনকোট গায়ে।
আপেল খাচ্ছে মেয়ে. বৃষ্টির ফোটা আপেলে
গা ছুঁয়ে পড়াই নিচে. আমি শুধু আপেলের রঙ
খুঁজে ফিরি মেয়েটির গণ্ডদেশে. মেয়েটি বোঝেনি।
আজ সারাদিন শুধু বৃষ্টিপড়ে. আমার হৃদয়
ভিজছে রটোড্রাম শহরের মত. একমেয়ের
হাতের আপেল ছোঁয়া জলঝরে প্লাবন জাগায়
আমার চৈতন্য জুড়ে. আমি তাতে কাটছি সাঁতার।

# অলোককুমার ঘোষ

## স্মৃতির কোলাজ

ঘরজাগুলো শক্ত খিলে আঁটা
ভেতরে স্মৃতিগুলো নিঃসঙ্গ নিথর
বাইরে আমি, যদি কষ্ট বাড়ে
স্মৃতি হাতড়াতে তাই বড় ভয়
ওগুলোকে রেখেছি বন্দি করে
জীর্ণ বাড়ি, অবহেলায় বেড়েছে ফোকর
সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছে
নাছোড় স্মৃতির কিছু কিছু—
আকাশ মাপের খোলা মাঠ,
ঢেউ খেলছে সবুজ কার্পেট কিংবা
হেমন্তে হিমানী বুকে ধরে
সোনালী ঘোমটা টেনে নুয়ে সোনার মাঠ
চেনা-অচেনা পাখিদের ওড়াউড়ি,
বোশেখে দিঘির জলে দাপাদাপি
সঙ্গী কমল, ইকবাল ডেভিড কতজনা—
পাড়েতে জগী ডুমুরের ডালে মাছরাঙা
তার ছড়ানো দৃষ্টি দিঘির জলে
হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে জীয়ন্ত মাছ
দু'ঠোঁটে চেপে ফিরে আসে ডালে
বকুলের পুতুলের বিয়ে, নিমন্ত্রণে যাওয়া
কচু পাতায় সাজান কুল পাতার লুচি,
মাটির পায়েস চাকুসচুকুস শব্দে মিছে খাওয়া
তৃপ্তির নকল ঢেকুর তুলে আশীর্বাদ
— এসব ভাবতে ভাবতে বিভোর
সকাল গড়িয়ে দুপুর
বিকেলের কোলে সন্ধে এসে গেল
সকালের সাজানো ক্যানভাস সাদাই রয়ে গেল
ছবি আর আঁকা হোল না।

CENTRAL LIBRARY

# অর্কিড-এর গ্রাহক হতে গেলে

## গ্রাহক চাঁদা ঃ

এক বছরের জন্য সডাক ৭৫-০০ টাকা [ পঁচাত্তর টাকা ] মাত্র।
দু' বছরের জন্য সডাক ১৪০-০০ টাকা [ একশ চল্লিশ টাকা ] মাত্র।
আজীবন সদস্য চাঁদা ১০০০-০০ টাকা [ এক হাজার টাকা ] মাত্র।

- ☐ পত্রিকা প্রতি সংখ্যা সার্টিফিকেট অফ্ পোস্টিং-এ পাঠান হবে।
- ☐ গ্রাহকরা অর্কিড প্রকাশনীর যে কোন বই ( সংকলন বাদে ) কেনার সময় শতকরা তিরিশ টাকা হারে ছাড় পাবেন।
- ☐ বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যাবে।
- ☐ মনি অর্ডারেও টাকা পাঠিয়ে যে কেউ গ্রাহক হতে পারবেন।

**টাকা পাঠানো বা সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা**

সম্পাদক,

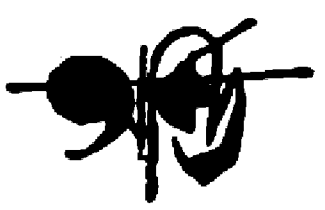

২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে, সাহাপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩৮, পশ্চিমবঙ্গ।
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

---

## অর্কিড-এর পরবর্তী প্রকাশনা

**এই শতাব্দীর শেষ প্রতিনিধিত্বমূলক বাংলা কবিতার সংকলন**

প্রখ্যাত সমালোচকের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত

# স্বাধীনতা-উত্তর শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতা

সম্ভাব্য মূল্য : একশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : নব্বই টাকা [ এককালীন ]

যোগাযোগ :

২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে সাহাপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩৮
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

Registration No. 32758/77 ARKID 23rd Year 3rd Issue 2000

## অর্কিড প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কিছু বই

প্রবন্ধ

### শান্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায় এবং অন্যান্য

উপেক্ষিত লেখক অপেক্ষিত অবলোকন

উপন্যাস

### চণ্ডী মণ্ডল

অলীক অবন্তর

কাব্য সংগ্রহ

### পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কাব্য সংগ্রহ : ১

কাব্য সংগ্রহ : ২

কবিতা

### সুব্রত রুদ্র ( সম্পাদিত )

স্বর্ণকুমারী দেবীর

প্রেমের গান আর কবিতা

কবিতা

### দীপক মুখোপাধ্যায়

ওষ্টাভিয়ো পাজ ( অনুবাদ )

### প্রদোষ দত্ত

কার্গিল ভালোবাসা ভিনটেজকার

### শান্তনু প্রামাণিক

শিকড় বাকড়

### রাণা চট্টোপাধ্যায়

নীল সামিয়ানার নিচে

আধভাঙা চাঁদের আলোয়

### প্রসেনজিৎ বক্সী

এখন কোরাস

জটায়ুর প্রতীক্ষা

সমুদ্র ও সারস

### অলোককুমার ঘোষ

নিম ফুলের মধু

সময় ধরা শূন্য মুঠোয়

Published From : 29 H. B. Pathway Sahapur Calcutta-700 038
Printed at : G. D. Enterprise, 29, Sitalatala Road, Sahapur
Calcutta-38. ✆ : 468-8214 Rs. 15/- only

# কবিতা

অলোককুমার ঘোষ সম্পাদিত

CENTRAL LIBRARY


## একবিংশ শতকের প্রথম বই মেলায় অর্কিড প্রকাশনী থেকে
## প্রকাশিত হয়েছে আকর্ষণীয় ১২টি বই

কাব্যগ্রন্থ

**রাণা চট্টোপাধ্যায়**
বিকেলের আলোর ভিতরে

**অলোককুমার ঘোষ**
স্বজনে বিজনে

**সুভদ্রা ভট্টাচার্য**
তাপকলের মেয়ে

**প্রসেনজিৎ কুমার বক্সী**
জটায়ুর প্রতীক্ষা

**প্রদোষ দত্ত**
কার্গিল ভালোবাসা ভিনটেজকার

**শান্তনু প্রামাণিক**
শিকড় বাকড়

**দীপক মুখোপাধ্যায়**
ওস্তাদিয়ো পাজ ( অনুবাদ )

কাব্যগ্রন্থ

**শ্যামল কুমার নাইয়া**
নদী ঝরিয়েছে ঘাম

**সুব্রত রুদ্র ( সম্পাদিত )**
স্বর্ণকুমারী দেবীর
প্রেমের গান আর কবিতা

**অলোককুমার ঘোষ ( সম্পাদিত )**
এ সময়ের নির্বাচিত দীর্ঘ কবিতা

উপন্যাস

**মিহির ভট্টাচার্য**
ঘূর্ণিকাল

প্রবন্ধ

**মুরারি ঘোষ**
কবি মধুসূদন ও বাঙালী
বুদ্ধিজীবী সমাজ

CENTRAL LIBRARY

059.9144
AR 48

# শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক

চব্বিশ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা
[ শারদীয়া ] ১৪০৭

সম্পাদক
অলোককুমার ঘোষ

প্রচ্ছদ
দেবকমল মণ্ডল

প্রকাশিকা
ছবি ঘোষ

প্রকাশস্থল
২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে, সাহাপুর
কলকাতা-সাত লক্ষ আটত্রিশ
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

মুদ্রক
ছবি ঘোষ

মুদ্রণস্থল
জি. ডি. এণ্টারপ্রাইজ
২৯, শীতলাতলা রোড, সাহাপুর
কলকাতা-সাত লক্ষ আটত্রিশ

পঁয়ত্রিশ টাকা

## সূচীপত্র

অনুবাদ

মুসোর্গিনির বিচার
সংবর্ত রায় ৯

প্রবন্ধ

পরশুরামের রাজনীতি গল্প :
পুনশ্চ/রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১২৯

আধুনিক মৌল হিন্দুবাদের
উত্থান ও কীর্তি/মুরারি ঘোষ ১৩৪

বিদ্যাসাগর ঃ বিভ্রান্তির জাল
আশিস খাস্তগীর ১৪৩

কবিতার ভাষাবিধি ঃ প্রসঙ্গ
অনুষঙ্গ ঃ চল্লিশের চারজন/৬
শান্তনু প্রামাণিক ১৫৮

আমার জীবন ঃ সুব্রত রুদ্র
রথীন ভৌমিক ২৯৩

গল্প

বিকেলে শিউলির ঘ্রাণ
জীবন সরকার ২১৩

বাবা হওয়া/অনিল ঘড়াই ২২৫

ডাইনিং টেবিল/শম্ভু চক্রবর্তী ২৩২

আজ-কাল পরশুর গল্প
প্রবীর জানা ২৪২

বাবার ফাঁসি হবে/চুনীলাল রায় ২৪৭

আঁধারে আলোর ফুলঝুরি
অশোক কুমার রায় ২৬০

জন্মদিন/চণ্ডী মণ্ডল ২৬৫

CENTRAL LIBRARY

## কবিতা

সুধেন্দু মল্লিক ১২৩ তারক চট্টোপাধ্যায় ১২৩ প্রদোষ দত্ত ১২৪ গৌতম মুখোপাধ্যায় ১২৪ বিজয় কুমার দত্ত ১২৫ মতি মুখোপাধ্যায় ১২৬ গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭ শিপ্রা সেনধর ১২৭ প্রমোদ বসু ১২৮ জয়ন্ত বিশ্বাস ১২৮ বাসুদেব দেব ১৭১ শ্যামল কুমার নাইয়া ১৭১ রবীন্দ্র গুহ ১৭২ চন্দন চট্টোপাধ্যায় ১৭২ বসু ভদ্র ১৭৩ মৃণাল বসুচৌধুরী ১৭৪ দেবব্রত দত্ত ১৭৫ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ১৭৫ মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৬ মানসকুমার চিনি ১৭৬ রাণা চট্টোপাধ্যায় ১৭৭ মানবেন্দ্র চক্রবর্তী ১৭৮ দীপেন রায় ১৭৯ সাগর চক্রবর্তী ১৮১ অমরেন্দ্র গণাই ১৮২ অনন্ত দাশ ১৮৩ সুভদ্রা ভট্টাচার্য ১৮৪ প্রদীপ পাল ১৮৪ অজিত বাইরী ১৮৫ প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬ দেব ভট্টাচার্য ১৮৭ অরূপ পান্তী ১৮৭ অভিজিৎ ঘোষ ১৮৮ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯ পিনাকী রায় ১৯০ অদীপ ঘোষ ১৯১ অশোক কুমার দত্ত ১৯১ বৃন্দাবন দাস ১৯২ রমেশ পুরকায়স্থ ১৯৩ সঞ্জয় রায় ১৯৪ কানাইলাল জানা ১৯৫ চন্দন সেন ১৯৫ মিহির সরকার ১৯৬ রফিক উল ইসলাম ১৯৭ সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ১৯৭ নিখিল ভৌমিক ১৯৮ অমরনাথ বসু ১৯৯ গণেশ ভট্টাচার্য ১৯৯ বিশ্বনাথ মাঝি ২০০ ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০ তরুণ গোস্বামী ২০১ শ্যামল কুমার বিশ্বাস ২০১ নিভা দে ২০২ রফিক আলাম ২০৩ সেখ মোজাম্মেল ২০৩ আব্দুস শুকুর খান ২০৪ সিদ্ধার্থ সিংহ ২০৫ অশোক কুমার রায় ২০৫ স্বপ্না ঘোষ ২০৬ সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায় ২০৬ মুরারী মান্না ২০৭ রাজকুমার শেখ ২০৮ শামসুল ইসলাম ২০৮ সুদেব সাহা ২০৯ বাসন্তী গঙ্গোপাধ্যায় ২০৯ গোপাল দে ২১০ সাগ্নিক দেব ২১০ উৎপলকুমার গুপ্ত ২১১ অলোককুমার ঘোষ ২১২

CENTRAL LIBRARY



# বিশ্বায়নে বিপন্ন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি

আই. টি. অর্থাৎ ইনফরমেশন টেকনলজি যা কিনা বিশ্বায়নের অন্যতম বাহক হিসেবে পরিগণিত সেই আই. টি. এখন আর শুধু পরিষেবার ক্ষেত্রের বিষয় নয়। এখন তা আর্থিক, রাজনৈতিক, মানুষের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক, মানুষের মনস্তত্ত্বে, মানুষের সংস্কৃতির জগতে এক বিপুল, প্রলয়ঙ্করী পরিবর্তন এনে দিচ্ছে, বিপন্ন করছে তার স্বপ্নময় জীবনকে। 'কালচারাল গ্লোবালাইজেশন' বা সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের নামে বিশ্বের সমস্ত দেশের শেষ প্রান্তর পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট জীবন-দর্শন গড়ে তুলতে চাইছে। যা পরোক্ষে একটা নিয়ন্ত্রিত জীবনধারা, রুচি, চাহিদা, ভোগ, নিজস্ব দেশজ ঐতিহ্যের চাইতে অনেক বেশি মোহময় সম্ভোগের তীব্র ইচ্ছা মহামারীর মতো ছড়িয়ে দিতে চাইছে। আসল উদ্দেশ্য হলো কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো ছাড়াই পছন্দ-অপছন্দ রুচির সম্মোহন গড়ে তোলা এবং যুক্তিশীল মানুষের স্নায়ু-কেন্দ্রে প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য প্রবাহকে আছড়ে ফেলা। বিশ্ব-সংস্কৃতির এই কোরিওগ্রাফি আমাদের নিষ্ফলা, হতোদ্যম করছে এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে রক্তের সম্পর্ককে।

এই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের হাত ধরে পর্ণোগ্রাফীর সঙ্গে ফিল্ম, টি. ভি. ম্যাগাজিন, ব্লু-ফিল্মের মরণপণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। সর্বাধিক প্রচারিত মাধ্যম হিসাবে সারা বিশ্বে পর্ণোগ্রাফী বছরে ১০ বিলিয়ন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা ৪৫.০০০ কোটি টাকা আয় করছে এবং প্রতিনিয়ত তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে অন্যান্য সব ধরণের ফিল্মের সঙ্গে পর্ণোগ্রাফী বা ব্লু-ফিল্মের হার হলো ১ ঃ ৩। শুধু বৃটিশ পর্ণোগ্রাফী ম্যাগাজিনই বছরে বিক্রি হয় ২ কোটি কপি। ছয় ঋতু আর সামাজিক উৎসবের ছাউনিতলে প্রতিযোগিতার নামে বাড়ছে প্রায় উলঙ্গ শরীরের শোভাযাত্রা। ফ্যাশান শো, বিউটি কনটেস্ট, মডেলিং, বিজ্ঞাপন, সোপঅপেরা, প্রিন্ট ম্যাগাজিন, টেলি-ম্যাগাজিন পপুলার ফিকশান, সিনেমা, টেলিভিশন কেবল টি. ভি. ভিডিও — হাণ্ড্রেড পারসেন্ট এ্যাকিউরেসির এইসব অস্ত্র আমাদের সৌন্দর্যচেতনা আর মূল্যবোধের সীমানা জুড়ে শুরু করেছে বহাবহ ব্যাপকতায়। হেল্‌থ ক্লাব, ম্যাসাজ পার্লার, বিউটি পার্লার, ডায়েট ইণ্ডাস্ট্রিজ, কসমেটিক সার্জারি, লিকুইড ফার্মিং, হার্বাল

কসমেটিক, ফার্মাসিউটিকালস কসমেটিক আমাদের এক নতুন জীবন দর্শনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রক্ষণশীল যৌন-নৈতিকতা আর দৈহিক শুচিতার সুপ্রাচীন বিশ্বাস বোধের ভারতবর্ষে শরীর সচেতনতার এক বিস্ময়কর বিস্ফোরণ ঘটেছে। দেশজ মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা সৌন্দর্যবোধ আর জীবন যাত্রার পারস্পর্য দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের যৌন-নৈতিকতা আর নারী সমাজের স্বাভাবিক সহবতকে বেআব্রু করে দিচ্ছে অকল্পনীয় তীব্রতায়। একটা সমাজ অন্য আর একটা সমাজের জীবনযাপনের ভঙ্গিকে নকল করে বেঁচে থাকতে পারা কি কোনোভাবে সম্ভব ? যে কোন সমাজ এবং তার মূল্যবোধ নির্মিত হয় ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে। অথচ এসব মৌলিক উপাদানগুলিকে অস্বীকার করে জীবনটাকেই একটা ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে, আর এর ফলশ্রুতিতে এক প্রতিবন্ধী সমাজ এবং এক দর্শনহীন জারজ মূল্যবোধ আমরা উপহার হিসেবে পাচ্ছি।

আটলান্টিকের ওপার থেকে যাই আসুক না কেন — সঙ্গীত থেকে চিত্রকলা, চলচ্চিত্র থেকে নাটক, গ্রন্থ, সি ডি রম, ভি. সি. ডি., এ. সি. ডি. ভিডিও গেমস, ভি. সি. আর., স্যাটেলাইট, টি. ভি., মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট — এ সব কিছুই তৃতীয় বিশ্ব আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে পান করবে। শিল্প সংস্কৃতি এত তীব্র দৈহিক চেহারা নিয়ে, বিপুল পণ্য সম্ভার নিয়ে বিচিত্র বৈভবে এমন ভাবে কোনদিনই মূর্ত হয়নি। এই বিশ্বায়ন শিল্প-সংস্কৃতির বাণিজ্যেও এক সর্বগ্রাসী চেহারা দিয়েছে। 'কালচার' এবং 'এন্টারটেনমেন্ট' ইণ্ডাস্ট্রিজ সুবৃহৎ বাণিজ্য হিসেবে বিশ্বে দ্রুত বিকাশমান। রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি শাখার এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে — সাংস্কৃতিক পণ্যসামগ্রী, যেমন গ্রন্থ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, ফোটোগ্রাফি, এবং টি. ভি. সরঞ্জামের বাণিজ্য ১৯৮০ সাল থেকে ৩০০ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমান অর্থমূল্যে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ২৫০ বিলিয়ন ডলার। বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভিন্নতর সক্রিয়তার অবিশ্বাস্য সুযোগ নিয়ে বেড়ে চলেছে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা। এই সংস্কৃতির জাতিগত এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির কোন দায় নেই। ফলে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক সংস্কৃতির অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি।

সংস্কৃতির এই বিশাল একমুখী স্রোত ধেয়ে আসছে শুধু আটলান্টিকের ওপার থেকেই। বিনোদন শিল্পের গণ সম্মোহনের অপরিমেয় ক্ষমতা সম্পন্ন শাখাটি হচ্ছে — চলচ্চিত্র। সংখ্যাগত দিক থেকে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র তৈরি হয়। কিন্তু সারা বিশ্বে পরিবেশনায় হলিউডের আশপাশে কেউ নেই। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অসামান্য চলচ্চিত্রকারদের

সৃজনশীল প্রতিভার বিচ্ছুরণ যখন আমাদের বিমোহিত করে, তখন হলিউডের প্রণবিত চলচ্চিত্র এক অতিভোজের আগ্রাসী দৈহিক জীবনাদর্শে, জীবন যাপনের এক রুদ্ধশ্বাস হিংস্র ভঙ্গিমায় তীব্র আকর্ষণে সংক্রামিত করছে তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ মানুষকে।

মার্কিনীদের বাণিজ্যিক সংজ্ঞায় তাদের হিংস্র, আগ্রাসী, যৌন-উত্তেজক শিল্পহীন চলচ্চিত্রগুলিকে বলা হয় 'Targeted products.' অন্তহীন মুনাফা ছাড়াও মার্কিন জীবনাদর্শের একান্ত অনুষঙ্গ হিংসা, ধর্ষণ, ব্যাভিচার আর মনোবিকলনের মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের নিঃস্ব, ব্যর্থ, হতশ্রী জীবন নিজেদের অজান্তেই সব অচিরতার্থতার নিরাময় খুঁজে নেয়। জীবনের নিঃসীম বঞ্চনা আর অপমান মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পের যৌন বিকৃতি আর হিংসার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে ক্রমশ হারিয়ে ফেলে বঞ্চনার প্রতিবাদ ক্ষমতা, অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহা। উগ্র নেশাখোরের মতো ঘুরে বেড়ায় প্রদর্শনের জায়গায়। মার্কিন অর্থনীতির ভাষায় একে বলা হয় 'Cash flowing violence'.

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও মার্কিনী প্রভাব অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে। এখন আর কোনো জনপ্রিয় সঙ্গীত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট জন গোষ্ঠীর বার্তা বহন করে না। শুধু তাই নয় নির্দিষ্ট সঙ্গীতের বাণীর সুন্দর কাব্যসুষমাও বহন করে না আগ্রাসী মার্কিনী প্রভাবে। বিভিন্ন ধারার সঙ্গীতের তাল, লয়, ছন্দের নিজস্ব আবেদনকে চুরি করে এক জটিল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করে অবয়বহীন এক সঙ্গীত। ক্যারাবিয়ান ছন্দ, সুর, আফ্রিকার ড্রাম, সুদীর্ঘ কাল ধরে দাসত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহী নৃত্যছন্দের শরীরী বিক্ষোভ, ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সৃষ্টিশীল পরিবেশনা পদ্ধতি, সব সঙ্গীত আর নৃত্যের নির্যাস নিয়ে তৈরি এক দ্রবণের সঙ্গে মেশায় রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাকর অস্থির এক প্রযুক্তি। আর প্রচারের তূর্যনিনাদে সমগ্র বিশ্বকে সেই অবয়বহীন, পটভূমি আর মৌলিকত্ব-হীন সঙ্গীতকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। গণমাধ্যমের আগ্রাসী প্রচারের মুখে প্রকৃত স্রষ্টারা নিজের সুরেরই বিকৃত রূপকে অনুকরণ করতে শুরু করেন, আমূল বদলে ফেলেন নিজস্ব সঙ্গীতের লোকায়ত মাধুর্যকে। সাওপাওলো কিংবা রিও ডি জেনেরোর হতশ্রী বস্তীবাসীদের দুঃখময় জীবনের অবদমিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে মন্থন করে ব্রাজিলের ভুবন ভোলানো যে 'সাম্বা' সঙ্গীত নির্মিত হয় সেই সুর আর ছন্দকে লুট করে প্রাচুর্যময় বিলাসী জীবনের চটুল চমকের কথায় বদলে ফেলা হচ্ছে সাম্বার কালজয়ী প্রাণশক্তিকে। বিশ্বায়নের এই সর্বভুক মার্কিনী চৌর্যবৃত্তির কথাই জানিয়েছেন ব্রাজিলের শ্রীমতী আলমা গুইলারমেপ্রিয়েতে, তাঁর

'সাম্বা' গ্রন্থে — "প্রকৃত সঙ্গীত থেকে চুরি করা সুর আর ছন্দকে মেশানো হচ্ছে ঝাঁঝালো এবং প্রাণহীন মেটাল মিউজিকের সঙ্গে। তারপর শরীর ঝাঁকিয়ে এই টুকলিকেই 'আসল সাম্বা' বলে গণমাধ্যমের পেশির জোরে সারা বিশ্বে প্রচার করা হচ্ছে। এই ভেজ্ঞালকারদের এতটাই ক্ষমতা, যে, রিও'র দুঃখী মানুষদের বেঁচে থাকার পরাক্রান্ত প্রাণশক্তি সাম্বা, তার কাব্য আর অপরূপ ছন্দময় মাধুর্য হারিয়ে যখন এক মৌলিকত্বহীন মিশ্রণের চেহারা পায় রপ্তানি করা সেই টুকলিকেই আসল সাম্বা বলে ব্রাজিলের তরুণ প্রজন্ম মহানন্দে গ্রহণ করে প্রতারিত হয়।"

এই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের জন্যেই এক গভীর সংকটে পড়েছে আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ভাষা। বিশ্বায়নের অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতিতে একটা কথা চালু হয়েছে। সেটা হলো 'ল্যাঙ্গুয়েজ ইম্পিরিয়ালিজম'। ভাষা ও সংস্কৃতি মনুষত্বের পরিচয় বহনকারী দু'টি প্রধান উপকরণ। আর যে কোনো জাতির মননশীলতা গড়ে ওঠে তার ভাষা, সংস্কৃতি, দেশজ বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগলিক পরিবেশকে ভিত্তি করেই। বর্তমান আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষ কয়েক হাজার ভাষায় কথা বলে। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে, ভাষার জন্ম প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে। তাঁদের মতে পৃথিবীতে ৪ থেকে ৬ হাজার মাতৃভাষা আছে। এর মধ্যে অনেক ভাষার মৃত্যু ঘটেছে। বিশেষজ্ঞদের আরও ধারণা আগামী শতাব্দীর মধ্যে সেই সব ভাষার মধ্যে ৯০ শতাংশই হারিয়ে যাবে। এবং বর্তমানে নিয়মিত যে কয়েক হাজার ভাষা ব্যবহার হয় তা কমে দাঁড়াবে ২৫০ থেকে ৬০০-র মধ্যে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ও সমৃদ্ধ ভাষা ছিল হিব্রু। তা আজ প্রায় অবলুপ্ত। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম ভাষা ছিল সংস্কৃত। তাও আজ মৃত ভাষা বলে কথিত। গ্লোবাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থা ইংরেজি ভাষাকে প্রাণশক্তি যোগাচ্ছে আন্তর্জাতিক আধিপত্যবাদী ভাষা হিসেবে। ১৯৭০ সালের পর প্রায় দেড় লক্ষ নতুন শব্দ ইংরেজি ভাষার ভাণ্ডারে স্থান করে নিয়েছে। পাশাপাশি পৃথিবীর প্রধান ৫০ টি ভাষা থেকে প্রায় দু'লক্ষ শব্দ হারিয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আরও ধারণা শেষ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাই বিশ্বের মানুষের নিজের ভাষায় পরিণত হবে। মহাত্মা গান্ধীর একটি উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি জলবৎ তরলং হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস — 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্যের বিস্তার ও প্রশাসনিক কাজে সুবিধার জন্য এদেশে ইংরাজী এনেছিল। তা দ্রুত সারা দেশে প্রভাব সৃষ্টি করে। এভাবে তা

উচ্চশিক্ষার ভাষার মাধ্যমে পরিণত হয়। আস্তে আস্তে তা তথাকথিত শিক্ষিত জনের বাক্যালাপের মাধ্যমে হল। এরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ইংরাজীকে দূরে রাখতে পারেনা। এরা মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা পায়।' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে, সাম্রাজ্যবাদীদের 'বিশ্বায়নের' দাপটে বিশ্বের উন্নয়নশীল অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতি, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যেমন আক্রান্ত তেমনি আক্রান্ত আমাদের মনোজগত, সাংস্কৃতিক জগৎ, সাহিত্য শিল্পকলার জগৎ। অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির স্বার্থরক্ষাকারী মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত আজ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টির জগৎ। 'মার্কিনী নতুন ইংরেজীর দাপটে' ধ্রুপদী ইংরেজী ভাষা আজ আক্রান্ত। অনেক নতুন ধরনের শব্দ ও বানানের সংস্কার অভিধানে স্থান পাচ্ছে। আমাদের দেশে তথাকথিত 'ফিল্মি হিন্দী'-র আধিপত্যে-ব্যবহারে হিন্দীভাষা এবং উর্দুও আক্রান্ত। হিন্দির নামে এখন এক 'অদ্ভুত' ভাষা ব্যবহার হচ্ছে।

মানুষের মনোজগত গড়ে ওঠার চিরায়ত প্রক্রিয়া দ্রুত ধর্ষিত হচ্ছে বিস্ময়কর প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ গণমাধ্যমের বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে। আমদানিকৃত এক সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠছে মানুষের মনোজগত। গড়ে উঠছে দেশজ বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন শিকড়হীন দায়হীন প্রক্ষিপ্ত এক আবহ। যেখানে শুধু আছে অতৃপ্তি। জীবনের উর্দ্ধে জীবনকে ভোগ করার বিকৃত বাসনা। দর্শনহীন, আত্মীয়হীন অসংলগ্ন এক একক মানুষ। আর সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন হলো আজন্ম লালিত দেশজ মৌলিকত্বের বন্ধন থেকে এই একক মানুষের দ্রুত মুক্ত হওয়ারই প্রক্রিয়া।

ক্যারাবিয়ান পাবলিশিং এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট হ্যারল্ড হোয়েট বারবাডোসে অতি দুঃখের সঙ্গে এক সময় বলেছিলেন — 'সুপ্রাচীন বিশ্বাসের মতো আমাদের একটা প্রবচন ছিল — তা হলো 'আমরা আমরাই'। আমাদের শিকড়, আত্মপরিচয় একের সঙ্গে অন্যের সুগভীর সংলগ্নতা — এরকমই তীব্র আর জীবন্ত আত্মীয়তায় গ্রন্থিত ছিলাম আমরা। আর এখন অতি খেদের সঙ্গে তিনি বলেছেন — 'There is no doubt in my mind that we are being bomberded by American television.'

'American news, American everything which is saying loud and clear that there are only winners and losers. The way its going will no longer have a political identity of our own, we'll no longer be we'.

**অলোককুমার ঘোষ**

# ভূমিকা

বেশ কয়েক মাস আগে গিল্টি মেন (Guilty Men) নামে একটি বই বুকষ্টলগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে। এক অর্থে বইটি বেশ নাম করেছিল, কিংবা বলা ভাল দুর্নাম. কারণ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন অপবাদ আর কুৎসায় আকীর্ণ ছিল বইটির পাতার পর পাতা। বাস্তবিকই তারপর থেকে 'গিল্টি মেন' এই শব্দ-বন্ধটি চলিত ইংরাজীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। যুক্তি নির্ভর এবং বিবেচনাপূর্ণ কার্যবিধিতে যাদের এতটুকুও শ্রদ্ধা ছিল তাদের কেউই ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখেন নি। বর্তমান এই বইটির লেখক ক্যাসিয়াস (Cassius) তার পূর্ববর্তী লেখক কেটো (Cato) অর্থাৎ গিল্টি মেন-এর লেখকের সাথে ভিন্নমত এইখানে যে তিনি বিশ্বাস করেন যে বিশ্বযুদ্ধের সূত্র-পাত ঘটাবার অপরাধে যাদেরই অভিযুক্ত করা হোক না কেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার অবশ্যই তাদের থাকা উচিত। মুসোলিনির ক্ষেত্রে এইরকম একটি আশঙ্কা যেন প্রকট উঠেছে যে আকস্মিক কোনো কিছুর প্রকোপে প্রকাশ্য বিচার সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন তিনি। এই বইটি সংকলিত হ'ল কেবল এইটুকু নিশ্চিত করার জন্য যাতে যথাযত বিচার তার হয়। বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্যের বয়ান হিসাবে যা বিবৃত করা হয়েছে সেগুলি যে যথার্থই সত্য অনুসারী তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক সংবাদ-এ। প্রধান চরিত্রগুলি কোনোটিই কল্পিত নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে পরোলকগত ব্যক্তিদেরও যেন সমাধি থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যাতে প্রাসঙ্গিক কোনো সাক্ষ্য বাদ না পড়ে।

বিশেষ কোনো একটি মামলা, তা শুরু হওয়ার আগেই তার বিবরণ লিখতে যাওয়ার কতগুলি অসুবিধা আছে। আইনজীবিদের কাছে তা অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হতে পারে। ঐতিহাসিক সঠিকতা বজায় রাখবার জন্য ক্যাসিয়াসের যে দায়বদ্ধতা তা বিবেচনায় আনলে এই ত্রুটি আশা করা যায় ক্ষমার অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে না।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

ক্যাসিয়াস

CENTRAL LIBRARY

# মুসোলিনির বিচার

## অনুবাদ : সংবর্ত রায়

### প্রথম দিন

**বিচারক :** এই বিচার সভার কার্যক্রম শুরু করবার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমেই আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই এই আদালতের বিশেষ প্রকৃতি, তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব এবং সেই দায়বদ্ধ কর্তব্য সম্পন্ন করার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলি।

এ এক অভিনব মামলা। যতদূর আমি জানি এক নজিরবিহীন ঘটনা, যেখানে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একের পর এক অসংখ্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। বাদীপক্ষের কাছ থেকে তা আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। অবশ্যই ইংল্যাণ্ডের আইনে এ জাতীয় বিচারের বিধি বা দৃষ্টান্ত এমন কিছুই নেই যা কিনা এই বিশেষ মামলায় অনুসরণ করা যেতে পারে। সুতরাং ব্যতিক্রমী এই মামলার জন্য আমাদের একটি বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। সেই বিশেষ পদ্ধতিটির স্বরূপ নির্ধারণের জন্য খানিকটা চেষ্টা আমি নিজেই করব এবং বাকিটুকু নির্ধারিত হবে ঘটনাবলীর অগ্রগতির মধ্য দিয়ে এবং বাদী ও বিবাদী পক্ষের প্রয়োজন অনুসরণ করে।

কি উদ্দেশ্যে এই বিচার সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সে সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই আমি। এক্ষেত্রে সেটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার বিষয়ও বটে। আমি আশা করব যে জুরীবৃন্দ, কাউন্সেল এবং এই আদালত কক্ষের ভিতরে উপস্থিত জনগণ এবং যারা বাইরে আছেন তারাও, সকলেই এই বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা প্রতি মুহূর্তেই মনে রাখবেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করবেন যাতে যথাযথভাবে তা পালন করা যায়।

এই আদালত গঠিত হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে। নিকট অতীতে ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিও ব্রিটিশ সরকারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে যাতে ইটালির সেই সবচেয়ে জঘন্য অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিটির যথপোযুক্ত বিচার নিশ্চিত করা যায়। বারোজন ব্রিটিশ নাগরিককে এই আদালতে জুরী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন এই সরকার। বাদীপক্ষের কাউন্সেল হিসাবে অ্যাটর্নি জেনারেল মহাশয়কে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর উপর নির্দেশ আছে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির বন্দীটির বিরুদ্ধে সমস্ত

অভিযোগগুলিকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করার। আসামীপক্ষের জন্যেও একজন কাউন্সেল নিয়োগ করা হয়েছে যাতে ইচ্ছা করলে বন্দী যথাযথভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ পেতে পারেন।

নিশ্চয়ই আপনারা অনুধাবন করতে পারছেন, যে পরিস্থিতিতে এই বিশেষ বিচার সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা এমনই যে অনুরূপ কোনো মামলায় বন্দীর বদলে কোনো ব্রিটিশ নাগরিক যদি আসামী হতেন তাহলে যে সব আনুকূল্য তিনি দাবী করতে পারতেন তার সবটুকু কিন্তু বন্দীর জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ জনসাধারণের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, এই মামলার বিচার যেন মামলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁরা করে ফেলেছেন। বাস্তবিকই জুরীবৃন্দের কোনো কোনো সভ্য হয়ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ইদানীংকালে বন্দীর সম্পর্কে করা মন্তব্যটি যথারীতি মাথায় রেখেই এখানে হাজির হয়েছেন। তাঁর সেই মন্তব্যে যা তিনি বলেছেন তা আমার মনে হয় তাঁকে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে। নিরপেক্ষ এবং যথাযথ বিচার নিশ্চিত করার পথে অন্তরায় হয়ে অন্তত এই পক্ষপাতমূলক ধারণাটি যে অন্যতম অসুবিধার কারণ হয়ে রয়েছে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যাইহোক, এই অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা অবশ্যই আমরা করব।

আসামীর কাঠগড়ায় যে বন্দীটি আজ দাঁড়িয়ে আছেন, কিছুকাল আগেও তিনি ছিলেন শত্রু-রাষ্ট্রের একজন অবিসংবাদিত নেতা। সাধারণত যুদ্ধের মত ভয়ংকর জ্বলন সৃষ্টিকারী কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পরাজিত রাষ্ট্রের নেতা বা নেতৃবর্গের বিচার, আদৌ যদি তাকে বিচার আখ্যা দেওয়া যায়, তা যখন হয় তখন তা পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত আক্রোশ বা জনরোষের দ্বারা। অন্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার থাকে ভবিষ্যতের উপর। দেখা গেছে যে, মানুষের পক্ষে সম্ভব এমন যতরকম অপরাধ আছে তার কোনোটির ক্ষেত্রেই কোনো একজন মানুষ কখনই এমন অপরাধী বলে বিবেচিত হয় না যাতে তার পক্ষ অবলম্বন করবার জন্য একেবারে কেউ-ই থাকে না। এই কথাটি তাঁদের উপরও প্রযোজ্য যাঁদের লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর বৃহত্তর অংশকে দখল করে নেওয়ার। জুলিয়াস সীজারকে নিন্দা করে অনেকেই কিন্তু তাঁর প্রশংসা করেন আরো অনেক বেশী সংখ্যক লোক। আর, চতুর্দশ লুইসের কথা বলতে গেলে বলতে হয় কদাচিৎ নিন্দিত চরিত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন তিনি। ফ্রেডেরিক দি গ্রেটও বীর হিসাবে খ্যাত হয়েছেন। সে প্রশংসা যার কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন, স্বভাবে

খানিকটা পাগলাটে ধরণের হলেও তিনি একজন বিখ্যাত স্কটবাসী। এমন কি যদি নেপোলিয়ানের কথা ধরা যায়, তাকে নিয়ে বিতর্কের অবসান আজও হ'ল না। কেউ তাকে চিত্রায়িত করেন ফরাসী বিপ্লবের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি হিসাবে। অন্যদিকে কেউ তাকে দেখেন রক্তের তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত আদ্যপ্রান্ত একজন অত্যাচারী হিসাবে।

কাইজার উইলহেমকেও ক্ষমা করবার মতো লোক আছে। অথচ একদিন গোটা ইংল্যাণ্ড তার মুণ্ডু দাবী করেছিল। বিশ বছর পর যখন বার্দ্ধক্যে পৌঁছে একদা সকলের অগোচরে ডুর্ণ অঞ্চলের স্বাস্থ্যনিবাসে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করলেন, তখন পৃথিবীতে কার মনে তাঁর বিরুদ্ধে কতটুকু তিক্ততা অবশিষ্ট ছিল! ততদিনে মানুষ এগিয়ে চলে গেছে অন্যদিকে। ব্যস্ত এই পৃথিবী তাঁর এই উদাহরণ থেকে কিছুই শিখল না। শুধু তাই নয়, যদি সত্যিই তিনি অপরাধী হয়ে থাকেন তাহলে, বলতে হয় পরবর্তীকালে যাঁরা তাঁর সফল অনুকরণকারী তাঁরা কিন্তু তাঁর প্রাপ্ত শাস্তির কথাটা বিবেচনার মধ্যেই আনলেন না।

আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি কেবলমাত্র একজন বিচারক হিসাবেই। তবু এতসব ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর উল্লেখ যে করলাম, আশা করি তার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। এই ট্রায়ালের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য এই উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। জীঘাংসার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কখনই যথার্থ বিচার সম্ভব নয়। কখনও কখনও অবশ্য তেমনটি ছাড়া আর কোনো পথ যে খোলা থাকে না তা সত্যি, বিশেষতঃ স্বৈরাচারী শক্তির তাণ্ডবে বিচার নামক এই প্রক্রিয়াটি যখন সামগ্রিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, এবং প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে সেই বিচার মুক্ত হওয়ার পথ পায় না। এ কথা অনস্বীকার্য যে বন্দুকের গুলি, ছোরা, বোমা প্রভৃতি অনেক স্বৈরাচারীর প্রাণ যেমন নিয়েছে ঠিক তেমনি নিয়েছে আব্রাহাম লিংকন, মাইকেল কলিনস এবং আরো অনেকের, দেশপ্রেমী এবং মুক্তিকামী হিসাবে যাদের খ্যাতি অবিসংবাদিত, তাঁদের প্রাণও।

জনরোষ বা স্বতঃস্ফূর্ত জীঘাংসা যে সব সময়ই যথার্থ বিচার দিতে পারবে এমন কথা ধরে নেওয়া যায় না কখনই। যদিও অনেক সময়ই তার প্রয়োগ হয়েছে বিচক্ষণতার সাথে এবং সঠিকভাবে, যদিও অনেক সময়ই সে জীঘাংসার প্রকাশ ঘটেছে বাস্তবিকই যথার্থ ভয়ংকর এবং জঘন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধেই। তথাপি, প্রায়শই দেখা যায় যে জনতার দেওয়া সে বিচারের সাথে বিচার বিহীন গণহত্যা প্রথার কোনো পার্থক্য থাকে না।

আবার তাই বলে গোটা ব্যাপারটি ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়ও ফেলে রাখা যায় না। আজও যখন সীজার, নেপোলিয়ন এবং ফ্রেডরিককে নিয়ে তাঁদের বাদ প্রতিবাদের নিষ্পত্তি হয়নি তখন আর কখনই এমন আশা আমরা করতে পারিনা যে মুসোলিনির ব্যাপারে তাঁরা কোনোদিন সকলে একমত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট রায় দিতে পারবেন। তাছাড়া সেই ইতিহাসই শ্রেষ্ঠ যা সমকালের কারোর দ্বারা রচিত। মাননীয় জুরীবৃন্দ আপনারাই হলেন সেই মানুষ যাদের অবস্থান এই বর্তমান কালে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পেলেন উজ্জীবিত করবার আশা, দুঃখজনক মোহভঙ্গ এবং যুগসন্ধি কালের ভীতিপ্রদ উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ। আপনারা দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখলেন আপনাদের আয়ুষ্কালের মধ্যে। বিগত বিশ বছর আপনারা এমন এক পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করেছেন যেখানে সেই পর্বে জনমানসে তিনিই ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত্ব, আজ যিনি বন্দী অবস্থায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। সুতরাং অনাগত ভবিষ্যতে পুঁথির মধ্যে ডুবে থাকা সেই সব ঐতিহাসিকদের অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ততার সাথে এই সব ঘটনাবলীর পর্যালোচনা এবং বিচার করতে পারবেন আপনারাই। এই শ্রেষ্ঠতম যুক্তিতেই আজ এখানে সর্বসমক্ষে বেনিটো মুসোলিনির বিচার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যদি মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য হয়, আমরা চাই গোটা পৃথিবীর এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তার প্রতি ভাগ্যের এই নির্দেশ যেন বিশ্বাসযোগ্যতা পায়। তার অপরাধের যথার্থ প্রকৃতি আমরা নির্ধারণ করতে চাই। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সমস্ত সুযোগও আমরা তাকে দিতে চাই।

এই লণ্ডন শহর ছাড়া এমন জায়গা আর কোথাও নেই, যেখানে এর থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ বিচার কেউ আশা করতে পারে। জনগণের চোখে যারা বীর বা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের যারা প্রিয়জন, এমন অনেকেরই বিচার হয়েছে এই আদালতে এবং তাদের অনেকেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বিচার শেষে। অন্যদিকে এই হচ্ছে সেই আদালত কক্ষ যেখানে অনেক দুস্থ, নির্বান্ধব এবং তাড়া খাওয়া লোক নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন বিচারে এবং মুক্তি পেয়েছেন অবশেষে। কখনও কখনও অবশ্য এমন হয়েছে যখন নিরপেক্ষ এবং নির্মোহ বিচারের এই উচ্চতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি কিন্তু এই বিশেষ মামলাটিতে সেই চ্যুতি কখনই ঘটতে পারবে না। আমি আশা করব আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস সেই উৎকর্ষতা নিশ্চিত করবার অভিমুখে চালিত হবে কারণ যদি আমরা কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান এই বন্দীকে যথার্থ বিচার দিতে পারি তাহলে এই

পৃথিবীতে জনগণের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে আমরা অবদান রেখে যেতে পারব।

সুতরাং এই হল আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের পদ্ধতিটি হবে সরল। উভয়পক্ষের কাউন্সেলকেই আমরা অনুমতি দেব প্রয়োজন সাপেক্ষে যে কোনো পর্যায়ক্রমে সাক্ষীদের ডাকবার। প্রধান সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই আজ আর পৃথিবীতে নেই কিন্তু তাদের সাক্ষ্য সকলেই জানেন এবং তা প্রকাশিতও বটে। ফলশ্রুতির নিরিখে তাঁদেরকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডেকে আনা যেতে পারে। এ ছাড়া অন্যত্র আমরা ঘটনাক্রমের দ্বারা পরিচালিত হব।

আদালতের ক্লার্ক এখন অভিযোগগুলি পড়ে শোনাবেন। তারপর বাদীপক্ষের তরফে অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় মামলাটির উপস্থাপন করবেন।

ক্লার্ক ঃ বেনিটো মুসোলিনি, এই বিশেষ আদালতে আপনি মানবজাতির প্রধান শত্রু এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধনকারী যুদ্ধের জন্য দায়ি প্রধান অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত। যে বিশেষ বিশেষ অপরাধের অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেগুলি হ'ল — আপনি নির্মম এবং নিষ্ঠুর-ভাবে পার্লিয়ামেণ্টকে শেষ করে, বিরুদ্ধপন্থীদের খতম করে এবং ইটালির সমস্ত মুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্বাসিত করে ইটালির ফ্যাসিস্ত ডিকটেটর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনি ক্রমাগত এবং ক্রমবর্ধমান হারে সেই সব আন্তর্জাতিক নীতিগুলি ক্রমান্বয়ে লঙ্ঘন করে গেছেন যেগুলি অনতিদূর অতীতে একসময় আপনার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়েছিল। আপনি সেইসব আন্তর্জাতিক দায়-বদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করে চরম বিশ্বাসঘাতকতার সাথে ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা আবারও লঙ্ঘিত হ'ল যখন আপনি স্পেনের উপর আক্রমণ হানলেন একের পর এক ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে। বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন রাখলেন আরো, যখন নাৎসী-জার্মানীর সাথে আপনি সন্ধি স্থাপন করলেন ১৯৩৬ সালে এবং সেই অনুসারে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন মুক্ত পৃথিবীর পক্ষে ক্ষতিকারক জার্মানীর আকাশচুম্বী উচ্চাশাকে বাস্তবায়িত করে তুলতে। বিশ্বাসঘাতকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছুল যখন ১৯৪০ সালে পিছন থেকে ছুরি বসিয়ে দিলেন ফ্রান্সের পিঠে, যুদ্ধ ঘোষণা করলেন গ্রীসের বিরুদ্ধে, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাদের সাথে একদা অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন আপনি। সংক্ষেপে সমস্ত জীবনব্যাপী আপনার সমস্ত কর্মক্ষমতা এবং ইটালির সমস্ত সম্পদ যা আপনার হস্তগত হয়েছিল, তা আপনি ব্যয় করেছেন ভয়ংকর ধ্বংস সাধনের জন্য এবং আপনার স্বজাতির মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য।

বেনিটো মুসোলিনি আপনি কি আপনার এই সব অপরাধ স্বীকার করেন ?

**বেনিটো মুসোলিনি :** আমি নির্দোষ

[ জুরীবৃন্দকে শপথ পাঠ করান হ'ল ]

**অ্যাটর্নী জেনারেল :** মহামান্য আদালত, মাননীয় জুরীবৃন্দ, আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত নজিরবিহীন এই অভিযোগ-গুলিকে প্রমাণ করবার জন্য।

কিভাবে এই মামলার বিচারকার্য চলবে সে সম্বন্ধে ধর্মাবতার যে উপদেশ দিয়েছেন আমি তা সাগ্রহে এবং মনযোগের সাথে শুনেছি। এই সব নির্দেশ যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় এবং নিরপেক্ষ ও প্রভাব মুক্তভাবে বিচারকার্য যাতে চলতে পারে তার জন্য আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিশ্চয় থাকবে। আমি যথার্থই অনুধাবন করতে পারি কেন বন্দী দোষী প্রমাণিত হতে বাধ্য। বিচারকার্য যেমন উচিত খোলামেলা হওয়া, আমি মনে করি, তেমনি তা সংক্ষিপ্ত হওয়াও উচিত। আমরা চাই বাহুল্য বর্জন করতে, যাতে অকারণ আইনী মারপ্যাঁচ বা সূক্ষ্মতর বিতর্ক অপ্রয়োজনীয় কালক্ষয় এড়িয়ে যাওয়া যায়। সাক্ষ্য, যা প্রমাণিত তথ্য, তা সকলেরই জানা। বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য তাই আমি বেশী সংখ্যক সাক্ষীকে ডাকবার প্রস্তাব রাখব না। আমি প্রস্তাব করব এমন কয়েকটি প্রামাণিক তথ্য বা দলিলের উপর নির্ভর করতে যার সত্যতা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

সুতরাং অনতিবিলম্বে মনযোগ দেওয়া যাক অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত অপরাধ-গুলির বিবরণে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হ'ল এই যে ইটালিতে নিজেকে ফ্যাসিস্ত একনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে যে পথের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন তা নির্মমতায় এবং নিষ্ঠুরতায় নজিরবিহীন। আমার মনে হয় না বন্দী বা তাঁর কাউন্সেলও তা অস্বীকার করতে পারবেন। ১৯২২ সালে বেনিটো মুসোলিনির ডাক পড়ে রোমে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবার জন্য। ধরে নেওয়া যেতে পারে সংবিধান মতোই তার নিয়োগ হয়েছিল এবং ফ্যাসিস্ত মনভাবাপন্ন নয় এমন অনেকেই সেই মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এটা সত্যি পার্লামেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করবার কোনো অভিপ্রায় যে তাঁর ছিল না তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। যাইহোক, পরবর্তীকালে অতিদ্রুত প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে অন্যান্য বাগাড়ম্বরের মত এই ঘোষণাটিও অর্থহীন। অনতি-

বিলম্বেই তিনি পার্লামেণ্টকে সতর্ক করে দিলেন তার কর্তৃত্বের এই ঘোষিত স্বরূপের অস্থায়ীত্ব সম্পর্ক। একটি পাল্টা সংগঠন তিনি তৈরী করলেন যার নাম "ফ্যাসিস্ত গ্রাণ্ড কাউন্সিল"। যথার্থ ক্ষমতা, যতখানি তা তিনি নিজে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন তার বাইরে বাকি যতটুকু ছিল, তা ছিল এই সংগঠনটির হাতে। জুরীবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে এইটিই সেই সংগঠন, ভোট দানে যার বিরুদ্ধাচরণের ফলেই ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে পতন ঘটেছিল বন্দীর। এই কাউন্সিলের গঠন এবং পরিশেষে বন্দীর ক্ষমতা থেকে অপসারণ-এর মধ্যবর্তী সময়ে, যতটুকু জানতে পারা গেছে, কেবলমাত্র এই ডিক্টেটরটির স্বেচ্ছাচারিতার প্রয়োজনে 'রাবার স্ট্যাম্প' হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া আর কোনো কার্য্যকলাপের প্রমাণ কাগজ-পত্রে নেই। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে বন্দীর পতনের সেই দিনটির আগে পর্যন্ত বাইরের পৃথিবীতে কেউ জানতেই পারে নি এই কাউন্সিলের সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতমভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিতর্ক, ভোট প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির অসারতা এবং বাহ্যাড়ম্বর। সুতরাং, বছরের পর বছর ধরে যে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছিল তা বোঝাবার জন্য আর কোনো উদাহরণের উল্লেখের দরকার পড়ে না এরপর।

যাইহোক, আলোচনার প্রথম পর্যায়ে নিবদ্ধ থাকবার উদ্দেশ্যে আরো কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব আমি। জুরীবৃন্দ হয়ত শুনে অবাক হবেন যে, ১৯২৪ সালে ইটালিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এ তথ্য আমার বক্তব্যকে অপ্রমাণ করছে। কিন্তু সন্দেহ বা সংশয়ের সে সম্ভাবনা অমূলক। বন্দী যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে সাবধানতা অবলম্বন করলেন নতুন এক নির্বাচন সংক্রান্ত আইন চাপিয়ে দিয়ে। তা হ'ল নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যায় যে দল গরিষ্ঠ হবে নবগঠিত চেম্বারে (chember)-র সভ্যপদের অন্তত দুই তৃতীয়াংশ তাদের অধিকারে থাকবে। বলা বাহুল্য যে, সংখ্যালঘুদের সমস্ত মতামত যাতে ফ্যাসিস্তবাহিনী পদদলিত করে দিতে পারে তার জন্যই এই সহজ কৌশলের আশ্রয়। অবশ্য কেবলমাত্র এই একটি ব্যবস্থার উপর বন্দী কখনই পুরোপুরি নির্ভর করেন নি। সে সময় ইটালিতে নির্বাচন মানে চরম বিশৃঙ্খলা এবং হিংসাত্মক ঘটনা। ট্রেনিং প্রাপ্ত গুণ্ডা বদমায়েশদের পাঠান হ'ত বুথগুলির প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দিয়ে। এই কৌশলের সফলতার ফলে মূলতঃ ফ্যাসিস্ত আধিপত্যাধীন একটি পার্লামেণ্ট গঠিত হতে পেরেছিল।

এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বর তখনও টিঁকে ছিল। সমাজবাদী

নেতা মেট্টিওটি ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম একজন। ১৯২৪ সালের ৩০শে মে' তারিখে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক পদ্ধতি অবলম্বনের অভি-যোগ আনলেন। বন্দী নিজেই দায়িত্ব নিলেন উত্তর দেওয়ার। তিনি পরোয়ানাজারী করলেন, তার স্বভাবের অনুগত যে উগ্রতার প্রকাশ ঘটালেন তাতে তা আর বক্তব্যের পদবাচ্য না থেকে হুঁশিয়ারিটি বোঝায়. যে কয়জন সংখ্যালঘিষ্ঠ M.P. এখনও রয়েছেন তাঁরা যদি সরকারের সাথে সহযোগিতা না করেন তবে তাঁদেরকে একেবারে শেষ করে দেওয়া হবে। অতঃপর মেট্টিওটিকে তাঁর সেই বক্তৃতা দেওয়ার দিন তিনেক পরে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যেতে দেখা গেল এবং একই পরিণতি ঘটল অন্যান্য আরো অনেকের যারা সেই শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এইভাবে ১৯২৪ সালের শেষভাগে পৌছাবার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বন্দীর নিরঙ্কুশ একনায়কতন্ত্র। সামান্য-তম গোপনীয়তার আড়ালও যেহেতু ছিল না তাই তা সকলেরই জানা। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমার সওয়াল দীর্ঘায়িত করার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কেবল-মাত্র বন্দীর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উক্তি, যা প্রামাণ্য নথি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তা মাননীয় জুরীবৃন্দের কাছে উল্লেখ করে অভিযোগের প্রথম অপরাধ সংক্রান্ত আলোচনা এখানেই শেষ করব। ১৯২৪ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে বন্দী বলেন "যা কিছু ঘটেছে তার নৈতিক, রাজনৈতিক এবং ঐতি-হাসিক সমস্ত দায়িত্ব কেবল আমার একার"। এরপর থেকে ১৯২৫ সালের ১৫ই মে তারিখের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে এই তত্ত্ব আরো সুস্পষ্ট অবয়ব পেল যখন তিনি বললেন "নির্বিশেষে সকলকেই সর্বময় কর্তৃত্বের (chief) ইচ্ছার কাছে অধিনত হতে হবে"। জুরীগণ, সে ডিউস আজ এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত। তাকে আপনারা অভ্যর্থনা জানান। যদিও তারপর অনেকগুলি দিন পার হয়ে গেছে। তবু মনে হয় না ইতিমধ্যে এই বিশেষ পদবিতে তার আপত্তির কোনো কারণ ঘটেছে।

এবার আমরা আসব তার বিরুদ্ধে আনীত দ্বিতীয় অভিযোগে। একের পর এক অসংখ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি-ভঙ্গ এবং সংশ্লিষ্ট নৈতিক দায়িত্বের অস্বীকৃতির ঘটনা নিয়ে বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত দ্বিতীয় অভিযোগ। উদাহরণ এত অসংখ্য যে বুঝতে পারছি না কেমন করে শুরু করব আলোচনা। যাইহোক, এই সাথে যদি চরম বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন সেই আবিসিনিয়া আক্রমণের বিষয়টিরও উল্লেখ করি তাহলে হয়ত আদালতের সময়ের সাশ্রয় হবে খানিকটা।

তারিখ ২রা অক্টোবর। ১৯৩৫ সাল। ইটালির সৈন্যবাহিনী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। অনতিবিলম্বে, ফ্যাসিস্ত জেনারেল হিসাবে যাঁর পরিচিতি আরো অনেক বেশী, তার অপসারণের পর আবিসিনিয়া অভিযানের সফলতা চিহ্নিত হ'ল ৫ই মে, ১৯৩৬ তারিখে আদিস আবাবা দখলের মাধ্যমে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যে আমাদের অভিযোগে কেন এই আক্রমণের ঘটনাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে? অন্যভাষায় প্রশ্নটি এইরকম দাঁড়ায় যে এমন কোন কোন নৈতিক দায়িত্ব তিনি একদা পালন করবার অঙ্গীকার করে পরবর্তী কালে তা অমান্য করে তার চরম অমর্যাদা করেছিলেন বিজয়লাভের তথা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য? কেবলমাত্র ছোট্ট একটি তালিকা আমি পেশ করব জুরীবৃন্দের সুবিধার্থে, যা দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আলোচনায় অনুরূপ প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

১. 'কভেন্যাণ্ট অব লীগ' নামক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল ইটালি, এবং তারপর কখনই বন্দী সেই চুক্তির শর্তের সাথে সহমত হতে অসীকৃতি জানান নি বা নিজের স্বাক্ষর ফিরিয়ে নেন নি। সুতরাং তিনি তার শপথ অনুযায়ী বাধ্য ছিলেন "যে কোন বিবাদ যা কিনা রাজনৈতিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে" সেগুলিকে সালিশির জন্য পাঠাতে।

২. বন্দী নিজে ১৯২৮ সালে 'কেলগ চুক্তি' (Kellog Paco)-তে স্বাক্ষর করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি "যুদ্ধকে জাতীয় নীতি স্থির করার থপ" হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ পথ অনুসরণ করার শর্ত মেনে নিয়েছিলেন।

৩. বন্দী ১৯২৩ সালে আবিসিনিয়াকে লীগের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং আবিসিনিয়া যাতে কখনও আগ্রাসনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করবার ব্যাপারে বন্দীর দায়বদ্ধতা ছিল দ্বিবিধ।

৪. ১৯২৮ সালের ২রা আগস্ট আবিসিনিয়ার রাষ্ট্র প্রধানের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন বন্দী। স্থায়ী শান্তি এবং অটুট বন্ধুত্বের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিতে তারা আবদ্ধ হয়েছিলেন এই চুক্তি অনুযায়ী। যে কোনো বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য "যুদ্ধের পথ অবলম্বন না করে" সালিশির জন্য পাঠাবার কথা।

৫. নিকট অতীতে ১৯৩২ সালের ১১ই মার্চ যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় লীগ অব অ্যাসেমব্লীতে এবং ১৯৩৩ সালের ২৪-শে ফেব্রুয়ারি যার পুনর্নবীকরণ হয়, বন্দী ছিলেন সেই সভায় অংশগ্রহণকারী অন্যতম একজন সভ্য। সেই সিদ্ধান্তের

ভাষ্য ছিল এই রকম "লীগ-অব-নেশনসের" সকল সদস্যের উপরই এই দায়বদ্ধতা থাকল যে লীগ-অব-নেশনস অথবা প্যারিস প্যাক্টের শর্তের বিরোধী কোনো চুক্তি বা রফা বা তদ্‌জ্ঞানিত কোনো ফলশ্রুতিকে কখনই তাঁরা স্বীকৃতি জানাবেন না।

৬. বন্দী ছিলেন তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যখন ইটালি-সরকার পর্যায়ক্রমে প্রথমবার ১৯৩৪ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর এবং পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালের ১৮ই এপ্রিল যুদ্ধের আশ্রয় নেওয়ার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এবং ১৯২৮ সালের স্বাক্ষরিত চুক্তির বৈধতায় পুনরায় আস্থা জ্ঞাপন করে আশ্বাস বাণী শুনিয়েছিলেন।

মাননীয় জুরীবৃন্দ, আশা করব আপনারা আমাকে এই একই জাতীয় ঘটনার বারবার উল্লেখের একঘেঁয়েমী থেকে মুক্তি দেবেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ যুদ্ধের দৃষ্টান্ত এইটিই যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। বিষাক্ত গ্যাস এবং চরম ধ্বংস সৃষ্টিকারী অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল এই যুদ্ধে। যদি জঘন্য অপরাধগুলিরও পুনরায় শ্রেণী বিভাগ সম্ভব হয় তাহলে কুখ্যাতির শীর্ষে থাকবে সেই কপটতা, সেই মিথ্যাচারের ঘটনা, যে আগ্রাসনের অব্যহিত পূর্বে বন্দীর নির্দেশে নিরাপত্তায় আশ্বস্ত করে ভরসা দেওয়া হ'ল।

ভদ্র মহোদয়গণ, এবার একটু তাড়াতাড়ি এগোব। আমরা কেবল বন্দীর অপরাধের প্রকৃতি নিয়েই চিন্তিত নই। সেই অপরাধের মাত্রা এবং তার ভয়াবহ পরিণাম যার শিকার শেষ পর্যন্ত সকল দেশের সকল মানুষই, সে-গুলিও আমাদের বিচার্য। একের পর এক সমস্ত ঘটনাগুলির একই রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার হয়ত দরকার নেই। কেবলমাত্র তার সাধারণ ফলশ্রুতি এবং যে কপটতার আশ্রয় নিয়ে সেগুলো সম্পাদিত হয়েছিল সেটুকু তুলে ধরলেই হয়ত যথেষ্ট হবে।

তখন সবেমাত্র বন্দী তার সদ্য দখলীকৃত দেশের সম্রাট হিসাবে ইটালির রাজাকে নিযুক্ত করেছেন, নতুনতর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার পথ খুলে গেল তাঁর সামনে। ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে বন্দীর সাথে রোমে সাক্ষাৎ করতে এলেন স্পেনের এমন কয়েকজন রাজতন্ত্রবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা তাঁদের দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে আশঙ্কিত। তাঁদের এই আশঙ্কা বা ভীতির ব্যাপারে কৌতুহল ছিল বন্দীর। সে কৌতুহল ছিল আরো বেশী এই কারণে যে মেডিটারেনিয়ানের আরো একটি অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার

করার সম্ভাবনা যেন দেখতে পাওয়া গেল তার মধ্যে। প্রথমে কথাবার্তা, দর কষাকষি চলল কিছুদিন। তারপর দেখা গেল ইটালিকে স্পেনের সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যে যুদ্ধ চলেছিল ১৯৩৬ এর শুরু থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি এবং চরম এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল স্পেনকে।

আরো একবার বলি, আমার মনে হয় না বিবাদীপক্ষ জুরীবৃন্দের নির্দেশে উপস্থিত করা যেত বিশেষ সেই প্রামাণ্য বিবরণ। তা হ'ল এই যে, ব্রিটিশ যুদ্ধ শিবিরে নিকট অতীতে ইটালির বন্দী সৈন্যদের প্রথাগতভাবে এক সঙ্গে হাজির করা হয়েছিল। তখন সকলের চোখে পড়েছিল — স্পেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ফলে তাঁদের যার যেমন পদোন্নতি হয়েছিল সেই মর্যাদা সূচক ব্যাজ প্রভৃতি তাঁরা তখনও ব্যবহার করে চলেছে। যে অভিযোগের বর্ণনা আমি দিলাম, তাঁরা কেউই সে অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করে নি। ব্রিটেনের সাথে ১৯৩৮-এ স্থাপিত চুক্তি অনুযায়ী বন্দী রাজী হয়েছিলেন স্পেন থেকে তাঁর দশ হাজার জন তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবকদের তুলে নিতে, স্পেনের মাটিতে যাঁদের উপস্থিতি একসময় তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

অভিযোগের এই অংশটি শেষ করবার জন্য কেবল আর একটি কথা বলা বাকি আছে। কথাটি আগেও বলা হয়েছে বিশদভাবে তবু আর একবার বন্দী কর্তৃক একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ঘটনাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমি পেশ করব যার মধ্য দিয়ে বন্দীর বিশ্বাসঘাতক-প্রকৃতির নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'নন-ইণ্টারভেনশন কমিটি'র মিটিং-এ ইটালির বিরুদ্ধে আনীত স্পেনে অস্ত্র এবং সৈন্যবাহিনী পাঠানোর অভিযোগের উত্তরে ইটালির প্রতিনিধি বললেন "এই অভিযোগগুলি সমস্তই কষ্টকল্পিত এবং ভিত্তিহীন"। পরের বছর জানুয়ারি মাসে বন্দী ব্রিটিশ সরকারের সাথে ভদ্রলোকের চুক্তি করলেন এই নিশ্চয়তা দিয়ে যে অতঃপর মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে। ব্রিটিশ বিদেশ সচিব, মিঃ ইডেন বললেন — "অ্যাঙ্গলো-ইটালিয়ান সেই ঘোষিত চুক্তিতে না ছিল এমন কোনো একটা শব্দ, না ছিল কোথাও এমন কমা বা সেমিকোলোনের ব্যবহার যাতে ব্যাখ্যার হেরফের ঘটিয়ে কোনো বিদেশীশক্তি এতটুকুও অধিকার পেতে পারে স্পেন-এর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবার, তা সে যে রকমেরই সরকার সেখানে থাকুক না কেন।" পরিশেষে ১৯৩৮ সালের ১৬ই এপ্রিল আর একটি অ্যাঙ্গলো-ইটালিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল যার মধ্য দিয়ে ১৯৩৭ সালের সেই ভদ্রলোকের চুক্তির শর্তগুলিতে পুনরায় নিশ্চয়তা দেওয়া

হ'ল। কিন্তু তারপর স্পেনে একের পর এক ইটালির হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে গেল এই সমস্ত অঙ্গীকারগুলিকে অগ্রাহ্য বা অবমাননা করে। যে তালিকা এখানে পেশ করলাম তা হয়ত ঠিক ততখানি বিশাল নয়, যতখানি বিশাল সংখ্যায় তেমন চুক্তিভঙ্গের ঘটনা আবিসিনিয়ার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। কিন্তু সে যাইহোক, বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ প্রমাণ করার পক্ষে এই কয়টি উদাহরণই যথেষ্ট।

আমরা এবার অভিযোগের শেষ পর্য্যায়ে পৌঁছুব। আমাকে ক্ষমা করা হোক। কেন না সেগুলিকে আমি সাধ্যমত সংক্ষেপে পেশ করব। বিশ্বাস-ঘাতকতার মত গুরুতর অপরাধেরও বারবার উল্লেখ হয়ত ক্লান্ত করতে পারে। কখনও কখনও একই অপরাধের পুনরুল্লেখে এক ঘেঁয়েমি আসতে পারে। বাস্তবে শেষের বছরগুলিতে ঘটনাপ্রবহ চলেছিল খানিকটা অন্যপথে। যে বিশেষ উচ্চাশাগুলি ছিল একান্তভাবেই বন্দীর নিজের, সেগুলি একীভূত হয়েছিল তার দেশবাসীর এবং পরবর্তীকালে বার্লিনস্থিত তার সেই প্রভুটির অপ্রতিরোধ্য উচ্চাশার সাথে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর-মাসে বন্দী জার্মানীর নাৎসী শাসকদের সাথে এণ্টি-কোমিণ্টার্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে জার্মানীর অস্ট্রিয়া-আক্রমণ যখন তিনি মেনে নিলেন তখন তার নামের পাশে বিশ্বাসঘাতকতার আরো একটি অভিযোগ যুক্ত হ'ল। কারণ বিগত বছরগুলিতে বহুবার তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে প্রয়োজনে ইটালির শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত দিয়ে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আলবেনিয়া আক্রমণ করলেন। চুক্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটল আবার। অবমাননা করা হ'ল আলবেনিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত তার বিশেষ অনাক্রমণ চুক্তির এবং মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার শর্তে ব্রিটেনের সাথে স্বাক্ষরিত নানান চুক্তির।

এহ বাহ্য। এগুলি এমন সব অপরাধের বর্ণনা, বন্দীর দ্বারা সংগঠিত অন্যান্য অপরাধের জঘন্যতার তুলনায় যা নেহাৎ তুচ্ছ। এগুলিকে বরং সেই চরম জঘন্যতম অপরাধের প্রস্তুতি হিসাবে দেখা যেতে পারে। বন্দী অপেক্ষা করে থাকলেন ততদিন পর্যন্ত যতক্ষণ না ফ্রান্স ভেঙে পড়ে। চোখে দেখলেন ফ্রান্সকে চরম বিপর্যস্ত হতে। তবু পদাঘাত করতে দ্বিধাবোধ করলেন না এতটুকু। কারণ তিনি আশায় ছিলেন যে, এমন দূর্বল মুহূর্তে সামান্যতম আঘাতেও অনেককিছু আদায় করে নেওয়া যেতে পারে। না ছিল কোনো প্রাক-সতর্কীকরণ, না দেখান হ'ল কোনো কারণ, হুকুম দিয়ে দেওয়া হ'ল ইটালির সৈন্য-

বাহিনীকে ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ার, দখল করার, অবরুদ্ধ করে রাখার এবং ইচ্ছামত অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যাওয়ার। বিচারাধীন এই বন্দীর লজ্জাজনক ইতিহাসে এইটিই সবচেয়ে বড় লজ্জার ঘটনা। নতুন করে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করার কোনো দরকার নেই, সে সময়কার লোকজন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সে সবের জীবন্ত সাক্ষ্য। আকস্মিক এবং ভয়ংকর আগ্রাসণের এমন দ্বিতীয় কোনো নজির দুরাচারের দীর্ঘ ইতিহাসে আর নেই। কিন্তু তবু বন্দী যেন স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন এমন কুখ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গিয়ে অধিকতর কোনো কুখ্যাতির সাথে নিজেকে যুক্ত করার। বিনা অজুহাতে এবং কোনোরকম সতর্কীকরণ ঘোষণা ছাড়াই সমস্তরকম চুক্তি ভঙ্গ করে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন ছোট্ট এক দেশ গ্রীসকে আক্রমণ করতে। এবং সেটা ঠিক এমন এক সময় যখন সে দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে তার নিজের দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের আলোচনা চলছিল। অথচ গ্রীস সে সময় ছিল এমন একটা দেশ যে না কোনোকালে বন্দীর প্রতি, না অন্য কারুর প্রতি বা কোনো দেশের প্রতি এতটুকু কোনো অন্যায় করেছে। বন্দীর অভিপ্রায় ছিল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে এই প্রাচীন রাষ্ট্র গ্রীসকে বরাবরের জন্য মুছে ফেলে তাকে আলবেনিয়া এবং ইথিওপিয়ার সাথে মিশিয়ে দেওয়া।

আমার শেষ সাক্ষী হিসাবে মিঃ উইনস্টন চার্চিল ছাড়া অধিকতর যোগ্য আর কারুর নাম আমি প্রস্তাব করতে পারছি না। ১৯৪০ সালের ২৪-শে ডিসেম্বর বক্তব্য রাখবার কালে তিনি বলেন — 'একজন মানুষ, কেবল একজন মানুষ একাই সমগ্র ইটালির জনগণকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে এবং ইটালিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি এবং বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে'।

এইটি নথিভুক্ত তথ্য, যা প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত, এবং যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মাননীয় জুরীবৃন্দ, আজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ঐ করুণাপ্রার্থী এবং হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে দেখলে একথা কল্পনায়ও আনা যায় না যে এই মানুষটিই এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টিকর্তা। আপনাদের হয়ত মনে হতে পারে যে, এই আদালত কক্ষে এসে পৌছুবার আগে এঁর উপর সেই অত্যাচারগুলো অবশ্যই করা হয়েছে যা ফ্যাসিস্ত বিচার পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি তেমনটি কখনই হয়নি। অবশ্য তাঁর উপর সেটা না করার পেছনে অন্য একটি কারণ আছে। আমরা তার ভেতর থেকে ভীত সত্ত্বাটাকে খুঁজে বার করে আনতে চাই। যে সৈন্যবাহিনী একদা তাঁর নেতৃত্বাধীন ছিল আজ তা বিচ্ছিন্ন। যে জনগণ তাঁর অনুগত ছিল আজ তাঁদের

মোহমুক্তি ঘটেছে, যে জাতির তিনি ছিলেন একমেবম্ দ্বিতীয় নেতা আজ তা ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। রোমে এবং মিলান শহরে আজ তিনি তেমনই নিন্দিত যেমন ছিলেন একদা এথেন্সে এবং আদ্দিস আবাবাতে। নিঃসন্দেহে ডিউস আজকে অতুলনীয় অবমাননায় বিবশ। কিন্তু কেবল সেই কারণেই তার চোখে এতটা ভীতি ফুটে ওঠেনি। আসলে তিনি জানেন যে সত্যিই তিনি অপরাধী। তিনি জানেন আদালতের বিচারের খড়্গ তার উপর নেমে আসবে। জুরীবৃন্দের কাছে আমার আবেদন যে অকারণে সওয়াল-জবাবের প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত না করে আপনারা সেই বিচার তরান্বিত করুন। আমি অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের বিচারের রায় দেওয়ার সময় আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন বুদ্ধ ইটালির কথা, খুন হয়ে যাওয়া আবিসিনিয়ার কথা। মনে রাখবেন হত দরিদ্র হয়ে পড়া স্পেনের কথা, লুণ্ঠিত আলবেনিয়া, অপমানিত ফ্রান্স এবং ক্ষুধার্ত গ্রীসের কথা। আমি জানি, — কৃত এইসব অপরাধের যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করার অনুরোধ করা যায় না, কারণ চরম ভয়ংকর শাস্তিও সে সব অপরাধের তুলনায় সামান্য। তাই আমি বলব যে, যে মৃত্যুদণ্ড তাকে দিতেই হবে তা যদি তেমন ভয়াবহ রকমের যন্ত্রণাদায়ক নাও করা যায়, অন্তত দ্রুত যেন করা যায় সেই শাস্তিবিধান। মাননীয় জুরীবৃন্দ, আমি মনে করি আমার এ প্রস্তাব আপনাদের সমর্থন পাবে। রাজ-সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমি যেন বিবাদীপক্ষের কাউন্সেলের কাছে আবেদন করি যাতে অর্থহীন বাদবিতণ্ডায় অকারণ কালক্ষেপ না হয়। মাননীয় বিচারক মহাশয়ের কাছে আমি আমার মতামত পেশ করছি এই যে এই মামলার অভিযোগগুলি ইতোমধ্যে কোনো সংশয়ের অবকাশ না রেখেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং একদা যেমন নিষ্করুণ এবং নিষ্কম্প এই বন্দীর হাত থেকে চরম অবিচার নেমে এসেছিল দুর্বল, প্রতিরোধহীন এবং নির্বিরোধীদের উপর, ঠিক সেই ভাবেই যেন আজ বিচার নেমে আসে তার উপর, অন্য কোনো বিবেচনায় যেন তা এতটুকু নরম না হয়।

**বিচারক :** এই আদালতের কাজ আজকের মত স্থগিত রাখা হ'ল। আবার তা শুরু হবে আগামীকাল।

## দ্বিতীয় দিন

**বিচারক :** আমি নিশ্চিত যে এই মামলায় বাদীপক্ষের তরফে অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের প্রাঞ্জল বিবরণের জন্য আদালত কৃতজ্ঞ থাকবে তাঁর কাছে। মানতেই হবে যে তার বক্তব্যের পক্ষে তিনি অত্যন্ত সবল যুক্তির অবতারণা

CENTRAL LIBRARY

করেছেন। যাইহোক, তার শেষ আবেদনটি মঞ্জুর করার ক্ষমতা আমার নেই যদি না বিবাদীপক্ষ নিজের ইচ্ছেতেই এক্ষেত্রে সরে দাঁড়ায়। হয়ত বন্দী আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকতে পারেন অথবা. যেহেতু তিনি এই মামলায় তার স্বপক্ষে অন্য আর কোনোদিকে আলোকপাত করবার মতন অবস্থায় নেই. সুতরাং তার পক্ষের কাউন্সেল হয়ত তার হয়ে বাদীপক্ষের প্রস্তাবকে যথাযথ বলে মেনে নিতে পারেন। যাইহোক. বিষয়টি আমি বিবাদীপক্ষের কাউন্সেলের হাতে ছেড়ে দিলাম।

**কাউন্সেল** ঃ মহামান্য আদালত. মাননীয় জুরীবৃন্দ. যে গুরুভার আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই আমি এই আদালতে বক্তব্য পেশ করতে উঠেছি। সন্দেহ নেই যে মাননীয় বিচারকের এ হেন উপদেশ যদি আমি মেনে নিই. তবুও আমার খ্যাতিতে এতটুকু দাগ লাগবে না। এরপর যথারীতি জুরীবৃন্দ তাদের রায় পেশ করবেন। আদালতের দায়িত্বভার যাবে শেষ হয়ে। গোটা পৃথিবীই সংশয়হীনভাবে বিশ্বাস করবে এ কথা যে. যথার্থই বিচার হয়েছে বন্দীর। ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার যথার্থতা প্রমাণ হওয়া এতটুকু আটকাত না তাতে। আগামী দিনের মানুষেরা ভেবে অবাক হত শুধু যে. আদালত বন্দীর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সওয়াল জবাবের অনুমোদন দিয়েছে কতই না উদার হস্তে। তবু যখন নীরব ছিলেন তিনি তখন সে নীরবতাকেই তার দোষের স্বীকারোক্তি তথা প্রমাণ বলে ধরে নিতেন তাঁরা।

কিন্তু আমার বিবেক তা অনুমোদন করছে না। সুতরাং এতদসত্ত্বেও আমি সেই সুযোগটিই গ্রহণ করব যে মহার্ঘ সুযোগ মহামান্য বিচারক তার প্রারম্ভিক ভাষণেই মঞ্জুর করেছেন। আমি আদালতের কাছে আবেদন রাখব আমার দীর্ঘ সওয়াল এবং ব্যাখ্যা সানুগ্রহে অনুসরণ করবেন। মহামান্য বিচারপতি, আপনি যথার্থই বলেছেন এটি একটি অভিনব মামলা ; যেখানে ঘটনার প্রতিপাদন করা বা তদানুসারে আইন প্রয়োগ করাটা লক্ষ্য নয়। এই মামলার প্রধান বিচার্য বিষয় হ'ল রাজনৈতিক নৈতিকতা। আশা করি. এই আদালতে আমি প্রমাণ করতে পারব যে রাজনৈতিক নৈতিকতার সাথে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক মতবাদের প্রশ্ন। রাজনৈতিক স্বার্থের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক মতবাদও পাল্টায়। ঠিক এই কারণেই সন্দেহ জাগে যে, এ জাতীয় প্রশ্ন যথার্থই কোনো আইনের আদালতের বিচার্য বিষয় হতে পারে কিনা!

অনুমান করতে পারছি আমার প্রতি আদালতের বিরূপ ধারণাকে সাথে নিয়ে আমি শুরু করছি। সুতরাং, আদালতের কাছে আমি আবেদন রাখব

অনুগ্রহ করে ধৈর্য রক্ষা করবার। আমি প্রার্থনা করব যেন আমাকে সুযোগ দেওয়া হয় অভিযোগের প্রতিটি অংশকে একের পর এক আলোচনায় আনবার এবং তার মাঝখানে মাঝখানে সাক্ষীদের ডেকে এনে এবং কখনও কখনও পুনরায় তাঁদের ডেকে আমার যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করবার।

বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত প্রথম মারাত্মক অভিযোগটি হ'ল এই যে, তিনি নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতার পথ ধরে নিজেকে ফ্যাসিস্ত একনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পার্লামেণ্টকে উৎখাত করেছেন, সমস্ত রকম বিরুদ্ধ মতামতকে পদ-দলিত করেছেন, চির নির্বাসন দিয়েছেন সমস্ত মুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইটালির মানচিত্র থেকে। সন্দেহ নেই, অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ এটি। কিন্তু হয়ত অত্যন্ত রূঢ় শোনাবে এই সত্যভাষণ যে, মাননীয় স্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় প্রাপ্তিসাধ্য সাক্ষ্যগুলির এক দশমাংশও ব্যবহার করেন নি তার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য। বন্দীর কৃতকর্মের এই সদর্থক দিকটিকে অবশ্যই স্বীকৃতি জানাতে হবে যে, কোথাও কখনও তিনি ছদ্মবেশের আড়াল নেন নি, অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য বা কর্ম পদ্ধতি গোপন রাখতে চেষ্টা করেন নি কখনও।

এটা ঠিকই যে, তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সময়কাল অবশ্যই চিহ্নিত হয়ে আছে অস্বাভাবিক রকমের হিংসাশ্রয়ী ঘটনার বিস্তারের মধ্য দিয়ে। মোলিনেলা গ্রামের সেই বিখ্যাত ঘটনাটি এই আদালতে স্মরণ করা যাক্। কৃষি-গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পো অঞ্চলে অবস্থিত এই গ্রামটির সুখ্যাতি সুবিদিত। আনুমানিক বছর তিরিশেক সময়ে এই পো অঞ্চলের কৃষকরা একটি চমৎকার ধরণের সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল। যা কিছু তাঁরা সে জমিতে উৎপাদন করত তার মালিকানা ছিল তাঁদের নিজেদের। তাঁদের নিজেদের বাড়ী ছিল, নিজেদের মেশিন ছিল, নিজেদের টাকা পয়সা রাখবার জন্য তাঁদের নিজেদের ব্যাঙ্ক পর্যন্ত ছিল। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে মোলিনেলা ছিল পৃথিবীর একটি বিস্ময়। কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং সমবায় বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে এখানে আসতেন। কিন্তু রোম অভিযানের সেই বিশেষ দিনে বন্দীর রাজনৈতিক অনুসারণকারীরা একেবারে তছনছ করে ফেলল সেই গ্রামটিকে। সমস্ত মেশিনপত্র গুঁড়িয়ে ফেলে, জমির ফসল এবং ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা লুঠপাট করে, শেষে যা তারা ফেলে রেখে গেল তা একটি মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নয়। মোলিনেলা আজও তেমনি মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে।

মোলিনেলার ঘটনাই সব নয়। সরকারী নথি অনুযায়ী ফ্যাসিস্ত আমলের প্রথম বছরেই হত্যা এবং অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল দু' হাজারটি।

এ ছাড়া সরকারী হিসাবের বাইরে এমন ঘটনার সংখ্যা আরো অনেক বেশী। আদালত চাইলে একজন সাক্ষীকে আমি এখানে ডাকতে পারি যিনি "The Fascisti Exposed : a year of Fascist Domination" নামে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন ইটালির একজন এম. পি। নাম গিয়াকোমো ম্যাট্টেওটি।

অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় অবশ্য ম্যাট্টেওটির নামটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি একান্তভাবে মনে করি না যে, সেই বিষয়টি সম্পর্কে আদালতকে পুরোপুরি জানাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ম্যাট্টেওটিকে খুন করেছিল আমেরিগো ডুমিনি নামে একজন কুখ্যাত খুনে। সে ছিল বন্দীর মাস-মাইনের একজন কর্মচারী। অনেককাল আগে ম্যাট্টেওটির সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকার জন্য একদা তাঁর পরিচয় ঘৃণায় চিহ্নিত হয়েছিল। ইটালির অন্ধকার জগতে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল তার নাম, কারণ এক সময় অগুন্তি খুন সে করেছিল ম্যাট্টেওটির নির্দেশে। বোধহয়, সেই কারণেই তাঁকে নিকেশ করার হুকুম যখন সে বন্দীর কাছ থেকে পেল, তখন অতি সহজেই সেটা সে মেনে নিতে পেরেছিল। কিন্তু স্থূল বুদ্ধির খুনে সে. বন্দীর পরামর্শ সে অবহেলা করল। একজন সুপরিচিত এম. পি. কে শেষ করে দেওয়ার জন্য সম্ভবত বন্দী পরামর্শ দিয়েছিল, প্রধানত সাংবিধানিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার। কিন্তু ডুমিনি নির্বোধের মতন তুলে নিয়ে গেল ম্যাট্টিওটিকে এবং বাধা পেয়ে তাকে ছুরি মেরে খুন করে লাশ গুম করে দিল।

মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, এই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করবার কারণ একটিই, যাতে ঘটনাকাল এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি আপনারা জানতে পারেন। তারিখটা ছিল ১৯২৪ সালের ১১ই জুন এবং ফলশ্রুতি গভীর সংকটে পড়ল তাঁর শাসনতন্ত্র। ম্যাট্টেওটির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এবং তারপর তাঁর মৃত্যুর সংবাদে ক্রমবর্ধমান ক্রোধ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন। সরকারের ভিত উঠল কেঁপে। ক্ষমতায় থাকলেও এই বন্দী তখন এমনই অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন যে তেমনটি তিনি ১৯৪৩ সালে পতনের আগে পর্যন্ত আর কখনও থাকেন নি। আসন টিকিয়ে রাখবার জন্য তখন তাঁকে যা নয় তাই করতে হয়েছে। প্রথমত তিনি ঐ খুনের ঘটনার সাথে কোনোরকম সংস্রব অস্বীকার করলেন এবং তারপর, যেহেতু তা কারুর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হ'ল না, তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন সেই ষড়যন্ত্রে বাকি যাঁরা তাঁর সাথে জড়িয়ে ছিল, তাঁদের সকলকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার। তিনি গর্জন ছাড়লেন যে তাঁদের সকলকেই ধরিয়ে দেওয়ার এবং তাঁদের কৃত অপরাধের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার, যে

অপরাধ কিনা তাঁরা বন্দীর হুকুমেই করেছিল।

অবশ্যই এ ঘটনা থেকে মস্ত বড় একটা শিক্ষালাভ হয়েছিল বন্দীর। এর পর থেকে তিনি ম্যাকিয়াভেলির তত্ত্ব বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, ভালবাসা পাওয়ার থেকে ভীতি সঞ্চার করতে পারাটা ঢের ভাল। তিনি একেবারে স্পষ্ট এবং খোলাখুলি বললেন — "আমার কাছে সহিংস্র পদ্ধতি যথাযথভাবে নৈতিক এবং তা অনেক বেশী নৈতিক আপোষের চেয়ে এবং দর কষাকষির চেয়ে।" ১৯২৫ সালের ২২শে জুন তিনি বললেন — "আমার শাসনতন্ত্র অপার্লামেণ্টিয়, অগণতান্ত্রিক এবং উদারপন্থা বিরোধী"। ১৯২৭ সালের ২৭শে মে তিনি ঘোষণা করলেন — "আমরা আইনতান্ত্রিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ( corporate state ) প্রবর্তন করেছি। আজ আমরা সাড়ম্বরে সার্বজনীন গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারের মিথ্যাচারকে কবর দিচ্ছি।" এই সময়কালের মধ্যে বন্দী সত্যি সত্যিই তার কর্মসূচির প্রথম অংশ সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। "রাষ্ট্র কি ?" — ১৯২৩ সালে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর দিলেন নিজেই "তা মূলত সৈন্যবাহিনী। এটা ছাড়া সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত কথার কচকচানি একেবারে অন্তঃসারশূন্য।" ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে এই তত্ত্বকে কার্যকর করা হ'ল। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদেরকে এই তারিখগুলি স্মরণ করবার জন্য আবেদন করছি।

বন্দীর এই সহিংস তত্ত্বের বাস্তবায়নের উদাহরণ কেবল যে তাঁর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যেই দেখতে পাওয়া গেল, তা নয়। শুরু থেকেই একই রকম অফুরন্ত এবং খোলামেলা ছিলেন তাঁর বৈদেশিক নীতিতেও সে তত্ত্বের ঘোষণায়। ক্ষমতায় আসবার আঠারো মাস আগে তিনি একদিন বলেছিলেন — "ফ্যাসিজিম কখনই জাতিগুলির ঐক্যের তত্ত্বে বা সে তত্ত্বের সারবত্তায় বিশ্বাস করেনা। কারণ, সে প্রকার ঐক্যে কখনই অন্তর্ভুক্ত সকলে সমমর্য্যাদায় থাকেনা। এটি হচ্ছে ফ্রাঙ্কো-এঙ্গলো-স্যাক্সন গ্রুপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এক প্রকারের তথাকথিত পবিত্র সন্ধি, এমনকি, স্বার্থের সহস্ররকম অনিবার্য দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও। উদ্দেশ্য একটিই। এই পৃথিবীর বিরাট অংশব্যাপী শোষণ এবং লুণ্ঠন চালাবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার পারস্পরিক নিশ্চয়তা প্রদান।" ১৯২১ সালে তিনি তাঁর সেই তত্ত্বকে প্রথম প্রকাশ করলেন যা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন — "এটাই নির্দিষ্ট হয়ে আছে যে মেডিটেরানিয়ন অঞ্চলের গোটাটাই আমাদের হবে এবং রোম হয়ে উঠবে সেই শহর যে গোটা পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার বিকাশে নেতৃত্ব দেবে।"

বন্দীর এই বক্তব্য কেবল কথার কথা ছিল না। ১৯২৩ সালে গ্রীস এবং আলবেনিয়ার সীমান্ত নির্ধারণে সাহায্যকারী ইটালিয়ান কমিশনের কয়েক-জন সভ্য অজ্ঞাত কারণে খুন হলেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করে গ্রীসকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পালনের চূড়ান্ত শর্ত জানালেন বন্দী। গ্রীস যখন লীগের দ্বারস্থ হ'ল ততক্ষণে ইটালির সৈন্যবাহিনীকে হুকুম দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে অরক্ষিত কর্ফু দ্বীপের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করার। এ ব্যাপারে জেনিভার হস্তক্ষেপের অধিকার তিনি মানলেন না। এমন কি লীগ থেকে সরে আসবার হুমকি পর্যন্ত দিলেন। অবশেষে সেই পর্ব কোনোভাবে শেষ হ'ল। কিন্তু. বৈদেশিক ব্যাপারে তার প্রথম হস্তক্ষেপের সফলতায় বন্দী খুশি হলেন। তাঁর ভাষায় কর্ফুর ঘটনা ইটালির ইতিহাসে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মনে হয়ত প্রশ্ন আসতে পারে যে বন্দীর পক্ষে সওয়াল করতে এসে কেন আমি তার রাজনৈতিক জীবনের কালো অধ্যায়গুলো এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরণ করছি। অবশ্যইএকটা উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে। এই সব ঘটনাগুলি, যতটা আমার স্মরণ ক্ষমতা এবং পড়াশুনায় সম্ভব, আমি স্মরণ করছি এই জন্যই যাতে প্রসিকিউশন বা সরকার পক্ষ পুনরায় সে সবের উল্লেখ করে আপনাদের বিচারকে প্রভাবিত করতে না পারে। তার কারণ, আমি আশা করি আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণ করতে পারব যে বন্দীর রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভকালের এই সব ঘটনাগুলির একটিও আপনাদের বিচারের উপযুক্ত বিষয় হতে পারে না। আমি প্রমাণ করব যে এই বর্ণিত ঘটনাগুলো এমন নয় যে তা আপনাদের কাছ থেকে দণ্ডাদেশ পেতে পারে। বরং এগুলি আপনাদের কাছ থেকে প্রশংসা বা বাহবা দাবী করতে পারে: বেশ কয়েকজন সাক্ষীর মুখের কথা থেকে আমি তার প্রমাণ দেব। মহামান্য বিচারপতি, আশা করি আমি তাঁদের এখন ডাকতে পারি। প্রথম জন হলেন স্যার অসটেন চেম্বারলেইন।

[ স্যার অসটেন চেম্বারলেইন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল** : স্যার অসটেন, ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ সরকারের কোন পদে আপনি ছিলেন ?

**স্যার অসটেন** : আমি ছিলাম বৈদেশিক দপ্তরের সচিব।

**কাউন্সেল** : সেই পদাধিকারে আপনি প্রথম কোন দেশে যান ?

**স্যার অসটেন** : প্রথম রোমে গিয়েছিলাম আমি।

**কাউন্সেল ঃ** কবে গিয়েছিলেন ?

**স্যার অসটেন ঃ** গিয়েছিলাম ১৯২৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর। ছিলাম ১২ই ডিসেম্বর অবধি।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার সেই বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

**স্যার অসটেন ঃ** আমি গিয়েছিলাম সদ্য গঠিত ইটালিয়ান সরকারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে। অবশ্য এটি একটি সামাজিক ভ্রমণও বটে। এই রকম বার দুই / তিন আমি সপরিবারে গিয়েছিলাম মুসোলিনির সাথে সামাজিক সাক্ষাৎ করতে।

**কাউন্সেল ঃ** হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে কয়েকটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। বোধহয় তাঁর ফোটো তোলা হয়েছিল, তাই না ?

**স্যার অসটেন ঃ** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল ঃ** বোধহয় মুসোলিনির সাথে যখন করমর্দন করছিলেন, সেই সময় ?

**স্যার অসটেন ঃ** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল ঃ** তাহলে হয়ত একথাও আপনার মনে আছে যে মুসোলিনির নির্দেশে সেই ছবির পনেরো লক্ষ কপি ছাপান হয়েছিল এবং গোটা ইটালিতে তা বিলি করা হয়েছিল !

**স্যার অসটেন ঃ** মুসোলিনির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না।

**কাউন্সেল ঃ** অবশ্য ঠিক সে কথা, স্যার অসটেন। সে সময় বোধ হয় ট্রিবুনা পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে এমন অনেক কথা বলেছিলেন যেগুলো পরবর্তীকালে বহুবার উদ্ধৃত হয়েছিল। আমার কাছে সেই পত্রিকার একটি কপি আছে যা আপনার স্মৃতি রোমন্থনে সাহায্য করতে পারে। আশা করব আপনি অনুগ্রহ করে এই আদালতে তা একবার পড়ে শোনাবেন।

**স্যার অসটেন ঃ** ( পড়তে লাগলেন ) সিগনর মুসোলিনি একজন চমৎকার মানুষ এবং একজন বিরাট মাপের কর্মী। অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমি কখনই ঢুকতে চাই না। কিন্তু এ কথা আমায় অবশ্যই বলতে হবে যে মহত্ত্বের মর্য্যাদায় তাঁর দেশের উত্তরণ ঘটাবার জন্য নিরলস প্রয়াসে ব্রতী রয়েছেন তিনি। বিরাট দায়িত্বের সেই গুরুভার তিনি বহন করে চলেছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম — "আপনি বরং আমার মতন করুন, বিশ্রাম নিন বেশ কিছুদিনের জন্য। থাকবেন সেই সময়টা ইয়াখ্‌ট নৌকার উপর একেবারে নিরিবিলিতে যাতে বিশ্রাম হয় পুরোপুরি ষোলো আনা। যেমন ধরুন আমার কথা, গত

দশদিনে এমনকি একটা খবরের কাগজও পড়িনি। আর একটা কথা, নৌকায় যখন থাকবেন তখন আমার উপদেশ হ'ল এই যে আমার মতন করুন, ওয়ারলেস সরিয়ে দিন নৌকা থেকে।"

**কাউন্সেল** ঃ ধন্যবাদ আপনাকে স্যার অসটেন। এই-ই যথেষ্ট। বন্দীর সাথে আপনার বাক্যালাপে সেদিন বিশেষ ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার যে প্রকাশ ঘটেছিল তা নিয়ে প্রশ্ন করে অকারণে আপনাকে বিব্রত করার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করছি না। সম্ভবত আদালত আপনার এই বিদেশ ভ্রমণের রাজনৈতিক তাৎপর্যেই বেশী আগ্রহী। এই ঘটনাটি নিয়ে আমি বন্দীর সাথে আলোচনা করেছিলাম। তিনি আমাকে বারবার সেই একই কথা বলেছেন যা তিনি ১৯২৪ সালে ব্রিটেনে লেবার গভর্ণমেণ্টের পতন এবং গভর্ণমেণ্টের পুনরুত্থানের খবর পাওয়ার পর ফ্যাসিস্ত কাউন্সিলে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন। মনে পড়ে লেবার গভর্ণমেণ্টের একজন সদস্য আর্থার হেণ্ডারসন অত্যন্ত বিশ্রীভাবে বন্দীকে ম্যাট্টেওটির খুনী হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। সেই কারণেই সেই সরকারের পতনে বন্দী খুশি হয়েছিলেন অতখানি। সেই কারণেই নতুন সরকারের উত্থানে তিনি অতখানি উল্লসিত হয়ে তার ফ্যাসিস্ত কাউন্সিলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন — "জয় হয়েছে। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ত বিরোধী মোর্চার একটা অংশের পতন হয়েছে।" মনে হয় আপনার সে সময়কার ঐ ভ্রমণ এবং মতামত বন্দীর এই ভাবাদর্শকে নতুন উচ্চতায় তুলে ধরেছে। অবশ্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে আপনার ঐ মতামতের পক্ষে বিখ্যাত অনেকেরই সমর্থন ছিল। এবার আমি পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকব। পরবর্তী সাক্ষী মৃত লর্ড রোদের মেয়ার।

[ মৃত লর্ড রোদের মেয়ার যেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠলেন ]

**কাউন্সেল** ঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির ( বন্দী ) চরিত্র সম্পর্কে আপনার প্রামাণিক সাক্ষ্য আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার মনে হয় ব্রিটিশ বৈদেশিক সচিব হিসাবে স্যার অসটেন চেম্বারলেইনের সফল ইটালি ভ্রমণ প্রসঙ্গে আপনি কিছুটা আলোকপাত করতে পারবেন। এই আদালতে আপনি অনুগ্রহ করে আপনার নিজের ভাষায় অথবা যদি সময় বাঁচাতে চান তাহলে ১৯২৮ সালের ২৮-শে মার্চ ডেইলি মেল কাগজে যে ভাষায় লিখেছিলেন সেই ভাষায় বলবেন কি বন্দীর সাথে সাক্ষাৎকারের অবকাশে আপনি কি কি দেখতে পেয়েছিলেন।

**রোদের মেয়ার** ঃ সিগনর মুসোলিনির ঘর থেকে বেড়িয়ে আসবার সময় চোখে

পড়ল স্যার অসটেন চেম্বারলেইনের একটি ফোটোগ্রাফ। দেখে খুশি না হয়ে পারি নি যে ফোটোগ্রাফটি রয়েছে এমনই একটা জায়গায় একটি টেবিলের উপর তাঁর মূল্যবান সামগ্রীগুলোর সাথে সমমর্য্যাদায় যে. তা চোখে পড়বেই। ফোটোগ্রাফটির উপর শুভকামনা জানিয়ে স্যার অসটেন-এর নিজের স্বাক্ষর ছিল। স্যার অসটেন চেম্বারলেইন যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন. তিনি যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন ব্রিটিশ এবং ইটালি সরকার-এর মধ্যকার সুসম্পর্ককে নতুনতর উচ্চপর্যায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। ভবিষ্যতের প্রতিটি বৈদেশিক সচিবেরই উচিত আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক. যা উভয়দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক, তা রক্ষা করবার এবং দৃঢ় করবার স্থির সংকল্প গ্রহণ করা।

**কাউন্সেল** ঃ ধন্যবাদ লর্ড রোদের মেয়ার। সেই বারই কি আপনি প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন মুসোলিনির সাথে সাক্ষাৎ করবার ?

**রোদের মেয়ার** ঃ না। সিগনর মুসোলিনির সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালে। যখন ফ্যাসিস্ত পার্টির উগ্রপন্থীদের হাতে সমাজতান্ত্রিক নেতা ম্যাট্টেওটি খুন হওয়ার ঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় মুসোলিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবার ঘটনাবহুল কালে এইটিই ছিল মুসোলিনির পক্ষে সবচেয়ে সংকটজনক সময়। সমস্ত পৃথিবীরই তখন তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা। অন্যভাবে তাঁরা সকলে তাঁকেই দায়ী করেছিল সেই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডর জন্য। ফলে. মুসোলিনির শাসনতন্ত্রের উপর নেমে এসেছিল মারণ আঘাত। যে স্থিরতা এবং আত্মবিশ্বাস মুসোলিনি সে সময় দেখিয়েছিলেন. যেভাবে স্থির ছিলেন অনিষ্টকারী সম্ভাবনাগুলিকে উৎখাত করে ফেলবার সংকল্পে. যা কিনা তাঁর নিজের ফ্যাসিস্ত সংগঠনের ভিতরেও কার্যকর করা হয়েছিল. তা তাঁর বিচারবোধের নির্ভুলতা এবং চরিত্রের অসাধারণ শক্তির প্রমাণ দেয়। "যখন সকলে তোমাকে সন্দেহ করে তখনও যদি তুমি নিজের উপর আস্থা রাখতে পার" — রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর এই বিখ্যাত উক্তির মাপ-কাঠিতে বিচার করলে বলতে হয় মুসোলিনি সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন তাঁর পরীক্ষায়।

**কাউন্সেল** ঃ অনিষ্টকারী বৃদ্ধিগুলি কি তিনি সত্যিই ছেঁটে ফেলতে পেরেছিলেন ? শোনা যায় আমেরিগো ডুমিনি, যে ম্যাট্টেওটিকে খুন করেছিল, সে নাকি আপনার থেকেও বেশী দিন বেঁচেছিল। সত্যি সত্যিই তো তাঁকে ভেরনা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা গিয়েছিল যখন ১৯৪১ সালে ওয়াভেল-এর বাহিনী সেই শহরে ঢুকে পড়ে। যাইহোক, থাক সে কথা।

একটা ব্যাপার কি আপনি লক্ষ্য করেছেন লর্ড রোদের মেয়ার যে, আপনার প্রথম দিককার মতামত পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর দ্বারা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

**রোদের মেয়ার :** আন্তর্জাতিক রাজনীতির একজন মনযোগী ছাত্র হওয়ার সুবাদে মুসোলিনির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল অবস্থায় ছিলাম আমি। বলশেভিজমের অতল অন্ধকার গহ্বরের কিনার থেকে সবলে ইটালিকে টেনে তুলে এনে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতাকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। নিজের দেশে তার ভূমিকা ছিল কালান্তক বিষের চরম প্রতিষেধকের এবং ইউরোপের বাকি দেশগুলির বেলায় তার ভূমিকা ছিল বলবর্ধক টনিকের যা সকলেরই অপরিসীম মঙ্গল করেছে। এই আত্মতৃপ্তি আমার আছে যে আমি দাবী করতে পারি জনমত সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতায় থাকা মানুষদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর অভাবনীয় সাফল্যকে যথার্থ আলোকে তুলে ধরতে পেরেছিলাম।

**কাউন্সেল :** আপনার অহঙ্কারের কারণ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু এমন কেউ কি সে সময় ছিল না যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করতেন আপনার সাথে ?

**রোদের মেয়ার :** আছে একদল সমালোচক, আরামকেদারার আলস্য যাঁরা ত্যাগ করতে পারল না সারাজীবনে কোনোদিন। যে মুসোলিনি গোটা জাতির জীবনকে সফলতায় পৌঁছে দিয়েছে, সেই তাঁকেই অপবাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে যাঁরা নিজেদেরই জীবনব্যাপী ব্যর্থতার হাহাকার তুলে ধরেছে তাঁদের মতামত এবং বিশ্লেষণ যখন আমি শুনি তখন তাঁদের অসার অহং এবং বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির মানুষ সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। মানুষের যথার্থ মহত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা উদারপন্থী (liberals) এবং সমাজতন্ত্রীদের (socialists) একেবারেই নেই।

**কাউন্সেল :** তাহলে এইটাই আপনার শেষ কথা। হ্যাঁ, পরবর্তীকালেও কখনও আপনাকে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে আসতে দেখি নি। এই আদালতে আপনি একবার বলবেন কি ১৯২৮ সালে মার্চ মাসে আপনার পাঠকদের কাছে আপনি কি বক্তব্য রেখেছিলেন ?

**রোদের মেয়ার :** তিনি হচ্ছেন এই সময়ের মহত্তম ব্যক্তিত্ব। সম্ভবতঃ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মুসোলিনিই প্রভুত্ব করবেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে যেমন করেছিলেন নেপোলিয়ন। আমি গর্বিত যে 'ডেইলি মেল' শুধু ইংল্যাণ্ডেই

নয়, ইটালির বাইরে গোটা পৃথিবীর মধ্যেই প্রথম সংবাদপত্র যে জনগণের কাছে তার কাজের গভীরতা এবং স্থায়ীত্বর সঠিক মূল্যায়ন পৌঁছে দিতে পেরেছিল।

**কাউন্সেল** ঃ আপনার সাক্ষ্যের জন্য আপনার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। যাইহোক, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে নিজের কাছে সৎ থাকবার গরজে এই সময়ের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের প্রতি এই যে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্যটি আপনি অর্পণ করলেন তার প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে আদালত এই তারিখটা মনে রাখবেন। সময়টা ছিল ১৯২৮ সাল — হিটলারের সাথে আপনার দেখা হওয়ার আগে।

পরবর্তী সাক্ষী হলেন মিঃ জি. ওয়ার্ড প্রাইস, লর্ড রোদের মেয়ারের সংবাদপত্র 'ডেইলি মেল'-এর বিশেষ সংবাদদাতা।

[ ওয়ার্ড প্রাইস সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল** ঃ মিঃ ওয়ার্ড প্রাইস, সন্দেহ নেই যে, বন্দী সম্পর্কে অতীতে আপনি যে ধারণা পোষণ করতেন তা আপনার বর্তমান ধারণা থেকে ভিন্ন। কিন্তু এখানে আপনাকে আপনার বর্তমান ধারণা প্রকাশ করার জন্য সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়নি। আমি জানি আপনার কলম এখনও একই রকম সচল আছে। এখনও অনেক অনেক মানুষকে 'ডেইলি মেলে' আপনার রচনার মাধ্যমে আলোকিত করে তুলতে পারেন। এহ বাহ্য, এই আদালতের বিচার্য বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি মনে করি, আদালত আপনার কাছ থেকে জানতে চায় বন্দী সম্পর্কে কেবল আপনার অতীত ধারণাটুকু, অর্থাৎ বন্দী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা আপনি পোষণ করতেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করব স্মৃতির পথ ধরে সেই পিছনের দিনগুলিতে ফিরে যেতে। আপনার উপর যাতে কোনো অবিচার করা না হয় তার জন্য প্রশ্নগুলি আমি এমন ভাবে সাজাব যাতে উত্তর দিতে গিয়ে কখনই আপনার সে সময়কার ধারণা, যা আপনার স্বাক্ষরসহ বক্তব্যের আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে সরে যেতে না হয়। আপনার সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ আপনি এই একনায়ককে চিনতেন এবং আপনার রচনাতেই ফ্যাসিজমের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য যথাযথ মূল্যায়ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল।

তাহলে ফিরে যাওয়া যাক অতীতে। ধরা যাক, আমরা দাঁড়িয়ে আছি ১৯২৪ সালে অর্থাৎ ম্যাট্টেওটির মৃত্যুর বছরে। 'ফ্যাসিজিম'কে আপনার কেমন মনে হয়েছে এই পর্যায়ে ? এটা কি সত্যি যে ফ্যাসিজিমের পিছনে খুব

সামান্যই সমর্থন ছিল ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** ইটালির যা কিছু সর্বোত্তম, তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মুসোলিনি সমস্ত অগ্রগণ্য শিল্পোৎপাদক, আজকের ইউরোপের যে কোনো দেশের তুলনায় যাঁরা এগিয়ে চলেছে অনেক বেশী দ্রুত গতিতে, তাঁরা সবাই হলেন তাঁর অন্যতম সমর্থক। নিজেদের মৌলিকতা টিকিয়ে রাখার তথা আত্ম নির্ধারণের সেই সহজাত প্রবণতা থেকেই ইটালিতে আবির্ভাব ঘটেছে ফ্যাসিস্ত সরকারের, যে প্রবণতা রয়েছে ইংল্যাণ্ডেও, যদিও তা লুকোচাপার আড়ালে কিন্তু তাই বলে এতটুকুও কম নয়।

**কাউন্সেল ঃ** মুসোলিনির শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সে সময় আপনি এতখানি উচ্চ-ধারণা পোষণ করতেন যে তা আমাদের কাছে শিক্ষণীয়।

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** যে সব ব্রিটেনবাসী অনুধাবন করতে পেরেছেন যে অত্যন্ত এক বিপজ্জনক অবস্থার দিকে এগোচ্ছে। ব্রিটেনের ঘটনাপ্রবহ তাঁদের কাছে ইটালি একটি উদাহরণ এবং আশার আলোস্বরূপ। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইটালির অবস্থা এমনই হতাশাব্যঞ্জক ছিল যে মনে হত কোনোদিনও বোধহয় তার আর পুনর্নির্মাণ সম্ভব নয়। কিন্তু এখন যাঁরা ইটালি এবং ইংল্যাণ্ড উভয় দেশ সম্পর্কেই অবহিত তাঁরা কেউই এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে ইটালি আজকে আমাদের দেশের থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যৎ তার আরোও উজ্জ্বল। সে দেশের জনগণ অনেক বেশী সুখী এবং তৃপ্ত।

**কাউন্সেল ঃ** সেই সময়কার মুসোলিনি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** কেবল এখনই নয়, পরবর্তীকালের ইতিহাসেও মুসোলিনি তাঁদের সকলের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন, যাঁরা স্বাধীনতাকে মূল্য দেন এবং নিজের মাতৃভূমিকে ভালবাসেন।

**কাউন্সেল ঃ** এবার ১৯২৬ সালে এগিয়ে আসা যাক্। এখনও কি আপনি সেই একই ধারণা পোষণ করেন ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** ফ্যাসিজিম ইটালি জাতিকে সুসংবদ্ধতা, সমৃদ্ধি এবং আত্ম-বিশ্বাসের এমন এক উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছে যার তুলনা ইউরোপের আর কোনো দেশে পাওয়া যাবে না। চার বছর পার হয়ে যাওয়ার পর আজ মুসোলিনির প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা ইটালির মানুষের কাছে এ্যাতো বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, জাতি হিসাবে গঠিত হয়ে ওঠার পর ইটালিকে আর কোনো প্রশাসকের কার্যকালে যা কখনও হতে পারে নি।

**কাউন্সেল ঃ** আরো এগিয়ে এবার ১৯৩২ সালে আসা যাক্। এ সময় আপনার মূল্যায়ন কি রকম ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** পৃথিবীর ইতিহাসে গত দশকের শ্রেষ্ঠ ক্রমবিকাশের ঘটনাটা হ'ল ইটালির জাতীয় প্রতিভার পুনর্জাগরণ।

**কাউন্সেল ঃ** কোনো তুলনীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ কি আপনি করতে পারেন যা থেকে আমরা এই সফলতার পরিধি এবং গভীরতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** যখন তিনি ১৯১৯ সালে মিলান শহরে প্রথম ফ্যাসিও (Fascio) গঠন করলেন তখন পৃথিবীর রাজনীতিতে মুসোলিনি তেমনিই সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটালেন, ঠিক যতখানি ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছিলেন লুথার। আজ থেকে চারশত দুই বছর আগে উইটেনবার্গ গির্জার দরজায় তার "৯৫টি সূত্রের" পেরেক গেঁথে দিয়ে।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার ধারণায় তার কোন গুণাবলীর কালে ১৯৩২ সালে তিনি এরকমটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** প্রধান কারণ হ'ল তার সাহস এবং বাস্তবমুখীতা।

**কাউন্সেল ঃ** অন্য আর কোনো কিছু ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** তার সফলতার গোপন কথা হ'ল এই যে তিনি তাঁর বিশ্বাস দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। যাঁরা অশিক্ষিত, যাঁরা সংস্কারাচ্ছন্ন ও গোঁড়া তাঁরা ইটালির এই ব্যাপারটিরই যে অপব্যাখ্যা করত তা শুনে মনে হতো সমগ্র জাতি যেন ভয়ংকর অত্যাচারীর কবলে পড়ে আছে যার উৎখাত একদিন নাকি তাঁরা করবেই।

**কাউন্সেল ঃ** তাঁর শাসনতন্ত্রের বিরোধী সমালোচনাগুলিকে আপনি কেমন ব্যাখ্যা করবেন ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** বরং অবহেলামিশ্রিত করুণার সাথেই দেখি গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের, ব্রিটিশ জনমতের সেই একাংশকে যা ভুল এবং অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর গড়ে উঠেছে। তাঁদের প্রকৃতিই এই রকম। ফ্যাসিস্ত শাসনতন্ত্রের সেই বিরাট কর্মযজ্ঞের দিকে চিরকালই তাঁরা চোখ বুজে ছিল। আমি বহুবার শুনেছি মুসোলিনিকে 'ডেইলি মেল'-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে, যেহেতু এটাই ছিল প্রথম ব্রিটিশ দৈনিক সংবাদপত্র যে পৃথিবীর কাছে তাঁর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সযত্নে তুলে ধরেছে।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার বক্তব্য অদ্ভুতভাবে লর্ড রোদের মেয়ারের বক্তব্যের সাথে মিলে যাচ্ছে হুবহু। কিন্তু কেনই বা তিনি কিংবা কেনই বা আপনি তাঁর এই নতুন তত্ত্বকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন, অথবা অন্যভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ১৯৩২ সালে সেই নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেমন ছিল আপনার চূড়ান্ত মূল্যায়ন ?

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** একটি প্রশ্ন আমি নিজেকে করেছিলাম যে মুসোলিনি যেমন দাবি করে থাকেন তেমন কি সত্যি সেকথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে এই শতকটি বিশ্ব-ফ্যাসিজিমের শতক, ঠিক যেমন বিগত শতক ছিল গণতন্ত্রের শতক, যে গণতন্ত্র এখন সারা বিশ্বে ভীষণভাবে নিন্দিত হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ সংকটে বিদীর্ণ জাতির মর্মস্থলে যখন প্রথম ফ্যাসিও (Fascio) প্রতিষ্ঠিত করলেন ভিউস, তার আগে পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সম্ভবনা ততখানি বিরাট আকারে দেখা যায় নি। এইভাবে দ্রুত এবং ব্যাপক সংস্কার এবং উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হ'ল যার উপর আজকের ফ্যাসিস্ত শাসনতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। যা আজ প্রাচীন রোমের পুনরুদ্ধারিত ঐতিহ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সঙ্গত অহঙ্কারে অতীতকে দেখছে।

**কাউন্সেল ঃ** মিঃ প্রাইস, এরকম প্রশ্ন করা আমার পক্ষে অশোভন এবং অসঙ্গত হবে যে কখনও কোনোদিন আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে যে, এই বিষয়ের উপর আপনি একটি বই লিখেছিলেন যার শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। আপনি কি অনুগ্রহ করে এই আদালতে সেই বই-এর ২২০ পৃষ্ঠায় বন্দীর চরিত্রের যে মূল্যায়ন করেছেন তা একবার পড়ে শোনাবেন ? এটি এমন একটি মূল্যায়ন যা, আপনার কথা অনুযায়ী, বন্দীর সাথে আপনার দীর্ঘ চোদ্দ বছরের পরিচয়কালে কখনও পরিবর্তন করবার কারণ ঘটেনি।

**ওয়ার্ড প্রাইস ঃ** "তিনি একজন এলিজাবেথান। রানী এলিজাবেথের সময়ে ইংল্যাণ্ডে র‍্যালে (Raleigh) এবং ড্রেক যেমনভাবে প্রতীয়মান ছিলেন, পরবর্তী কালে অর্থাৎ আধুনিক ইটালিতে মুসোলিনিও তেমন ভাবেই প্রতীয়মান। যে ভাবধারায় আবিষ্ট হয়ে আছে আজকের ইটালি, তা তিনিই মূর্ত করে তুলেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইটালির সাথে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ইংল্যাণ্ডের মানসিকতার বহুল সাদৃশ্য যেখানে লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল একই জাতিগত গর্ববোধ, একই অপ্রতিরোধ্য আশাবাদ, নতুনতর সুযোগ সৃষ্টি করবার ক্ষেত্রে একই রকম তীব্র অনুভব, একই রকম বেপরোয়া প্রবণতা, একই

স্বজ্ঞাতাবোধের অনুগত উষ্ণতা তাঁকে যৌবন এবং শক্তিতে পূর্ণ করেছে।"

**কাউন্সেল :** আমরা সকলে মিঃ ওয়ার্ড প্রাইসের কাছে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকব তাঁর এই স্মৃতিচারণার জন্য। আমি নিশ্চিত আমরা এখন তাঁর বই আরো বেশী মনযোগের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পড়ব। কিন্তু আমি এখনও আদালতের কাছে আরো কয়েকজন সাক্ষীকে ডাকবার অনুমতির জন্য আবেদন করব। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এমিল লুড উইগকে এখন আমি ডাকছি।

[ এমিল লুড উইগ কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল :** মিঃ লুড উইগ, প্রথম কবে আপনি বন্দীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন ?

**লুড উইগ :** ১৯২৯ সালের বসন্তকালে। পরবর্তীকালে আরো কয়েকবার তাঁর সাথে দেখা হয়।

**কাউন্সেল :** তাঁর সাথে দেখা হওয়ার আগে তাঁর শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আপনি কি কোনো ধারণা পোষণ করতেন ?

**লুড উইগ :** হ্যাঁ, অবশ্যই। অবশ্যই একটি মিশ্র ধারণা নিয়েই তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমার বন্ধুরা এবং আমি প্রথম আকৃষ্ট হই মুসোলিনির নেতৃত্বে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের পরবর্তী সময়ের সামাজিক বৈশিষ্ট্য-গুলির প্রতি অর্থাৎ তাঁর কর্মসূচীর সেই অংশ যাঁর ফলশ্রুতি হ'ল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অন্যদিকে সংবাদপত্রের উপর তাঁর ভয়ংকর হস্তক্ষেপ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরনের নীতির অবশ্যই বিরোধী ছিলাম আমরা। এই দুই রকম মনোভাবের তুল্য মূল্য বিচার করলে দেখা যাবে যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ-এর এই প্রথম বারে আমাদের মনোভাব যতখানি তাঁর বিরুদ্ধে ছিল ততখানি তাঁর অনুকূলে কখনই ছিল না।

**কাউন্সেল :** এই একই ধারণা কি রয়ে গেল পরবর্তীকালেও ? কেমন ছিল সেই প্রাথমিক ধারণা ?

**লুড উইগ :** মুসোলিনির মানসিকতার যে ছবি বাইরের জনসাধারণের মনে আঁকা হয়ে থাকে তা তাঁর সঠিক পরিচয়ের প্রতিফলন নয়। বিগত চারশত বছরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শিল্পে সমৃদ্ধ, চমৎকার হলঘরে প্রথম যখন কেউ প্রবেশ করবে তখন তার মনে হবে ঘরটা বোধহয় ফাঁকা। অনতি বিলম্বেই দূরতম প্রান্তে, প্রায় বিশ গজ দূরে, ডেস্কের আড়াল থেকে একটা মানুষ উঠে দাঁড়াবে এবং হলের মাঝখানে এগিয়ে আসবে সাক্ষাৎ প্রার্থীকে অভ্যর্থনা জানাতে।

দৈর্ঘে খাটো এবং গঠনে মজবুত তাঁর চেহারা। প্রথমে অবাক হতে হয় তাঁর নারী সুলভ কোমল হাত দু'খানি দেখলে। কিন্তু সে ধারণা তৎক্ষণাৎ পাল্টিয়ে যায় যখন তিনি করমর্দনের জন্য অতিথির হাত ধরেন। সেই করমর্দনে থাকে পুরুষালী দৃঢ়তা। গভীর কালো তাঁর চোখ দু'টির সাথে তাঁর গোলাকার বিরাট কপাল এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে বিশিষ্ট। অবয়বে দৃশ্যমান এই বৈপরীত্য যেন আসলে তাঁর সমগ্র সত্ত্বায় ব্যাপ্ত হয়ে থাকা স্ববিরোধীতারই প্রতিফলন। যে কোনো সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী মানুষের মতই তাঁর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে পুরুষের এবং নারীর বিশিষ্ট গুণাবলীর অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতার এবং স্বপ্নের।

**কাউন্সেল ঃ** মিঃ লুড উইগ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনার এই মতামত জুরীবৃন্দের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে। একজন মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসবেত্তা হিসাবে আপনার অতলস্পর্শ জ্ঞানের আলোকে আপনার এই তত্ত্ব আর একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন কি ?

**লুড উইগ ঃ** অনুপ্রেরণা আর কল্পনা হ'ল অসাধারণ মানুষের দু'টি ডানা যা তাঁকে অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে যায় যাতে সে উপর থেকে দেখতে পায় তাঁর সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডের জগতটিকে এবং অনুধাবন করতে পারে তাঁর পরিধি। তারপর যখন সে নেমে আসে তখন তাঁকে কাজ করতে হয় দু'টি হাত দিয়ে। এই প্রাণিত চেহারা স্পষ্ট টের পাওয়া যায় তাঁর উনিশ বছর বয়সের একটি ফটোর দিকে তাকিয়ে দেখলে। দু'চোখে কবির দৃষ্টি। এমনই দেখতে পাওয়া যায় যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির অল্প বয়সের ছবিতে। পরবর্তী জীবনে দেহ রেখাগুলি আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে থাকে। মাথাটা আস্তে আস্তে বড় হয়। কিন্তু তা কেবল খাওয়া-দাওয়া এবং আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে নয়, বরং বেশি করে হয় কর্মশক্তির ব্যবহার ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। সময়ের সাথে সাথে মুসোলিনির মাথার আকৃতিও পাল্টে গেল।

**কাউন্সেল ঃ** মিঃ লুড উইগ, সত্যিই বন্দীর দিকে একবার তাকালে মানসিক শক্তি নির্ণয়ার্থ করোটির বহির্ভাগের বিচার পদ্ধতি ক্ষেত্রে আপনার অন্তর্দৃষ্টির সমর্থন মেলে। যাইহোক, আমার মনে হয় আপনার দ্বারা বর্ণিত এই অসাধারণ মানুষের উদাহরণ অনুসরণ করে এবার আমাদের বাস্তবে নেমে আসা উচিত। সব সময়ই কি তার চোখে এই কবির দৃষ্টি ছিল ?

**লুড উইগ ঃ** না। যখন তিনি সমবেত জনসাধারণের আবেদনে সাড়া দিতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর অবয়বে সেই দৃঢ়তাই লক্ষ্য করলাম যা কিনা দেখা যেত যখন তিনি গঠনমূলক কাজের বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন।

**কাউন্সেল ঃ** তিনি কি আপনাকে গঠনমূলক কাজের কোনো উদাহরণ দেখিয়েছিলেন ?

**লুড উইগ ঃ** আমার মতন দীর্ঘকাল ইটালিতে কাটিয়েছেন এবং সেখানে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন এমন কারোরই নজর এড়িয়ে যেতে পারে না সেই সব উন্নতির নিদর্শনগুলি যা কিনা সেখানে সর্বত্র দৃশ্যমান।

**কাউন্সেল ঃ** তাঁর বৈদেশিক নীতি নিয়ে কোনো আলোচনা কি তিনি আপনার সাথে করেছিলেন ?

**লুড উইগ ঃ** অবশ্যই। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তিনি ১৯৩০ সালের বসন্তকালে অমন মারমুখী বক্তব্য রেখেছিলেন। তার নিজের ভাষায় উত্তর হ'ল এই "আমাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। তখন আমার পক্ষে নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছিল যে তেমন জরুরী অবস্থায় আমার দেশ কতদূর অবধি আমার সাথে থাকবে। যখন আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে, আপৎকালে এঁরা আমাকে অনুসরণ করবে, তখন আমি বেতারে বিবৃতি দিয়েছিলাম আবার, ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে। সে বিবৃতিতে ভবিষ্যতে শান্তি সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ছিল। আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে আমার অনুভব বা চিন্তাধারা দেশবাসীর সমর্থন পেয়েছে। আমি কখনই জনগণকে যুদ্ধের জন্য বলিনি। গঠনমূলক ভাবনার মানুষেরা সকলেই শান্তি চান।"

**কাউন্সেল ঃ** আপনার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ কি এই ব্যাখ্যা অনুমোদন করেছিল ?

**লুড উইগ ঃ** আমার বিবেচনায় মুসোলিনি ছিলেন ইউরোপে শান্তির গ্যারান্টি। আমার চোখে তিনি প্রতিভাত হয়েছিলেন এমন একজন গঠনমূলক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে যাঁর একমাত্র লক্ষ্য তাঁর দেশবাসীকে উন্নতমানের জীবনযাত্রায় উন্নীত করা এবং অন্যান্য জাতিগুলির পুরোভাগে তাঁদের স্থান করে দেওয়া। তা ছাড়া, আমার সাথে যখন তাঁর দেখা হয় তখন ক্রমে ক্রমে তাঁর উগ্রতা কমে আসছে। তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই আরো বেশি ধীর, স্থির এবং চিন্তাশীল। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সময় নিতেন। বিশেষতঃ কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় যত্নবান হতেন আরো বেশি। মূলতঃ তিনি ছিলেন একজন গঠনমূলক বাস্তববাদী। সমস্ত রকম বিরোধীতা সত্ত্বেও তাঁর শাসনতন্ত্র আমার মন কেড়ে নিয়েছিল। আমার বিশ্বাস যৌবনে মুসোলিনি

কেবলমাত্র একজন সাধারণ বিপ্লবীই ছিলেন না, উপরন্তু চোখে তাঁর স্বপ্ন ছিল একটি সুনির্দিষ্ট নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার। এবং সত্যি কথা বলতে কি তিনি যদি ক্ষমতা চেয়ে থাকেন তবে তা নিজের জন্য নয় বরং তিনি তা চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের সেই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার তাগিদেই।

কাউন্সেল ঃ ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ লুড উইগ। আপনার এই সাক্ষ্য বিশেষ ভাবে মূল্যবান। যথার্থ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন আপনি। যাইহোক, আপনার পক্ষে দাবি করার কারণ আছে, এবং আরো অনেক সাক্ষীর দাবিও করতে পারেন যে, আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বিখ্যাত একজন ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত। তাঁকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডেকে আনবার প্রস্তাব আমি রাখছি না কিন্তু তাঁর প্রামাণিক বিবৃতি সংশয়াতীত ভাবে মূল্যবান। এখন আমি আদালতের সামনে মিঃ উইন্সটন চার্চিলের সেই বক্তৃতার ভাষ্য পড়ে শোনাব যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন মিঃ বল্ডউইনের অধীনে রাজস্ব দফ্তরের চেয়ারম্যান থাকা কালে। ১৯২৭ সালের ২০-শে জানুয়ারি তারিখে রোমে ইটালির এবং বিদেশের সাংবাদিকদের সামনে ঐ বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন। পড়ে শোনান হয়ে গেলে এটি জুরীবৃন্দের কাছে জমা দেওয়া হবে প্রামাণিক নথি হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য। অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় নথি হিসাবে যেগুলি জমা দিয়েছেন তার সাথে এটিও রাখা হবে। মিঃ চার্চিল বলেছেন. "অনেকের মত আমিও অবাক না হয়ে পারিনি কঠিন দায়িত্ব এবং বিপদের মধ্যেও মুসোলিনির বিনীত এবং সহজ আচরণ, নির্বিকার মানসিকতা ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারার ক্ষমতা দেখে। দ্বিতীয়তঃ, সকলেরই চোখে পড়বে যে ইটালির জনগণের স্থায়ী মঙ্গল ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা তাঁর ছিল না। সামান্যতমও আত্মস্বার্থের কোনো অবকাশ সেখানে থাকত না। আমি যদি ইটালির নাগরিক হতাম তাহলে বর্বর ক্ষুধা এবং লেনিনিও ভাবাবেগের বিরুদ্ধে তাঁর সফল যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই সর্বান্তকরণে একজন সহযোদ্ধা হয়ে যুক্ত থাকতাম আপনার সাথে। ফ্যাসিজিমের সাথে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি কথা আমি বলব। বাহ্যত আপনার এই আন্দোলন পৃথিবীর বিরাট একটি উপকার করেছে। যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বা শ্রমিক আন্দোলনের নেতাকে যে ভীতি আচ্ছন্ন করে রাখে সমস্ত সময় তা হ'ল. এই যে. অনুরূপ আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যাঁরা চরমপন্থী তাঁদের কাছে তিনি খাটো হয়ে যেতে পারেন বা চক্রান্তের শিকার হতে পারেন। ইটালি দেখিয়েছে, এই সব অন্তর্ঘাত মূলক

শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার একটা পথ আছে যাতে জনগণকে যথার্থ নেতৃত্বের মাধ্যমে সভ্য সমাজের স্থায়িত্ব ও সম্মান রক্ষা করার ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। রাশিয়ার বিষের প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকের সন্ধান দিয়েছে ইটালি। বলশেভিজমের ক্ষতিকারক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপায় কোনো দেশের আর অজানা থাকবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই পর্যায়ে আমি কেবলমাত্র আর একজন সাক্ষীকেই ডাকব। তারপর আপনাদের কাছে অনুমতি চাইব এই সব সাক্ষ্য, যা আমার সাথে আপনারাও শুনলেন, তাঁর ভিত্তিতে আমার সওয়াল শুরু করবার। জনৈক চেম্বারলেইন কে ডেকে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়েছিল। শেষ করব আর একজন চেম্বারলেইনকে ডেকে। মিঃ নেভিলে চেম্বারলেইন এখন কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াবেন। পরবর্তীকালে আরো একবার, তাঁকে ডাকবার অধিকার আমার থাকবে যদি অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় চান মামলা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে।

[ মিঃ নেভিলে চেম্বারলেইন কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল ঃ** ১৯৩৮ সালে ইটালির সাথে আপনি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, বৈদেশিক ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে ঐ চুক্তি। হয়ত এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করবার দরকার হতে পারে। যাই-হোক সেই উপলক্ষে আপনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁর শেষের দিকে আপনি ইটালির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়েও মতামত দিয়েছিলেন। অনুগ্রহ করে যদি সেই অংশটুকু পুরোটাই পড়ে শোনান তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

**মিঃ চেম্বারলেইন ঃ** অতীতে ইটালির সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়, আমাদের সমর্থন এবং সহানুভূতি নিয়ে কেভুর, মাজিনি এবং গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে ইটালি তাঁর স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। আজ আর এক নতুন ইটালির জন্ম হয়েছে। সিগনর মুসোলিনির মত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় এই নতুন ইটালি এক নতুন প্রাণবন্ততার নিদর্শন সৃষ্টি করেছে যা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে প্রশাসনে তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন রকমের কর্মতৎপরতা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নত করে তোলার নানান রকম ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আমাদের উভয় দেশের মধ্যকার ক্ষণস্থায়ী কিছু মত পার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে এই যে চুক্তি বর্তমানে স্বাক্ষরিত হ'ল, তাঁর দ্বারা আমি বিশ্বাস করি, নতুন ইটালির সাথে যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তা হবে ততখানিই দৃঢ় যতখানি অতীতে ছিল।

**কাউন্সেল ঃ** মাননীয় জুরীবৃন্দ, যথেষ্ট ধৈর্যের সাথে আপনারা একের পর এক নানান সাক্ষীর সাক্ষ্য মনযোগ দিয়ে শুনলেন। আমি নিশ্চিত যে সেই সাক্ষী-দের খ্যাতি বা তাঁদের প্রতিনিধিত্বের জগতের ভিন্নতা নিয়ে আপনাদের মনে প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। বিদেশ দপ্তরের একজন রক্ষণশীল সচিবের সাক্ষ্য যেমন আপনারা শুনলেন, তেমনই শুনলেন একটি সুপরিচিত সংবাদপত্রের মালিকের সাক্ষ্য যাঁর পত্রিকা ছিল একসময় ব্রিটেনের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা। শুনলেন এমন একজন সুপরিচিত সাংবাদিকের সাক্ষ্য যার সুযোগ হয়েছিল অসংখ্যবার বিদেশ ভ্রমণের এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা সমূহ জানতে পারার। শুনলেন একজন সুপরিচিত এবং বোধহয় সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত একজন আধুনিক ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য। আপনারা আরো শুনলেন একদা অর্থদপ্তরের একজন রক্ষণশীল চ্যান্সেলরের বক্তৃতার উদ্ধৃতি, পরবর্তীকালে যিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। পরিশেষে আরো একজন প্রধানমন্ত্রী তথা অন্যতম একজন কনজারভেটিভ পার্টির বক্তৃতার অংশও সাক্ষ্য হিসাবে শুনলেন যে বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন ঐ দুইটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে।

মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, বিশেষ কয়েকটি তারিখ স্মরণে রাখবার কথা আমি আগেও বলেছিলাম, যেমন যে তারিখে ম্যাটিওটি খুন হয়েছিলেন, যে তারিখে বন্দী প্রথম অন্যদেশ কর্ফুতে হস্তক্ষেপ ঘটালেন ; তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনাকাল সনাক্তের সেই সব উগ্র বক্তৃতা এবং হিংসাশ্রয়ী ঘটনাবলীর তারিখগুলি যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় এবং তারপর তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি। সেই আমি আবার সেই তারিখগুলি স্মরণ করতে বলছি। এবার আপনারা ভেবে দেখুন যে বন্দীর চরিত্র সম্বন্ধে বা তাঁর শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সাক্ষীদের যে মতামত প্রকাশ করতে আমরা দেখলাম সেই সব মতামতগুলি কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল ঐ সব উল্লিখিত তারিখগুলির পরবর্তী সময়ে। বন্দীকে স্যার অসটেন চেম্বারলেইন ব্যক্তিগতভাবে যে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন তা ম্যাটিওটির মৃত্যুর এবং ইটালির পার্লিয়ামেণ্ট ভেঙে দেওয়ার পরেই। 'লর্ড রোদের মেয়ার-এর শ্রদ্ধা, মিঃ ওয়ার্ড প্রাইসের ভবিষ্যদ্বাণী, ও মিঃ এমিল লুড উইগের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন, বন্দীর ব্যক্তিত্বের প্রতি এবং সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর নির্ভিক প্রচেষ্টার প্রতি মিঃ উইন্সটন চার্চিলের প্রশংসা সবই জ্ঞাপন করা হয়েছিল পরবর্তীকালেই অর্থাৎ বন্দী কর্তৃক অভিযোগক্রমে কৃত অপরাধগুলি সম্পন্ন হয়ে

যাওয়ার পরে এবং কখনও কখনও অনেক পরে। এহ বাহ্য, আদৌ সেগুলি অপরাধ কিনা, অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের ভাষায় যা এই রকম যে বন্দী অত্যন্ত নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতার পথে নিজেকে ইটালিতে ফ্যাসিস্ত একনায়ক হিসাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পার্লিয়ামেণ্টের বিনাশ ঘটিয়ে, মত প্রকাশের অধিকার খর্ব করে এবং ইটালি থেকে সমস্ত মুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্বাসিত করে।

এখন আমার মনে হয় আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে, এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষ্যগুলি সমগ্র এই মামলাকে নতুন এক প্রেক্ষাপটে এনে হাজির করেছে। এই সব সাক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করে আমি তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুব, আমার মনে হয়, অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় হয়ত সে নিয়ে বিতর্কে যেতে চাইবেন না।

প্রথমতঃ এই সব সাক্ষ্যগুলি প্রমাণ করে যে ব্রিটেনের রক্ষণশীল মতবাদীদের একটি বিরাট অংশ বাদী কর্তৃক ইটালিতে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের কেবল যে অনুমোদনই করেছিলেন তাই নয়, উপরন্তু সে প্রসঙ্গে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসার নিদর্শনও আছে। এই নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবার কালে অন্যায় হয়ত কোথাও ঘটলেও ঘটে থাকতে পারে ( যদিও সাক্ষীগণ আদৌ কেউ সে রকম কোনো কিছুর উল্লেখ করেন নি ) কিন্তু এই সব সাক্ষীদের মতে ইটালিতে এই ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি প্রকৃত পক্ষে একটি অভিনব সাফল্য যার জন্য নিন্দা নয়, বরং অভিনন্দনই প্রাপ্য হয় বন্দীর। তাঁদের বিবেচনায় ম্যাট্টেওটির খুন হওয়ার ঘটনা বা পার্লামেণ্টের দমন বা কর্ফুর উপর আক্রমণের ঘটনা কোনোটাই এমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যাঁর দ্বারা তাদের বিচার বা মতামত কোনোভাবে প্রভাবিত হতে পারে। বন্দীর কৃতিত্ব যতটুকু, তাঁদের বিবেচনায় যা কৃতিত্ব হিসাবেই গণ্য হয়েছে, তাঁর তুলনায় অভিযোগের বিষয়-গুলি নেহাৎ-ই গুরুত্বহীন।

এইটিই হ'ল আমার প্রথম সিদ্ধান্ত। লক্ষনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সাক্ষীগণ কেবলমাত্র বন্দীর কৃতিত্বের প্রশংসা করেই নিবৃত্ত থাকেন নি। প্রকৃত-পক্ষে বন্দীর সে সব কাজে তাঁরা সহযোগিতাই করেছিলেন। যেমন ধরা যাক, স্যার অসটেন-এর ইটালি ভ্রমণের কথা। সময়টা তখন এমনই যে তাঁর সামান্য কিছুদিন আগে ম্যাট্টেওটি খুন হয়েছেন এবং বন্দীর রাজত্বকাল তখন ঐ ঘটনার জন্য গভীরভাবে সংকটাপন্ন, এবং বন্দীর ভবিষ্যৎ তখন অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান। ঠিক এই সময়ই স্যার অসটেন-এর ইটালি ভ্রমণ-এর মধ্য দিয়ে

বন্দীর শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁর কর্যকরী সমর্থন প্রত্যক্ষ সহযোগিতার রূপ নিয়েছে। তিনি নিজে এবং সেই সাথে দেশের সংবাদপত্রগুলি কেউই, পিছপা হননি এই মতামত প্রকাশ করতে যে, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যা কিছুই ব্যর্থতা ঘটে থাকুক না কেন, বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নতুন শাসনতন্ত্র ক্রমাগত বিজয় এবং সম্মান অর্জন করে চলেছে। ইটালিতে বিরোধী শক্তিরা তখনও বেশ প্রবল এবং গোপন আন্দোলনও চলছে যথেষ্ট। ঠিক এই সময়ই স্যার অসটেন-এর ইটালি ভ্রমণ, খোদ রোমের মাটিতে দাঁড়িয়ে মিঃ চার্চিলের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, রোদের মেয়ারের তরফ থেকে বন্দীর স্বপক্ষে বিশ্বব্যাপী সপ্রশংস প্রচার প্রভৃতি ঘটনাগুলি যে তাৎপর্যের দিক দিয়ে একই সাথে তৎকালীন সেই আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত এবং বন্দীর প্রতি অকৃপণ সহযোগিতার নিদর্শন—সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাস্তবিকই,ভ দ্রমহোদয়গণ, সে সময় এমন সব শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, এমন সপ্রশংস সমর্থন, কিংবা যুদ্ধে জয় লাভের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক ব্যাপারে সম্মান পুনরুদ্ধারের গৌরব প্রভৃতির বদলে যদি সেদিন বৈদেশিক শক্তি-গুলির দ্বারা সামগ্রিকভাবে পরিত্যক্ত হতেন তিনি অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় বর্ণিত অপরাধগুলির জন্য তাহলে কি আর বন্দীর পক্ষে সম্ভব হত ক্ষমতায় টিকে থেকে এবং পরবর্তীকালে বাদীপক্ষের অভিযোগ ক্রমের বাকি অপরাধগুলি সাধন করা? উত্তর নেহাৎ-ই অনুমান নির্ভর। কিন্তু যেহেতু কেবলমাত্র ঘটনারই অনুগত থাকতে চাই আমি তাই, আমরা শুধু এইটুকুই বলব যে, সাক্ষীদের ভূমিকা কেবলমাত্র বন্দীর প্রশংসাতেই শেষ হয়ে যায় নি, উপরন্তু ধারাবাহিকভাবে তাঁরা বন্দীকে সহযোগিতা করে গেছেন। এখন আমি আমার তৃতীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছুব। এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত এই প্রথম অভিযোগটিতে বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কিনা সে প্রশ্নটি ঘটনার বা আইনের নয়। প্রশ্নটি একান্তভাবেই রাজনীতির, যে ব্যাপারে পরস্পরের থেকে ভিন্ন নানারকম মত পোষণ করা হয়ে থাকে। মতামতের এই ভিন্নতা যে ভবিষ্যতেও থাকবে তা বলা বাহুল্য। মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন এবং লেবার পার্টি হয়ত তাঁকে ম্যাট্টেওটির খুনি হিসাবে, নষ্টামির শিরোমণি হিসাবে অথবা শান্তি বিনষ্টকারী একজন হিসাবে মনে করতে পারে, কিন্তু কনজারভেটিভ পার্টির বিপুল সংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তিদের দেখা গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতে। বাস্তবিকই আপনারা শুনলেন যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে বন্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র আমাদের এই দেশের জন্য একটি মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হোক। এই আদালত কি বসেছে, রাজনৈতিক দলগুলির অতীতের বিস্তৃত মতবাদের বিচার করার জন্য?

কিংবা সেই মতবাদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধান করার জন্য ? আমাদের কি উচিত ছিল না জুরীবৃন্দের প্রত্যেকের রাজনৈতিক মতামত এবং তাঁদের রাজনৈতিক অতীত পরীক্ষা করে দেখার ? একদা বিশ বছর আগে স্যার অসটেন চেম্বার-লেইনের অনুসরণকারী এবং স্তাবক হিসাবে অথবা 'ডেইলি-মেল'-এর পাঠক হিসাবে যাঁর প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ ছিলেন এবং সাগ্রহী সহযোগী ছিলেন কোনো অধিকার কি আর তাঁদের আজ থাকতে পারে বন্দীকে নিন্দিত করবার ?

ভদ্রমহোদয়গণ, এই সব প্রশ্নগুলি, নিশ্চিতভাবে আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরবে — অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় এবং এ দেশের সরকার এ হেন একটা বিষয়কে অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদেরকে কোন অযৌক্তিক এবং হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। বন্দীর রাজনৈতিক জীবনের ফেলে আসা সেই পর্বের কৃত কর্মগুলিকে যদি সত্যিই অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং এখন এই বর্তমানেই যদি তাঁর বিচার করতে হয় তবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি কখনই এই আদালতের হতে পারে না। বরং তা হওয়া উচিত হাউস অব কমনসে, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে পুরাতন মতবাদ পরিত্যাগ সংক্রান্ত আলোচনার সিদ্ধান্তে। মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় বরং তাঁর বাগ্মীতা সেইখানেই প্রদর্শন করুন। কনজারভেটিভ-কূলকে আগে দীক্ষিত করুন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তথা নানা দেশে তাঁর নানা কৃতকর্মের বিরুদ্ধে মহতী ঘৃণার মতবাদে। ভদ্রমহোদয়গণ, যেভাবে এই বিষয়টি আদালতের সামনে হাজির করা হয়েছে তাঁর মধ্যে কপটতার গন্ধ পাচ্ছি আমি। এর চেয়ে বেশি আমি আর এগোতে পারছিনা এ বিষয়ে। বন্দীর defence-ই আমার দায়িত্ব। বলতে চাই যে, এই বিষয়টিকে অভিযোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় সরকার পক্ষের এই মামলাকে হাস্যকর করে তোলার চেয়েও অতিরিক্ত আরো কিছু করেছেন। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তিনি বন্দীর বিরুদ্ধে জুরীবৃন্দকে বিষিয়ে তুলেছেন। মহামান্য আদালতের কাছে আমি আবেদন রাখছি এই অভিযোগ বাতিল করে দেওয়া হোক।

( বিচারপতি এবং অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের মধ্যে অতি দ্রুত আলোচনা সারা হ'ল )

বিচারক ঃ আদালত আবার কাল বসবে পরবর্তী শুনানীর জন্য।

CENTRAL LIBRARY

## তৃতীয় দিন

**বিচারক ঃ** সমস্ত অভিযোগ বাতিল করে দেওয়ার পক্ষে আসামীর পক্ষের কাউন্সেল-এর আবেদন আমি বিবেচনা করেছি। অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের সাথেও আমি আলোচনা করেছি। যেহেতু এ মামলায় অভিনবত্ব আছে এবং যেহেতু আসামী পক্ষের কাউন্সেল এ পর্যন্ত অভিযোগের কেবল একটি অংশ নিয়েই সওয়াল করেছেন, সুতরাং গোটা অভিযোগটাই বাতিল করে দেওয়ার আবেদন, যদি তাঁর আবেদন তাই হয়ে থাকে, মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যাইহোক, অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের সাথে আলোচনা করে একটি মীমাংসায় পৌছুন গিয়েছে। তিনি আমায় বলেছেন যে ফরিয়াদি পক্ষ যদি খুশি হয় তাহলে তিনি রাজি আছেন অভিযোগের প্রথম অংশটি বাতিল করে দিতে। বাকি অভিযোগগুলি নিয়ে মামলা চালিয়ে যেতে তিনি প্রস্তুত। যদি ফরিয়াদি পক্ষের কাছে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তাঁকে আমি অনুরোধ করব যে অভিযোগের প্রথম অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তিনি যেন তাঁর যা কিছু বলার তা কেবল বাকি অভিযোগগুলি সংক্রান্ত আলোচনাতেই নিবদ্ধ থাকেন।

**কাউন্সেল ঃ** আমি খুশি। এই সানুগ্রহ আদেশনামার জন্য। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আমি আশা করব যে অভিযোগের বাকি অংশ নিয়ে আলোচনার আগে যদি এই অভিনব সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় সামান্য বেশি কিছু সময় দাবি করি তবে তা ধৃষ্টতা বলে বিবেচিত হবে না। এই সিদ্ধান্তের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বন্দীর ফ্যাসিস্ত মতবাদ বা ইটালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনুসৃত পথ প্রভৃতির কারণে যে বিরুদ্ধ মনোভাব জুরীবৃন্দের মনে সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁরা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলবেন। যা বললাম তা এখন আর কেবলই ফরিয়াদি পক্ষের একটি দাবি মাত্র নয়, এ আবেদনের যথার্থতা মেনে নিয়েছেন স্বয়ং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ও সহমত হয়েছেন যে, বন্দীকে ফ্যাসিস্ত হিসাবে অভিযুক্ত করলে এমনই সব জটিলতা এবং কূট তর্ক এসে পড়বে যে ঐ অভিযোগের ব্যাপারটি নিয়ে আর না এগোনই ভাল। অর্থাৎ বৈদেশিক নীতি ও তাঁর প্রয়োগ ঠিক যে রকম প্রচলিত থাকার কথা ছিল সে সময়, তাঁর সাথে সাযুজ্য স্থাপিত হলো আদালতের কার্যক্রমের পরিচালন। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন স্যার অসটেন চেম্বারলেইন যে, অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই আদালতেও সেই একই বক্তব্য রাখা হয়েছে যে, বন্দীর যে কার্যকলাপ একান্তভাবেই তাঁর নিজের দেশের মধ্যে

সীমাবদ্ধ তা এই আদালতের বিচার্য হতে পারে না ।

অতঃপর এখন আসা যাক্ অভিযোগের বাকি অংশগুলির আলোচনায় । আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে যদি অভিযোগ তালিকায় উল্লেখিত উদাহরণ-গুলির কয়েকটি একসঙ্গে নিয়ে আলোচনা করি এবং আশা করব আদালত তা অনুমোদন করবে । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, একদা স্বেচ্ছায় যে সব আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রগুলি তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন পরবর্তীকালে নিজেই তা ভেঙেছেন একের পর এক । বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আবিসিনিয়ার ওপর বিশ্বাসঘাতী আক্রমণ এবং স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যুদ্ধের ঘটনা । অভিযোগ আছে আরো, মুক্ত পৃথিবীর নানা প্রান্তে হিটলার যে অন্যায় আক্রমণ চালিয়েছিলেন, বন্দী তাতে ক্রমবর্ধমান হারে মদত যুগিয়ে গেছেন । এই গুলিই হচ্ছে সেই উদাহরণ যেগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি আমি । কেবলমাত্র বর্তমান যুদ্ধের বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করব আলাদাভাবে । কারণ আমার যুক্তিতে তা সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ।

আমি আশঙ্কা করছি যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী জেরা শুনবার ধৈর্যশীল মনযোগ আর একবার আমায় দাবি করতে হতে পারে আদালতের কাছে । তার আগে কিছু মন্তব্য সহকারে প্রাক্-কথন সেরে নেব যাতে আমার যুক্তি প্রণালী সহজে অনুধাবন করা যায় ।

প্রথমতঃ আমরা দেখলাম, অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় মাত্রাতিরিক্ত ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেই বিষয়টির উপর, তাঁর নিজের ভাষায় যা হ'ল—বন্দীর বিশ্বাসঘাতকতা (treachery) । বিশ্বাসঘাতকতা ! কার প্রতি ? রাষ্ট্রদ্রোহীতা (treason) একটা অপরাধ বটে এবং মেনে নেয়ার মত তার একটা সংজ্ঞা আছে । সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সে ক্ষেত্রে আবশ্যিক যার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মর্মার্থ্য অনুধাবন করা যেতে পারে । Treachery শব্দটা যেহেতু Treason শব্দের উৎপাদক সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এক্ষেত্রে বোধহয় treachery শব্দটাকে তার যথার্থ অর্থে ব্যবহার করা হয় নি । কারণ অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় treachery 'র উদাহরণ দিতে গিয়ে এখানে কেবল কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করার কথা উল্লেখ করেছেন । সুতরাং প্রশ্ন থেকেই যায় অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় যথার্থ কি বোঝাতে চেয়েছেন । মনে হয় তিনি ঐ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন অতি সরলীকৃত এবং অতি সাধারণ কোনো অর্থে । বন্দীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ এই যে, বন্দী তার সেইসব আস্থাভাজনদের বারবার বঞ্চিত করেছেন একদা যাঁরা

তাঁর মুখের কথায় তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন বা তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন। যদি অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় সত্যিই কেবল সেইটুকুই বোঝাতে চেয়ে থাকেন, এবং আমার বিশ্বাস অবশ্যই তা ছাড়া আর কিছু নয়, তাহলে অবাক হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকে না এই ভেবে যে, আদৌ কি এরকম অভিযোগ আনবার কোনো কারণ থাকতে পারে ? আমার মনে হয় বৈদেশিক ব্যাপারে বন্দী নিজেকে আধুনিক কালের অন্যতম একজন সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রমাণ করেছেন। ১৯২৩ সালে কর্ফু আক্রমণের ঘটনা থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সালে আলবেনিয়া আক্রমণের ঘটনা পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রে যে নীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন তা অপরিবর্তনীয়ভাবে সর্বত্র একই রকমের এবং হয়ত বলা যেতে পারে যে, আদতে তা একই আচরণের গ্লানিকর পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাঁর এই আচরণের উপযুক্ত তুলনা বোধহয় অনুরূপ সুসংবদ্ধ আর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লেডি অ্যাস্টর, যিনি একদা উগ্র জার্মান বিরোধী ছিলেন ১৯১৯ সালে, কিন্তু সেই তিনিই আবার জার্মান সমর্থক হয়ে পড়লেন ১৯৩৮ সালে। পরিশেষে, ১৯৪৩ সালে ফের ফিরে গেলেন প্রচণ্ড জার্মান বিরোধিতায়।

আদালতে আমার বক্তব্যের আগেই এই তথ্যের উল্লেখ এসে পড়েছিল যে, বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বন্দীর মতবাদ ঘোষিত হয়েছিল অনেক আগেই এবং পরবর্তীকালে তা কার্যকর করা হয়, তাও অনেক আগে, সেই ১৯১৯, ১৯২০ এবং ১৯২১ সাল নাগাদ। এবং পরবর্তীকালেও তাঁকে দেখা গেছে একইভাবে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে অগ্রিম অবহিত করেছেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। সেই সময় সেখানে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে জানিয়ে এসেছিলেন তাঁর সমুদ্র অভিযানের অভিপ্রায়ের কথা এবং মেডিটারেনিয়ানে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবার আকাঙ্ক্ষার কথা। ১৯২৭ সালের মে মাসে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন — "১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সালের ইউরোপ তার ইতিহাসের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে গিয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে ইটালি অবশ্যই পঞ্চাশ লক্ষ নতুন আরো মানুষকে সামরিক বাহিনীতে উপযুক্ত সৈনিক হিসাবে পেতে সক্ষম হবে। ফ্যাসিজিম যে আমদানীযোগ্য পণ্য নয় এই পুরোনো তত্ত্বকে অস্বীকৃতি জানিয়ে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে তা থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। তিনি বললেন — "এ তত্ত্ব আমার পক্ষে বিরাট ভুল। আজ আমি আমার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি যে ফ্যাসিজিমের ধারণা, তত্ত্ব বা অনুভব সার্বজনীন। আগামীতে এমন

বৃহত্তর অংশের অনুমোদন লাভ করেছে অথচ বন্দীর কাছ থেকে অমর্য্যাদা পেয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেমন করে বা কোন যুক্তিতে যে তিনি আদালতের কাছে বন্দীর শাস্তির জন্য আবেদন করেন তা আমার বোধের অগম্য।

জুরীবৃন্দের কাছে একটি অনুরোধ আমি রাখব যে তাঁরা যেন এই কথাটা মনে রাখেন যে, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের কালে আমার লক্ষ্য কিন্তু এটা নয় যে প্রশ্নগুলিকে এমনভাবে সাজাব যাতে সমদোষে দোষী আরো অনেকের নাম এসে পড়ে এবং তখন তারই রেশ টেনে বন্দীর নির্দোষণীয়তা প্রমাণ করব। তা করলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। আরো অনেকেরই যে এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার কথা সে কথা যতই সত্যি হোক না কেন, সে নজির আমার মক্কেলের গর্দান বাঁচাতে পারবে না। কেবল এইটুকু প্রমাণ করা আমার লক্ষ্য নয় যে, যে আন্তর্জাতিক নৈতিকতা অমান্য করার অভিযোগে বন্দী অভিযুক্ত তাঁর সংজ্ঞা কোনোদিনই বৃহৎ সংখ্যক খ্যাতনামা এবং দায়িত্ববান ব্যক্তিদের ধারণার ঐক্যমতে নিরূপিত হয়নি। আমি চেষ্টা করব এটাও প্রমাণ করতে যে আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ বা নৈতিকতার মাপকাঠি যেটুকুবা স্থিরীকৃত ছিল, তাঁর নিরিখে বিচার করলে বন্দী বরং তুলনামূলকভাবে নির্দোষী-ই প্রতীয়মান হয়।

এখন আমি আমার প্রথম সাক্ষী লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড সিমনকে ডাকব।

[ লর্ড সিমন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল ঃ** লর্ড সিমন, কবে আপনি বিদেশ দপ্তরের সচিব হলেন ?

**সিমন ঃ** ১৯৩২ সালে

**কাউন্সেল ঃ** কবে আপনি এই দপ্তর থেকে বিদায় নিলেন ?

**সিমন ঃ** ১৯৩৫ সালে।

**কাউন্সেল ঃ** লর্ড সিমন, আপনার এই মেয়াদকালের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার নেই। যেমন ধরুন জাপানের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল, তা জানবার আগ্রহ আমার নেই। আমরা কেবল-মাত্র বন্দীর ব্যাপারটিতেই আগ্রহী। যাইহোক, আমি আপনার সাহায্য চাইব এমন কতকগুলি মূল ব্যাপারের প্রতিপাদনের জন্য, যার সাথে ইটালির ব্যাপারের কোনো না কোনো সম্বন্ধ যে আছে তা আমি দেখাতে পারব আশা করতে পারি। ১৯৩২ সালের ৭ই মার্চ, আমার মনে আছে, লীগ অ্যাসেম্বেলীতে আপনি ভাষণ দিয়েছিলেন। আপনার সেই বক্তৃতায় যুদ্ধের দ্বারা বিজিত দেশগুলির প্রতি লীগ

অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির কর্তব্যের তথা দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ ছিল। এই দায়বদ্ধতার যথার্থ তাৎপর্য এই আদালতে আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করে শোনাবেন কি ?

**সিমন ঃ** এ জাতীয় পরিবর্তনের যেগুলি শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়া বা আপোষরক্ষার মাধ্যমে না ঘটে অন্য কোনো উপায়ে তথা প্যারিস চুক্তির সিদ্ধান্তের অন্যথায় ঘটেছে সেই সব পরিবর্তন কখনই অ্যাসেম্বেলী অব নেশনস-এর অন্তর্ভুক্ত দেশ-গুলির অনুমোদন পেতে পারে না, কারণ অ্যাসেম্বেলী অব নেশনস-এর অস্তিত্ব ঐ বিশেষ দায়বদ্ধতা এবং নীতিগুলিকে মেনে চলবার জন্যই।

**কাউন্সেল ঃ** যে দিন আপনি এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার চারদিন পর লীগ অ্যাসেম্বেলীর সভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল প্রধানত আপনার উদ্যোগেই। সেই গৃহীত সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত শর্তগুলি কি আপনি আমাদের জানাবেন ? এ ব্যাপারে আপনার কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়, কারণ অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় এই আদালতে তা আগেই উল্লেখ করেছেন যেহেতু জেনিভাতে ঐ সভায় বন্দীর প্রতিনিধি ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর সম্মতি এবং সহমত জ্ঞাপন করেছিলেন।

**সিমন ঃ** অ্যাসেম্বেলী ঘোষণা করে যে "লীগ অব নেশনসের" অন্তর্ভুক্ত দেশ-গুলির উপর এই দায়বদ্ধতা থাকল যে এমন কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা চুক্তি বা আপোস রফা যা লীগ অব নেশনসের সিদ্ধান্তের অথবা প্যারিস চুক্তির শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচার বা অন্যথা সৃষ্টি হয়েছে, তা তাঁদের স্বীকৃতি পাবে না।

**কাউন্সেল ঃ** বিদেশ সচিব হিসাবে বন্দীর সাথে প্রথম কবে আপনার রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘটল ?

**সিমন ঃ** চতুঃশক্তির চুক্তির (Four Power Pact) সময়

**কাউন্সেল ঃ** কত তারিখ ?

**সিমন ঃ** ফোর-পাওয়ার প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়েছিল রোমে ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইটালির মধ্যে।

**কাউন্সেল ঃ** কি উদ্দেশ্য ছিল এই চুক্তির ?

**সিমন ঃ** এই চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী চারটি দেশকে শপথপূর্বক ঘোষণা করতে হয়েছিল প্রথমত তাঁদের ইউরোপ সংক্রান্ত কূটনীতির সমন্বয় সাধনের অভিপ্রায়। দ্বিতীয়ত শান্তি চুক্তির (Peace Settlement) সংশোধন করার কথা বিবেচনায় আনবার জন্য মানসিকভাবে তাঁরা প্রস্তুত। তৃতীয়ত

"উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব কূটনীতিকে পূর্ণতা দান করার তথা অখণ্ড রূপ দেওয়ার" আকাঙ্ক্ষা।

**কাউন্সেল :** অভিপ্রেত সেই ইউরোপীয় কূটনীতির সমন্বয় ঘটাতে কি আপনি পেরেছিলেন ?

**সিমন :** সেই চুক্তিকে কখনই কার্যকর করা যায়নি। কারণ ফ্রান্স তা বলবৎ করতে অস্বীকার করে।

**কাউন্সেল :** আমার মনে হয় লর্ড সিমন, আপনি নিজের প্রতি অবিচার করলেন। এর মধ্যে দিয়েই কি সেই কূটনীতির যাত্রা শুরু হলো না যার সানন্দ পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল মিউনিখে ১৯৩৮ সালে ? অবশ্যই তাই। যাই-হোক আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আমি এই আলোচনার মাঝখানে দুই-একটি মন্তব্যের উল্লেখ করতে চাই। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাসাধিক কাল আগে বন্দী জেনিভা চুক্তি-কে নানান ভাষায় আক্রমণ করে চলছিলেন। "আলোচনা করে নীতি নির্ধারণ করার পদ্ধতির অবসান ঘটেছে" — এই কথা তিনি বলেন এবং সে পদ্ধতি বর্জনীয় মনে করেন কারণ তাঁর মতে তা হলো "চিরকালের এক প্রচলিত অলীক গল্প। না আছে বাস্তবে তার অস্তিত্ব, না ছিল তা অতীতে কোনোদিন। এই বিশেষ মানসিকতা নিয়েই তিনি চতুঃশক্তি চুক্তির কর্মসূচির প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং যে দ্রুততায় আপনি এবং প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকোনাল্ড তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ছুটলেন তাতে তাঁরই নীতির বিজয় ঘোষিত হলো আনকথানি। এই চতুঃশক্তি চুক্তির ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে বন্দীর অনুকূলে গেল। ইউরোপীয় শক্তির সম্মেলনে রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পূর্ব ইউরোপ এবং বল্কান ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলির তীব্র আপত্তি ছিল এই চুক্তির বিরুদ্ধে। এই চুক্তি প্রকারন্তরে বিরাট এক আঘাত হয়ে নেমে এসেছিল ফ্রান্সের সম্মানের উপর, বিশেষত পোল্যাণ্ডের সাথে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে. যে পোল্যাণ্ড এই সময় থেকেই প্রথম জার্মানীর কূটনীতির অনুসরণে এবং সেই অভিমুখে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সংহত করার প্রয়াস নিয়ে ছিল।[১]

বাস্তবিকই ক্ষুদ্র শক্তিগুলির চোখে ব্রিটেনের তরফে এই চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হওয়ার অর্থ লীগের প্রতি দায়বদ্ধতার শর্ত অমান্য করা। সন্দেহ নেই এতে বিষয়টিকে একটু বেশি বড় করেই দেখা হয়েছিল, বিশেষত যখন কিনা তা আদপে কোনো কার্যকর রূপই পেল না। সে যাইহোক, আমি আশা করব আমার এই প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার ব্যাপারটি আপনারা নিশ্চয়

ক্ষমা করবেন। আমি চেয়েছি কেবল এইটুকুই প্রমাণ করতে যে সে সময় বন্দীর একটি সুস্পষ্ট এবং ঘোষিত নীতি ছিল এবং তা এতটাই নিরাবরণ ছিল যে প্রাগের পার্লামেন্টে ডাঃ বেনেস[২] ( চেক প্রেসিডেন্ট ) তা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে এর লক্ষ্য হলো প্রথমত বৃহৎ শক্তিবর্গের জন্য বিশেষ মর্যাদা নিশ্চিত করা, বিশেষত মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশগুলির তুলনায়। দ্বিতীয় বৃহৎশক্তিবর্গের মধ্যে এমন একটা নতুন ভারসাম্য স্থাপন করা যার লক্ষ্য ফ্রান্স এবং তার মিত্র দেশগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া। তৃতীয়ত এমনভাবে পুরনো চুক্তিগুলির সংশোধন করা যাতে ক্ষুদ্র দেশগুলির সংহতি (little ententie) এবং পোল্যাণ্ড ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। চতুর্থত ইটালিকে বিশেষ ঔপনিবেশিক সুবিধা প্রদান করা। এখন, লর্ড সিমন, আপনি বলবেন কি রোমের এই মিটিং-এর পর আর কোনো উল্লেখ করবার মত উপলক্ষে বন্দীর সাথে আপনার যোগাযোগ হয়েছিল ?

**সিমন ঃ** স্ট্রেসা শহরের ইসোলো বেলা-এর বোরোমিও প্যালেসে। উপলক্ষ্য স্ট্রেসা সম্মেলন।

**কাউন্সেল ঃ** আপনি ছাড়া আর কে কে ছিলেন সেখানে ?

**সিমন ঃ** মুসোলিনি, ফ্রানডিন, লাভলে এবং র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড[৩]

**কাউন্সেল ঃ** তাৎপর্যপূর্ণ সমাবেশ। কিন্তু কি লক্ষ্য ছিল এই সম্মেলনের ?

**সিমন ঃ** জার্মানী তখন সদ্য ভার্সাই সন্ধির (versailles treaty) নিরস্ত্রীকরণ শর্তের বিরুদ্ধাচারণ করে বাধ্যতামূলক সৈন্যবিভাগে নিযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। তিন বৃহৎশক্তি তাঁদের লক্ষ্যের অভিন্নতা ঘোষণা করে পুনরায় অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার স্বপক্ষে পুরোনো সিদ্ধান্তে আস্থাজ্ঞাপন করেছে। "এককভাবে এমন কোনো চুক্তি লঙ্ঘন, যার ফলে ইউরোপের শান্তি বিপন্ন হতে পারে"। তাকে তাঁরা নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

**কাউন্সেল ঃ** ইউরোপের শান্তি শুধু ?

**সিমন ঃ** হ্যাঁ

**কাউন্সেল ঃ** আফ্রিকার কথা কি কেউ উল্লেখ করেছিলেন ?

**সিমন ঃ** আবিসিনিয়া নিয়ে আলোচনা এসে পড়েছিল প্রক্ষিপ্তভাবে।

**কাউন্সেল ঃ** বন্দী দাবি করেন যে তিনি এই সম্মেলন থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যা তিনি আগেও জানতে পেরেছিলেন মিঃ লাভালের কাছ থেকে যে, ফ্রান্স ব্রিটেন কখনই আবিসিনিয়া নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাত না।

আপনি যা বললেন তা অন্যরকম। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো এই যে, ইউরোপে একতরফা চুক্তি লঙ্ঘনের ব্যাপারটি নিন্দিত হয়েছিল।

**সিমন ঃ** হ্যাঁ অত্যন্ত জোরের সাথে এবং সেই নিন্দা-প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল কয়েক সপ্তাহ পরে জেনিভাতে।

**কাউন্সেল ঃ** এবং এটাও কি ঘটনা নয় যে স্ট্রেসা সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ আগে বার্লিনে আপনি হিটলারের সাথে নৌ-চুক্তির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং স্ট্রেসা সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পরে আপনার উত্তরাধিকারী স্যার স্যামুয়েল হোর অ্যাংলো-জার্মান নৌ-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যার মধ্যে দিয়ে সরাসরি এবং একতরফাভাবে ভার্সাই-সন্ধির পঞ্চম পর্বের উল্লিখিত শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি ঐ তিন বৃহৎশক্তি এবং আরো অন্যান্য দেশ যে বিশেষ ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার কারণ কি এই নয় যে, ঐ চুক্তিতে জার্মানীকে ফ্রান্সের সমকক্ষ হওয়ার মত নৌ-বহর প্রস্তুত করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল যার জোরে সে কিনা বাল্টিকে আধিপত্য করতে পারে ?

**সিমন ঃ** এ প্রশ্নের উত্তর স্যার স্যামুয়েল হোর নিজেই ভাল দিতে পারবেন।

**কাউন্সেল ঃ** আমার মনে হয় একই কথা প্রযোজ্য ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ফার্স্ট লর্ডের প্রতিও।

**সিমন ঃ** অবশ্যই।

**কাউন্সেল ঃ** তাহলে, আপনি হয়ত জানেন যে ফার্স্ট লর্ড সে সময় বলেছিলেন যে, ফ্রান্সকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বিরূপতা কখনই এমন মাত্রা পায় নি যার নিরিখে ঐ বিশেষ চুক্তি, যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ছিল পৃথিবীতে শান্তি নিশ্চিত করবার, তা থেকে সরে আসাটা সঙ্গত বিবেচিত হতে পারত। তিনি আরও বলেন যে ঐ চুক্তির আগে স্বাক্ষরকারী দেশ ভিন্ন অন্যান্য দেশগুলির সাথে আলোচনায় যাওয়ার অর্থ অনৈক্যের রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত চুক্তিটি আর হতে না দেওয়া। আমার মনে হয় লর্ড সিমন, এই সব চুক্তিগুলির অলঙ্ঘনীয়তার ব্যাপারটা অংশগ্রহণকারী দেশগুলির এক এক জনের চোখে এক এক রকম। এমন কি ইউরোপের ব্যাপারে, যার উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে স্ট্রেসা সম্মেলনের সিদ্ধান্তবলীতে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা বাস্তব এবং লক্ষ্যনীয় ছিল। সে ক্ষেত্রে এমনকি হতে পারে না যে বন্দী ভেবেছিলেন, তাঁরও অধিকার আছে নিজের মতন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে আফ্রিকার ব্যাপারটি দেখবার, যার উল্লেখ ঐ চুক্তিতে বিশেষভাবে ছিল না ?

হ্যাঁ। তিনি তাই ভেবেছিলেন। সত্যিই যদি তাঁর সে ভাবনা ভুল হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে আপনারাই বা কতখানি প্রস্তুত ছিলেন তাঁর সম্ভাব্য আবিসিনিয়া অভিযানে বাধা দিতে ?

**সিমন :** না, একেবারেই নয়। আবিসিনিয়ার স্বাধীনতার জন্যে এমনকি একটি মাত্র জাহাজেরও ডুবে যাওয়া মেনে নিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তা সে নৌ-যুদ্ধে সফলতার সম্ভাবনা একশোভাগ নিশ্চিত হলেও নয়। একথা আমি হাউস-অব-কমনসের সভাতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম ১৯৩৬ সালের ২৪-শে জুন তারিখে।

**কাউন্সেল :** ধন্যবাদ আপনাকে, লর্ড সিমন। আমার মনে হয় আপনার চিন্তাধারা আগাগোড়াই খুব স্বচ্ছ ছিল — কেবল ছোট্ট একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে। আজকের আগে আর কোথাও কি আপনার ডাক পড়েছিল যেখানে আজকের মতনই আপনাকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল ঐ মতামত থেকে, ১৯৩২ সালের ৭ই মার্চ শপথপূর্বক যা আপনি ঘোষণা করেছিলেন ?

**সিমন :** আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

**কাউন্সেল :** কখনও কি আপনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন আবিসিনিয়ার সেই পরিবর্তিত অবস্থাকে যা বন্দীর সৃষ্টি এবং যা তিনি সম্ভব করে তুলেছিলেন লীগ অব নেশনস এবং প্যাক্ট অব প্যারিসের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধ পথে গিয়ে ! থাক, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে যে অমর্য্যাদা আপনার ঘটবে, তাঁর মধ্যে ফেলতে চাই না আপনাকে। হাউস অব কমনসের সমস্ত নথি ঘেঁটে দেখতে দেখতে একদিন চোখে পড়ে গেল যে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে অ্যাঙ্গলো-ইটালিয়ান এগ্রিমেণ্টের সমর্থনে আপনি ভোট দিয়েছিলেন যাঁর অর্থ ইটালি কর্তৃক আবিসিনিয়া বিজয়কে স্বীকৃতি দেওয়া।

আমি এখন স্যার স্যামুয়েল হোরকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকতে চাই।

[ স্যার স্যামুয়েল হোর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল :** বন্দীর সাথে আপনার যোগাযোগ প্রথম কবে হয়েছিল ?

**হোর :** প্রথম যোগাযোগ হয় তাঁর সাথে ১৯১৫ সালে যখন বিশেষ একটি উপলক্ষ্যে আমি ইটালিতে যাই।

**কাউন্সেল :** অর্থাৎ পরিচয় দীর্ঘ দিনের ! স্যার স্যামুয়েল, বিস্তারিত বিবরণে গিয়ে আপনাকে বিব্রত করব না। আমি কেবলমাত্র আপনার সেই রকম প্রথম যোগাযোগের ব্যাপারেই জানতে চাইছি যা বন্দীর দ্বারা অভিযোগক্রমে কৃত

অপরাধগুলির কোনোটির সাথে সম্পর্কিত। কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র আবিসিনিয়ার ঘটনা সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

**হোর ঃ** আমি বিদেশ সচিব হই ১৯৩৫ সালের ১১ই জুলাই। অর্থাৎ আবিসিনিয়া সংক্রান্ত বিবাদ যথারীতি লীগের বিবেচনাধীন হয়ে উঠবার সামান্য কিছু পরে। আমার মতামত আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমি এটিও স্পষ্ট করে জানিয়ে রেখেছিলাম যে ইটালির সামুদ্রিক বিস্তার লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা আমাদের জানা ছিল এবং ভাল করেই জানা ছিল। বাস্তবিকই অতীতে ইটালির উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আমরা কার্যকরী ভাবেই জানিয়েছিলাম। ১৯২৫ সালে ইটালিকে আমরা জুবাল্যাণ্ড ছেড়ে দিই এবং সে সময় নানা আলোচনায় আমরা উদ্যোগ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম যাতে ইটালির সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করবার জন্য আবিসিনিয়ার সাথে যুক্তিসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত কোনো বোঝাপড়ায় আসা যায়। আমি মনে করতাম সত্যিই ইটালির বিস্তার লাভের প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমি এও মনে করতাম যে আবিসিনিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমালোচনাগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে সত্যিই যথার্থ ছিল। কিন্তু কখনই আমি মনে করতাম না যে ইটালির এই বিস্তার লাভের প্রয়োজনীয়তা এবং আবিসিনিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা সত্যিই যুদ্ধ ডেকে আনবার কারণ হতে পারে। অবশ্যই, তখনও এ আশা আমরা মনের মধ্যে ধরে রেখেছিলাম যে, যে কোনো একটা সুযোগ নিশ্চয় পাওয়া যাবে যাতে সেই ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একই সাথে আমি M. P.-দের জানিয়ে দিয়েছিলাম, যে তাঁরা যেন এই ভিত্তিহীন গুজবে কান না দেন যে আমরা ফ্রান্সকে বলেছি ইটালির বিরুদ্ধে কোনো একটি সামরিক অবরোধে যোগ দিতে বা এ রকম কোনো চেষ্টা আমরা নিজেরাই চালিয়ে যাচ্ছি সেই দেশটাকে (ইটালি) শায়েস্তা করার জন্য যাঁর সাথে আমাদের মিত্রতা কিনা অনেক দিনের পুরোনো।

**কাউন্সেল ঃ** এটি অত্যন্তই তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি, স্যার স্যামুয়েল। আপনার এই বিবৃতি নিশ্চয়ই M. P.-দের স্বস্তিতে ফিরিয়ে এনেছিল, এবং মুসোলিনিও নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হতে পেরেছিলেন এই কথা জেনে যে অন্তত সেই সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইটালির বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অবরোধের বাস্তব সম্ভাবনা তখন ছিল না। বন্দী আমার কাছে বলেছিলেন

যে এরও দুই মাস আগে তিনি পুরোপুরি খোলাখুলিভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আফ্রিকায় তিনি তাঁর অবস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য চেষ্টা করবেন। তারপর, জুলাই-এর শুরুতেই তিনি সেই তথাকথিত "ক্ষমার অযোগ্য সিদ্ধান্ত" ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে ১৮৯৬ সালে আডোয়াতে আবিসিনিয়ার কাছে ইটালির পরাজয়ের প্রতিশোধ তিনি নেবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্যার স্যামুয়েল, আপনি কি মনে করেন যে ব্রিটিশ সরকারের অসন্তুষ্টি আদৌ তেমন কোনো জোরালো এবং অর্থপূর্ণ সতর্কবাণীর আকারে তাঁর কাছে পৌঁছেছিল যা তাঁকে বাধ্য করতে পারত তাঁর সে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য? অথবা, আপনার কি মনে হয় যে ব্রিটিশ সরকারের এবং লীগের সতর্কবাণী কঠোর হওয়া সত্ত্বেও বন্দী তাঁর যুদ্ধ অভিযান চালিয়ে যেতে স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন?

**হোর** : বন্দীর হয়ে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আমার সেই সতর্কবাণীতে কোনো অস্পষ্টতা এতটুকুও ছিল না। ১১ই সেপ্টেম্বর জেনিভাতে বক্তব্য রাখবার সময় আমি বলেছিলাম "লীগ এবং তাঁর সাথে আমার দেশ লীগের শর্তগুলি যাতে পূর্ণ মান্যতা পায় তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে স্থির প্রতিজ্ঞ। প্রাসঙ্গিকভাবেই যে কোনো প্ররোচনা বিহীন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্রিটিশ জাতির মনোভাব গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এটা কোনো পরিবর্তনীয় বা অনির্ভরযোগ্য সাময়িক ভাবনা নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক আচরণবিধির সুনির্দিষ্ট একটি নীতি যার প্রতি ব্রিটিশ জাতি এবং তাঁর সরকার স্থির এবং নিবেদিত থাকবে।"

**কাউন্সেল** : এটি অবশ্যই অত্যন্ত স্পষ্ট একটি সতর্কবাণী। তবু মনে হয় না তাঁর ফলে বন্দীর কর্মপন্থা কোনোভাবে ব্যাহত হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে তিনি বললেন — "বিষয়টিতে যথোপযুক্তভাবে মননিবেশ করেছি। সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সব রকমের সম্ভাবনা আমি খতিয়ে দেখেছি।" এবং তারপর অক্টোবর মাসের ২ তারিখে সত্যিই যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। এই রকমই যখন ঘটনার গতি, তখন এটিই কি আপনার বিশ্বাস যে আপনাদের অথবা লীগের তরফ থেকে যত ভীতি প্রদর্শনই করা হোক না কেন, বন্দী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতেনই।

**হোর** : আমি আগেই বলেছি যে বন্দীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা আমার কাজ নয়। ওটা আপনাদের ব্যাপার। আমি এর পরেও বলে চলেছিলাম এবং হাউস অব

কমনস-এও বলেছিলাম "আমাদের নীতি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে।"

**কাউন্সেল** ঃ সে দিনের তারিখ ?

**হোর** ঃ ২৩-শে অক্টোবর, ১৯৩৫

**কাউন্সেল** ঃ সাধারণ নির্বাচনের আগে ?

**হোর** ঃ হ্যাঁ, সাধারণ নির্বাচনের আগে।

**কাউন্সেল** ঃ আপনাদের ঐ নীতি কি সাধারণ নির্বাচনের পরেও অপরিবর্তিত ছিল ?

**হোর** ঃ আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নে আমি এবং মিঃ লাভাল যে পরিকল্পনা করেছিলাম তাঁর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পদত্যাগ করবার সময় হাউস অব কমনস-এ আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তাঁর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম এই কথা ভেবে যে আমরা হয়ত একদিন আবিসিনিয়াকে আমাদের কর্মপদ্ধতির প্রতি সন্দিহান করে তুলব। আবিসিনিয়া হয়ত একদিন ভাববে যে আমরা যা করতে পারতাম তার জন্য আমরা করেছি তার চেয়ে অনেক কম। পরিশেষে মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হবে একদিন যখন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আবিসিনিয়ার অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে চিরতরে।

**কাউন্সেল** ঃ সংক্ষেপে তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে প্ররোচনা বিহীন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং সমবেত প্রতিরোধের নীতি, যার প্রতি আপনার সরকার একদা সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল তার কার্যকারিতায় আপনার আর বিশ্বাস থাকল না।

**হোর** ঃ প্রতিরোধ সমবেতভাবে সংগঠিত হয় নি। হাউস অব কমনস-এ আমি আমার পদত্যাগ বক্তৃতায় তো বলেইছিলাম "না একটি জাহাজ, না একটি অস্ত্র, না কোনো মানুষ যোগ দিয়েছিল লীগ অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো দেশের তরফ থেকে।

**কাউন্সেল** ঃ একটি অত্যন্ত মজবুত অজুহাতের আশ্রয় নিলেন আপনি, স্যার স্যামুয়েল। এই অজুহাতের আশ্রয় আগেও নেওয়া হয়েছে বহুবার। তবু আমি খুশি হব যদি নির্বাচনের আগে ২৩-শে অক্টোবর আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁর উল্লেখ আর একবার করেন। আপনি কি সেই বক্তৃতায় সামরিক সতর্কতার কোনো উল্লেখ করেছিলেন ?

**হোর** ঃ সে সব কথা এখন আমি স্মরণ করতে যাব না। আমি আমার আগের

বক্তব্যেই স্থির থাকব যে কেবলমাত্র আমরাই একা কোনো সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, স্যার স্যামুয়েল। এটা আশা করা আমার পক্ষে সত্যিই অন্যায় যে আপনার অতীতের কোনো বক্তৃতার খুঁটিনাটি সব কিছু আপনি স্মরণে আনতে পারবেন। যাইহোক, আপনি হয়ত আমাকে অনুমতি দেবেন যদি আপনার হয়ে আমি নিজেই সেই প্রাসঙ্গিক অংশ পড়ে শোনাতে চাই। মহামান্য আদালতকে আর একবার মনে করিয়ে দিই যে এই বক্তৃতা দেওয়ার তারিখ ২৩-শে অক্টোবর। স্যার স্যামুয়েল বলেছিলেন — "হিজ ম্যাজেস্টিস" গভর্ণমেণ্ট একথা শুরুতেই পরিষ্কার জানিয়ে রেখেছেন যে লীগের সভ্য হিসাবে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে চলবেন কিন্তু কখনই বিচ্ছিন্নভাবে নিজেরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মসূচীতে যাবেন না। নিকট অতীতে ক্লারমণ্ট-ফেরাণ্ড (Clermont-Ferrand)-এ মিঃ লাভাল যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে আমাদের এই কথার সত্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, আমরা কখনই ফ্রান্সের কাছে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পাঠাইনি। এই বাস্তব অবস্থার নিরিখে দেখলে বোঝা যায় কতখানি অসততা আশ্রয় পেয়েছে সেই সব প্রচারে যেখানে আমাদেরকে দেখান হয়েছে এমন এক যুদ্ধবান দেশ হিসাবে যাঁরা নাকি বিরাট বিধ্বংসী যুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীকে টেনে নিয়ে যেতে স্থিরচিত্ত। অথচ এটি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হত এই রকম একটি প্রচার চালিয়ে যাওয়া যে, আমরা রাজি আছি চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু তা পারা যাচ্ছে না কারণ অন্যরা ভীত-চঞ্চল, বিশেষত শুরু থেকেই যখন একথা জানা ছিল যে, বিশেষ কতগুলি দেশ কখনই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবে না। কিন্তু যাইহোক, আমরা কখনও তা করিনি এবং ভবিষ্যতেও কোনোদিন এরকম প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেব না।" ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে আমরা এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের দেখা পাচ্ছি। স্যার স্যামুয়েল তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলেছেন, মিঃ লাভালের সাথে তাঁর সমঝোতার পক্ষে অজুহাত খাড়া করবার জন্যে যে, আর কোনো দেশ কোনো সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অথচ এর আগের বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করেছেন যে ফ্রান্সকে কখনই সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়নি। সুতরাং লীগ, অন্তর্ভুক্ত বাকি দেশগুলির দুর্বল চিত্ততার যে অভিযোগ তিনি করেছেন তা অমূলক। কিন্তু আরো অদ্ভুত ঘটনা হ'ল এই যে, অক্টোবর মাসের ২৩ তারিখে অর্থাৎ যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ২০ দিন পর ফ্রান্স এবং ব্রিটেন মনে হ'ল ঐকামত হয়ে কোনোরকম সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করে দিল। স্যার

স্যামুয়েল, বলতে পারেন কেন এমন হ'ল ?

**হোর ঃ** সে কথা আমি আগেই বলেছিলাম আমার পদত্যাগ বক্তৃতায়, সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির বিধ্বংসী যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা যে করেই হোক ঠেকাতে হবে—এ চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু তখন আমাদের মাথায় ছিল না।

**কাউন্সেল ঃ** আমি বলব এই উত্তর যথেষ্ট নয়। বাস্তবিকই, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বলব, স্যামুয়েল এখানে এই আদালতের সামনে ততখানি কপটতার আশ্রয়ই নিয়েছেন যতখানি তিনি নিয়েছিলেন হাউস-অব-কমন্স-এ এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে। ১৯৩৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে লীগ-অব অ্যাসেম্বলীতে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তার কথা তিনি আমাদের বলেছেন। কিন্তু যে কথা তিনি আমাদের কখনও বলেন নি বা ব্রিটিশ সরকারের কোনো বিবৃতি বা কোনো প্রকাশনায় যা কোনোদিন প্রকাশিত হয়নি তা হ'ল ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রে যা ঘটেছিল তার বিবরণ। সে কাহিনী অবশ্য জানা গেছে। জানিয়েছেন মিঃ লাভাল। এ কাহিনী এক গোপন চুক্তির। চুক্তি স্যার স্যামুয়েল হোর এবং মিঃ লাভালের মধ্যে, যার মর্মকথা মিঃ লাভালের ভাষায় এই রকম — "সময়ের বিনা অপব্যয়েই আমরা ঐকমতে পৌঁছালাম কোনো রকম সামরিক নিষেধাজ্ঞাজারি করার বিপক্ষে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে, কোনো রকম নৌ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না বা সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হবে না। এক কথায়, যা কিছুই যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে, সম্ভাব্য সে রকম সমস্ত কিছুই নাকচ করে দেওয়া হ'ল।"

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে এ ঘোষণা যদি সত্যি হয় তাহলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আর যদি তা সত্য না নয় তাহলে তা নস্যাৎ হয়ে যাবে যেমন তা বহুবার হতে দেখা গেছে বেসরকারি প্রকাশনার সংবাদে। এই মুহূর্তে স্যার স্যামুয়েল হোরের নীরবতার বিরুদ্ধে যেমন আমরা পেলাম মিঃ লাভালের বিবৃতি। যদিও মিঃ লাভাল যা বলেছেন তা যে আমি খুব একটা বড় করে ধরছি তা নয়। কিন্তু সেই সাথে এটাও আমার মনে হয় না যে এই নীরবতা অন্য আর কোনো তথ্যের আঘাতে ভাঙা যেতে পারে, কারণ ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ সরকার যখন ভবিষ্যতে শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞাজারি করার সম্ভাবনার ব্যাপারে ফ্রান্স সরকারের কাছে একটা নোট পাঠালেন তখন ফ্রান্স সরকার তার উত্তর দিয়েছিলেন নির্দিষ্টভাবে সেই গোপন আলোচনার উল্লেখ করে। ফ্রান্স সরকারের সেই উত্তর হয়ত এখনও ব্রিটিশ সরকারের বিদেশ দপ্তর সংক্রান্ত পুরোনো নথিপত্রের মধ্যে খুঁজে

পাওয়া যেতে পারে যদি না সুযোগমত এতদিনে তা নষ্ট করে ফেলা হয়ে থাকে। তদুপরি, এই গোপন চুক্তির অন্তর্নিহিত বিষয় বস্তুর মধ্যে যে ব্যাখ্যাই পাওয়া যাক না কেন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কুড়ি দিন পর স্যার স্যামুয়েল অমন বিবৃতি দিয়েছিলেন যে কোনোরকম সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবা হয় নি ?

কেবল এইটুকুই নয়, আরো অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐ গোপন বোঝাপড়ার মধ্যে। আমি যা বলব, খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই তাতে যে, এই গোপন চুক্তির কথা খুব দ্রুতই পৌঁছে গিয়েছিল বন্দীর কাছে ! আমি বলব যে মিঃ লাভালের মাধ্যমেই তা পৌঁছেছিল। আমার মত হচ্ছে এই যে ১০ই সেপ্টেম্বরের পর মুসোলিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, এমনকি ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্যার স্যামুয়েলের বক্তৃতা সত্ত্বেও, যে বৃহৎ শক্তিধরদের কাছ থেকে সশস্ত্রশত্রুতা আশঙ্কা করবার কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় এই ঘটনা থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মুসোলিনির সমস্ত বক্তৃতার, জেনিভা চুক্তিকে অস্বীকার করার এবং বাহান্নটি রাষ্ট্রের শত্রুতার সম্ভাবনার মুখোমুখি হওয়ার মত সাহস পাওয়ার। কেমন করে স্যার স্যামুয়েলের বিবেক ১৯৩৮ সালে আবিসিনিয়া দখলের ঘটনাকে স্বীকৃতি দেওয়া অনুমোদন করল তা সহজ হয়ে ওঠে ঐ গোপন চুক্তির নিরিখে ব্যাপারটিকে দেখলে। যদি তার বিবেক আদৌ কোনো দংশন অনুভব করে থাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনায়, তবে সে দংশনের জ্বালাটিতে ছিল বড় জোর সেপ্টেম্বরের ঐ সন্ধ্যার ঐ তিন ঘণ্টার মিটিং-এর আগে পর্যন্ত। আমি বলব এই চুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে ঐ নিষেধাজ্ঞার পর্বটি ছিল পুরোপুরি একটি প্রহসন। সুতরাং আমার মতে এইসব ঘটনাবলি এই ইঙ্গিতই দেয় যে বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ বন্দীর দ্বারা অভিযোগক্রমে কৃত এই বিশেষ অপরাধটি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তা সংঘটিত হওয়ার অনেক আগেই। সুতরাং বন্দীর বিরুদ্ধে আজ এত দীর্ঘকাল পর নিন্দায় মুখর হয়ওার জন্য যাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে, এই বাস্তব তথ্য তাদের বিবেচনা দাবি করতে পারে।

পরবর্তী সাক্ষী হিসাবে আমি মিঃ নেভিলে চেম্বার লেইন কে ডাকব।

[ মিঃ চেম্বার লেইন কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল** ঃ যে সব বিষয়গুলির উপর আলোচনা আগেই হয়ে গেছে বিস্তারিত ভাবে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছা আমার নেই। শুধু এই কথাটি কি এই

আদালতে একবার বলবেন যে ১৯৩৫ সালের নির্বাচনের আগে আবিসিনিয়ার ব্যাপার নিয়ে ব্রিটেন এবং ইটালির বিরোধ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল ?

**চেম্বার লেইন :** দেশের সরকারের বাকি আর সকলের মতামত যা ছিল, আমারও ছিল তেমনি একই।

**কাউন্সেল :** সে সময়ে দেওয়া আপনার বিশেষ কোনো বিবৃতির কথা আপনি স্মরণ করতে পারেন কি ?

**চেম্বার লেইন :** তৎকালীন সরকারের বাকি আর সকল সভ্যদের থেকে পৃথক কোনো মতামত আমার ছিল না। আগাগোড়াই তা ছিল ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত নীতি।

**কাউন্সেল :** তবু আপনার কোনো বিশেষ বিবৃতির কথা আপনার মনে পড়ে কি যা সে সময় বিশেষভাবে মনযোগ আকর্ষণ করেছিল ?

**চেম্বার লেইন :** গৃহীত সে সিদ্ধান্তের সাথে সহমত ছিলাম আমি।

**কাউন্সেল :** কি ছিল সেই সিদ্ধান্ত ?

**চেম্বার লেইন :** "লীগ-অব নেশনসের শর্ত দ্বারা নির্ধারিত যে দায়বদ্ধতার দ্বারা অন্যান্য সভ্যদের সাথে অনুরূপভাবে আমরাও বিধৃত হয়ে আছি আমরা তা পূর্ণ করে যেতে কৃত সংকল্প"

**কাউন্সেল :** কেবল সেইটুকুই ?

**চেম্বার লেইন :** এইটেই ছিল ব্যবহৃত বাক্যবন্ধ

**কাউন্সেল :** সেই বাক্যবন্ধে আরো বেশ কিছু শব্দ কি ছিল না উদ্ধৃত ঐ লাইনগুলির ঠিক পরেই ! যেমন "কেবলমাত্র এই ভাবেই আমরা পারি সম্ভাব্য আক্রমণকারী দেশকে একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে যে আমাদের দ্বারা গৃহীত পবিত্র শপথ ভেঙে অন্য দেশকে আক্রমণ করলে ফল ভাল হয় না।"

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ। এই কথাগুলোও ছিল তাঁর মধ্যে।

**কাউন্সেল :** এবং আপনি তা সমর্থন করতেন ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** আপনার কি মনে পড়ে না এই একই বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরবার জন্য আপনি আর কোনো ভাষা ব্যবহার করেছিলেন কিনা ?

**চেম্বার লেইন :** যা যা বলেছিলাম, সব কথা এখন আর আমার মনে পড়ে না।

**কাউন্সেল :** না মনে পড়ারই কথা। তবুও কি মনে পড়ে আপনাদেরই সদস্য বার্মিংহামের মিঃ অ্যামেকির * সাথে এক বিশেষ বিতর্কে আপনি জড়িয়ে

পড়েছিলেন ?

**চেম্বার লেইন :** কিছু কিছু কথা আমার মনে আছে।

**কাউন্সেল :** সেই বিতর্ক চলাকালে এই রকম কোনো কথা কি আপনি বলেন নি যে, "আবিসিনিয়া ব্যাপারটা বড় কথা ছিল না, বড় কথা ছিল লীগের ভবিষ্যৎ এবং এই প্রশ্নটি যে, কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাই কি উচিত ছিল আমাদের ? উচিত কি ছিল আগামী প্রজন্মের চোখে নিজেদেরকে সেই পাপের লজ্জায় নামিয়ে আনা ?" এগুলো কি আপনার কথা নয় ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ এ কথা আমি বলেছিলাম।

**কাউন্সেল :** এরপর নির্বাচন পরবর্তীকালে কোন সময়ে এসে আপনার চিন্তার পরিবর্তন ঘটল ? আমার মনে হয় তৎকালীন সময়ে সরকার পক্ষের উল্লেখ-যোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আপনিই প্রথম যিনি নিষেধাজ্ঞাজারি করার নীতির বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তাই নয় কি ?

**চেম্বার লেইন :** সময়টা তখন ১৯৩৬ সালের জুলাই মাস। লীগ অব নেশনস-এর তরফ থেকে সভাদের মধ্যে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তিজারি করা হ'ল যে, বিষয়টি নিয়ে দোদুল্যমানতার অবসান এখনও হয়নি। সুতরাং সাংসদদের এবং সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে এই মর্মে প্রচার চালিয়ে যাওয়া হোক যে, নিষেধাজ্ঞাজারি করা হলে এবং এমন কি তা আরো তীব্র করে তুললে এখনও সম্ভব আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই নীতিকে আমি "চূড়ান্ত পাগলামো" বলে বর্ণনা করি। আমার মনে হয়েছিল ঐ নীতি অবলম্বন করার অর্থ অধিকতর দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনা যা আমাদের তাৎক্ষণিক মানসিকতাকে শ্রেয়তর সমাধানের অন্বেষণ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

**কাউন্সেল :** সেই "শ্রেয়তর সমাধানের" জন্য কখন আপনি সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করলেন ?

**চেম্বার লেইন :** এক বছর পর যখন আমি প্রধানমন্ত্রী হ'লাম।

**কাউন্সেল :** আপনার কি মনে হয়নি যে আপনার প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্দীর সাথে কোনো আলোচনায় যাওয়া আপনার চলে না ?

**চেম্বার লেইন :** আমি মনস্থির করে ফেলি এবং হাউস অব কমনস-এ জানাই যে, বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে হলে আমাদের পক্ষে এখন দরকার দৃঢ়তার সাথে আর একবার উদ্যোগ নেওয়া। আমি বিশ্বাস করতাম যে আমাদের মধ্যকার বিবাদের হেতু মূলত নিহিত রয়েছে পারস্পরিক অযৌক্তিক সন্দেহ এবং

ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে। এরপর যতখানি সহজে আমরা বরফ গলাতে পেরেছিলাম এবং যেভাবে আমরা আলোচনা শুরু করে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে পেরেছিলাম তা, আমার মনে হয়, আমার দৃষ্টিভঙ্গিকেই সঠিক বলে প্রমাণ করেছিল যে সত্যিই কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না আমাদের এই অনুমানের। আমাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী।

**কাউন্সেল :** কিভাবে এ'ল সেই আলোচনার সুযোগ ?

**চেম্বার লেইন :** মিঃ কাউন্ট গ্র্যাণ্ডি তখন লণ্ডনে ইটালির রাষ্ট্রদূত। সিগনর মুসোলিনির একটি ব্যক্তিগত চিঠি তিনি নিয়ে এসে আমাকে দিলেন।

**কাউন্সেল :** অর্থাৎ সমস্ত উদ্যোগ বন্দীই নিয়েছিলেন ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ তাই।

**কাউন্সেল :** তা নিয়ে কোনো সন্দেহ হ'ল না আপনার মনে ?

**চেম্বার লেইন :** না। চিঠিটিতে ছিল বন্ধুত্বের সুর এবং আমার মনে হ'ল নতুন করে আলোচনার শুরু করার একটা সুযোগ যেন আমরা উপহার পেলাম যা গ্রহণ না করা উচিত হবে না। উত্তরে আমিও একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালাম তাঁর কাছে।

**কাউন্সেল :** উত্তরে কি লিখেছিলেন আপনি ?

**চেম্বার লেইন :** আমি লিখেছিলাম যে, আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব যদি কতগুলো ভুল বোঝাবুঝি এবং ভিত্তিহীন সন্দেহ আমরা দূরে সরিয়ে ফেলতে পারি। আলোচনায় বসতে আমরা যে প্রস্তুত আছি এ কথা জানিয়ে ছিলাম।

**কাউন্সেল :** সঙ্গে সঙ্গেই কি আলোচনা শুরু হয়েছিল ?

**চেম্বার লেইন :** না, কিছু দেরি হয়েছিল। প্রায় আট মাস পর ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলোচনা শুরু হয়।

**কাউন্সেল :** অর্থাৎ তাঁর আগে ততদিনে বন্দীর সাথে আপনার পরিচয় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সামরিক নিষেধাজ্ঞাজারি থাকাকালীন এই সমগ্র অন্তবর্তী পর্যায়েই আপনি সরকারের একজন সভ্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে দু বছর ধরে তাঁর সাথে আপনি সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। বন্দীর চরিত্র সম্পর্কে আপনি কোন ধারণায় পৌঁছেছিলেন ? কোনো রকম সন্দেহ কি এসেছিল আপনার মনে ( ঐ আলোচনার আগে ) ?

**চেম্বার লেইন :** হাউস অব কমনস-এ আমি বলেছিলাম আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে মুসোলিনির সরকারও আমাদের মত একই রকম আন্তরিকভাবে

ঐক্যমতে পৌঁছবার সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনায় বসবে।

**কাউন্সেল ঃ** অর্থাৎ বন্দী সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন এমনই ছিল যে আপনি তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন পুরোপুরি ?

**চেম্বার লেইন ঃ** আমি বিশ্বাস করতাম যে ঐক্যমতে পৌঁছাতে হলে এমন বিশ্বাসের মনোভাবই দেখান উচিত ছিল।

**কাউন্সেল ঃ** আমার মনে হয় প্রশ্নটাকে আপনি খানিক এড়িয়ে গেলেন। বাস্তবে কি বন্দীর উপর আপনার বিশ্বাস অনড় এবং অচল ছিল না ?

**চেম্বার লেইন ঃ** কখনও আমি তা বলিনি।

**কাউন্সেল ঃ** ঠিক তা বলেন নি বটে, কিন্তু যা বলেছেন তাঁর অর্থ তাই দাঁড়ায়। আপনি কি বলেন নি যে, যদি ঐ চুক্তির ফলে আপনারা প্রবঞ্চিত হয়ে থাকেন বন্দীর দ্বারা তাহলে আপনি আর টুঁপি রাখবেন না মাথায় ? কথাগুলো কি আপনার নয় ?

**চেম্বার লেইন ঃ** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল ঃ** তা যদি হয় তাহলে আমি বলব যে মাথায় আর টুঁপি না রাখার এই যে কঠিন দিব্যি আপনি করলেন তাঁর মধ্যে দিয়ে আমার মক্কেলের চরিত্রের প্রতি আপনার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা মাত্রাতিরিক্তভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আমি আরোও বলব যে আপনার এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কেবল বন্দীর প্রতিই নয়, তাঁর প্রতিনিধির উপরও বটে। ইটালির রাষ্ট্রদূত কাউন্ট গ্র্যাণ্ডি সম্পর্কে আপনার কোনো মন্তব্য আপনি এখন স্মরণ করতে পারেন কি ?

**চেম্বার লেইন ঃ** হ্যাঁ, মনে হয় করেছিলাম মন্তব্য।

**কাউন্সেল ঃ** আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনি বলেছিলেন — "কখনও আপনার ভুল হয়নি তৎকালীন লণ্ডন স্থিত ইটালির রাষ্ট্রদূত কাউন্ট গ্র্যাণ্ডির অবদানকেও যথা সম্মানে ও শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দিতে যিনি আপন অধিকারে নিজের দেশে শ্রদ্ধার এবং বিশ্বাসের জায়গা করে নিয়েছেন এবং যিনি তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা এবং সক্রিয় উদ্যোগের ফলে সফল হয়েছিলেন পারস্পরিক সন্দেহ এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনার এবং ঐক্যমতের পথ প্রশস্ত করে দেওয়ায়।"

এখন, মিঃ চেম্বার লেইন, আমরা সেই চুক্তির বিষয়বস্তুতে যেতে চাই। যখন আপনি সিগনর মুসোলিনির সাথে এই আলোচনা শুরু করেন তখন কি অবস্থা এরকম নয় যে, স্পেন-এ তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ইটালির সৈন্য-বাহিনী যে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে সে সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** আলোচনার শুরুতে স্পেন-এর ব্যাপারে আপনারা কোনো শর্ত আরোপ করেছিলেন কি ?

**চেম্বার লেইন :** আমি ইটালির রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলাম যে, যদি আমাদের এই চুক্তি অনুমোদনের জন্য লীগের কাছে সুপারিশ করতে যেতেই হয় তাহলে আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে এই যে, তা (যুদ্ধে অংশগ্রহণ) করা যাবে না। কারণ, লীগ বলবে ফ্র্যাঙ্কোর অনুকূলে নতুন করে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে এবং বিদেশী সৈন্য-বাহিনী সেখান থেকে তুলে আনার যে পরামর্শ ব্রিটেনের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল তা অগ্রাহ্য করে স্পেনের পরিস্থিতির অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে ইটালি।

**কাউন্সেল :** সে শর্ত কি ইটালি সরকার মেনে নিয়েছিল ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** ১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে রোমে স্বাক্ষরিত অ্যাঙ্গলো চুক্তিতে (Anglo Agreement) কি এই শর্তের পুনরুল্লেখ ছিল ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** স্পেন-এর ব্যাপারে শর্তের এই বিষয়টি কি সমগ্র আলোচনা জুড়ে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অপর একটি বিষয় যথা আবিসিনিয়া দখলের ব্যাপারটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে ব্যাঘাত হয়েছিল ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** স্পেন-এর ব্যাপারে ইটালির এই অঙ্গীকার কি পরবর্তীকালে মেনে চলা হয়েছিল ?

**চেম্বার লেইন :** এটা সব সময়ই বলা অত্যন্ত কঠিন যে ঠিক কত সংখ্যক বিদেশী সৈন্য স্পেন-এ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল ?

**কাউন্সেল :** আসল কথাতে আসুন মিঃ চেম্বার লেইন, এটা কি ঘটনা নয় যে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে অর্থাৎ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এবং আবিসিনিয়া দখলীকরণকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব জেনিভাতে অনুমোদন পাওয়ার পর আপনার প্রতিনিধি রোমে অবস্থান কালেই ইটালির সরকারের বিরুদ্ধে স্পেন-এ পুনরায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনে ? এবং এটিও কি ঘটনা নয় যে ঐ একই সপ্তাহে ইটালি সরকারের খোলাখুলি মদতে ফ্র্যাঙ্কো স্পেন থেকে সৈন্য তুলে নেওয়ার সমস্ত শর্ত অগ্রাহ্য করে ? প্রয়োজন নেই আপনার উত্তরের কারণ এর আসল উত্তর তো সমস্তই নথিভুক্ত হয়ে আছে। এ ছাড়াও

আরো প্রমাণ আছে — এই আলোচনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স আপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। নয় কি ?

**চেম্বার লেইন** : হ্যাঁ তাই।

**কাউন্সেল** : কোনো কিছুই নিশ্চয় আপনারা একে অপরের কাছে গোপন রাখতেন না ?

**চেম্বার লেইন** : না, কখনই না।

**কাউন্সেল** : তাই যদি হয়, আপনার কি মনে আছে ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এই বিশেষ ব্যাপারটির উপর তাঁর বক্তৃতায় কি বলেছিলেন ?

**চেম্বার লেইন** : কোন বক্তৃতা ?

**কাউন্সেল** : বেশ তবে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বলেছিলেন — "ইটালি এবং ব্রিটেনের এই আলোচনার প্রথমদিন থেকেই সিগনর মুসোলিনি একথা স্পষ্ট জানিয়ে এসেছেন যে অন্যরা মেনে নিক অথবা না নিক তিনি কখনই ফ্র্যাঙ্কোকে পরাজিত দেখতে প্রস্তুত নন এবং তার কারণ সর্বজনবিদিত"। আপনি কি জানতেন এ খবর ?

**চেম্বার লেইন** : হ্যাঁ।

**কাউন্সেল** : অতএব, ভদ্রমহাদয়গণ, আমার মতে এ সবের অর্থ কেবল একটাই। ব্রিটেন এবং ইটালির মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াশে মিঃ চেম্বার লেইন এবং বন্দীর মধ্যে নানা সময় নানা আলোচনা যা চলেছিল তা চলবার কালে এ কথা জানা ছিল সকলেরই যে স্পেন-এ জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো এবং তার ইটালিয় সাকরেদদের জয়যাত্রা ব্যাহত করার মতন কোনো কিছুই করা হবে না। অবশ্যই সেইরকম ধারনাই ছিল বন্দীর। ১৯৩৯ সালের ৩ই জুন তিনি বললেন, "যুদ্ধের প্রথমদিন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত কখনই আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম না প্রকাশ্যে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাঠাতে, কোনো অস্পষ্টতার অবকাশ এর মধ্যে ছিল না। এখন লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের কথা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকারেরও কোনো সংশয় ছিল না এ ব্যাপারে। অর্থাৎ এ খবর জানা থাকতেও মিঃ চেম্বার লেইন তাঁর "যথোপযুক্ত শুভবুদ্ধি"-র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে প্রস্তুত ছিলেন। জুরীবৃন্দকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এতদসত্বেও বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে স্পেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

যাইহোক, স্পেন যুদ্ধে বন্দীর ভূমিকা যে তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে

পারে এ কথা তো মিঃ চেম্বার লেইন বিশ্বাস করতেনই না উপরন্তু অন্যান্য প্রশ্নে বন্দীর ইতিবাচক ভূমিকার কথা ভেবে তার প্রতি তিনি শ্রদ্ধায় আনত ছিলেন। সাক্ষীর কাছে এ ব্যাপারটি জানতে চাইব। মিউনিখ সম্মেলনে সিগনর মুসোলিনির ভূমিকা কেমন ছিল ?

**চেম্বার লেইন :** তাঁর অবদান অবশ্যই স্মরণীয় এবং সম্ভবত তা ছিল নিষ্পত্তিমূলক। তাঁরই পরামর্শে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে জার্মান সৈন্য প্রেরণ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখবার একটা সুযোগ আমাকে দেওয়ার জন্য। ১৯৩৮ সালের ৩রা অক্টোবর এ কথা হাউস-অব-কমনস-এ বলেছিলাম যে, সিগনর মুসোলিনি এবং তাঁর দেশের বিদেশ-সচিব কাউণ্ট সিয়ানো যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আলোচনায়। আলোচনার প্রায় শুরুতেই, আর কেউ নয় তাঁরই সেই একটি বিজ্ঞপ্তি পেশ করেন যা মিঃ দালদিয়ের এবং আমি আলেচনার ভিত্তি হিসাবে মেনে নিতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয় ইউরোপ তথা গোটা পৃথিবীরই ইটালির সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবার সঙ্গত কারণ আছে শান্তিপূর্ণ সমাধানে তাঁদের অবদানের জন্য।

**কাউন্সেল :** আশা করি মাননীয় জুরীবৃন্দ যথা মনযোগ সহকারে নজর করবেন যে বন্দীর প্রতি এই অকৃপণ শ্রদ্ধার্ঘ এমন এক ব্যক্তিত্বের, মিউনিখ চুক্তির কারিগর হিসাবে যার অন্যতম পরিচয়। এ কথা মনে রাখতে হবে যে সাক্ষীর মতে শান্তি রক্ষার্থে বন্দী যা অবদান রেখেছেন তার তুলনায় তা অতি তুচ্ছ বলে বিবেচিত হবে যদি আদৌ কোনো সামান্য ত্রুটি তার দ্বারা ঘটে থাকে। সাক্ষীর এই মনোভাব যদি আদৌ স্পষ্টতর প্রকাশের অপেক্ষা রাখে তাহলে মিঃ চেম্বার লেইনকে আমি অনুরোধ করব তাঁর ১৯৩৮ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখের বিবৃতিটি পড়ে শোনাতে।

**চেম্বার লেইন :** "একটি ঘটনার পর অন্য আর একটি ঘটনা — আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই পারম্পর্যের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে। ইটালির সাথে আমাদের মতানৈক্য মিটিয়ে ফেলার যাথার্থতা যদি অনুসন্ধান করতে যাই তাহলে তা খুঁজে পাব সিগনর মুসোলিনির সেই কার্যকারী সহযোগিতায় যা হ'ল এই রকম যে তিনি আমার অনুরোধে হের হিটলারের উপর তাঁর প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে আলোচনায় এনে বসিয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে সম্পাদিত হ'ল মিউনিখ চুক্তি। এর ফলে ইউরোপের শান্তি রক্ষা পেল। অথচ আজ থেকে আঠারো মাস আগেও ইটালির সাথে যে রকম সম্পর্ক আমাদের ছিল, আজও যদি তেমনই

থাকত তাহলে কি কখনও আশা করা যেত যে তিনি এমনভাবে সাড়া দেবেন আমার অনুরোধে অথবা আমিই কি পারতাম এমন অনুরোধ তাকে করতে ?"

**কাউন্সেল :** ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ চেম্বার লেইন। অপরিসীম মূল্য আপনার এই সাক্ষের। এ দেশে এখনও এমন লোক বেশ কিছু আছেন যাঁরা মনে করেন মিউনিখ চুক্তি বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে গেছে। এই সাফল্যের জন্য কৃতিত্বের দাবীদার, এখন বোঝা গেল, অন্যতম ভাবে দু'জন, আপনি এবং বন্দী। আজ যদি উপযুক্ত বিচারের অভাবে সত্যিই বন্দীকে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গের এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাহলে অন্তত ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সঙ্গত কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর এই অবদানের কথা, অর্থাৎ শান্তির প্রশ্নে যে মহৎ ভূমিকা সে সময় তিনি নিয়েছিলেন। মিঃ চেম্বার লেইন এর মতন সিগনর মুসোলিনিও মিউনিখ চুক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যাইহোক মিঃ চেম্বার লেইন বিদায় নেওয়ার আগে শেষ দু' একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আমি রাখতে চাই। মিউনিখ চুক্তির সময়েই কি বন্দীর সাথে শেষবারের মত সাক্ষাৎ হয়েছিল আপনার ?

**চেম্বার লেইন :** না। এরপর ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর সাথে আর একবার দেখা হয়।

**কাউন্সেল :** কোথায় ?

**চেম্বার লেইন :** রোমে।

**কাউন্সেল :** সেটিও কি কোনো রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে ?

**চেম্বার লেইন :** যতটা রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশী করে তা ছিল বরং সামাজিক এবং আনন্দ অনুষ্ঠান।

**কাউন্সেল :** কোনো রাজনৈতিক আলোচনা কি সেখানে হয় নি ?

**চেম্বার লেইন :** কোনো অর্থেই তাকে নিয়মানুগ সম্মেলন বা আলোচনা বলা চলে না। নানান বিষয় যখন যেমন এসে পড়েছে তেমনই আলোচনা হয়েছে বিশেষ কোনো প্রথার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে।

**কাউন্সেল :** কোনো বিশেষ উপলক্ষে কি সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ, সেটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় ভোজসভা।

**কাউন্সেল :** আপনি কি সেখানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ?

**চেম্বার লেইন :** হ্যাঁ, আমার সাথে ছিলেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এবং কিং ভিক্টর এ মানুয়েল

**কাউন্সেল :** আপনি কি কোনো বক্তৃতা দিয়েছিলেন ?

**চেম্বার লেইন** ঃ বিশেষ তাৎপর্যের তেমন কিছু নয়।

**কাউন্সেল** ঃ কোনো স্বাস্থ্য কামনার প্রত্যুত্তরেও নয় ?

**চেম্বার লেইন** ঃ ও হ্যাঁ, সে রকম ব্যাপার ছিল বটে এবং এরকম একটির উত্তর আমি দিয়েছিলাম যা উত্থাপন করেছিলেন মুসোলিনি।

**কাউন্সেল** ঃ সেদিন যে ভাষায় আপনি তা বলেছিলেন, আজ এই আদালতে আর একবার তার পুনরাবৃত্তি করবেন কি ?

**চেম্বার লেইন** ঃ "মহামহিম আপনাকে এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত করছি যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের যে অভিব্যক্তিক প্রকাশ আপনার বক্তব্যে দেখা গেল তা আমি যথামর্যাদায় গ্রহণ করলাম। আমি আশা রাখি ইউরোপে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করবার প্রয়াসে পরস্পরকে আমরা সহযোগী হিসাবে পাব। আমি আমার এই গ্লাস তুলে ধরছি মহামান্য মুসোলিনি, ইটালির রাজা এবং ইথিওপিয়ার সম্রাটের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধায় এবং তাঁর শাসনাধীন সকলের স্থায়ী মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনায়।"

**কাউন্সেল** ঃ এই যথেষ্ট। এরপর আমি লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে সাক্ষী হিসাবে ডাকব।

[ লর্ড হ্যালিফ্যাক্স সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল** ঃ ১৯৩৯ সালে রোমে সেই রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় আপনিও উপস্থিত ছিলেন। তাই নয় কি ?

**হ্যালিফ্যাক্স** ঃ হ্যাঁ।

**কাউন্সেল** ঃ ইথিওপিয়ার সম্রাটের স্বাস্থ্যকামনায় যে পান-আসর উৎসর্গ করেছিলেন মিঃ চেম্বার লেইন, আপনিও তা'তে অংশগ্রহণ করেছিলেন ?

**হ্যালিফ্যাক্স** ঃ হ্যাঁ।

**কাউন্সেল** ঃ আপনার কি মনে পড়ে ইথিওপিয়ার আগের সম্রাটের সাথে একবার আপনার আলোচনা হয়েছিল ?

**হ্যালিফ্যাক্স** ঃ হ্যাঁ।

**কাউন্সেল** ঃ কোথায় হয়েছিল সেই মিটিং ?

**হ্যালিফ্যাক্স** ঃ জেনিভায়।

**কাউন্সেল** ঃ কোন বিষয় আলোচনা হয়েছিল সে সময় ?

**হ্যালিফ্যাক্স** ঃ ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে যে আংলো-ইটালিয়ান চুক্তি হয়েছিল, সেই বিষয়। লীগের অনুমোদনের জন্য আমি আবেদন করেছিলাম।

**কাউন্সেল** ঃ এ ছাড়াও অধিকৃত আবিসিনিয়াকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল

তাঁর অনুমোদনের জন্যও চেষ্টা করেছিলেন, তাই নয় কি ?

**হ্যালিফ্যাক্স ঃ** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার কি মনে হয়নি একটি দেশকে দখল করে নেওয়ার এ রকম একটি ঘটনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে কতগুলো নৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল ? কারণ আপনাদের দেশ তা প্রতিরোধ করবার শপথ নিয়েছিল এক সময়।

**হ্যালিফ্যাক্স ঃ** আমি বলেছিলাম যে, বিষয়টি "নীতির উপর আঘাত" বলে মনে হয় আমার।

**কাউন্সেল ঃ** "আঘাত" শব্দটা অনেক মোলায়েম। কেবল এইটুকুই কি বলা হয়েছিল ?

**হ্যালিফ্যাক্স ঃ** এ ছাড়া "চিরন্তন এবং অখণ্ডনীয় ন্যায়তত্ত্বের" বিষয়েও আমি আলোচনা করেছিলাম।

**কাউন্সেল ঃ** কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল আপনাদের আলোচনায় ?

**হ্যালিফ্যাক্স ঃ** আমি বলেছিলাম যে, সংঘাত যখন দুটি আদর্শের মধ্যে — একদিকে মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি অনড় সমর্পণের আদর্শ যা ব্যবহারিক দিক দিয়ে বিচার করলে অবাস্তব, অন্যদিকে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তবানুগ আদর্শ — তখন আমার কাছে কোনো সংশয় থাকে না এ ব্যাপারে যে শান্তির দাবীই অগ্রাধিকার পাবে।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার এই মূল্যায়নের উপর নির্ভর করলে আমরা কেবল এইটিই ধরে নিতে পারি যে ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় সম্রাট, যার সাথে আপনার দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল, তিনি প্রথম সম্রাটের তুলনায় যোগ্যতর। দ্বিতীয় জন, আপনার ভাষায়, শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তব আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে প্রথম জনের আদর্শ মহত্তর হওয়া সত্ত্বেও তা ছিল অবাস্তব। হেইলি সেলাসি এবং কিং ভিক্টর ইমানুয়েলের মধ্যে এমন সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি কিং ভিক্টরের প্রতি যে শ্রেষ্ঠত্ব আপনি অর্পণ করলেন, আমার মক্কেল তার খানিক অংশের দাবীদার হতে পারে। এরই মাঝখানে আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, আপনার এই মতবাদ কি জেনিভায় দেশ নির্বিশেষে সকলেরই অনুমোদন লাভ করেছিল ? নাকি এমন কোনো কোনো দেশ ছিল যারা অন্যমত পোষণ করেছিলেন ?

**হ্যালিফ্যাক্স ঃ** কেউ কেউ প্রতিবাদ করেছিল।

**কাউন্সেল** ঃ কোন কোন দেশ ?

**হ্যালিফ্যাক্স** ঃ নিউজিল্যাণ্ড, বলিভিয়া, চায়না এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন

**কাউন্সেল** ঃ মাননীয় জুরী মহোদয়গণ আপনারা শুনলেন যে কেবলমাত্র ঐ চারটি দেশ ছাড়া আর কোনো দেশ আবিসিনিয়া দখলের ব্যাপারকে মার্জনা করে দেওয়ার মধ্যে কোনো নৈতিক অপরাধ দেখেনি। আশা করি জুরীবৃন্দ এই ঘটনার কথা মনে রাখবেন, বিশেষত আপনাদের মধ্যে কেউ যদি মনে করেন যে বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্য থেকে এই বিশেষ অভিযোগটিকে অগ্রাহ্য করবার অনুরোধের অর্থনীতির উপর আঘাত হানা।

এখন আমি মিঃ এল. এস. অ্যামেরি মহাশয়কে ডাকতে চাই।

[ মিঃ অ্যামেরি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল** ঃ চলুন আমরা ফিরে যাই ১৯৩৫ সালে। আবিসিনিয়া বিতর্ক নিয়ে আপনার মতামত কি ছিল ?

**অ্যামেরি** ঃ উদ্বেগ এবং সংশয়ে আমি আচ্ছন্ন ছিলাম।

**কাউন্সেল** ঃ কি ভাবে সে উদ্বেগ দূর করা গেল বলে আপনার মনে হয় ?

**অ্যামেরি** ঃ এক মুহূর্তের জন্যও এ বিশ্বাস আমার মনে স্থান পায় নি যে মিঃ চেম্বার লেইন কখনও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সত্যিই যদি তিনি তা থাকতেন তাহলে তা সাধারণের কাছে অনতিবিলম্বে স্পষ্ট করে বলার দায়িত্ব ছিল তাঁর এবং প্রধানমন্ত্রীরই।

**কাউন্সেল** ঃ অর্থাৎ আপনি নিজে ইটালির বিরুদ্ধে, আবিসিনিয়ায় তাঁর ভূমিকার কারণে, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন না ?

**অ্যামেরি** ঃ না, আমি একটিও বার্মিংহামের যুবককে আবিসিনিয়ায় মরবার জন্য পাঠাতে প্রস্তুত ছিলাম না।

**কাউন্সেল** ঃ ১৯৩৬ সালেও কি আপনি এই মতে স্থির ছিলেন ?

**অ্যামেরি** ঃ হ্যাঁ। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আমি বলেছিলাম যে সামরিক নিষেধাজ্ঞা আমাদের কোনো সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে না।

**কাউন্সেল** ঃ কি কারণে সে সময় এমন জোরালো মতবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন আপনি ?

**অ্যামেরি** ঃ সে সময় আমার বিশ্বাস ছিল এই যে, পরিশেষে স্যার স্যামুয়েল হোরের মতবাদের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য কোনো মতবাদ আমাদের সামনে

CENTRAL LIBRARY

পাব না। আবিসিনিয়ার যে সব জায়গা ইটালির শাসনাধিকারে আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল তাঁর কোনোটিতেই আবিসিনিয়া জাতিভুক্ত মানুষের বসবাস নয়। তা কেবল, আবিসিনিয়া কর্তৃক দখলীকৃত এবং সে সব জায়গাগুলির এতদিনে উন্নতি হত আরো অনেক বেশি যদি তা নিষ্ঠুর এবং অক্ষম আবিসিনিয়ার শাসকদের শাসনাধীন না থেকে অন্য একটা সভ্য জাতির নিয়ন্ত্রণে থাকত।

**কাউন্সেল** : বন্দীও একই রকম বিশ্বাস করতেন। আপনার এই প্রশংসায় নিশ্চয় তিনি খুশি হবেন। থাক সে সব কথা, এরপর ১৯৩৮ সালে এসে আপনি কোন মতবাদে পৌঁছলেন? আপনি কি মিঃ চেম্বার লেইনের পক্ষে ছিলেন তখন? নাকি মিঃ ইডেনের?

**অ্যামেরি** : মিঃ ইডেনের ' বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশি করে যা আমার নজর কেড়েছিল তা হ'ল এই যে, তাঁর কেবল ইটালির বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভের কথাটুকুই জানা ছিল। তাঁর জানা ছিল না যে ইটালিও তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, তা সে ঠিক হোক অথবা বেঠিক, আমাদের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভের একটা তালিকা তৈরী করে রেখেছিল।

**কাউন্সেল** : এই বিশেষ ব্যাপারটি কি ভাবে, আপনার মনে হয়, ইউরোপের সাধারণ অবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল?

**অ্যামেরি** : আমি চেয়েছিলাম যে করেই হোক দুটি পরস্পর বিরোধী এবং শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীতে দেশগুলির বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে এড়াতে। যেমন একদিকে আমরা, রাশিয়া এবং ফ্রান্স, আর অন্যদিকে জার্মানী, ইটালি, জাপান এবং অন্যান্যরা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর আর কোনো পক্ষ-বিভাজন আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না।

**কাউন্সেল** : ইতিমধ্যে মিঃ চেম্বার লেইনের সাথে মত পার্থক্যের অবসান কি ঘটাতে পেরেছিলেন আপনি, যা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৩৫ সালে?

**অ্যামেরি** : হ্যাঁ। আমার মনে হয়েছিল তিনি যে প্রধান মন্ত্রী হওয়ার অব্যবহিত পরই আমাদের দেশ এবং ইটালির মধ্যেকার অর্থহীন বিরোধের অবসান ঘটাবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর অনুকূলে গিয়েছিল।

**কাউন্সেল** : মিঃ অ্যামেরি, আপনার রাজনীতি একই সঙ্গে সুসংবদ্ধ এবং দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে দেখা দিয়েছে। বেঁচে থেকে আপনাকে দেখতে হ'ল সেই পক্ষ-বিভাজন যা আপনার কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে মরণান্তক বলে মনে হয়েছিল। একদিন সেই সরকারেরই সভ্যপদ পেলেন আপনি যে সরকার ব্রিটিশ যুবকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার

জন্য। আমি আশা করব জুরীবৃন্দের নজরে নিশ্চয়ই পড়েছে যে আবিসিনিয়ায় বন্দীর কৃতকর্মের নিন্দা করার ভাবনা আপনি নেহাৎ-ই অর্থহীন মনে করে এসেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

এখন আমি মিঃ ডাফ কুপারকে ডাকব।

[ মিঃ ডাফ কুপার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল ঃ** মিঃ অ্যামেরি, যেখানে শেষ করেছেন তাঁর পরবর্তী সময়ের কিছু তথ্য আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব, মিঃ ডাফ কুপার। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ধরুন ১৯৩৭ সালে ইটালির ব্যাপারে কোন নীতি গ্রহণ করা আপনার মতে সঠিক ছিল ?

**ডাফ কুপার ঃ** আমার মত ছিল এই রকম যে, যা হয়েছে তা ভুলে গিয়ে চেষ্টা করা উচিত ইটালির সাথে অতীতের সেই পুরোনো মধুর সম্পর্ক আবার ফিরিয়ে আনা।

**কাউন্সেল ঃ** আপনি কি আশা করতেন যে, সে নীতি সফল হবে ?

**ডাফ কুপার ঃ** আমি মনে করতাম ইটালি এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে তেমন বড় রকমের কোনো ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে না। ইটালির সাথে আমাদের সুসম্পর্কের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। জুলিয়াস সিজার প্রথম আমাদের দেশে পা রাখার পর সামান্য যা বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সত্ত্বেও ইটালির সাথে আমাদের সুসম্পর্কের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার এই আশা কি তখনও টিকে ছিল যখন আপনি সরকারের জার্মানের ব্যাপারে গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকার থেকে পদত্যাগ করলেন ? ১৯৩৮ সালের ২রা নভেম্বর আপনি ইটালির উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ আপনি উদ্ধৃত করে আমাদের শোনাবেন কি ?

**ডাফ কুপার ঃ** "একনায়কতান্ত্রিক দেশ নয়। বরং আগ্রাসী দেশগুলিই আজকে বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। কখনও কখনও দুটো চরিত্রই একিভূত হয়ে একই অবয়বে আশ্রয় নেয় — এ কথা সত্যি কিন্তু তা সব সময় হয় না। যুদ্ধ পরবর্তীকালের ইটালির ইতিহাস তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। রোম-পদযাত্রার ঘটনা পর্যন্ত মধ্যবর্তী এই তেরো বছর সময়ে অ্যাংলো-আমেরিকান সম্পর্কের নীল আকাশে কখনও কালো মেঘের কালিমা লাগে নি এবং এই পর্বের সমস্ত সময় ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে সিগনর মুসোলিনির ভূমিকা ছিল শান্তির

দিকে। আবিসিনিয়া পর্ব সম্পর্কে আজ যত কম বলা যায় ততই ভাল। বিবাদের শেষে বন্ধুত্বের পুনর্মিলনের সময় পুরোনো মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার মধ্যে অবশ্যই বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এই রকম আলোচনা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে শুরু হলেও শেষ হয় বিস্ফোরণে। এবং বিবাদ আবার আরো ব্যাপ্ত হয়ে শুরু হয়ে যায়। সুতরাং অতীতকে আজ ভুলে যাওয়া যাক এবং চোখ ফেরান যাক ভবিষ্যতের দিকে। সম্ভাবনা কখনই হতাশাব্যঞ্জক নয়। ব্রিটেন এবং ইটালির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটবার আদৌ কোনো কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। ইটালি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুসংহত করবার জন্য শান্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। তাঁর ইউরোপীয় সীমান্তের অবস্থা আজকে সন্তোষজনক, আফ্রিকায় তাঁর উপনিবেশ গড়ে তুলবার রাস্তা এখন পরিষ্কার এবং সর্বোপরি তাঁর অতি সুসভ্য দেশবাসী যুদ্ধকে ঘৃণা করে।"

**কাউন্সেল :** বন্দী আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে সেই তেরো বছরে শান্তির স্বপক্ষে তাঁর ভূমিকার এমন সপ্রশংস উল্লেখের কারণে। মাননীয় জুরীবৃন্দ নিশ্চয় নজর করবেন যে, যে অতীতকে স্রেফ অতীত মনে করেই ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মিঃ ডাফ কুপার, সেই বিষয়টিরই পুনরুত্থান ঘটিয়ে বন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে দায়ের করা হয়েছে।

আমি এখন অন্য হাউস (other House) থেকে লর্ড মোট্টি স্টোনকে ডাকব।

[ লর্ড মোট্টি স্টোন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল :** আবিসিনিয়ায় ইটালির কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম ?

**মোট্টি স্টোন :** আমি তার বিরোধীতা করিনি।

**কাউন্সেল :** আপনার এই মনোভাবের কারণ ?

**মোট্টি স্টোন :** আমি চেয়েছিলাম হাস্যকর এই বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে যে, পরাজিতের পক্ষ অবলম্বন করা বা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াটাই সব সময় শ্রেয়। আবিসিনিয়ার শাসন প্রণালী এই রকম যে, জীবিত মানুষের অঙ্গচ্ছেদ করে তারপর তাকে বালির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয় হত্যা করার জন্য। সেখানে তখন প্রায় দশ লক্ষ মানুষের বাস। এঁদের মধ্য থেকে যাঁরা ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে সভা করতে চেয়েছিলেন, আমি আশা করেছিলাম তাঁরা হয়ত মনে রাখবে যে, এই সব হিংস্র লোকগুলি তখন ইটালির বীর যুবকদের মুখোমুখি।

**কাউন্সেল :** প্রাথমিক পর্যায় এ ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো খবর ছিল কি ?

**মোট্টি স্টোন ঃ** আবিসিনিয়ায় যে দাসত্ব প্রচলিত ছিল সেই দাস-দের ভূমিকা জানতে চেয়ে জেনারেল ডি. বোনোকে টেলিগ্রাফ করি আমি।

**কাউন্সেল ঃ** উত্তরে কি জানালেন তিনি ?

**মোট্টি স্টোন ঃ** উত্তরে তিনি জানালেন যে, যাঁদের দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁরাই নয় উপরন্তু, সেখানকার সাধারণ মানুষরাও উৎসাহের সাথে ছুটে এসেছিলেন ইটালির সৈন্যবাহিনীকে স্বাগত জানাতে।

**কাউন্সেল ঃ** সেই জবাবী টেলিগ্রামে তিনি ইটালির সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারের কোনো উল্লেখ করেছিলেন কি ?

**মোট্টি স্টোন ঃ** তাতে বলা হয়েছিল যে, ইটালি-সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে সাধারণ মানুষের জীবনের এবং সম্পত্তির সমস্ত রকম সুরক্ষার ব্যবস্থাই করা হয়েছে। কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি সাধারণ মানুষের কারুর হয়ে থাকলে তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আছে।

**কাউন্সেল ঃ** এমন একটি মহার্ঘ খবর পাওয়ার পর আপনি কি তা কাউকে জানিয়েছিলেন ?

**মোট্টি স্টোন ঃ** হ্যাঁ, হাউস অব লর্ডস-এ ১৯৩৫ সালের ২৩ শে অক্টোবর এ খবরের পুরোটাই আমি জানিয়েছিলাম।

**কাউন্সেল ঃ** তখন কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছিল ?

**মোট্টি স্টোন ঃ** আবিসিনিয়ায় অস্ত্র পাঠাবার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন এবং আমি বলেছিলাম যে, ঐ নিষ্ঠুর এবং বর্বর আবিসিনিয়ানদের জন্য অস্ত্র পাঠান বা অন্য কেউ পাঠালে সে দিকে চোখ বুজে থাকা এবং তদুপরি অন্যপক্ষ, যাঁদের ভূমিকা অনেক বেশি সম্মানজনক, তাঁদের সেগুলি দিতে অস্বীকার করা অপেক্ষা অধিকতর অন্যায় আর কিছুই হতে পারে না।

**কাউন্সেল ঃ** অন্যপক্ষ বলতে আপনি কি ইটালিয়ানদের বুঝিয়েছিলেন ?

**মোট্টি স্টোন ঃ** অবশ্যই।

**কাউন্সেল ঃ** আপনার দেওয়া এই বিশেষ ভাষ্যে বন্দীর কোনো বিশেষ উল্লেখ এসে পড়েছিল কি ?

**মোট্টি স্টোন ঃ** হ্যাঁ। আবিসিনিয়া থেকে ইটালি-সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার টেলিগ্রাফ করেছিল মুসোলিনিকে। তাঁর ভাষা এই রকম "আপনি হয়ত জানেন যে, আমার কাছে আমাদের পুরো সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র বস্ত্রের সংস্থান আগামী বেশ কয়েক মাসের মতন যথেষ্টই আছে কিন্তু আমি

কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, যাঁরা আমাদের নিরাপত্তাধীন এই রকম এক লক্ষ কুড়ি হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুদের ভরণপোষণ কি করে চালাব।" মুসোলিনি উত্তর দিলেন "ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। স্থানীয় মানুষদের খাদ্য যোগান অব্যাহত রাখুন আগের মতনই।"

**কাউন্সেল :** বন্দীর উত্তরের কথা হাউস অব লর্ডস-এ জানাবার সময় আপনি কোনো বিশেষ মন্তব্য করেছিলেন কি ?

**মোর্টি স্টোন :** আমি বলেছিলাম মুসোলিনির এই উত্তর তাঁর জন্য চিরস্থায়ী সম্মানের আসন নির্দিষ্ট করে রাখল।

**কাউন্সেল :** এর চেয়ে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী শ্রদ্ধা নিবেদন আমি কল্পনা করতে পারি না।

আমি এখন ডাকব মিঃ লেসলি হোরে-বেলিশা মহাশয়কে যিনি সে সময় সামরিক বিভাগের সচিব ছিলেন।

[ মিঃ হোরে-বেলিশা সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল :** আপনি কি চেম্বার লেইন-এর নেতৃত্বাধীন সরকারের একজন সভ্য ছিলেন ?

**হোরে-বেলিশা :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** অ্যাংলো-ইটালি চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন আপনি সরকারে ছিলেন। নয় কি ?

**হোরে-বেলিশা :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আপনিই কি প্রথম ব্যক্তি নন যিনি মিঃ চেম্বার লেইন-এর নেতৃত্বাধীন সরকারের তরফ থেকে রোম-এ গিয়েছিলেন ?

**হোরে-বেলিশা :** হ্যাঁ। আমার মনে হয় আমিই প্রথম।

**কাউন্সেল :** আপনি কি বন্দীকে বলেন নি যে — "ব্রিটেন এবং ইটালির ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার" পরম মুহূর্তটিতে রোমে উপস্থিত থাকতে পেরে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছেন আপনি ?

**হোরে-বেলিশা :** হ্যাঁ।

**কাউন্সেল :** বন্দীর নাম উল্লেখ করে আর কোনো বিশেষ মন্তব্য কি আপনি করেছিলেন সে সময় ?

**হোরে-বেলিশা :** সম্ভবতঃ করেছিলাম।

**কাউন্সেল :** শুনুন মিঃ হোরে-বেলিশা একথা ভোলা কিন্তু আপনার পক্ষে

সম্ভব নয়। ১৯৩৮ সালের ২৪ শে এপ্রিল এ কথা কি আপনি বলেন নি যে, বন্দীর সাক্ষাৎ লাভের এই ঘটনা সারা জীবন আপনার কাছে একটি সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে ?

**হোরে-বেলিশা** : বলেছিলাম হয়ত।

**কাউন্সেল** : এ কথাও কি আপনি বলেন নি যে — বন্দী যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা অন্যান্যদের মত আপনিও অবহিত আছেন কিন্তু সে সবের সম্পূর্ণ এবং যথাযথ অনুভব কারুর পক্ষে সম্ভব নয় যদি না তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসেন বা তাঁর দেশকে অন্তরঙ্গভাবে জানেন। এ ভাষা কি আপনার নয় মিঃ হোরে-বেলিশা ?

**হোরে-বেলিশা** : হ্যাঁ আমারই কথা বটে।

**কাউন্সেল** : আপনাকে এবং মুসোলিনিকে নিয়ে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল, নয় কি ?

**হোরে-বেলিশা** : বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

**কাউন্সেল** : বন্দী আপনাকে একটা ব্রোঞ্জের পদক উপহার দেন নি ?

**হোরে-বেলিশা** : হ্যাঁ দিয়েছিলেন।

**কাউন্সেল** : সেই পদকে কি খোদাই করে এই কথা লেখা ছিল না — "সাহস এবং বীরত্বের জন্য" ? মিঃ হোরে-বেলিশা আমার মনে হয় এই স্বীকৃতির জন্য আপনার গর্ববোধ করা উচিত।

আমি এখন লর্ড লয়েডকে ডাকব।

[ লর্ড লয়েড সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন ]

**কাউন্সেল** : আপনি বোধ হয় ১৯৪০ সালে সভাপদ পান চার্চিল নেতৃত্বাধীন সরকারে ?

**লয়েড** : হ্যাঁ

**কাউন্সেল** : তার আগে আপনি কোন পদে ছিলেন ?

**লয়েড** : আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রধান ছিলাম।

**কাউন্সেল** : ব্রিটিশ কাউন্সিল বলতে কি বোঝায় ?

**লয়েড** : এটি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান যার কাজ হ'ল ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিদেশে তুলে ধরা।

**কাউন্সেল** : আপনার বিশেষ কোন যোগ্যতার বলে 'ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত' বাইরের দেশের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব আপনি পেয়েছিলেন ?

লয়েড : আমাদের কার্যকলাপ বিদেশ দপ্তরের অনুমোদন লাভ করেছিল।

কাউন্সেল : অর্থাৎ ব্রিটিশ কাউন্সিল তাহলে একটি আধা সরকারী সংগঠন।

লয়েড : হুঁ।।

কাউন্সেল :আপনাদের সেই প্রচারে কখনও বন্দীর উল্লেখ এসে পড়েছিল কি ?

লয়েড : হুঁ।। কখনও কখনও তা করা হয়েছিল।

কাউন্সেল : কি রকমভাবে ?

লয়েড : একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলাম। তাতে তাঁর উল্লেখ ছিল।

কাউন্সেল : কি নাম দেওয়া হয়েছিল পুস্তিকাটার ?

লয়েড : দি ব্রিটিশ কেস।

কাউন্সেল : পুস্তিকাটির কথা আমি জানি। দয়া করে আপনি সেই পুস্তিকাটির ৩৭ এবং ৩৮ পাতার কোনো কোনো অংশ, যেখানে ইটালির উল্লেখ আছে, তা এই আদালতে একবার পড়ে শোনাবেন ?

লয়েড : "সর্বোপরি, ইটালির প্রতিভা বিকশিত হয়েছে এক চূড়ান্ত কর্তৃত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা তথা বৈশিষ্ট্যসূচক ফ্যাসিবাদের মধ্যে। কিন্তু তা কখনই অন্যের অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর কর্তৃত্ব করতে যায় না বা অন্য ইউরোপীয় দেশগুলির নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায় না। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, গঠনতন্ত্র এবং নীতির নিরিখে ফ্যাসিস্ত দেশের সাথে নাৎসী এবং সোভিয়েত ধরণের রাষ্ট্রের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। ইটালির শাসন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রধানত দুটি স্তম্ভের উপর। প্রথমত চার্চ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃথকীকরণ। কিন্তু চার্চের প্রাধান্য যে কেবল বিশ্বাসের উপরই তা নয়, উপরন্তু নৈতিকতার উপরও এ কথা একই ভাবে সত্য। দ্বিতীয়টি হ'ল শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ফ্যাসিজমের রাজনৈতিক কার্যবিধি বাস্তবিক পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেড-ইউনিয়ন-নিজমের উপর যেখানে জার্মান দেশের ক্ষেত্রে তা দাঁড়িয়ে রয়েছে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের ধ্বংসাবশেষের উপর পা রেখে।"

কাউন্সেল : ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার বক্তব্য স্পষ্ট এবং বোধগম্য। কোন তারিখে ঐ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশ পেয়েছিল ?

লয়েড : ১৯৪০ সালে।

কাউন্সেল : তাঁর মানে অনেক দেরীতে। আপনি কি মনে করেন জুরীবৃন্দের পক্ষে আপনার এই বক্তব্যকে বিদেশ দপ্তরের তরফ থেকে আধা-সরকারী ভাষ্য বলে মনে করা ঠিক হবে ? নাকি এটা কেবল আপনার ব্যক্তিগত মতামত মাত্র ?

**লয়েড :** অবশ্যই এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত।

**কাউন্সেল :** এই পুস্তিকা প্রকাশ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো ভৎর্সনা শুনতে হয়নি আপনাকে ?

**লয়েড :** না।

**কাউন্সেল :** তা না হওয়ার কারণ ? কি যুক্তি ছিল স্বপক্ষে ?

**লয়েড :** এই পুস্তিকাটির জন্য লর্ড-হ্যালিফ্যাক্স একটি প্রশংসাসূচক ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

**কাউন্সেল :** তখন কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি ?

**লয়েড :** বিদেশ সচিব

**কাউন্সেল :** অর্থাৎ এটিকে প্রায়-সরকারি পুস্তিকা বলা যায়।

সুতরাং, জুরী মহোদয়গণ, আমি আশা করব আপনারা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন যে, আমি আপনাদের কাছে সুনির্দিষ্ট এবং প্রামাণ্য সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পেরেছি। আমি আশা করব, এ কথাও আপনারা মেনে নেবেন যে, এ পর্যন্ত সাক্ষীরা যা বললেন তার সমন্বয়ে যে প্রামাণ্য সাক্ষ্য গঠিত হয় তা বিশেষ কয়েকটি নির্দিষ্ট এবং অনস্বীকার্য্য সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। অবশ্য এটাও সত্যি যে এমন কয়েকজন স্বাক্ষীকেও ডাকা যেতে পারত যাঁরা এর বিপরীত কথা বলতেন। সে সময়, অ্যাংলো-ইটালিয়ান সম্পর্ক যখন অন্যতম একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন হাউস-অব-কমনস-এ বৈদেশিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্যবার এবং প্রথানুগ ভাবে নথিভুক্ত হয়ে আছে অসংখ্য ভৎর্সনা-ভোট, যে মত-দান লিবারেল এবং লেবার পার্টির। সে যাইহোক, তাঁর দ্বারা আমার মতামত পরিবর্তিত হয়নি কোনোভাবে। আজ আপনাদের সামনে যাঁরা সাক্ষ্য দিলেন তাঁরা সকলেই বর্তমান শাসক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সমস্ত তথ্যই তাঁদের অধিগত এবং আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করলেন যে তাঁদের মতামত নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত।

এখন দেখা যাক, এই সব সাক্ষ্যগুলি আলোচনা করে মূল কোন সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পারি। আগেই আমি বলেছি যে, বিশ্বাসঘাতকতার যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা অবান্তর এবং কল্পনাপ্রসূত। আপনারা দেখলেন যে তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাগুলি তিনি তাঁর কথায় এবং কাজে এমনই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, ১৯৩৩ সালে চতুঃশক্তির চুক্তি স্থাপন কালে মিঃ বেনেস তা জানতে পেরেছিলেন। আপনারা দেখলেন আবিসিনিয়ার ব্যাপারে মিঃ লাভাল এবং স্যার স্যামুয়েল হোরে এই বিতর্কের

শুরুতেই স্থির করে নিয়েছিলেন কোন পথ অবলম্বন করবেন তাঁরা যদি বন্দী তাঁর যুদ্ধের হুমকিকে সত্যিই কার্যকর করতে যেতেন। আপনারা দেখলেন স্পেন-এর ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে রেখেছিলেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে যে, তাঁর পক্ষে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর পরাজয় মেনে নেওয়া কখনই সম্ভব নয়। এর পরও বিশ্বাসঘাতকতার ঐ অভিযোগে স্থির থাকতে হলে এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের নেহাৎ-ই অজ্ঞ বিবেচনা করে তাঁদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করতে হয়।

প্রথম এই বিশ্লেষণটি সাধারণ। পরবর্তীটিও মনে হয় না জটিল। এ কথা সত্যি যে কখনও কখনও সাক্ষীদের মধ্যে কেউ কেউ বন্দীর কার্য-কলাপের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কখনই সে বিরূপতা প্রকাশের মধ্যে এমন কোনো গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ছিল না যাঁর জন্য নিন্দা-প্রস্তাব দূরে থাক, শেষ পর্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশের অবকাশটুকুও থাকতে পারে। ১৯৩৯ সালে পৌঁছিয়েও দেখা গেল মিঃ চেম্বার লেইন নিজেকে ধন্য মনে করছেন বন্দীর বন্ধুত্ব লাভ করতে পেরে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, স্যার স্যামুয়েল হোর, লর্ড সিমন, মিঃ অ্যামেরি, মিঃ ডাফ কুপার সকলেই তাঁর আবিসিনিয়া আগ্রাসন কেবল মার্জনাই করলেন না, এমনকি আবিসিনিয়ায় তাঁর অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেন এবং যে সময় তা তাঁরা করলেন, স্পেন-এর যুদ্ধ তখনও চলছে। কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। মিঃ অ্যামেরি এই বিষয় সংক্রান্ত পূর্ববর্তী বিরোধগুলিকে "অর্থহীন" বলে বর্ণনা করলেন। মিঃ ডাফ কুপার চেয়েছিলেন এ সব ব্যাপারে যা কিছু অতীত হয়ে গেছে তাঁর আর পুনরুত্থান না হোক। লর্ড মোট্রি স্টোন জানালেন বন্দীর চিরকালীন সম্মানের স্থানের কথা। মিঃ হোরে বেলিশা বন্দীর কাছ থেকে সানন্দে গ্রহণ করলেন একটি ব্রোঞ্জের পদক। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করলেন যে, ভুল ত্রুটি যদি বন্দীর তরফে কিছু ঘটেও থাকে, তা কখনই তাঁদের এবং বন্দীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা নিশ্চয়ই চোরের উপর কখনও বিশ্বাস রাখি না। কিংবা বিশ্বাসঘাতকের সাথে চুক্তি করি না বা খুনির সাথে হাত মেলাই না। অতএব কেবল এই কথাটাই আমি ধরে নিতে পারি যে, এ যাবৎকাল বন্দীর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ থেকে অনায়াসে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তা থেকে তিনি মুক্ত।

তবু ভদ্রমহোদয়গণ, এমন অনেক কূটতার্কিক আছেন যাঁরা বলতে পারেন যে, কারুর ব্যক্তিগত জীবনের এই খুশি বা অখুশি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে

প্রাসঙ্গিক হতে পারে না। তাঁরা বলতে পারেন রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অপেক্ষাকৃত সরলতার শর্তের প্রয়োগ জরুরী। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কে যথোপযুক্ততার বিচার কখনও কোনো চূড়ান্ত মাপকাঠির নিরিখে সম্ভব নয়। সহজবোধ্য ভাল এবং মন্দ'র মধ্য থেকে নির্বাচন করবার সুযোগ কদাচিৎ আসে রাষ্ট্রনেতাদের কাছে। বরং এখনই তাঁদের বেছে নিতে হয় তুলনায় কম ক্ষতিকারক এবং বেশী ক্ষতিকারকের মধ্যে থেকে একটিকে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এই রকম যে, বন্দী চোর বা বিশ্বাসঘাতক বা খুনী যদি নাও হ'ন, তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কিন্তু তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন অধিকতর ক্ষতিকারককে এড়াবার জন্য। আজ যদি এইসব সূক্ষ এবং জটিল তত্ত্বের অবতারণা করা হয় বন্দীকে দোষী সব্যস্ত করার জন্য, অথচ যদি মাপ করে দেওয়া হয় সেইসব সাক্ষীদের যাঁরা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করতে, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি তবে আর কোন আন্তর্জাতিক মাপকাঠি পড়ে থাকল যার নিরিখে বাদীপক্ষের দ্বারা বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণ করা সম্ভব ? সত্যিই কি কোনো অলঙ্ঘনীয় নৈতিকতা অনুসরণ করা হ'ত সেই সব পবিত্রতম আন্তর্জাতিক চুক্তি বা অঙ্গীকারগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে ? হ্যাঁ, আমার মক্কেল বেশ কয়েকটি তেমন চুক্তি ভেঙেছিলেন। কিন্তু কে-ই বা তা ভাঙেন নি ? যে সব সাক্ষীদের সাক্ষ্য আজ আপনারা শুনলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সেই সরকারের বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত সব ব্যক্তিত্ব। যে সরকার অঙ্গীকার বদ্ধ ছিল যে দখলীকৃত এমন অঞ্চলকে স্বীকৃতি দেবে না যা কিনা লীগ অব নেশনস এবং প্যারিস চুক্তির নির্দেশাবলী অমান্যক্রমে দখলীকৃত। তাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি। যে সরকার শপথপূর্বক অঙ্গীকার করেছিল — যে কোনো মূল্যে আবিসিনিয়া, স্পেন এবং আলবেনিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার। তাঁরা অবশ্য বলতে পারেন যে উপযোগিতা বিবেচনায় সেই পবিত্রতম শপথগুলি অমান্য করার যথাযথ কারণ এক সময় দেখা দিয়েছিল। যদি এটাই তাঁদের যুক্তি হয় তাহলে, একই রকম চুক্তি বা অঙ্গীকার অমান্য করার জন্য অন্যদের অপবাদ দেওয়ার নৈতিক অধিকার তাঁদের থাকতে পারে না।

এ ছাড়াও অতিরিক্ত আর কোনো মাপকাঠি আছে কি যাঁর নিরিখে বন্দীর সেই অতীত কার্যকলাপের বিচার করা যেতে পারে ? আমাদের কি তবে এই কথাই বলতে হবে যে বন্দীর কার্যকলাপ ইউরোপের স্থিতাবস্থা বিপন্ন করেছিল ? এটিই যদি বিচারের মাপকাঠি হয় তাহলে বলব যে, অনেক কথা

বলবার আছে এ প্রশ্নের উত্তরে। আপনারা নিশ্চয় মিঃ ডাফ কুপারকে বলতে শুনলেন বন্দী সেই তেরো বছরে ইউরোপের শান্তি রক্ষার্থে কতখানি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই শুনলেন মিঃ চেম্বার লেইনকে বলতে, সেই বিশেষ অবস্থার কথা, যে সময় বন্দীর হস্তক্ষেপ ছাড়া সেই বিখ্যাত মিউনিখ শান্তি চুক্তি কখনই সম্ভব হতে পারত না। এটি হ'ল প্রশ্নের একটি উত্তর। উত্তর আরো একটি আছে এবং তা আরো জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরাই এর আশ্রয় নেবেন যাঁরা সহমত পোষণ করেন না মিঃ ডাফ কুপারের সাথে যে তেরো বছর ব্যাপী সময় জুড়ে বন্দী শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সফল এবং কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কিংবা যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে মিউনিখ সম্মেলনের আদৌ কোনো সার্থকতা ছিল। এ হেন ব্যক্তিরা যে যুক্তির আশ্রয় নেবেন তা হ'ল এই যে, অন্যের সাহায্য না পেলে কেবল মাত্র নিজের প্রয়াসে বন্দীর পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না ইউরোপের স্থিতাবস্থা ব্যহত করা। অর্থাৎ এইসব বলপ্রয়োগের প্রক্রিয়ায় কেউ না কেউ তাঁর সহচর ছিলই এবং যদি সত্যিই সুবিচার করতে হয় তাহলে সেই সব দোসরদেরও আজ বিচার হওয়া উচিত যাঁরা সেই আগ্রাসন সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিলেন। ইটালির সৈন্যবাহিনীর পক্ষে কখনও কি আবিসিনিয়া দখল করা সম্ভব হত যদি ব্রিটিশ সরকার ১০-ই সেপ্টেম্বর তারিখের ব্যক্তিগত বোঝা-পড়া অনুযায়ী না চলে ১৯৩৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় ঘোষণা করা নীতি অনুযায়ী চলত? স্পেন-এর উপর ইটালির আক্রমণ কি কখনই সফল হতে পারত মিঃ চেম্বার লেইন এবং লর্ড হ্যালিফ্যাক্স-এর সাহায্য ছাড়া? ইটালি কি কখনই পারত নাৎসী জার্মানীর প্রতি এমন মাত্রায় সহযোগিতায় সামিল হতে যদি না ইটালির সম্মান এবং ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটত ১৯৩৩ সালে লর্ড সিমনের রোম যাত্রার দিন থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সালে মিঃ চেম্বার লেইনের রোম যাত্রার দিন পর্যন্ত এই সময়কালে? ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যদি এই সব বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও অভিযুক্ত করা হয় একমাত্র তবেই বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু, যদি তাঁদের নির্দোষ ধরে নেওয়া হয় তাহলে কোন নিরিখে যে বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে তা সত্যি বোধের অগম্য। মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় কি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য অনেকগুলি বিচার সভার প্রস্তাব দেবেন? তাহলে কি স্যার স্যামুয়েলকে মাদ্রিদ থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে অভিযোগ-কারীদের মুখোমুখী হওয়ার জন্য? লর্ড সিমনকে কি তাহলে উল স্যাক ছেড়ে আসতে হবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার জন্য? লর্ড হ্যালিফ্যাক্স-এর বিরুদ্ধে

কি অভিযোগ আনা হবে নীতিহীনতার ? ক্রমওয়েলের মতো তবে কি মিঃ চেম্বার লেইনের দেহাবশেষও কবর খুঁড়ে বার করে এনে নিক্ষেপ করতে হবে অন্য সাধারণ মানুষের দেহাবশেষের সাথে একই কবরের গর্তে ? অনুমানগুলি সকলই যে অস্বাভাবিক, অবাস্তব এবং অকল্পনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে দয়া এবং মানবিকতার যে দাক্ষিণ্য এইসব ব্যক্তিবর্গের উপর অনায়াসে ঝরে পড়তে পেরেছে তাঁর এক ক্ষুদ্রাংশ অনুরূপভাবে আমার মক্কেলের জন্যও বরাদ্দ করা হোক। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আরো একবার আবেদন করছি আপনাদের কাছে যে, এই সব অভিযোগগুলি খারিজ করে দেওয়া হোক। মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়কে আমি বলব সতর্ক হতে, কারণ এক বিপজ্জনক জমির উপর তিনি পদচারণা করছেন। তাঁর প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, রাজনৈতিক চুক্তিগুলির পবিত্রতা বা আন্তর্জাতিক নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি মহৎ চিন্তাবলী যদি সত্যিই তাঁর মাথা খেয়ে ফেলে থাকে তাহলে সেই সম্ভাবনাগুলি বরং হাউস অব কমনসের জন্য মজুত করে রেখে এই আদালতে আমাদের রেহাই দিন তা থেকে।

**বিচারক ঃ** আদালত আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকল।

## চতুর্থ দিন

**বিচারক ঃ** অভিযোগ খারিজ করার আবেদনের পক্ষে ফরিয়াদি পক্ষের কাউন্সেলের সওয়াল আমি বিবেচনায় এনেছি। আমি স্বীকার করছি যে, তাঁর বক্তব্য ভীষণভাবে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয়েছে আমার। কিন্তু সে যাইহোক, যেহেতু এই মামলাটি অনন্যতায় অসাধারণ এবং যেহেতু ফরিয়াদি পক্ষের প্রতি অত্যন্ত বেশী নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে সুতরাং আপাতত এই মামলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে আমি বাধ্য। আমি মনে করি অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের নিশ্চয় কিছু বলবার আছে।

**অ্যাটর্নী জেনারেল ঃ** ফরিয়াদি পক্ষ থেকে যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তার উত্তর ঠিক এখনই আমি দিতে চাইছি না বিস্তারিতভাবে। যে সব যুক্তি তাঁর তরফ থেকে হাজির করা হ'ল সেগুলি বন্দীর ধূর্তামির সহায়তায় কৃত তথ্য-বিকৃতির ফসল কিনা তা আমার সঠিক জানা নেই। এগুলির যথার্থতা নিয়ে যে আমার সন্দেহ আছে — কেবল সেই কথাটাই আমি জানিয়ে রাখছি। আমার মনে হয়েছে মান্যবর কাউন্সেল আদালতকে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রহিসেবে পরিণত করেছেন। সে যাইহোক, তা আমার কাছে

প্রধান সমস্যা নয়। এখানে আমার উপস্থিতির উদ্দেশ্য বন্দীর দ্রুত শাস্তিবিধান নিশ্চিত করা। এবং যেহেতু মহামান্য বিচারক (your lordship) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ফরিয়াদি পক্ষের এই অতীত পর্যালোচনা চলতে দেওয়া হবে সুতরাং ফরিয়াদি পক্ষকে পরবর্তী অভিযোগগুলি নিয়ে তাঁর সওয়াল চালিয়ে যেতে বলা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। জুরীবৃন্দকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, পরবর্তী অভিযোগের বিষয় হ'ল ১৯৪০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এই পর্বে বন্দীর কার্যকলাপ। আমার সন্দেহ আছে এই সব অপরাধের বৃত্তান্তগুলি হজম করে ফেলবার মত যথেষ্ট বড় পাকস্থলী আমার জ্ঞানী বন্ধুবরের আছে কিনা।

**কাউন্সেল ঃ** আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার জ্ঞান এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষমতার ব্যাপারে কিংবা মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের আইন জ্ঞানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিশ্চয়ই জুরীবৃন্দের আছে। আমি চাই না এই আদালতে সে সব জাহির করতে। কিন্তু পাছে অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় শীঘ্রই হতাশ হয়ে পড়েন তাই আমি একটু তাড়াতাড়িই বলে ফেলছি যে বন্দী চেয়েছেন এ ব্যাপারে নিজেই কিছু বলতে, যদি আদালত অনুমতি দেন।

**বিচারক ঃ** বলতে পারেন তিনি।

**বেনিটো মুসোলিনি ঃ** এই আদালতের সওয়াল জবাব আমি শুনলাম। শুনতে শুনতে আমারও ধৈর্যহানি ঘটেছে। অবাক লাগছে ভেবে যে আপনারা কি এই বিতর্ক অনন্তকাল অবধি চালিয়ে যাবেন! মনে হচ্ছে তাই হবে। যদি আপনারা আশা করে থাকেন এইভাবে আইন এবং নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে যেতে যেতে কোনো একদিন আপনারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন, তাহলে একদিন দেখবেন যে, এ প্রক্রিয়ার কোনো শেষ নেই। বলতে দ্বিধা হয়, তবু বলি আপনাদের এই বিতর্ক কেবল একটি সত্যকে প্রমাণ করে যে, রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক আপনারা বোঝেন না। ক্ষমতার জন্য এক নগ্ন সংগ্রামের নাম রাজনীতি এবং এক দেশের সাথে আর এক দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইন বলতে কোনো কিছু যদি থাকে তা হ'ল স্রেফ জঙ্গলের আইন। সেই আইনের জোরেই কুড়ি কুড়িটি বছর আমি ছিলাম বিজয়ী। এই একই আইনের প্রয়োগে আমি ঘৃণিত হয়েছি ব্রেনার গিরিপথে, লিবিয়া'র মরুভূমিতে, সিসিলির পর্বত চূড়ায় এবং মিলানের রাস্তায় রাস্তায়। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সাথে আরো যা কিছু সংযোজন করুন না

কেন. আমার এই কথা অনড় থাকবে কারণ দোষী তারাই যারা দুর্বল. আর বলবান সব সময়ই ত্রুটিহীন।

ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের কোনো কিছু শেখাতে যাওয়ার অভিপ্রায় আমার নেই। আমি জানি, ইংল্যাণ্ডের, এই সব সত্যকে স্বীকার না করার এক বিশেষ ঐতিহ্য আছে। আপানারা সত্যকে এখানে মিথ্যার মুখোশে ঢেকে রাখতে চান। আপনারা এমন ভাণ করেন যেন এক সর্বশক্তিমান ভবিতব্য. সাধারণত তা ব্রিটিশ নৌবহরের চেহারায়. চারিদিকে সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটিয়ে চলেছে সাধারণের উপকারার্থে। ফ্রান্সিস ড্রেক যখন একজন জলদস্যু হিসাবে সাগরে পাড়ি দিল, সে তা করল সৎ-ধর্মের নামে। দিনেরবেলায় যুদ্ধ করে রাত্রে হাঁটু ভেঙে বসতেন রবার্ট ক্লাইভ। সেসিল রোহডস্ পর্যটন চালিয়ে গেছেন একহাতে মদের বোতল আর অন্যহাতে বাইবেল নিয়ে এবং বারুদ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকত হাতের কাছেই। চিরকালই এই হ'ল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। আজ ভারতবর্ষ আপনাদের শাসনাধীন এবং তা নাকি ভারতীয়-দেরই উপকারের জন্য। আফ্রিকার অর্ধেক অংশে আপনারা যে দখল বজায় রেখে চলেছেন তা আর অন্য কোনো কারণে নয়. কালো মানুষদের গণতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য। এবং উইনস্টন চার্চিল যুদ্ধে যান তাবৎ সন্ন্যাসীদের নাম নিয়ে যাতে আপনাদের পবিত্রতার বেদীতে পাপের কোনো দাগ না লাগে। এই রকমই কার্যবিধি আপনাদের ইংল্যাণ্ডে এবং এতে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধিটুকু হয় বেশ। এইভাবেই পৃথিবীর অর্ধেক জায়গা জুড়ে বিরাজ করছে. একদিকে প্রতারিত মানুষ আর অন্যদিকে ধর্মের নামে আপনাদের প্রেরিত দেবদূত। নিরীহ আপনাদের ভাষা. কিন্তু অতি হিংস্র আপনাদের কার্যকলাপ। তার জন্য অবজ্ঞা নয়. ঘৃণা করি আপনাদের। ভদ্রমহোদয়গণ, একটি মুহূর্তের জন্য প্রার্থনা করছি আপনাদের কাছে. দয়া করে আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন না। অন্তত আমাকে অভিযুক্ত করবার জন্য যেন এ হেন কপটতার আশ্রয় নেবেন না। তা সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে না। আজও জঙ্গলের আইন-ই একমাত্র আইন।

এই সত্য আমি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম আজ থেকে অনেক বছর আগে। ইটালির ইতিহাস আমি পড়েছিলাম আমাদের রাইসরজিমেণ্টোর (Risorgiments) গল্প। এই যে ঐক্যবদ্ধ ইটালি, ম্যাজিনির মহৎ ভাবা-দর্শে বা মহৎ, দয়ালু, পরোপকারী ইংল্যাণ্ডের আশীর্বাদে তা সম্ভব হয়নি। বৃহৎ শক্তিবর্গের যুদ্ধের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছে ঐক্যবদ্ধ ইটালি। নেপোলিয়ন-

থি: কখনই স্বাধীনতার রোমান্টিক প্রেমিক ছিলেন না। মানুষের স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রশ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি লোম্বার্ডি-র সমতলভূমি আক্রমণ করেননি। কিংবা লর্ড পামেরস্টন যে তা অনুমোদন করেছিলেন, তাঁর হৃদয়ের ঔদার্য্য মোটেই তার কারণ নয়। ছেলে ভোলানো এইসব পোষাকি কথাবার্তার সাথে প্রকৃত রাজনৈতিক বাস্তবতার অনেক তফাৎ। আসলে নেপোলিয়ন এবং পামেরস্টন দু'জনেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন হ্যাপসবার্গদের ক্ষমতার ক্রমহ্রাসমানতা দেখে। ইটালির রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধিত হতে দেখেই খুশি হয়েছিলেন তাঁরা। এইসব বৃহৎ শক্তিবর্গই ইটালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তাঁদের স্বার্থকে কাজে লাগিয়ে ক্যাভোর-এর (Cavour)[৬] চতুরতার প্রয়োগে তা সম্ভব হয়েছিল। এই একই নীতি অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও সত্য। আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি এর একটিও ব্যতিক্রম আপনারা আমায় দেখাতে পারবেন না। অন্তত আমার কাছে কখনও বলবেন না যে যুদ্ধে পৃথিবীর কোনো উপকার হয় না। সত্যিই হয়ত পৃথিবীর কোনো উপকার হয়নি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে ইংল্যাণ্ডের লাভ হয়েছে বিস্তর। আজ থেকে চার / পাঁচ'শ বছর আগে ইংল্যাণ্ড ছিল উত্তর সাগরের তীরে তাৎপর্যহীন একটি সামান্য দ্বীপ মাত্র। আর আজকে যে সেই ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে শ্রেষ্ঠ শক্তিধর হিসাবে, তা কি আপনারা মনে করেন সম্ভব হয়েছিল তার আইনের উৎকর্ষতার কারণে, কিংবা তার আচরণের ভব্যতার জন্যে বা তার কাব্যের মিষ্টত্বের ফলে? বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই বড় হয়েছে ইংল্যাণ্ড। তারপর পৃথিবীতে যথোপযুক্ত স্থান যখন তাঁর অধিগত হ'ল, নানাপ্রান্ত থেকে সংগৃহীত ধনরাশিতে কোষাগার যখন পূর্ণ হয়ে গেল তার, পত্তন হ'ল নগর, বাণিজ্য গড়ে উঠল দখল করা দেশের মানুষের ঘামে আর রক্তে, তখন সে স্থির করল এবার স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। কি ভাবে? বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। গলা উঁচু করে সে ঘোষণা করল পৃথিবীর কাছে যে, সাম্রাজ্য স্থাপনের পুরোনো কৌশল এখন থেকে আর প্রয়োগ করা চলবে না। এবং ইংল্যাণ্ড অতীতে যে পথে চলেছে সে পথে যদি এখন আর কেউ চলে তবে তার অর্থ দাঁড়াবে লীগ-অব-নেশনস, প্যাক্ট-অব প্যারিস এবং এরকম হাজারো চুক্তি এবং অঙ্গীকারের বিরোধীতা করা।

নিঃসন্দেহে তা এক চমৎকার প্রবণতা। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের পক্ষে যা সুবিধাজনক সে পথে চলায় আমার তৃপ্তি ছিল না। সোরেল আমাকে শিখিয়েছে হিংসা এবং বলপ্রয়োগই রাজনীতির প্রধান ভাষ্য, তথা শেষ কথা।

মিলানের অলিগলিতে ঘুরে ঘুরেও এই শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম। যখন আমি ক্ষমতায় এলাম, আমি শপথ নিলাম ইটালিকে বৃহৎ শক্তিতে (great power) পরিণত করার! আমার প্রতিভার প্রকাশ কেবল এই সাফল্যেই যে অতি শীঘ্রই অন্য যে কোনো কারুর থেকে বেশি স্পষ্ট এবং সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করতে পারলাম যে কঠিন এবং নির্দয় বলপ্রয়োগই একদিন পৃথিবীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এবং শপথ নিলাম পৃথিবীর সেই প্রাচীনতম এবং চিরকালীন মঙ্গলের আইন মেনে চলবার।

সফলতার সাথে চালিয়ে গিয়েছিলাম আমি। ভুলে যাওয়া চলে না যে অন্য যে কোনো খ্যাতমান রাজনৈতিক ব্যক্তির তুলনায় আমি অনেক কম সহায়-সম্পদ নিয়ে শুরু করেছিলাম। বৃহৎ শক্তিবর্গের সবচেয়ে নিচের সারিতে পড়েছিল ইটালি তখন। জার্মানী, ব্রিটেন, রাশিয়া অথবা আমেরিকার মত শিল্প সম্পদ এতটুকুও তার ছিল না। কোনোদিন কোনো বড় যুদ্ধে প্রধান এবং নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করার ইতিহাস তাঁর ছিল না। সুতরাং সেদিনের সেই রাজনীতির প্রহসনে, যেখানে চেম্বারে বসে আলোচনা চলত ন্যায়নীতি বা নৈতিকতার আর অ্যান্টি-চেম্বারের আলোচনায় একেশ্বর কর্তৃত্ব করত বলপ্রয়োগের উপযোগিতার তত্ত্ব, ইটালি তখন সব সময়ই ছিল অসুবিধাজনক অবস্থায়। আমি শপথ নিয়েছিলাম এই ব্যবস্থাকে পাল্টে দেওয়ার। শপথ নিলাম ইটালিকে আমি শান্তির বিঘ্নকারক দেশ হিসাবে দাঁড় করাব। স্থির করলাম রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার বৃহৎ শক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি করব। অনুভবে নিশ্চিত হলাম যে রাজনৈতিক সংশয় সৃষ্টি করতে পারলে একদিন সেই সংশয়ের মধ্যে থেকেই ইটালি তার আপন অধিকারে বৃহৎশক্তি হিসাবে সামনে এসে দাঁড়াবে।

চূড়ান্ত বিজয়লাভের কতখানি নিকটে যে আমি পৌঁছতে পেরেছিলাম তা আজও আপনারা বুঝতে পারেন নি। পারেন নি বুঝতে আপনাদের কর্তা-ব্যক্তিরাও, যাঁদের সহযোগিতা অবশ্য আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সফলতার নিকটবর্তী হতে পেরেছিলাম ১৯৩৫ সালে যখন আপনাদের নেতারা স্ট্রেসা-য় এলেন আমার সাথে দেখা করতে। আমার কাছে নতমস্তক হওয়ার জন্য সে কি তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছিল তাঁদের। আমি বেনিটো মুসোলিনি সেদিন ছিলাম ইউরোপের একমাত্র নিয়ন্তা। আমিই সেদিন ছিলাম অস্ট্রীয়ার রক্ষক এবং সেই অনুগ্রহের বিনিময়ে আমাকে দেওয়া হয়েছিল আবিসিনিয়ার উপর অধিকার। আমি দেখেছিলাম আমার স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠছে, ঠিক যেমন চার

চারটে বছর অনেক ঘাম ঝরার এবং দুশ্চিন্তায় দিন অতিবাহিত করার পর আর একবার আমার মনে হয়েছিল আবার তা পুনরুদ্ধার করতে পারলাম যখন চেম্বার লেইন এবং হ্যালিফ্যাক্স এলেন আমার সাথে দেখা করতে এবং "রোমান হলিডে" উপভোগ করতে।

সে যাইহোক, যখন আমি এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবি তখন দেখতে পাই আরো একবার এমন হয়েছিল যখন আমার লক্ষ্যবস্তুকে আরো পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম আমি। এটা আমার জিৎ যে আবিসিনিয়া দখল করার ব্যাপারটা অন্যদের চোখে অতি সামান্য ব্যাপার হিসাবে দেখা দিয়েছিল। তাৎপর্যের দিক দিয়ে সেই জয় সিজারের যে কোনো যুদ্ধ জয়ের সমতুল্য। কিন্তু যে জয়ের সম্ভাবনার স্পষ্টতার উল্লেখ আমি করলাম, শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবরূপ পেল না। ১৯৩৬ সালের ২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যায় রোম-পদযাত্রার চতুর্দশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রোমের পত্রগুলি বিশেষ সান্ধ্যসংখ্যা প্রকাশ করল। তাঁরা চমক জাগাল এই খবর জানিয়ে যে মাদ্রিদের পতন হয়েছে। ইটালির সৈন্য-বাহিনী শহরে ঢুকছে। অর্থাৎ স্পেন এখন আমার এবং স্পেন যদি আমার হয় তাহলে মেডিটারেনিয়নও আমার। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে খবরটা সঠিক ছিল না। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনী তখনও মাদ্রিদ থেকে চার মাইল দূরে এবং সেইখানেই তাঁরা থেকে গেল তিন তিনটে বছর, গভীর দুর্দশার তিনটে বছর। দীর্ঘ এই তিন বছরে আমার অর্থভাণ্ডার গেল নিঃশেষ হয়ে, আমার বিমান বাহিনী পড়ল ভেঙে। সেই অবসরে জার্মান সৈনবাহিনী ঢুকে পড়ল ব্রেনের-এ। ফলে নিরাপত্তা রক্ষার্থে ইটালিকে দাসোচিতভাবে নাৎসীবাহিনীর কাছে বিকিয়ে দিতে হ'ল নিজেকে। সত্যিই যদি মাদ্রিদের পতন হ'ত ১৯৩৬ সালে তাহলে, আজও আমি ডিক্টেটর হয়ে থাকতাম ইটালিতে এবং আজ এখানে এই আদালতের বদলে বসত নামী ট্রাইবুনালের বিচার সভা।

তবু এই দুর্ভাগ্য আমাকে কাতর করতে পারে নি। সেই ধ্বংসাবশেষ থেকেও অনেকটাই উদ্ধার করে আনতে পেরেছিলাম আমি। অতঃপর এখন আমি সেই বিষয়েই আসছি যে বিষয়ে এই আদালতে আমার বক্তব্য রাখার কথা। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে আমি অভিযুক্ত। যথাযথ অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে চাই। ১৯৩৯ সালে জার্মানীর সাথে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করি আমি। আপনারা কি চাইতেন আমি সেই শপথ ভঙ্গ করি? এই রকম ঠাট্টায় আমি আপনাদের জর্জরিত করতে চাই না আর। অবশ্য স্বপক্ষে আমার যুক্তির অভাব হ'ত না যদি সেই চুক্তি ভঙ্গ করতে চাইতাম।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিন বছর পার না হলে এমন বিরাট আকারের যুদ্ধে যাওয়ার কথা ছিল না। ইটালিকে সময় দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিরক্ষা বিভাগ ঢেলে সাজাবার। তা ছাড়া এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে জার্মানী কখনই এমন ধারণা করতে পারে নি যে, পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার পরিণতি এমন বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ডেকে আনবে। হয়ত হিটলার এই রকমই ধরে নিয়েছিলেন যে লর্ড সিমন তাঁর কাছে এসে বললেন যে, পোল্যাণ্ড এমন দামী কিছু নয় যার জন্য ব্রিটেনের পক্ষে সামান্য একটা জাহাজ হারাবার ক্ষতিও মেনে নেওয়া যেতে পারে অথবা স্যার স্যামুয়েল হোর হয়ত প্যারিসে এমন একজন সাকরেদকে পেয়ে যেতে পারেন যাঁর সাথে ফন্দি আঁটা যায় অর্ধেক পোল্যাণ্ড জার্মানীকে দিয়ে দেওয়ার ফিকির খোঁজার জন্য। মিঃ চেম্বার লেইন, হয়ত ভেবেছিলেন আমার ক্ষেত্রে যে রকম করেছিলেন সেই রকম সনির্বন্ধ অনুরোধ পাঠাবেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য এবং তারপর ওয়ারস-এ একটি সতর্ক-বার্তা ধরিয়ে দেবেন হাতে, যেমন একদা করেছিলেন প্রাগ-এ অথবা হয়ত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স গিয়ে হাজির হলেন বার্লিনে এবং পোল্যাণ্ডের সম্রাটের স্বাস্থ্য কামনা করলেন মদের গেলাস হাতে নিয়ে একই রকম উৎসাহে যেমন তিনি একবার তা করেছিলেন ইথিওপিয়ার সম্রাটের উদ্দেশ্যে। জানি না কিছুই, সুতরাং বলতে পারি না। সে যাইহোক, আমি কিন্তু কখনই হিটলারকে দোষ দিতে পারি না তার এই ভুল হিসাবের জন্য। একই ভুল আমিও করেছিলাম। ফ্রান্সের যখন পতন হ'ল, রাতারাতি যখন পাল্টিয়ে গেল ইউরোপের চেহারা, গোটা পৃথিবী যখন এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত তখন আমিও ভুল করেছিলাম। ভুল করেছিলাম বিশ্বাস করে যে প্রতিবন্ধক বলতে তখন যদি আর কেউ থাকে তবে তা হ'ল হ্যালিফ্যাক্স, চেম্বার লেইন, হোরে এবং সিমনের ইংল্যাণ্ড একমাত্র। তার অতি তুচ্ছতা যে নিরপেক্ষতার ভিত্তি, তা চালিয়ে যাওয়ার যথার্থতা আমি প্রতিপাদন করতে পারি নি।

আমার পক্ষে এবং আমার দেশের পক্ষে এটি ছিল একটি মস্ত বড় ভুল, একটি বেদনান্তক ভুল। যথাসময়ে যদি আমি হাত গুটিয়ে নিতাম তাহলে কি উজ্জ্বল এক সম্ভাবনা আজ খুলে যেত আমার সামনে, কি দারুণ অভ্যর্থনার ভীড় পড়ে যেত রোমে, কি ভীষণ শ্রদ্ধা পেতাম আমি আমার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার জন্য। ইংরেজ রাজনীতিবিদরা যাঁরা এর আগেই আমার সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন আমার শুভবুদ্ধির প্রতি, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অভিবাদন জানাতেন বিচক্ষণ পদক্ষেপের জন্য। আমার

প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা বেড়ে যেত আরো এবং সেই বর্ধিত শ্রদ্ধায় নতুন আরো প্রশংসা জানাত আমার প্রতি। ভদ্রমহোদয়গণ, এসব কথা যত সহজে আজ বুঝতে পারা যাচ্ছে ততটা সহজ তা সেদিন ছিল না। ভুল করেছিলাম আমি এই কথা বিশ্বাস করে যে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় হয়েছে। এই একই ভুল করেছিল পৃথিবীর প্রায় বাকি সকলেই। ভেনিজেলোস-এর গল্পটা মনে পড়ে গেল। কেউ একজন তাঁকে যখন বলেছিলেন যে গত যুদ্ধের পর গ্রীকের পক্ষে এশিয়া-মাইনর আক্রমণের পদক্ষেপটি ভুল ছিল, তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন "যে কোনো প্রয়াস সফল না হলেই তা ভুল।"

হ্যাঁ। ভুলই হয়েছিল, অসফল হওয়া যে অর্থে ভুল। আমার এই ব্যর্থতার জন্য যা খুশি শাস্তি দিন আমাকে, ভর্ৎসনা করুন, ফাঁসিতে ঝোলান কিংবা গুলি করে হত্যা করুন, কিন্তু দোহাই এই ব্যর্থতাকে অপরাধ আখ্যা দেওয়ার ইংরেজের এই কপটতা থেকে আমাকে রেহাই দিন। কোনো রাষ্ট্রনেতার কার্যকলাপকে কখনও অপরাধ বলে চিহ্নিত করা সমীচীন নয় কারণ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক কোনো ক্রিমিনাল কোড নেই। আমায় যদি ভর্ৎসনাও করেন আপনারা দেখবেন, কেউ না কেউ কিন্তু তখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব অর্জন করার জন্য। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলালেও বলপ্রয়োগ-তত্ত্বের পূজা থেমে থাকবে না। ক্ষমতা এখনও রাষ্ট্রগুলির আরাধ্য দেবতা। যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন অন্য আর কোনো কিছুই সে স্থান দখল করতে পারবে না। মানুষ মূলতঃ ভীরু, দাস মনোভাবাপন্ন এবং বিশ্বাসঘাতক। একমাত্র তাঁদের নৈতিক স্খলনের সূত্র ধরেই এবং তা কাজে লাগিয়েই তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তথা পরিচালনা করা যায়। অনায়াসে নির্যাতন চালান যায় তাঁদের উপর, রক্তে কাদায় মিশিয়ে দেওয়া যায় তাঁদের অস্তিত্ব, তাঁদের নেতৃবৃন্দের সমৃদ্ধির জন্য, তাঁদের মহিমা আরো ব্যাপ্ত করার জন্য। পৃথিবী তাঁদেরই যাঁরা এই সত্যটা জানে, ঠিক যে রকম কুড়িটা বছর তা ছিল আমার। এক আদিম বন্য আকাঙ্ক্ষা আমায় পেয়ে বসেছিল। আমার সমস্ত অস্তিত্বকে তা গ্রাস করেছিল। আমি চেয়েছিলাম আমার এই অধ্যায়ের উপর আমার ইচ্ছার দাগ রেখে যেতে, ঠিক যেরকম সিংহ রেখে যায় তার নখের দাগ। এবং আমি তা করেছি। ফলে রক্ত ঝরেছে অনেক, অন্যায় হয়েছে অনেক কিন্তু তার পরিধি ছিল বিরাট, ভীতিকরভায় তা ছিল ভয়ংকর। অনেক বছর লেগে যাবে সে দাগ শুকোতে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ততখানি করুণার পাত্র বোধহয় নয় যতটা আপনারা মনে করছেন। আমি ব্যর্থ হয়েছি সত্যিই কিন্তু সফল

হওয়ার উপায় আমার জানা আছে। ইংল্যাণ্ড আবার জয়ী হয়েছে বটে, আবার সে তার পা রাখতে পেরেছে আমাদের ঘাড়ের উপর বটে কিন্তু সেইখানেই তা তেমনভাবে রেখে যেতে হলে লড়াই তাকে চালিয়ে যেতে হবে অনেক। সুতরাং আমি আপনাদের পরামর্শ দেব যে আইন এবং নৈতিকতার এই সব গালগল্প আপনারা ভুলে যান। ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধই করে যেতে হবে তার এই দখলদারি টিকিয়ে রাখার জন্য। এক বিরামহীন যুদ্ধের অধ্যায় এবং বিশাল এক অরাজকতাময় ভবিষ্যৎ যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তারপর একদিন, ভগবান যেন তাই করেন, সমস্ত রকম ছলাকলা এবং ধূর্তামিসহ এই ইংল্যাণ্ড একদিন উৎপাটিত হবে এমন কোনো শক্তিমানের দ্বারা যাঁর পিছনে থাকবে বিরাট একটি জাতির তথা দেশের মানুষের সমর্থন। এবং সেই জয়ের ক্ষণে তাঁরা হয়ত একটা সৌধ গড়ে তুলবে বেনিটো মুসোলিনির স্মৃতিতে এবং তাঁর দ্বারা স্থাপিত উদাহরণের স্মারক হিসাবে।

**বিচারক :** এই আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং জনগণ হয়ত নজর করে থাকবেন যে এই আদালত প্রচলিত নিয়মের থেকে একটু অন্যভাবে চলছে। সেই অনিয়মের মধ্যে আমি আরো একটি বাড়তি সংযোজন এমন এক বিশেষ ভাবে ঘটাবার প্রস্তাব করছি যা নিশ্চিতভাবে এই আদালতের অনুমোদন লাভ করবে। অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের ভাষায় যা কেবল রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের অন্তর্ভুক্ত তা পরিত্যাগ করবার অভিপ্রায়ে তিনি কোনো সাক্ষীকে না ডাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা'তে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিচক্ষণতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হোক। তারপর যদি কোনো পক্ষের কাউন্সেলই কোনো বক্তব্য না রাখেন তাহলে জুরীবৃন্দের বিবেচনার সুবিধার্থে আমি সেই বক্তব্যের সার কথা ব্যাখ্যা করে শোনাব। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে সাক্ষী হিসাবে প্রথমে ডাকব একজন আবিসিনিয়াবাসীকে, তারপর একজন স্পেনবাসীকে এবং শেষে একজন ইটালিবাসীকে।

**আবিসিনিয়াবাসী :** বুশো বলেছিলেন যে যদি তিনি হতেন আফ্রিকার কোনো দেশের প্রধান তাহলে প্রথম ইউরোপীয় অনুপ্রবেশকারীর জন্য একটি ফাঁসি কাঠের ব্যবস্থা করে রাখতেন সীমান্তে। হঠাৎ আক্রমণে যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল আমাদের সৈন্যবাহিনী, যখন ধ্বংস করে দেওয়া হ'ল আমাদের দেশটাকে, যখন বেনিটো মুসোলিনির বাহিনী গ্যাস এবং বোমা বর্ষণ করতে করতে আদিস

আবাবায় ঢুকে পড়ল তখন বুশোর সেই কথা আমার মনে পড়ে গেল এবং আমি চেয়েছিলাম সেই পথই অনুসরণ করা হোক। বলে আপনাদের বোঝাতে পারব না কি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল মনে এবং কি ভীষণ বেদনাদায়কভাবে মোহভঙ্গ ঘটেছিল আমাদের। কিন্তু তবু আমার মনে হয় বুশোর কল্পনা এক অবাস্তবতাকে আশ্রয় করেছিল যে সাদা চামড়া এবং কালো চামড়ার মানুষ একই পৃথিবীতে বাস করবে এক সাথে। হয় বন্ধুত্বে নতুবা যুদ্ধে তাঁরা মিলিত হবে পরস্পরের সাথে। এই অকাশের নিচে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাঁদের পৃথক করে রাখতে পারে।

আমাদের মহাদেশে প্রথম অনুপ্রবেশ করেছিলেন আপনারা, ইংরেজরাই। নিমন্ত্রণ করে কেউ আপনাদের ডেকে আনে নি। হয়ত কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজনই আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্যে যৌক্তিকতা খুঁজবার চেষ্টা করবে। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অবশ্য আমরা বুঝতে পেরেছি যে কিছু উপকার আপনারা আমাদের করেছিলেন। বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং সেই সাথে আপনাদের নিজেদের ধর্ম আপনারা নিয়ে এসেছিলেন আমাদের জন্য। কিন্তু আমাদের উপকার করবার ইচ্ছা বা মানবজাতির উন্নতি বিধানের সংকল্প কখনই টেনে আনে নি আপনাদের এই উপকূলে। লুট করতে এসেছিলেন আপনারা। এবং সবচেয়ে দামী যে সামগ্রীতে আপনারা আপনাদের জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে গেলেন তা হ'ল মানুষের শরীর। আমাদের দেশের সন্তানদের আপনারা নিয়ে গেলেন অন্য এক দেশে এবং আজ চার চারটি শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি সমাজে তাঁদের জন্য সম্মানজনক স্থান নির্দিষ্ট করা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আজও তাঁদেরকে মনুষ্যেতর হিসাবে জ্ঞান করা হয়। নিগ্রোদের জন্য স্বতন্ত্র এমন কোনো রাজ্য নেই যেখানে কালো চামড়ার মানুষরা আত্ম নির্ধারণের অধিকার পেয়েছে। এ কথা সত্যি যে, নাগরিক পরিচয় এঁদের দেওয়া হয়েছে কিন্তু এঁদের মধ্যে থেকে খ্যাতিমান কয়েকজন যখন লণ্ডনে গেলেন তখন তাঁদের মুখের উপর তাঁদের জাত তুলে অপমান করা হয়েছিল। এইসব ঘটনাগুলি নিশ্চয় আপনাদের শিক্ষা চিন্তার পদ্ধতির দ্রুততা বা চমৎকারিত্বকে অতিরিক্ত গুণান্বিত করে না। আমরা অবাক হই ভেবে যে সত্যিই কি আমরা খুব খারাপ ফল করতাম যদি আপনাদের সংস্কৃতির আশীর্বাদ ব্যাতিরেকে আমাদের নিজেদের শক্তি এবং ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আমাদের নিজের পথে চলতাম এই দেড় শত বছর ?

কেবল আলোচনার খাতিরেই আলোচনা করা এ প্রশ্ন নিয়ে।

আমাদের অনিচ্ছার কারণে নয়, আপনাদের সিদ্ধান্তক্রমেই সেই সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। ক্রমে ক্রমে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনাস্থল হয়ে দাঁড়াল আফ্রিকা এবং সেই উন্মত্ততার মাঝখানে আমরা লাভবান হয়েছিলাম কেবল সেই উচ্ছিষ্টটুকু কুড়িয়ে যা. টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়েছিল আমাদের ক্ষত এবং যন্ত্রণার প্রশমনার্থে। কতটুকু লাভ আর কি ভীষণ ক্ষতি সে হিসাবে এখনও সন্দেহের অবকাশ থাকে। কারণ সেই সংঘর্ষের কাহিনী যে শেষ হয়নি এখনও। কালো চামড়ার মানুষদের অবস্থা আফ্রিকার এক এক দেশে এক এক রকম। কিন্তু. মোটের উপর কোথাও-ই সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। আফ্রিকার যে কোনো জায়গায় যেখানেই সাদা চামড়ার মানুষের বসবাস সেখানেই আফ্রিকানদের জন্য বিশেষ আইন তৈরি করা হয়েছে। সেই আইন বলে দেবে কোথায় সে কাজ করবে, ভোটাধিকার তার থাকবে কিনা এবং সাদা চামড়ার মানুষের সামনে এসে দাঁড়ালে কিরকম আচরণ তাঁকে করতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই যে আগামী পঞ্চাশ বছরে রাষ্ট্র নেতারা যদি এ ব্যাপারে যথাযথ বিচক্ষণতার প্রয়োগ না করতে পারেন তাহলে আরো ভয়ঙ্করভাবে উত্তাল হয়ে উঠতে পারে আফ্রিকা. বর্তমান অবস্থার তুলনায় তা হতে পারে আরো বেশি রক্তক্ষয়ী, আরো ভীতিকর। এবারের এই যুদ্ধে কালো চামড়ার মানুষদের কাছে থেকে যে সাগ্রহ এবং অকুণ্ঠ সমর্থন আপনারা পেয়েছেন তার জন্যে কোনো আত্মতৃপ্তির অবকাশ আপনাদের থাকতে পারে না। এক অর্থে তাঁরাও করেছে একই কারণে যে কারণে আপনারা যুদ্ধ করেছেন। প্রথমত তাঁরা যুদ্ধ করেছে কারণ এ ছাড়া আর কিছু তাঁদের করার ছিল না। দ্বিতীয়ত তাঁরা যুদ্ধ করেছে পরবর্তীতে স্বাধীনতা দাবি করবার অধিকার পাওয়ার জন্য। কিন্তু সে দাবি তাঁদের এখনও মেটেনি। পৃথিবীর চেহারা আগামীতে কেমন দাঁড়াবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে আমাদের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা কোন পথে সম্ভব হবে তার উপর। অর্থাৎ সে অধিকার বিনা বাধায় অনায়াসেই আমরা পাব, নাকি আপনাদের শত্রুতার তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে তা আমাদের পেতে হবে সেই ভবিতব্যের উপর। বাস্তবিকই কালো চামড়ার মানুষরা যে বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে সে ঘটনা নিশ্চয়ই তাদেরকে দেশে ফিরে তার প্রাপ্য অধিকার সংগ্রাম করে আদায় করে নেওয়ার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ করবে।

এখন, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে বেনিটো মুসোলিনির বিচারের সাথে এইসব বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? আমি চেষ্টা করব

আমাদের তা বোঝাতে। আবিসিনিয়া কখনই একটি আদর্শ রাষ্ট্র ছিল না। প্রাচীন বহু কুসংস্কার এবং অভ্যাসের চল ছিল সেখানে। হয়ত তর্ক তোলা যেতে পারে যে, সুসভ্য পাশ্চাত্য শক্তির শাসনে সেই যত কুসংস্কার ও বর্বরতা অতি দ্রুত দূর হয়ে যেত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারি হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সহজে সম্ভব হ'ত। সে তর্কের উত্তর সঠিক আমার জানা নেই। আফ্রিকার কোনো রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করলে হয়ত দেখা যেতে পারে যে কথাটা সত্যি। কিন্তু অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তা মোটেও সত্যি নয়। সে যাই-হোক আসল কথা হ'ল অন্য। আবিসিনিয়াতে কালো চামড়ার মানুষদের নিজেদের সমস্যার নিষ্পত্তি তাঁদের নিজেদেরই করতে হবে। আফ্রিকার মধ্যে আবিসিনিয়াই একমাত্র অংশ যা সাদা চামড়ার মানুষদের দ্বারা দখলীকৃত হয়নি। এটি তার বৈশিষ্ট্যের প্রতীক যে ভাল হোক অথবা মন্দ হোক, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার সাধারণ কালো চামড়ার মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি আছে। গত যুদ্ধের পর, যে যুদ্ধে কালো চামড়ার মানুষরা — আপনাদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছে, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মধ্যে নতুন যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল — এটি তারও প্রতীক। আবিসিনিয়াকে লীগ-অব-নেশনসের সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অন্য রাষ্ট্রের সাথে সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সে। এবং এক নিশ্বাসে বলতে হয় যে, পৃথিবীতে সেই প্রথম দেশ যার সেই সমস্ত অধিকার অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণভাবে যাকে অধীনস্থ করা হয়েছিল। আশা করি, আপনারা ক্ষমা করবেন আমাদের যদি আমরা ধরে নিয়ে থাকি যে, আমাদের উপর এই নিপীড়ন এবং অধিকার হরনের ঘটনা বাকি আর সকলের চোখের সামনে বিনা প্রতিবাদে যে ঘটে যেতে পারল তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের চামড়ার রঙ-এ।

কেবল যে আমরা মার খেয়েছিলাম সেটাই সব কথা নয়। কালো চামড়ার মানুষের উপর তা আগেও ঘটেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল আমাদের প্রতি। কালো চামড়ার মানুষের উপর তা-ও করা হয়েছিল আগে কিন্তু এমন নাটকীয় এবং আদর্শ অবস্থায় তা কখনও ঘটেনি। লীগ-অব-নেশনসের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশগুলি আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন। সকলেই একমত ছিলেন ইটালিকে দোষী সাব্যস্ত করায়। কিন্তু এইসব ঘোষণা সত্ত্বেও না কেউ পাশে এসে দাঁড়ালেন, না কেউ অস্ত্র সাহায্য পাঠালেন যখন আমাদের দেশ ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল ইটালির বোমা-আক্রমণের সামনে। জেনিভাতে আমাদের এলাকা

বিলিবণ্টন হ'ল এবং তারপর প্যারিস চুক্তির সময় আবার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড-কে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হ'ল। তবু মুসোলিনির বিজয়রথ যখন এগিয়ে চলতে লাগল, পাহাড়ি এলাকাগুলিতে না হলেও অন্তত সদর শহরগুলিতে, তখন আমাদের নেতৃবৃন্দকে বাধ্য করা হ'ল লর্ড হ্যালিফ্যাক্স-এর নৈতিক উপদেশা-বলী মেনে নিতে।

নিঃসন্দেহে সে সময়ে আপনাদের মাথাব্যথা ছিল কেবল ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম আফ্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে। বর্তমানে আমি চিন্তিত বর্তমান আফ্রিকা নিয়ে। আমার পরামর্শ এই যে সাদা চামড়া এবং কালো চামড়ার মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক যদি সত্যিই স্থাপন করতে হয় তাহলে অতীতের সেই বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন আজ মুছে ফেলতে হবে চিরকালের জন্য। এ ব্যাপারে কিছুটা অবশ্য ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। হেইলে সেলা-সিকে আবার তার আসনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যদিও কেবলমাত্র কানিং-হাম এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর দ্বারাই তা সম্ভব হয়নি, তবু আনন্দচিত্তে আমরা তাঁর অবদান স্বীকার করি। এর পিছনে আবিসিনিয়ানদের অবদানও ছিল অনেকখানি। আবিসিনিয়ার গেরিলাবাহিনী সেই অভিযানে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার উল্লেখ না করলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ ব্যক্তি। অন্য একটি যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী আদিস-আবাবা-র মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। তাঁর এই অভিযান, বলা নিষ্প্রয়োজন, হেইলি সেলাসির সমর্থনে। ইউরোপীয়ানদের শুভ বুদ্ধির প্রতি যে বিশ্বাস একদা তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হারিয়ে গিয়েছিল তা ঐ ইংরেজ ব্যক্তি ব্রিগেডিয়ার ওরদে উইনগেট আবার ফিরিয়ে আনেন। আমাদের মনের মধ্যে তার শ্রদ্ধার আসন কখনও হারিয়ে যাওয়ার নয়।

আবিসিনিয়া আবার মুক্ত হয়েছে একথা সত্যি, কিন্তু অতীত ঘটনাবলীর তিক্ত স্মৃতি এখনও কুরে কুরে খায় আমাদের। আমাদের চেতনায় এখনও এই ভীতি বাসা বেঁধে আছে যে ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়াবাসীর প্রতি যে অন্যায় এবং অমর্যাদা করা হয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত আছে আমার প্রতি, কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি ইউরোপীয়ানদের প্রকৃত মনোভাব, এবং উইনগেট-এর যে প্রয়াস তা কেবল সেই ব্যক্তি মানুষটিরই মহানুভবতার নিদর্শন কিন্তু কখনই তা বিশেষ একটি জাতির বা মহাদেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

আবিসিনিয়াকে তার হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার যে কর্তব্য উইনগেট-

CENTRAL LIBRARY

এর পরবর্তী পর্যায়ে এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ করার কাজ হয়ত এই আদালত থেকে শুরু হতে পারে। আমি মুসোলিনির মৃত্যুদণ্ড দাবী করছি। আমি দাবী করছি সেই দণ্ডাজ্ঞায় যেন এই কথা উল্লেখ করা থাকে যে ইউরোপীয়ান শাসকদের মধ্যে তাঁর সমকালে মুসোলিনিই হচ্ছেন অন্যতম, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে আবিসিনিয়ার মানুষকে কুকুরের মত হীনজ্ঞান করা যেতে পারে কারণ তাঁদের গায়ের চামড়ার রং কালো।

স্পেনবাসী : এই আদালতে মুসোলিনি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসের কোনো একদিনের কথা সেদিন রোমের সংবাদপত্র-গুলিতে মাদ্রিদের পতনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালের আগে মাদ্রিদের পতন হয়নি। আদালতকে আমি অনুরোধ করব যে রায় দেওয়ার কালে তাঁরা যেন এই ঘটনাটি বিস্মৃত না হ'ন। আমার অনুরোধ মাননীয় বিচারকের রায়-এ যেন সকৃতজ্ঞ উল্লেখ থাকে মধ্যবর্তীকালীন ঐ তিন বছরের অর্থাৎ যে সময়টুকু পর্যন্ত মাদ্রিদের পতন ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল।

ইটালির সংবাদপত্র পক্ষান্তরে খুব একটা ভুল কথা বলে নি। মুসোলিনি'র যে সামরিক অনুমান তা কেবল তার একার অনুমান ছিল না। হিটলার এবং ফ্রাঙ্কোর অনুমানও ছিল একই রকম যে, খুব বেশি দেরী হলেও বড় জোর নভেম্বর মাস, তার মধ্যে অবশ্যই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে অভিযান। পালাজো ভেনেজিয়া'র (Palazzo Venezia) সমস্ত হিসাব এই সহজ অঙ্কের উপরই দাঁড়িয়ে ছিল। এমনও হয়ে থাকতে পারে যে, হিটলার স্পেনে সৈন্য-বাহিনীর কমাণ্ডারদের সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু মুসোলিনির পক্ষে এই রকম বিলাসিতা সম্ভব ছিল না। তিনি আশা করেছিলেন সহজ জয়লাভ যা তার "রোমান লেক"-এর স্বপ্নকে বাস্তবতার নিকটবর্তী করত। ১৯৩৬ সালে স্পেন দখল হ'লে তা হ'ত ইতালির স্পেন। কিন্তু সেই বিজয়লাভের আগে তার গোটা সৈন্যবাহিনী পড়ল ভেঙে, বিরাট বিমান বাহিনী গেল প্রায় অবলুপ্ত হয়ে, আর অর্থভাণ্ডার তখন প্রায় নিঃশেষিত। কি করে মুসোলিনি আশা করলেন ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালের অধিকতর প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়ার আগের এই ক্ষয়ক্ষতির থেকে পার পেয়ে যাবেন তিনি ?

কেবল সেইটুকুই যে ক্ষতি হয়েছিল তাঁর, তা নয়। সত্যিই যদি ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিস্তদের দখলে চলে যেত স্পেন তাহলে বিনা যুদ্ধেই হার

মেনে নিতে হত সমগ্র ইউরোপকে। পরবর্তীকালে ইউরোপ পর্যুদস্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা হয়েছিল যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। মানব জাতির ভবিষ্যতে তার ফলে কতখানি পার্থক্য সূচিত হয়েছিল তার সঠিক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি মাত্র এবং সেই অনুমান যে চিত্র তুলে ধরবে সেটিই যথেষ্ট ভীতিকর। ১৯৪০ / ১৯৪১ সালে ইউরোপ যখন পর্যুদস্ত হ'ল তখন আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে তিক্ত শত্রুতা বিরাজ করছিল প্রায় প্রতিটি দেশেই। সেই অমোচনীয় ঘৃণার সহায়তা লাভেই আজ এই স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে। যুগোস্লাভিয়াতে আপনারা সেই ঘৃণার সক্রিয়তা দেখতে পাবেন। যুগোস্লাভিয়া যদি সেদিন নিমরাজি হয়েও অনুমোদন দিত তাহলে আরো কত বেশি সংখ্যক জার্মান ও ইটালিবাহিনী যে লিবিয়াতে অথবা সিসিলিতে ঢুকে পড়ত তা কি অনুমান করা যায়? ঠিক সেইটাই করেছিল স্পেন ১৯৩৬ সালে যা যুগোস্লাভিয়া তার আত্মসম্মান রক্ষার্থে করেছিল ১৯৪১ সালে। স্পেন একটা কথা অক্ষশক্তিদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তাদের কার্যসিদ্ধি কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ কুইসলিংদের (Quisling) উপর নির্ভর করে সম্ভব নয়। এই কুইসলিংদের সাহায্যার্থে তাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনীকেই পাঠাবার দরকার পড়েছিল প্রেরিত সেই সৈন্যবাহিনী পরোক্ষে বয়ে আনল ইউরোপের মুক্তির শেষ আশা। কারণ, যে সব দেশগুলিকে দমন করা হয়েছিল, সরাসরি বলপ্রয়োগ ব্যতীত কোনো চতুরতার দ্বারা তা সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ পর্যুদস্ত হ'ল যাঁরা, হার মানবার আগে তাঁরা প্রতিরোধের রাস্তাই বেছে নিয়েছিল। একদিন এই প্রতিরোধের রূপান্তর ঘটবে বিদ্রোহে এবং বিপ্লবে। স্পেন এ ব্যাপারে একটি আদর্শ হিসাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইউরোপকে সে শিখিয়েছিল কি করে প্রতিরোধ করতে হয়, কি করে যুদ্ধ করতে হয়।

তবু স্থায়ী হতে পারে নি সে প্রতিরোধ। বাদাজোজ (Badajoz), তালাভেরা (Talavera), টোলেডো (Toledo)..... অতিদ্রুত এক একটি প্রতিরোধ ক্ষেত্রের পতন ঘটতে থাকল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো সদর্পে ঘোষণা করলেন অক্টোবর মাসের মধ্যেই তিনি খোদ রাজধানীতে পৌঁছবেন। জেনারেল মোলা বুক ফুলিয়ে বললেন বারো তারিখের মধ্যেই পুয়ের্তা-দেল-সোল (Puerta-del sol)-এ বসে কফির কাপে চুমুক দেবেন তিনি। তারপর লারগো ক্যাবালেরোর (Largo Caballero) সরকার বিদায় নিল। মুরিশ বাহিনী প্রায় সদর শহরে গিয়ে পৌঁছল। লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা লিখল রিপাবলিক "অসহায় এবং ব্যর্থকাম"। স্যার স্যামুয়েল হোর এই যুদ্ধকে

আখ্যা দিলেন "অন্তর্বিরোধ"। তবু. 'টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক এবং স্যার স্যামুয়েল হোর এবং মানবজাতির বাকি সকলের সৌভাগ্য এই যে তারপরও মাদ্রিদের পতন হয়নি তিন বছর গত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ না বাস্ক ৮ জাতির মানুষদের প্রতিরোধ একেবারেই ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল সমুদ্রের মধ্যে, যতক্ষণ না অবশিষ্ট স্পেনকে কেটে আধখানা করে দেওয়া হ'ল, যতক্ষণ না ক্ষুধার যন্ত্রণা তার সমস্ত তীব্রতা নিয়ে নেমে এল অবরুদ্ধ সৈনিকদের মধ্যে, যতক্ষণ না সমস্ত পেশীগুলো অবসন্ন হয়ে পড়ল শরীরের। পায়ের পাতা তখন এমনই অসাড় এবং রক্তাক্ত, ক্রমাগত অনাহার তখন এমনই নিঃশেষ করে দিয়েছে প্রাণশক্তি যে কেবলমাত্র মনের সাহসে আর কাজ হ'ল না।

স্পেন এই যুদ্ধে একেবারে একা ছিল না। সাথে পেয়েছিল সে দূরবর্তী রাশিয়ার মূল্যবান সমর্থন। এ ছাড়াও আরো বেশ কিছু বন্ধু তাঁর ছিল যাঁরা প্রস্তুত ছিল তাঁকে সাহায্য করতে। তাঁরা এসেছিলেন নাৎসীবন্দি শিবির থেকে, ফ্যাসিস্ত কারাগার থেকে। এসেছিলেন পোল্যাণ্ড এবং কানাডা থেকে, গ্লাসগো শহরের বস্তি থেকে, রোহণ্ডার অন্ধকার গলি থেকে। তাঁরা এসেছিলেন আমাদের রক্ষা করতে এবং শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেও তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাসের নমুনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল স্পেনের মাটিতে, ভিয়েনায় এক ফেব্রুয়ারি মাসে, মার্চ মাসে. বার্লিনে, বেশ দীর্ঘ কয়েক বছর লম্বোর্ডিতে এবং একটি পর্বে লণ্ডনে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ফ্যাসিস্তদের উত্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিশ্চয়ই তাঁকে পশ্চাৎমুখী করা যেতে পারে। তাঁরা বিশ্বাস করছেন যে অবশ্যই তাঁদের ক্ষমতা আছে চূড়ান্ত যুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার, সত্যিই যা পরবর্তীতে করতে হয়েছিল আলামেইন এবং স্ট্যালিনগ্রাডে। এই যুদ্ধে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হত ইউরোপের শান্তি এবং স্বাধীনতা। কারণ মুসোলিনিকে যদি পরাজিত করা যেত স্পেন-এর মাটিতে তাহলে তার প্রভাব অনুভূত হত রোম এবং মিলান-এ, এবং অনতিবিলম্বে বার্লিন এবং হ্যামবার্গেও।

অলস কল্পনা ছিল না এগুলি। অথবা বীরত্বেরও কোনো ঘাটতি ছিল না। তবু সমস্ত আশা, সমস্ত সম্ভাবনা যে নিরর্থকতায় পরিণতি পেল, তার কারণ অন্য। স্পেন-এর হার হয়েছিল লণ্ডনে এবং প্যারিসে, যেখানকার মানুষ এমনই অজ্ঞতার শিকার যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মুসোলিনি স্পেন দখল করে নিলেও ইউরোপের শান্তি কোনোভাবে বিঘ্নিত হবে না, এবং এমনই পৌরুষহীন তাঁদের মানসিকতা যে, তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন স্পেন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও ইউরোপের স্বাধীনতা রক্ষা পেতে পারে। সবচেয়ে দ্রুত এবং

সবচেয়ে যা ভীতিকর হতে পারত, মুসোলিনির সেই জয়লাভের সম্ভাবনার পথ রোধ যে করা সম্ভব হয়েছিল, ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনেতাদের কোনো ভূমিকা তার কারণ নয়। সেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল অবসন্ন, উপযুক্ত অস্ত্রের সম্বলহীন এক সৈন্যবাহিনী। কেবল যে অস্ত্র ক্রয় করার অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাই নয়, উপরন্তু যে শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ, সেই মুসোলিনির মধ্যে "মহতি শুভবুদ্ধি" আবিষ্কার করে ব্রিটিশ হাউস-অব-কমনস তখনও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যখন ১৯৩৬ সালে তাঁর নিজের সৈন্যরা রক্তক্ষয়ী এবং মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাদ্রিদের প্রবেশ পথ ভেঙে প্রতিরোধ আবার গড়ে তুলতে। চোখ যাঁদের অন্ধ, হৃদয় যাঁদের পাষাণ, লণ্ডনের এমন কয়েকজন ভদ্রলোকের বিবেচনায় মুসোলিনির ভূমিকা নাকি ডাঃ নেগরিন-এর থেকেও অনেক বেশি শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে। যিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান জানিয়েছিলেন স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রস্তাবে যা অনায়াসে সমাধা করতে পেরেছিলেন পেটেইন ১৯৪০ সালে ফ্রান্স-এ। অন্যদিকে মে ফেয়ার-এ বিশ্রামকক্ষে যখন অভ্যর্থনা জানান হচ্ছিল কাউণ্ট গ্র্যাণ্ডিকে তখন আণ্ডর্জাতিক ব্রিগেডের অন্যান্য ইটালিয়ানরা, সৌভাগ্যক্রমে, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সহযোগিতা যুগিয়ে চলছিল গুয়াদালাজারার (Guadalajara) যুদ্ধে।

সেই অশুভ দিনগুলি গত হওয়ার পর মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তীকালে লণ্ডন এবং স্টালিনগ্রাডও লড়াই করেছে মাদ্রিদের মতন। যে কারণগুলিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালের এই যুদ্ধ, তার তাৎপর্য অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। কারণ পৃথিবীর সংকট তখন অধিকতর উচ্চতায় পৌঁছিয়েছে। প্রতিরোধের শেষ অবস্থা তথা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতির মুখোমুখি সেই অবস্থায় যে কোনো ব্যর্থতার মূল্য তখন ব্যক্তি নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে অসীম। তবু বীরত্বের দিক দিয়ে মাদ্রিদের তুলনায় অধিকতর উজ্জ্বলতায় আর কোনো শহর পারেনি ভাস্বর হয়ে উঠতে। গুয়াদালাজারার মত আরো অনেক জায়গাতেই স্বাধীনতার যোদ্ধারা অনেক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসে অবশেষে পশ্চাদাপসরনের পথ ছেড়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অধিক সংখ্যায় যোগদান ঘটতে শুরু করেছে, জয় অথবা মৃত্যু এমন কঠিন শপথ নিয়ে মরিয়া চেষ্টা তাঁদের, তবু ব্রিটেন অথবা ইউরোপ কোথাও সেই রকম দম বন্ধ করা তীব্র উন্মাদনায় মত্ত হতে আর কাউকে দেখতে পায় নি যেমন, আবিষ্ট হয়েছিল স্পেন, যখন তাদের কানে এ'ল যে, স্পেন-এর রাজধানী দখলের লক্ষ্যে মুসোলিনির দ্বিতীয় প্রয়াস ফলবতী হয়ে বিরাট জয় এনে দিয়েছে তাঁকে। ভাল হয়েছে

মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ে। ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালের তথাকথিত শান্তির নামাত্রয়ী কলঙ্কজনক দিনগুলির তুলনায় এখন অনেক বেশি অনুকূল অবস্থায় রয়েছে বর্তমান যুদ্ধমান দেশগুলি। এর ফলে, যে মুক্তির সন্ধান পাওয়া গেল, স্পেন কিন্তু তার অংশভাগী হতে পারল না। দুর্দশার শিকার হয়েছিল যে প্রথম, তার উদ্ধার প্রথমে হ'ল না। স্পেন পরাজিত হয়েছিল। অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হ'ল দেশের মানুষ এবং পরিশেষে পুনরায় সেই দাসত্বের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হতে হ'ল তাদের একদা যা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল তাঁরা। পাছে এই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে থেকেই পুনরায় তাঁরা শক্তি সংগ্রহ করে তাই মাদ্রিদ এবং বার্সিলোনার রাস্তার কোণায় কোণায় মোতায়েন করে রাখা হ'ল মেশিন-গান। এই মেশিন-গানগুলির বেশ কিছু তৈরী হয়েছিল মিলান এবং তুরিন-এ। এগুলি অমনভাবে মোতায়েন করে রাখার উদ্দেশ্য কেবল একটাই—তাদের ভয়ংকর এবং নির্মম সেই শত্রুটির কথা বারবার তাদের মনে করিয়ে দেওয়া।

স্পেন একথা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, কিছুকালের জন্য এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় তার নেই। সামরিক কৌশল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কখনও কখনও অতীত বিষাদ এবং পুরোনো গ্লানিকে হিসাবের মধ্যে আনার অবকাশ থাকে না। মনের মধ্যে থেকে সেগুলোকে মুছে ফেলতে হয়। কিন্তু আবিসিনিয়ার মত স্পেনের চেতনার গভীরেও এই ভীতি বাসা বেঁধে ছিল যে তাঁর বীরত্ব এবং তার যন্ত্রণার কাছে যে ঋণ থাকবার কথা অন্যদের, একদিন তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। এ কথা বিশ্বাস করতে পারে নি স্পেন যে ইংল্যাণ্ড সেই ফ্রাঙ্কোর প্রতি খুব বেশি দয়াপরবশ হবে যে ফ্রাঙ্কো একদা সহযোগী ছিল অক্ষশক্তির এবং তার বিজয় লাভের জন্য মনেপ্রাণে নিবেদিত করেছিল নিজেকে, যখন শক্তিশালী ছিল অক্ষশক্তি। কিন্তু তারপর ভাগ্যের চাকা অন্যদিকে ঘুরে গেলে সে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে অন্য শিবিরে। স্পেন কখনও বিশ্বাস করতে পারে নি যে তার প্রতি এতখানি অকৃতজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাপ ইংল্যাণ্ড কখনও করবে। কিন্তু, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত আশা তার ভেঙে খানখান হয়ে গেল যখন স্পেন জানতে পারল যে লণ্ডনে স্পেন-অ্যাম্বাসিতে ডিউক-অব-আলবা-র ডাকা ভোজসভায় যোগ দিতে এসেছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ সচিব। স্পেন বিশ্বাস করতে চায় যে এগুলি নেহাৎ-ই ছোটখাট ব্যাপার এবং তেমন কোনো তাৎপর্য নেই এ সবের। যাইহোক, সেই পুরনো

ঋণ শোধ করবার প্রক্রিয়া এই আদালত থেকেই নিশ্চয় শুরু হতে পারে। আমি মুসোলিনির মৃত্যু দাবী করছি। যে অপরাধ স্পেনের প্রতি করা হয়েছে তা যেন অভিযোগ পত্রে বিশিষ্টতম স্থান পায় এবং মাদ্রিদে এই "কুইসলিং"-এর বিশ্বাসঘাতকতা যেন তাঁর প্রভুর এই পরিণতি থেকে শিক্ষা পেতে পারে।

**ইটালিবাসী :** আমি ইটালির একজন অধিবাসী। বোধহয় তা তেমন কোনো কারণ হতে পারে না যার জন্য এই আদালতে আমার বক্তব্য পেশ করার আগে আমার পক্ষে বিশেষ করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া জরুরী মনে করা যেতে পারে। যে কোনো দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে গেলে শ্রেষ্ঠত্বের একটি দাবী আমাকে জানাতেই হবে। আমাদের আইন, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত এবং আমাদের শহরগুলির সৌন্দর্য, আমাদের পৃথিবীতে যে অবদান রেখে গেছে— তা থেকেই পাই আমার এই দাবীর অধিকার। অপর আর একটি বিশেষ দাবীর অধিকার বোধহয় পাই ইংল্যাণ্ড এবং ইটালির সংশ্লিষ্টতা থেকে, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শেষ অবধি এই পর্বকে বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করে। তৃতীয় দাবীটি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক এবং বর্তমানকাল সম্বন্ধীয়। যা কিছু আমার দেশের নাম নিয়ে করা হয়েছে তারজন্য আমি সত্যিই লজ্জিত, কিন্তু বিগত পঁচিশ বছরে লজ্জাস্কর যা কিছু ঘটেছে ইউরোপে, আবশ্যিকভাবে অনেক দেশই তার দায়ভাগী। গোটা ইউরোপের কাছেই তা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ, এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে ইউরোপ। এই যুক্তিতে ইটালি এবং জার্মানী উভয় দেশের অনেক মানুষই মুক্তি পাবে সেই অভিযোগ থেকে, যা প্রায়শই আনা হয় তাঁদের বিরুদ্ধে। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির তাগিদে ইটালির মানুষরাই কিন্তু ইউরোপে প্রথম ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই লড়াই তাঁরা শুরু করেছিল সেই সময় যখন অন্যান্যরা, যাঁরা আজ সেই অপরাধের দায় ইটালির সমস্ত মানুষের উপরই চাপিয়ে দিচ্ছে, তখন চুমো খাচ্ছিল ফ্যাসিজমের গালে। যত্রতত্র নানা সংঘর্ষের ঘটনা, বিশাল বিশাল বন্দী শিবির, ল্যাম্পেডুসা এবং লিপারি দ্বীপে দ্বীপান্তরিত বন্দীদের জেলখানার উঁচু উঁচু দেওয়ালগুলি ফ্যাসিজমের প্রতি ইটালির মানুষের চূড়ান্ত ঘৃণার প্রতীক। অন্য সেইসব দেশের মানুষরা, যারা একদা মুসোলিনির সাথে হাত মিলিয়েছিল ইটালির মানুষকে দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনায়, আজ যখন তাদেরই দেখি সমগ্র ইটালির মানুষের বিরুদ্ধে ফ্যাসিজমের দাসত্ব করার অপবাদ দিতে তখন সম্রাট জুলিয়েন-এর একটা কথা আমার মনে পড়ে যায় "যারা আমার বাবাকে হত্যা করে আমাকে অনাথ করল তাদের মুখে কি আমার

অনাথ বলে ভৎ'সনা করা মানায়" ?

আমি আশা করি, আমার বক্তব্য আমি স্পষ্ট করতে পেরেছি। একই নিশ্বাসে এই কথাটুকুও বলে নিতে চাই ইটালিতে যা কিছু ঘটেছিল তা কখনই ক্ষমা করতে বলব না আমি। চেষ্টা করছি ব্যাখ্যা করে বলবার। শুরু থেকেই শুরু করা যাক তবে।

ইটালির মানুষ প্রধান যে ভুলটা করেছিল তা হ'ল এই যে মুসোলিনিকে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে দিয়েছিল। একবার এ রকম ভুল করে ফেলার পর তা শোধরানো সহজ ছিল না। কেমন করে ঘটল এই নির্বুদ্ধিতা ? অন্যান্য দেশের অনেকে যা বিশ্বাস করেন যে, মুসোলিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন বলশেভিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এ কথা সত্যি নয়। ইটালিতে ফ্যাসিজমের জন্ম কমিউনিস্ট-ভীতি থেকে নয়, সমাজতন্ত্রের পরাজয় থেকে। রোমে তার পরক্ষেপের আগেই ইটালিতে বামপন্থীদের শক্তি ভেঙে পড়েছিল — এ কথা মুসোলিনি নিজেও স্বীকার করেছে। ফ্যাসিজম হ'ল, অত্যন্ত সঠিক হয়েছে এই ভাষায় বলা যে, যে বিপ্লব আদৌ কোনোদিন ঘটেনি তার বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লব। ধর্মঘট, কারখানা দখল, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সত্যিই এক সময় ঘটত কিন্তু সে সমস্তই মুসোলিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল। সুতরাং মুসোলিনি যা দাবী করেছেন তার সহজ নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক অতটা সহজ নিষ্পত্তি সম্ভব নয় সেই অভিযোগের যা তুলনায় সঠিকতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথাযথ সমাজ সংস্কার সাধনের জন্য বামপন্থীদের উদ্যোগ তথা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তা রাজা, সৈন্যবাহিনী, গীর্জা, এবং সরকারী মহল এমনই ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল যে তাঁরা প্রথমে মুসোলিনির গুণ্ডাবাহিনীকে এবং পরবর্তীকালে মুসোলিনিকে নিয়োগ করবার জন্য তৈরী হয়েছিল। সমাজের এই অংশের লোকেরা ছিল ফ্যাসিজমের দোসর। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্নের উত্তর তাহলে কেমনভাবে দেওয়া যেতে পারে ? কোনখানে সেই ভ্রান্তি ? দক্ষিণ পন্থীদের প্রধান অপরাধটি ছিল এই যে তারা সমাজ সংস্কারের চেয়ে ফ্যাসিজমকে শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করেছিলেন। অন্যদিকে বামপন্থীরা যে ভুল করেছিলেন তা হ'ল এই যে, সময়ে তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। যথেষ্ট সংঘবদ্ধভাবে এবং যথাশক্তি নিয়োগ করে সেদিন তারা সংগ্রাম করেন নি বিজয় অর্জনের জন্য। তারপর এই বিভ্রান্তি এবং এই ব্যর্থতার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ইউরোপে। ভবিষ্যতের জন্য এই তথ্যটি মনে রাখতে

হবে। মনে রাখবেন আপনারা, যাঁরা সমাজতান্ত্রিক সংস্কার অপছন্দ করেন, কোনো অবস্থাতেই নিজের দেশকে কোনোদিন ফ্যাসিজমের কাছে বিকিয়ে দেবেন না। মনে রাখবেন আপনারাও, যারা সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য স্থির চিত্ত, যেন যথেষ্ট সরল হয় আপনাদের সংগ্রাম। অন্যথায় অপরাধের দায়ভাগ আপনাদের উপরও বর্তাবে। যাইহোক, এ সমস্ত পরামর্শ সবই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয়। এখন আমি ইটালির মানুষের অপরাধের দায়ভার লাঘবার্থে সওয়াল করব এই যে ফ্যাসিজমের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল তাঁদেরই প্রথম। ফ্যাসিজমের বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসের প্রথম শিকার ইটালি। আশু বিপদের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করবার জন্য সে যদি সেদিন ধামাচাপা দেওয়ার বা আপোষের নীতিই বেছে নিয়ে থাকে তাহলে এই তথ্যটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৩৯ সালে চেম্বার লেইন যখন রোম-এ এলেন, তখনও এই ধামাচাপা দেওয়ার নীতি একটি সম্মানজনক নীতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

তাহলেও ইটালির জনগণ বা তাঁদের বেশির ভাগ মানুষ কিন্তু বিনা লড়াই-এ নতি স্বীকার করে নি। এমনই তীব্র ছিল সে সংগ্রাম যে, তাদের নেতা ম্যাট্টেওটিকে যখন জঘন্যভাবে হত্যা করা হ'ল, তখন গোটা প্রশাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল তাঁরা। সেই সংকট সহজে যায় নি। বেশ অনেক মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তবেই মুসোলিনি পেরেছিলেন স্বস্তি ফিরে পেতে এবং তাও পেরেছিলেন বিরাট সংখ্যক মানুষকে বন্দী করে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে, হত্যা করে এবং নানাবিধ নির্যাতন চালিয়ে। সে সময় তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল "ফ্যাসিজমের সামনে আজকে প্রধান সমস্যা কোনটি"। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "এর স্থায়ীত্বকাল"।

অবশেষে তিনি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অস্বীকার করব না, অনেকের আনুগত্যই তিনি অর্জন করেছিলেন। বাস্তবিকই বেশ বড় সংখ্যক মানুষকে নৃশংস পশুতে পরিণত করেছিলেন তিনি এবং তারপর তাঁর মতবাদ তাঁদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যাতে তাঁরা তার যোগ্য সমর্থক হতে পারে। কিন্তু আপনারা নিঃসন্দেহ হতে পারেন সময়ানুবর্তী ট্রেন চলাচল, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা বা নতুন নতুন সরকারী অফিসের বাড়ী ঘরদোর প্রভৃতির দ্বারা মোটেও তাঁদের সে আনুগত্য অর্জিত হয় নি। ইটালি চিরকালই একটি দরিদ্র দেশ। তখনও সে তেমনই দরিদ্র ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এহেন দরিদ্র দেশে দুর্নীতি সহজে আশ্রয় পায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের চালকই হোক বা ন্যায়দণ্ডের অধিকারী রাজাই হোক বা গীর্জার আশীর্বাদপুষ্টরাই হোক, এই দুর্নীতিই তাঁদের

হাতে প্রধান অস্ত্র। মুসোলিনি সত্যিই ইটালির জন্য কিছু করেছেন, কিন্তু কখনই কৃষকের হাতে জমি তুলে দেননি বা কারখানার শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন নি। ট্রেন সময় মত চলছে এই নিয়মানুবর্তিতা কখনই কৃষি-মজুরদের অভাবজনিত চরম দুর্দশার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না কোনো ভাবেই। মোট কথা ফ্যাসিস্ত ইটালি কখনই স্বর্গের অনুরূপ ছিল না, বিশেষত সে সময় যখন এর উচ্ছেদের আশঙ্কা রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। বেকার সমস্যা ততদিন পর্যন্ত দূর হয়নি যতদিন না ফ্যাসিস্ত প্রতিভা ইটালির মানুষের যুদ্ধোপকরণ এবং যুদ্ধের প্রতি গভীর আগ্রহ আবিষ্কার করতে পারে।

ফ্যাসিজিম আদ্যোপ্রান্ত জালিয়াতিতে ভরা। যদিও ইটালির মানুষ অনেকেই এর বাইরের চাকচিক্য দেখে প্রতারিত হয়েছে কিন্তু বাইরের অন্যান্য দেশের মানুষ প্রতারিত হয়েছে আরো অনেক বেশি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ইটালির মানুষরা কেন মুসোলিনির সাথে তাদের হিসাব বুঝে নিল না? কেন ১৯৪০ সালের জুন মাসের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের ঘটনায় ইটালির-বিদ্রোহের সম্ভাবনা সূচিত হ'ল না? প্রশ্নগুলি সহজ এবং তার সহজ উত্তর হ'ল এই যে, যতরকমের বিজ্ঞান মানুষ জানতে পেরেছে, বিপ্লব তার মধ্যে কঠিনতম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী দীর্ঘ দমন পীড়নের ইতিহাসের শেষ না হওয়া পর্যন্ত ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সম্ভব হয়নি। কুখ্যাত সামন্ততন্ত্রের প্রতি ফ্রান্সের মানুষের সহনশীলতা এমনই মাত্রাতিরিক্ত রকম বেশি ছিল যে ফ্রান্সকে বলা হ'ত নানা দেশের মাঝখানে উপবিষ্ট একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। দীর্ঘ অনেক বছরের প্রস্তুতি বিনা রাশিয়ার বিপ্লব সম্ভব হয়নি এবং তা শেষ পর্যন্ত ঘটতে পেরেছিল কেবলমাত্র তখনই যখন যুদ্ধের ফলে ইটালি থেকে আরো অনেক বেশি দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল রাশিয়ার জনসাধারণ। বিপ্লব, ট্রটস্কির ভাষায় ধাক্কা দেয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত চলচ্ছক্তিহীনকে। মুসোলিনি তাঁর দেশের মানুষের জন্য কোনো অনুকূল অবস্থা নিশ্চিত না করলেও, তাঁর আমলে সরকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত ছিল না। চরবৃত্তি, দুর্নীতি, দাসত্ব এবং অত্যাচারের নানাবিধ সূক্ষ্ম কৌশলে তুখোড় ছিল এই সরকার। দীর্ঘকাল ধরে ইটালির মানুষ, তা সে যাঁরা অত্যাচারিত হয়েছে তাঁরাই হোক অথবা যাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে তাঁরাই হোক, কারুর কাছেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কোনো দিশা ছিল না। কি করতে হবে — এ প্রশ্নের উত্তর কেউই পাচ্ছিল না খুঁজে। ইটালির কৃষক সমাজকে নিয়ে লেখা সিলোন-এর বিখ্যাত উপন্যাস "ফোনটামারা, ইগনাজিয়ো"-এর মর্মকথা এই রকমই এক উত্তরহীন প্রশ্ন। এই উপন্যাস পাঠ করলে জানা

যাবে কিভাবে প্রতিরোধ শুরু হয়। অনুধাবন করতে হয় কত দীর্ঘ এবং কত যন্ত্রণার মধ্যে অতিবাহিত করার পর প্রতিরোধের লড়াই কার্যকরী হতে পারে। শেষ প্যারাগ্রাফের কয়েকটা লাইন এখানে তুলে ধরছি।

"সে বলল 'এই যুদ্ধ কৃষকদের বিরুদ্ধে।'
'আর সকলের কার কি হ'ল ?'
'যাঁরা পালিয়ে যেতে পেরেছে, যাঁরা ধরা পড়ে নি।"
এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলে সিপোলা
'স্কারপোন কি পালাতে পেরেছে' আমার ছেলে জিজ্ঞাসা করল।
'তার আত্মার শান্তি হোক' সিপোলা উত্তর দিল ক্রস আঁকতে আঁকতে।
'ভেনেরডি সান্টো কি রেহাই পেয়েছে ধরা পড়ার হাত থেকে' ?
'তাঁর আত্মার শান্তি হোক' একই উত্তর দিল সিপোলা একই রকম ক্রস আঁকতে আঁকতে।
'আর পোনজিও পিলাটোর খবর ?'
'সে পাহাড়ের উপর দিয়ে পালিয়েছে।'
'আর মাইকেল জোম্পা ?'
'সে ওরতোনা যাওয়ার রাস্তা ধরে চলে গেছে।'
'আর জেনারেল বালডিসেরা ?'
'তাঁর আত্মার শান্তি হোক।'
'আর কে কে মারা গেল ?'

'ঠিক সে সময় আমরা শুনতে পেলাম ঘোড়ার পায়ের শব্দ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। হয়ত সৈন্যবাহিনী তখন পেনসিনা থেকে ফোনটা-মাভায় যাচ্ছিল।'

বাঁচবার জন্য আমরা মাঠের মধ্যে ছুট লাগালাম। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল পাসকোয়ালে সিপোলা। তারপর আর কোনো আওয়াজ পেলাম না তাঁর।

না পেলাম অন্য আর কারুর আওয়াজ, কেউ তাঁদের মধ্যে মারা গেছে, কেউ বা পালিয়েছে। আমাদের বাড়ি অথবা আমাদের দেশের কোনো খবরও আর পেলাম না।

আপাতত আমরা এখানে। কিন্তু চিরকাল তো আমরা এ রকম বাইরে থাকতে পারব না। কি করব তাহলে আমরা ?

এতদিনের এই সংগ্রাম, যন্ত্রণা, অশ্রুপাত, ক্ষত, রক্তপাত, ঘৃণা এবং হতাশার পর আমাদের প্রশ্ন এখন আমরা কি করব ?”

কি করবার ছিল তাঁদের ? ফ্যাসিস্ত ইটালিতে দশ লক্ষ বার উত্থাপিত হয়েছিল এই প্রশ্ন। কোনো উত্তর মেলে নি। তারপর আরো দশ লক্ষ বার ফিরে এসেছিল একই প্রশ্ন। নীরবতা ছাড়া অন্য কোনো উত্তর ছিল না। অবশেষে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল উত্তরের। জেলখানার দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বন্দীরা শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসা সেই অস্পষ্ট শব্দ। বিদ্রোহ শুরু হ'ল ইটালিতে, যেমন হয়েছিল আরো সেইসব দেশে, কঠিন পীড়নের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল যেখানকার মানুষদের দীর্ঘকাল, পথের খোঁজে মানুষদের যেখানে অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। তবু এই ক্লান্তিকর পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই সে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। এটা খুব সহজ কাজ ছিল না ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ হাউস-অব-স্যাভয়ের অনেক আগেই মিলানে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে ধর্মঘটে সামিল করা। মোটেও সহজ ছিল না আরো অনেক এমন রকমের প্রতিরোধ গড়ে তোলা যার ফলে মুসোলিনিকে সিংহাসন চ্যুত হতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। রাজা এবং ব্যাডোগ্লিয়োর দ্বারা এই পরিসমাপ্তি সম্ভব হয়নি মোটেও কারণ সত্যিই যদি তাঁরা তা চেয়ে থাকতেন তাহলে তাঁরা একুশ বছর আগেই তা করতে পারতেন। মিলানের বজ্র নির্ঘোষ এবং সংগঠিত বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি প্যালেরমো থেকে তাদের সহযোগিদের হাকি অভ্যর্থনা অবশেষে রাজাকে বাধ্য করে বাকি কর্তব্যটুকু নিজের হাতে সারতে। শেষ পর্যন্ত ইটালিতে যে শান্তি ফিরে এসেছিল তারজন্য কৃতিত্বের অধিকারী জনগণ। শান্তি দাবী এমনই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল পথে পথে যে বাকি আর সমস্ত বিষয় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যে দ্রুততায় ফ্যাসিজিমের পচন সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ল তার তুলনায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমকালীন ইতিহাসে খুব কমই আছে। এই সত্য অতি অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে, কোনো রকম অভিঘাত ব্যতিরেকেই এই বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। সত্যিই যদি ফ্যাসিজিম অনেকের আনুগত্য অর্জন করে থাকত। যেমনটি দাবী করা হত, তাহলে সত্যিই অনেকগুণ বেশি আঘাত করবার দরকার হত এবং আরো অনেক অনেক বেশি ব্রিটিশ নাগরিকের প্রাণ যেত লিবিয়া, টিউনিস এবং সিসিলিতে। ফ্যাসিজিমকে অংশত নিকেশ করা হয়েছিল ভিতর থেকেই। এই সত্যকে

কে আর অস্বীকার করবে আজকে ! মনে করুন সিসিলির জায়গায় যদি ক্রিমিয়া হ'ত এবং প্যালেরমোর জায়গায় সেবাস্টোপল ! অবস্থাটা তাহলে আজকে কতখানি অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত ! মুসোলিনি তাহলে আজও ইটালির ডিক্টেটর হয়ে থাকত ।

পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল এই যে ফ্যাসিজিম শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে নি ইটালিতে । তবু যতখানি ক্ষত সৃষ্টি করেছিল বেনিটো মুসোলিনি তা খুব কম নয় । দাসত্বে যাঁদের সে বেঁধেছিল স্বেচ্ছায় তাঁরা কেউ তা মেনে নেয় নি । তাঁরা কেউ নিষ্ঠুর অসভ্য মানুষ নয়, যাঁদের জোর করে যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল মুসোলিনি । যোগ্যতার ভিত্তিতে মানবজাতির অগ্রগতিতে যাঁর স্থান হত নেতৃত্বের, এমন যে জাতি, তার উপর সে নামিয়ে এনেছিল এমন ভীষণ রকমের বিপর্যয় এবং অসম্মান ।

এখন সেখানে আবার নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে । সমস্ত কিছুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আর একবার সে নিজেকে মুক্ত করেছে । মিলান আবার হয়ে উঠেছে বিদ্রোহের জন্য বিখ্যাত শহর । এমনও হতে পারে যে, যুদ্ধে সে বিশিষ্ট স্থান দখল করল এবং অন্যান্য পরাধীন শহরগুলির সামনে তুলে ধরল পথের সন্ধান যাতে তাঁরাও হয়ে উঠতে পারে নিজেদের নিয়ন্ত্রক এবং চরম অত্যাচার ও ভাগ্যের বিপর্যয় তাঁদের যতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছে তা ছাপিয়ে আবার মাথা তুলতে পারে তাঁরা । সেইটিই যদি সে লক্ষ্য স্থির করে থাকে তাহলে কি ভীষণ মর্মান্তিক এবং কি ভীষণ বোকামী হবে যদি সে তাঁর বন্ধুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যদি মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী অনর্থক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে ফ্যাসিজিমের জায়গায় চার্চের আধিপত্য, আনুগত্য এবং আমলা-তান্ত্রিকতার এক সংযুক্ত ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন করতে ।

এই আদালত পারে ইটালির মানুষের কাছে অন্য এক বার্তা পৌঁছে দিতে । আমি দাবী করি মুসোলিনিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক । আমি চাইব—নিজের দেশের এবং স্বজাতির উপর যে নির্যাতন সে করেছে সেই অপরাধটাই যেন অভিযোগের তালিকায় সবার আগে স্থান পায় । এত কিছুর পরেও বলব যে মৃতকে কবর দেওয়া নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই । জীবিতদের মধ্যে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করাই কাম্য আমাদের কাছে । এই লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হোক আমার দেশে যে ইংল্যাণ্ডকে সে আবার বন্ধু হিসাবে পেয়েছে ।

CENTRAL LIBRARY

## পঞ্চম দিন

**বিচারক ঃ** আমি শুরু করেছিলাম এই মামলাকে অভিনব আখ্যা দিয়ে। আমার স্থির বিশ্বাস যে এই বিশেষণে কারুর দ্বিমত থাকতে পারে না। এর এই অদ্ভুত চরিত্রের কারণ হ'ল এই যে, বন্দীর ব্যাপারে বিচারের রায় দিতে হলে আরো অনেক রাজনৈতিক প্রশ্নেও বিচারের রায় ঘোষণা করা ছাড়া উপায় নেই। বাস্তবিক, অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, আমি বলব এইসব জটিল বিষয়ের অবতারণার সম্ভাবনা আমাদের শুরুতেই অনুমান করতে পারা উচিত ছিল। যে কোনো রাজনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় এ হেন জটিলতা কখনই না এসে পারে না। কারণ স্থান, কাল, পাত্র নিরপেক্ষে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্ভব নয়। অবশ্যই তাঁর কেউ না কেউ সহচর, দোসর, শত্রু থাকবে এবং বিচার্য কার্যকলাপ নিশ্চয়ই সেইসব তাঁদের কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল বা সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং খুবই ভুল হবে যদি কেবলমাত্র মুসোলিনিকে এবং তাঁর বার্লিনের সহযোগীকেই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয়। আমাদের ভাবনা যদি নতুন পরিধি না পায়, যদি ঐ ভ্রান্ত ধারণার গণ্ডীর মধ্যেই আমরা আবদ্ধ থাকি তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে আর একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে কোনো মতে ঠেকান যাবে না। সে যাইহোক, একথা তবু অনস্বীকার্য যে অন্যান্য আরো অনেকে সেই অপরাধের দায়ভাগী, এই সত্য কিন্তু কোনোমতেই বন্দীকে দায়মুক্ত করে না।

এই আদালতে বন্দীর অপরাধের প্রকৃতির নানাবিধ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমরা সেগুলোকে প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে নেব। উদাহরণস্বরূপ, মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয় তাঁর প্রথম অভিযোগটির যুক্তিগ্রাহ্যতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সেটিকে বিচার্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে কেবলমাত্র ১৯৪০ সালের জুন মাসের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত শেষ অভিযোগটির ভিত্তিতে বন্দীর বিচারের দাবীতে এসে দাঁড়াতে রাজী হয়েছেন। এমনটি মেনে নিতে রাজী হওয়ার পিছনে কারণ হিসাবে ফরিয়াদি পক্ষের চাপ যতখানি সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য ফরিয়াদি পক্ষ যাঁদের সাক্ষী হিসাবে ডেকেছেন তাঁদের প্রতি অ্যাটর্নী জেনারেল মহাশয়ের শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম। এ কথা পরিষ্কার বোঝা গেছে তাঁদের সাক্ষ্য থেকে যে একটি নির্দিষ্ট তারিখের আগে পর্যন্ত তাঁদের কারুর কাছেই বন্দীর আচরণ বা কার্যকলাপ আপত্তিকর বিবেচিত হয়নি। মিঃ নেভিলে চেম্বারলেইন। স্যার অস্টেন চেম্বারলেইন, মিঃ চার্চিল, লর্ড লয়েড, লর্ড রদারমেয়ার, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, স্যার স্যামুয়েল

হোরে এবং আরো অনেকের সাক্ষ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে তাঁরা ঐ বিশেষ তারিখের আগে কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য বন্দীকে আদৌ দায়ী করেন নি বা তেমন গুরুতর অভিযোগ, যার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিচার সভা বসতে পারে বা মানবজাতির শত্রু হিসাবে নিন্দিত করা যেতে পারে, তা থেকে তাঁকে মুক্তি দিচ্ছেন। বন্দী যতদিন পর্যন্ত কেবলই একজন ফ্যাসিস্ত একনায়ক মাত্র ছিলেন ততদিন তাঁরা তাকে বাহবা দিয়েছেন। তারপর যতদিন পর্যন্ত তিনি কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক চুক্তিভঙ্গ করেই ক্ষান্ত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁরা আরো নতুন নতুন চুক্তি করে চলছিলেন তাঁর সাথে, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিকেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। কেউ কেউ তাঁদের মধ্যে এমন কথাও বললেন যার মর্মার্থ দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম।

সত্যিই তিনি ছিলেন মহান
কিন্তু শেষের পদক্ষেপেই সেই
সুনামের অবসান
স্বদেশ ধ্বংস হ'ল তাঁর নিজ হাতে
অন্যহাতে কুড়িয়ে নিলেন ঘৃণা
আগামী পৃথিবী কোনোদিনই তাকে
সম্মানে চিনবে না।

যদি ভাবনার এই সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আপনারা তাহলে আশা করব আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন আপনারা কি করলেন। সে ক্ষেত্রে আপনারা কখনই পারবেন না বিগত কুড়ি বছরের কোনো অপরাধের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে যা করা হয়েছিল আবিসিনিয়ার মানুষের প্রতি, স্পেনবাসীদের প্রতি এবং এমন কি ইটালির মানুষেদেরও প্রতি। মুসোলিনি নিন্দিত হলেও, ফ্যাসিজিম শেষ পর্যন্ত খালাস পেয়ে যাবে এই আদালতে। ফ্যাসিজিম সম্পর্কে আপনারাও তখন হয়ত এই ভাবে বলবেন।

পরাজয় শুধু, এইটুকু অপরাধ
দিয়েছে তাহাকে বেশ্যার অপবাদ।
মহিমা যেটুকু, থাক আপনার হয়ে
অন্ত্যজ নয়, তুচ্ছ সে নয়, তবু থাক নীচু হয়ে।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে তার আনুপূর্বিক বর্ণনা, যে মর্যাদায় ফ্যাসিজিমকে দেখা হত

বিগত বিশ বছর। এ কথা বলা কি সঙ্গত হবে আমাদের পক্ষে যে তাঁর কর্মকাণ্ডের কেবল শেষ পরিণতিটুকু অর্থাৎ তাঁর পতন তথা পরাজয়ই তাঁর নিন্দিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে কখনই আমি মনে করি না যে এই আদালতের রায় এবং বন্দীর শাস্তি-প্রাপ্তি আগামী প্রজন্মের কাছে আদৌ কোনো সার্থক উদাহরণ হয়ে থাকবে বা মুসোলিনির ভবিষ্যৎ অনুকরণকারীদের তা কোনো মতে নিবৃত্ত করতে পারবে। ফ্যাসিজমের নতুনতর কোনো প্রকাশ হয়ত ভবিষ্যতে একইভাবে আদৃত হতে দেখা যাবে। বাস্তবিকই যদি অভিযোগের কেবল এই অংশটুকুই পড়ে থাকে বিচারের অপেক্ষায় তাহলে বলব যে বন্দী তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে যে জবাব দিয়েছেন, গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে তা অনেক বেশি শক্তিশালী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যা কিছু তিনি করেছেন তাকে হঠকারিতা বলা যেতে পারে কিন্তু কখনই তা ক্রাইম বা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না কারণ আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো ক্রিমিনাল কোড নেই বা তা থাকতে পারে না।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক বন্দীর অপরাধ সম্পর্কের এই শর্ত আরোপিত ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করা হ'ল না। তৎক্ষণাৎ আমরা ফরিয়াদি পক্ষের কাউন্সেলের এই যুক্তির মুখোমুখি হই যে আন্তর্জাতিক নৈতিকতার এমন কোনো মাপকাঠি কোথাও নেই যার নিরিখে বন্দীর বিচার করা যেতে পারে বা তাঁকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। তাঁর এই দাবীর স্বপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ রাষ্ট্র নেতাগণ কর্তৃক এই পর্বে অনুরূপ চুক্তিভঙ্গের এমন অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করেছেন যেখানে এমন কতগুলো অন্যায়-দখলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যা তাঁরা কোনোদিনই দেবেন না বটে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, যেখানে এমন কতগুলো দেশকে দমন এবং দখল করবার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করা হয়েছে এই তথ্য অবগত থেকেও কোনোরকম শত্রুতা ঐ সব দেশগুলির আচরণে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি উপরন্তু তাঁরা আগেই অনুমতি দিয়ে দিয়েছিল উক্ত দখলকারীকে প্রয়োজনে তাঁদের এলাকা ব্যবহার করার। তবু বন্দীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা কষ্টকর যদি স্বপক্ষে তাঁর প্রধান দাবীটি সত্য হয়। কিন্তু আদৌ কি তা সত্য? সত্যিই কি আন্তর্জাতিক স্তরে আচরণের কোনো মাপকাঠি নেই?

আমি স্বীকার করি যে, এরকম কোনো সরল এবং সুসংবদ্ধ আইন প্রনয়ণ করা খুব সহজ নয় যা কিনা আন্তর্জাতিক আচরণ বিধি সম্পর্কিত আইন হিসাবে মান্যতা পাবে। কিন্তু তাই বলে আমি কখনই মনে করি না যে কেবল সেই কারণে এতদবিষয়ক সমস্ত ধারণাটাই বাতিল করা যেতে পারে।

সে রকম মাপকাঠি যে সত্যিই আছে এবং ইংরেজরা যে তা জানে তা আমার বিশ্বাস, ইংরেজের ইতিহাস থেকে উল্লেখ করে প্রমাণ করা যায়।

উনিশ শতকে ইটালি যখন স্বাধীনতা এবং ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করছিল তখন দীর্ঘ সেই পর্বে ইংরেজ যে নীতি গ্রহণ করেছিল তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইটালির লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করা যদিও সে সময় ইটালির সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ-কারীদের চিহ্নিত করা হ'ত শৃঙ্খলাহীন সমাজবিরোধী হিসাবে এবং যদিও ইংরেজের পক্ষে এমন নীতি গ্রহণ করার ফলে তাঁকে ইউরোপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দেশগুলির শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং কখনও কখনও তা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে ব্রিটেনের যুদ্ধে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ইটালি থেকে নির্বাসিতদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। যদিও তার ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে সেই নির্বাসিতদের আশ্রয়ের থেকেও আরো অনেক বেশি কিছু দেওয়া হয়েছিল। খোলাখুলি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছিল তাঁদের প্রতি। তাইনেসাইডের সাধারণ মানুষরা নিজেদের "ইউরোপীয় স্বাধীনতার মিত্র" হিসাবে বর্ণনা করে অভিভাষণ জানান জেনারেল গ্যারিবল্ডিকে। উত্তরে তিনি বলেন "ইংরেজরা আমাদেরকে লোক-বল, অস্ত্রবল এবং অর্থবল যুগিয়েছেন। তাঁরা সব সময় মানবজাতির প্রয়োজনে সাহায্য করে থাকেন।" এই মনোভাব যে কেবল সাধারণ ইংরেজ নাগরিকের-ই তা নয়। শাসককুলও এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। গ্ল্যাডস্টোন নীরব থাকতে পারেন নি যখন নিরাপোলিটান জেলখানার ভয়াবহ ব্যাপারগুলি তাঁর নজরে এ'ল। তিনি বেতার মাধ্যমে তার অভিযোগ সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন। একবার ভেবেও দেখলেন না যে এর ফলশ্রুতিতে বেশ কিছু শীর্ষ স্থানীয়দের ভাগ্যে এরপর কি ঘটতে পারে।

গ্ল্যাডস্টোন যখন মারা গেলেন, ইটালির প্রধানমন্ত্রী তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং একটি টেলিগ্রাম পাঠান এই মর্মে "যে নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ আজ আঘাত হানল ইংল্যাণ্ডের উপর সেই বেদনা একইভাবে মর্মাহত করল এমন সকলকেই যারা স্বাধীনতা এবং মুক্তির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ইটালি আজও ভোলে নি এবং কোনোদিনই ভুলতে পারবে না কি ভীষণ উৎসাহ এবং সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছিলেন ইটালির মানুষের সংগ্রামের প্রতি যার ফলশ্রুতিতে ইটালির স্বাধীনতা লাভ।" লর্ড জন রাসেল, যিনি ইটালির ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ফলপ্রসূ মধ্যস্থতা করেছিলেন, তিনিও অনুরূপ

শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। ইটালির রাষ্ট্রনেতা, ক্যাভুর, তার কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ একটি বার্তা পেয়ে তা পড়ে শোনাবার সময় "আবেগের তাড়নায় হঠাৎ তিনি চীৎকারকরে উঠলেন, তারপর অস্থিরতায় হাত দুটো ঘষতে লাগলেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, তারপর আবার বসে পড়লেন। কি যেন ভাবতে লাগলেন মাথা নীচু করে। তারপর যখন মুখ তুললেন, দেখা গেল অশ্রুধারা নেমে আসছে তাঁর দুই চোখ থেকে।" লর্ড জন রাসেল যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন "তাঁর স্বপ্নের ইটালিকে, তাঁর আকাঙ্ক্ষার ইটালিকে, তাঁর চিন্তনের ইটালিকে।" এইভাবে উনিশ শতকের একটি পর্বে ইউরোপে যেখানেই স্বাধীনতার জন্য কোনো আন্দোলন হয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ নীতির অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

যে ঘটনাগুলির কথা বলা হ'ল তার সাথে এই আদালতে আলোচ্য গত দশ বছরের ঘটনাগুলির চরিত্রগত বৈপরীত্য যেন আপনাদের চোখ এড়িয়ে না যায়। টাইনে সাইড (Tyneside), রোনদা (Rhondda) এবং গ্লাসগোর (Glasgow) সাধারণ মানুষ "ইউরোপীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মিত্র" হিসাবে যখন নিজেদের কষ্টার্জিত পারিশ্রমিক থেকে অর্থ সংগ্রহ করছিল স্পেন-এ পাঠাবার জন্য তখন ব্রিটেনের শাসককুল চেষ্টা করছিল তাঁদের নিবৃত্ত করতে এবং এমন কি "যুদ্ধবাজ" হিসাবে সাব্যস্ত করেছিল তাঁদের। অন্যদিকে আদালতে আলোচ্য এই দশ বছরের ঘটনাকালে ক্ষমতায় আসীন এমন কোনোও রাষ্ট্রনেতার দেখা কি পাওয়া গিয়েছিল যিনি লিপারি দ্বীপ বা ফ্যাসিজমের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে চলতে থাকা বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্ল্যাডস্টোনের মত প্রতিক্রিয়ায় নিন্দা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন ? না, কেউ না। তাঁরা তখন বড়ই ব্যস্ত ছিলেন খোদ অত্যাচারকারীদের সাথেই সন্ধি স্থাপন করার কাজে।

অন্য আর এক প্রেক্ষিতেও বৈপরীত্য নজর করা গেল বৈকি। মিঃ চেম্বারলেইন যখন মারা গেলেন তখন ইউরোপের অন্তর্গত পরাধীন দেশগুলির কোনো একটি থেকেও কি শোক এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করে কোনো বার্তা পাঠান হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ? সামান্য শোক জ্ঞাপন বার্তাও কি কারো পক্ষে আনা সম্ভব হয়েছিল মাদ্রিদ থেকে ? চোখের জল কেউ কি ফেলে-ছিল প্রাগ-এ ? অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি কোনো শোক সভা আদ্দিস-আবাবাতে ? এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে আবশ্যক নয়। যতদিন না ব্রিটেনের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটল এবং সে একনায়কতন্ত্রীদের এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল ততদিন পর্যন্ত ইউরোপের কোনো

উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনেতা কি কখনও ব্রিটিশ সরকারের পাঠান কোনো বার্তা পেয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছিলেন ক্যাডউরের মতন ? কেউ না। বরং বেশ কিছু এমন নির্মোহ মানুষের একটা তালিকা আছে. যাঁরা আশা রেখেছিলেন ইংল্যাণ্ডের উপর এই কথা চিন্তা করে যে. গ্ল্যাডস্টোনের বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা অন্তত কিছুটা হলেও সে বজায় রাখবে, তাঁরা হতাশ হলেন দেখে যে তার স্থান দখল করে বসে আছে সিমন এবং হোরের মত ব্যক্তিরা। তালিকার নামগুলি হ'ল — সেলাসি, নেগরিন, বেনেস — যা পড়লে অভিযোগের মত শোনায়।

ভদ্রমহোদয়গণ এই বৈপরীত্য নিশ্চয়ই অত্যন্ত লক্ষণীয় হিসাবে প্রতীয়মান হবে। আমি বলব এই বৈপরীত্য আসলে নীতিগত বৈপরীত্য। অবশ্যই কেউ কেউ এমন বলতে পারেন যে ইটালির স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করার নীতি যখন নেওয়া হয়েছিল তখন তা ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূলে এবং সে উদাহরণের উল্লেখ করে কখনই বলা যায় না যে অন্যান্য সময়ও বাস্তবতার নির্দেশ উপেক্ষা করে তেমনটিই চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই মতাবলম্বী লোকেদের মতে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আগে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনীতিতে যে ত্রুটি ছিল তার জন্য দায়ী বাস্তবজ্ঞান রহিত আশাবাদী কিছু লোক। ভদ্রমহোদয়গণ. এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে মানুষের স্বার্থ চিন্তা প্রায়শই তাঁর নীতিবোধকে প্রভাবিত করে কিন্তু এক্ষেত্রে যে অভিযোগ করা হ'ল তার একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর আছে। আমাদের কি একথা ধরে নিতে হবে যে, আবিসিনিয়া এবং স্পেন-এর ব্যাপারে নীতিগত আত্মসর্পণের যে পথ অনুসরণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ব্রিটিশ স্বার্থের অনুসারী ছিল ? মুসোলিনির কার্যকলাপ এবং উল্লেখিত সময়ে আগাগোড়া আমাদের সেই শত্রু. যার বিরুদ্ধে এখনও আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে. তার প্রতি সহযোগিতা যুগিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঐ মতবাদকে পরিহাস করব। না. ঠিক বলা হ'ল না। এই পর্যায় কালে "স্বার্থের খাতিরে যে ইংল্যাণ্ড তার নৈতিক উৎকর্ষ পরিত্যাগ করেছে তা নয়। বরং সে পরিত্যাগ করেছে তার স্বার্থ. যাতে তার নৈতিকতা অসদুদ্দেশ্যে বিকিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

যুদ্ধ পূর্ববর্তী দশ বছরের ব্রিটিশ কুটনীতিকে কখনই আন্তর্জাতিক নৈতিকতার মাপকাঠি হিসাবে উপস্থাপন করতে দেওয়া যেতে পারে না কাউকে। তেমন হলে সেই মাপকাঠির নিরিখে অনেক অপরাধীই বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে এবং এই যুদ্ধের পরবর্তীকালে যদি সেইটিই একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আগামীতে এমনতর বহু সংখ্যক যুদ্ধ যেমন অবশ্যম্ভাবী ঠিক তেমনি তারই আনুপূর্বিক প্রয়োজনীয়তা এমনতর বহু

সংখ্যক যুদ্ধ আদালত গঠন। বরং সেই ঘটনাকালকে ব্রিটেনের ইতিহাসে সবচেয়ে নিন্দাজনক এবং অগৌরবজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করা যাক। রাষ্ট্রনেতারা যাঁরা রোমে এবং বার্লিনে গিয়েছিলেন "তারা ট্রাইফোনিয়ান কেভ (Triphonian Cave)-এর মধ্যে ঢুকলেন হাসিমুখে এবং বেরিয়ে এলেন বিষন্নমুখে মারাত্মক এক ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়ে।" প্রকৃত পক্ষে ইউরোপকে পদানত করার প্রয়াসে তাঁরাও অংশগ্রহণকারী। কিন্তু যেহেতু তাঁদের হৃৎপিণ্ডটা ঢাকা পড়ে গেছে চর্বির তলায়, কান দুটি বধির এবং চোখ দুটি বন্ধ তাই তাঁরা কোনোদিন জানতেও পারল না কতখানি তা লজ্জাস্কর হয়েছিল তাঁদের পক্ষে। এঁরা ছিলেন এমনই এক প্রকৃতির মানুষ, চিরকালই যাঁদের বোকা বানিয়ে রাখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে নীতি নৈতিকতার এমন কোনো অনুভব এঁদের ছিল না যাতে অপরিণত মস্তিষ্ক প্রসূত বিভ্রান্তির থেকে কোনোভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। একের পরে এক দেশগুলিকে পদানত করা হতে দেখে কখনও তাঁদের মনে হ'ল না এই বিপদ ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও নিকটবর্তী হচ্ছে এবং যেহেতু তাঁরা তাঁদের তথাকথিত বাস্তবতার তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বাস করে না যে অন্য কারো পতন হলে তার প্রভাব তাঁদের উপরও পড়তে পারে সুতরাং কোনো রকম সাবধানতা অবলম্বন করার ধার ধারল না তাঁরা, তা সে তাঁদের রাষ্ট্রনীতি যাই হোক না কেন। মিঃ চেম্বার লেইন ১৩৯৯ সালে এসেও মুসোলিনির স্বাস্থ্য কামনা করে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন এবং ১৯৪০ সালেও তাঁর প্রশস্তি গেয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করে চলছিল ব্রিটেনের বিদেশ দপ্তর। তবু শেষ পর্যন্ত যে আমরা রক্ষা পেয়েছি তার কৃতিত্ব কিন্তু আদৌ এঁদের নয়। পরোক্ষে আমাদের এই উপকারটুকু করেছিল একনায়কতন্ত্রী নেতৃবৃন্দের আকাশচুম্বী উচ্চাশা, যাঁরা অতিরিক্ত তাড়াহুড়োয় ছুটল গোটা পৃথিবীটাকে দখল করে নিতে। সুতরাং একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রিটেনের জনসাধারণের হাতে সুযোগ তুলে দিল চেম্বার লেইনের পাপচক্রের অবসান ঘটাবার এবং নিজেদের সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রয়োগ করে মানবজাতিকে চরম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার এবং পৃথিবীর অন্যান্যদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগী হিসাবে পাওয়ার।

মনে হয়, এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্টই বলা হ'ল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রাসাঙ্গিকতা অবশ্যই আছে। আশা করি উদাহরণ তুলে ধরে প্রমাণ করতে পেরেছি যে নৈতিকতার অনুপস্থিতি ঘটলে কি ভয়ংকর দুর্যোগ নেমে পড়তে পারে একটি জাতির উপর। ইউটোপিয়ানিজম এবং রিয়ালিজমের দ্বন্দ্ব নিয়ে কোনো তর্কে যেতে চাই না আমি। দুটোই পরস্পরের পরিপূরক।

কিন্তু দুর্গতি সে জাতির ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী, কেবলমাত্র রিয়্যালিজমের উপরই যার একান্ত নির্ভরতা। মেটেরনিক্স-এর (Metternicks) পক্ষে হয়ত এতেই কাজ চলে গিয়ে থাকতে পারে কারণ অত্যন্ত প্রাচীন এক ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্য তার শাসনাধীন ছিল এবং তার সে তত্ত্ব প্রয়োগ করে আরো কয়েকটি দুর্দশার বছর তাঁর সাম্রাজ্যের আয়ুতে তিনি যোগ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ছোট্ট এই ইংল্যাণ্ড, উত্তর সাগরে তাৎপর্যহীন এই দ্বীপটি, একে যদি দীর্ঘায়ু লাভ করতে হয় তাহলে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ইউরোপে স্বাধীনতার আন্দোলনে নিজেকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার। অন্যথায় চরম দুর্গতি নেমে আসবে তাঁর মাথার উপর যদি সে রিয়্যালিজমের চোখ বাঁধা নীতি অনুসরণ করে। দুর্গতি তার ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবী যদি সে ইউরোপে নেতৃত্বের আসন থেকে সরে দাঁড়ায়। অবশ্য যদি সে হ্যাপসবার্গ-এর উদাহরণ অনুসরণ করতে চায় তাহলে কথা স্বতন্ত্র। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের আমি আহ্বান করছি বন্দীর বিচারের জন্য, কিন্তু তা যেন ইংল্যাণ্ডের সেই অতীত মূল্যবোধের নিরিখে না হয় যা ইংল্যাণ্ডকে সর্বনাশে পৌঁছে দিয়েছিল। বরং বিচার হোক সেই মূল্যবোধের নিরিখে যা ইংল্যাণ্ডকে মহত্ত্বের আসন দিয়েছিল এবং আগামীতে তাঁকে আরো মহান করে তুলবে।

এই মাপকাঠির স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা আর একবার করা যাক। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক শর্তাবলীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তাই তাঁর শেষ কথা নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির স্বাধীনতার বিষয়ও সেখানে প্রাসঙ্গিকতা পায়। কপট ও বিপজ্জনক এই ধারণাটি ত্যাগ করা যাক যে অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের উচিত নিস্পৃহ এবং উদাসীন থাকা। এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়েই একদা ইটালিতে ফ্যাসিজিমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। সেই পর্যায়কালে, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ফ্যাসিজিম যখন তার ভিত প্রস্তুত করছিল, মুসোলিনির সরকার তখন বিদেশী অনেক রাষ্ট্রের এবং কখনও কখনও ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকেও প্রভূত সাহায্য, সহযোগিতা এবং সমর্থন পেয়ে এসেছে। এখন, ধরা যাক ফ্যাসিজিম নিষিদ্ধ ঘোষিত হ'ল। ধরা যাক নতুন আর একজন গ্ল্যাডস্টোন গোটা পৃথিবীর জনমত এনে দাঁড় করিয়েছে ম্যাট্টেওটির খুনের প্রতিবাদে। ধরা যাক সদর্পে পদত্যাগ করবার আগেই ইটালিকে বহিষ্কার করা হ'ল লীগ থেকে। তাহলে হয়ত আর ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ইটালির জনসাধারণ হয়ত সে সব সমাধা করে ফেলতে পারত কুড়ি অথবা তিরিশের

দশকেই যা কিনা ঊনিশশো তেতাল্লিশ সালের আগে করে ফেলা যায় নি। এ সবই অনুমানমাত্র, কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে তা অবশ্যই সঠিক। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এটি অবশ্যকরণীয় কর্তব্য অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা লাভের অভিপ্সায় নৈতিক সমর্থন এবং সহযোগিতা অকৃপণ হস্তে যুগিয়ে যাওয়া। নতুন এক লীগ-অব-নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা আজ আবশ্যিক যা কেবলমাত্র সার্বজনীন-সভ্যপদ নীতির উপর ভিত্তি করে নয়, উপরন্তু বিশেষভাবে সেই সব দেশগুলির আবশ্যিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে যারা তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রমাণ রাখতে পেরেছেন যে যথার্থই তাঁরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সাধারণ মানুষের উন্নতি বিধানের জন্য কৃত সংকল্প।

নিশ্চিতভাবে হুবহু এই তত্ত্বের উপরই দাঁড়িয়ে আছে ইউনাইটেড-নেশনস-এর সংগঠন। একদা যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কেবলমাত্র কোনো এক দেশ অন্যের দ্বারা দখল হয়ে যাওয়া বা অন্যের কাছে তাঁর পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে তুলবার অতি সাধারণ এক উদ্দেশ্য নিয়ে, আজ কিন্তু তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ঘটাবার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য, ইতিমধ্যে যা ঘোষিত হয়েছে দখলীকৃত এলাকাগুলিতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত এই কর্মসূচী চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য কখনই বাধিত হবে না যদি এই মহৎ অঙ্গীকারগুলি নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া মাত্র পরিত্যক্ত হয় এবং সেই সব ভূখণ্ডগুলি, যা আমরা মুক্ত করেছি, তা যদি তাঁদের নিজ-ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তা হতে দেওয়ার অর্থ এই মহাদেশকে নতুনতর এবং অধিকতর ভয়ংকর আর এক ফ্যাসিজমের হাতে ছেড়ে দেওয়া। বন্দী এই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যবাণী করেছেন নতুন আর এক যুদ্ধ এবং অশান্তিময় আর এক যুগের যখন তার থেকে সফল অন্য কোনো উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আসবে ইংল্যাণ্ডের সাথে এবং তাঁকে পরাজিত করবে। মানবজাতির ইতিহাসে ঘটনার এমন ভিন্ন গতি হয়ত অদ্ভূত বলে মনে হতে পারে। আমি বলব এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। নব্য চিন্তন এবং তীব্র উত্তেজনার এমন এক যুগে আমরা এখন বাস করছি যার তুলনা অতীতের ধর্মযুদ্ধের সেই যুগ যা ইউরোপকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। পরিবর্তনগুলি অতি দ্রুত ঘটেছিল তখন। "সে স্মৃতি রোমন্থনের অতীত নয় যেখানে মার্টিন লুথার, একজন গোঁড়া সন্ন্যাসী তার জীবৎকালেই দেখে গিয়েছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ

ক্যাথলিক মতবাদের অনুগত ইউরোপের অর্ধাংশে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং বাকি অর্ধাংশে অনুরূপ আশঙ্কার ভীতি সঞ্চার করেছে। ব্যাতিক্রম সম্ভবত ইটালি এবং স্পেন, যদিও মাত্র দুই পুরুষ পরেই রোম সমূলে গোত্রান্তরিত হয়ে মিশে গেল ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ জার্মানী, বোহেমিয়া এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাথে একই স্রোতে।" পরিবর্তন এখন আরো দ্রুত ঘটে যেতে পারে। কেবলমাত্র সর্বতোভাবে নিজেদেরকে উদ্যোগে সামিল করেই আমরা আজ নতুনতর এক প্রতি-বিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে পারি নিশ্চিত-ভাবে। কেবলমাত্র অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজেদের আগ্রহকে উজ্জীবিত করেই আজ আমাদের পক্ষে সম্ভব বিপদের সম্ভাবনাকে গর্ভাবস্থাতেই সনাক্ত করা। কেবলমাত্র আদর্শগত যুদ্ধের মধ্য দিয়েই মানবজাতির মহত্তম স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে পারি আমরা। যুদ্ধ, সঠিকভাবেই তার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে যে, হয় তা দণ্ডার্হ অপরাধ নতুবা তা ধর্মযুদ্ধ তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ। আমরা যদি প্রমাণ করতে চাই যে আমাদের এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ তাহলে কখনই আমাদের ধ্বজা নামিয়ে নেওয়া চলে না যতক্ষণ না জেরুজালেম দৃশ্যমান হচ্ছে। ১৯৪০ সালে ইউরোপকে রক্ষা করে তারপর ১৯৪৪ সালে তাকে যদি পরিত্যাগ করি তাহলে ইউরোপের মানুষের কাছে কখনই আমরা ধন্যবাদার্হ হয়ে উঠতে পারব না। প্যারিস থেকে লাভালকে উৎখাত করে তারপর ফ্রান্সের মানুষদের যদি ছেড়ে দিই ডারলান [১০] এর হাতে, যদি মুসো-লিনিকে উৎখাত করে সেখানে কিং ভিক্টর এবং বাদোগ্লিওর পুনরাভিষেক নিশ্চিত করি, কিংবা একদা ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে তারপর যদি একনায়কতন্ত্রের সাথে আঁতাত করি তাহলে ইউরোপের মানুষকে নিক্ষিপ্ত করা হবে চিরন্তন দুর্দশার নিরন্তর হাহাকার করার দুর্ভাগ্যে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই সব বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা ভবিষ্যতের। সাক্ষীগণ যারা এই বিষয়গুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শুনতে আমি দ্বিধা করিনি কারণ এটা অত্যন্তই স্পষ্ট যে এই মামলার বিচারের আয়োজন করার মাধ্যমে আপনাদের আহ্বান করা হয়েছে যাতে আপনাদের বিচার কেবল একটি মানুষের অপরাধ নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা যেন বৃহত্তর পরিধি পরিগ্রহ করে। আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে বিগত সমগ্র পর্যায়কালের উপরই আপনাদের মতামত দেওয়ার জন্য। অতীতের সেই সব ঘটনাগুলিকে আপনারা যেভাবে দেখবেন তার উপরই নির্ভর করবে আগামী দিনে ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবী কোন অবয়ব ধারণ করবে।

আলোচ্য এই পর্যায়কালে অর্থাৎ যে পর্বে বন্দী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার এবং নিজ কর্তৃত্ব প্রয়োগে এ হেন সেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ পেলেন, সে সময় ইংল্যাণ্ডকে দেখতে পাওয়া গেছে ভিন্ন দুইটি রূপে। চেম্বার লেইন, সিমন এবং হোর এদের মতন নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্বাধীন যে ইংল্যাণ্ড, কনজারভেটিভ পার্টির পরিচালনাধীন যে ইংল্যাণ্ড, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল যাঁরা সমগ্র পর্যায়কালে, সেই ইংল্যাণ্ডের কথা আপনাদের বলা হয়েছে। এ হ'ল সেই ইংল্যাণ্ড যে ফ্যাসিজমকে ক্ষমা করেছে, তার সাথে মিতালি পাতিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছে, এবং কুঠারাঘাত করেছে বিবেচক এবং নিরাপদ এক আন্তর্জাতিক সমাজের সম্ভাবনার মূলে এবং পরিশেষে একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন সে বন্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে তখন সময় পার হয়ে গেছে মানবজাতিকে চরম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস নেওয়ার।

তবু এরই পাশাপাশি আর একটি ইংল্যাণ্ডও তখন ছিল। এই অন্য ইংল্যাণ্ড কিন্তু ফ্যাসিজমকে ঘৃণা করেছিল তার জন্ম মুহূর্ত থেকেই। আবিসিনিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সে লড়াই করেছিল। যে নীতির ফলশ্রুতিতে ধ্বংস হয়েছিল স্পেন, তার তীব্র বিরোধীতা করেছিল এই ইংল্যাণ্ড। বিরোধী পক্ষের অবস্থানে দাঁড়িয়ে সে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য। সে অনুধাবন করতে পেরেছিল—প্রধান যে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা দরকার তা হ'ল ফ্যাসিজম, তা সে যে বেশ ধরেই আসুক না কেন বা যে দেশেরই রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করে থাকুক না কেন। এই ইংল্যাণ্ড বামপন্থীদের ইংল্যাণ্ড, লেবার পার্টির ইংল্যাণ্ড, যে ইংল্যাণ্ড সেই ইউরোপীয় রাজনীতির উত্তরাধিকার বয়ে এনে পরিমার্জিত করে তাকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলেছে যা একদা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডকে সমস্ত দেশের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশ কিছু ভুলও করেছিল সেই ইংল্যাণ্ড। কিন্তু সে ভুলগুলি অন্যরকমের। কখনই সেগুলির তুলনা চলতে পারে না সেই সব লোকেদের অপরাধের সাথে যাঁরা মনে করত ফ্যাসিজমের সাথে অনায়াসে গাঁটছড়া বাঁধা যেতে পারে, যে ফ্যাসিজম এই মহাদেশকে অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত করার মত বিপদের সূচনা করেছিল। অন্য এই ইংল্যাণ্ডের ভুল হয়েছিল এইখানেই যে তাঁদের মতবাদ এবং বিশ্বাস কার্যকর করবার জন্য যতখানি কঠিন সংগ্রামের দরকার ছিল, তা তাঁরা করে নি। কখনও কখনও ফ্যাসিজমের ব্রিটিশ দোসরদের দেওয়া মিথ্যা স্তোকবাক্য তাঁরা বিশ্বাস করে-

ছিলেন। কখনও কখনও তা অতিরিক্ত ভেঙে পড়েছিলেন 'যুদ্ধবাজ' অপবাদে। এ অপবাদ তাঁদের দিত তাঁদের বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ কনজারভেটিভ পার্টি এবং তা দিত তখনই ঠিক যখনই তাঁরা তুলে ধরত ফ্যাসিজমের উত্থান ব্রিটিশ জাতির জন্য যে বিপদ ডেকে আনছে তার সত্যিকারের চেহারা। মারাত্মক ত্রুটি এগুলি। তা সত্ত্বেও এই অন্য ইংল্যাণ্ড, গ্যারিবল্ডির ভাষায় যে ইংল্যাণ্ড "মানবজাতির প্রয়োজনার্থে সর্বদাই সাহায্য যুগিয়ে চলেছে," তখনও জীবিত ছিল। বিশ্বাস-ঘাতকতার শিকার আবিসিনিয়াতে বা আক্রান্ত স্পেনেও মানুষের বিশ্বাস ছিল এই ইংল্যাণ্ডের প্রতি। অন্য এই ইংল্যাণ্ডের পুনরুত্থানই পৃথিবীকে রক্ষা করেছে এবং ভবিষ্যতে ইউরোপীয় বিপ্লবের আশা একমাত্র এই যুদ্ধে আমাদের শত্রুপক্ষের পরাজয়ের পরই যা কল্পনা করা সম্ভব, তার বাস্তবায়ণ আবশ্যিক ভাবে নির্ভর করবে কোন ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ পরবর্তীকালে শাসন ক্ষমতায় থাকবে তার উপর। অর্থাৎ তা নির্ভর করবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকগুলির মানসিক প্রকৃতির উপর অর্থাৎ তাঁরা যুদ্ধ পূর্ববর্তীকালে কৃত অপরাধের বোধ দ্বারা তাড়িত কিনা, প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তা মোচনে কতখানি উৎসুক এবং আন্তরিক কিনা তাঁদের এমন এক আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া যেখানে মানুষ পারবে নিজের জন্য যথার্থ স্বাধীনতার অনুসন্ধান করতে নাকি সেই কলঙ্কিত অতীত বিস্মৃত হয়ে সেই টোরী পার্টির ইংল্যাণ্ডকেই আবার তারা ক্ষমতায় ফিরে আসতে দেবে চোরাপথে ঠিক যেমন ভাবে নেপোলিয়নের পতনের পর আবার ফিরে এসেছিল রাজারা।

বিষয়টিকে এই রকম রাজনৈতিক চেহারাতেই উপস্থাপন করা প্রয়োজন। তা না হলে এই বিচার প্রহসনে পরিণত হবে। সুতরাং রায়দান-কালে অভিযোগের কোনো অংশই বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যদি আপনাদের অভিপ্রায় না হয় তাহলে এই ফ্যাসিস্ত একনায়কের সমগ্র কর্মজীবনটাই বিচারের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া উচিত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। যদি আপনারা মনে করেন যে ফ্যাসিজমকে মার্জনা করা উচিত, অথবা এমন কি কখনও কখনও প্রশংসাও প্রাপ্য হয় তাঁর, যদি আপনারা মনে করেন যে ১৯৪০ সালের পূর্ববর্তী সময়ে একের পর এক চুক্তিভঙ্গ করার অপরাধ খুবই সাধারণ এবং পৃথিবীর ক্রমোন্নতির পর্যায়ে তা খুবই স্বাভাবিক, তাহলে বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব এবং সেক্ষেত্রে বন্দী খালাস পেয়ে যেতে পারে কেবলমাত্র উচ্চাধ্যায়

ব্যর্থকাম একজন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে। যদি আদৌ তাকে ঘৃণা করেন ফ্যাসিজিমের জন্য, তাহলে ঘৃণা করুণ তাকে তার সমস্ত অপরাধের জন্যই যা সে করেছে ইটালিতে, স্পেনে, আবিসিনিয়ায় এবং গ্রীসে। ঘৃণা করুন তাকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈনিকের রক্তপাত ঘটাবার অপরাধের জন্য। যদি আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই রকমই হয়ে থাকে তাহলে, আমার বিশ্বাস. কেবলমাত্র এই কথা ভেবে আপনারা আপনাদের রায় দান করা থেকে বিরত থাকবেন না যে সেক্ষেত্রে তার দোসর হিসাবে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামও তার মধ্যে এসে পড়বে। বন্দীকে যদি আপনারা দোষী সাব্যস্ত করেন তাহলে যতকমই হোক না কেন, তার দায় ঐ ব্যক্তিবর্গের উপরও বর্তাবে।

দোষী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে বেনিটো মুসোলিনিকে যদি উদাহরণ হিসাবে দাঁড় করাতে চান আপনারা, তাহলে তার দোসরদের জন্যও অনুরূপ বিধান দিতে আপনাদের ভয় পাওয়া উচিত হবে না। ইগনাজিয়ো সিলোনে (Ignazio Silone), ইটালির এক মহান ব্যক্তি. এই উপদেশ দিচ্ছে আপনাদের। তিনি বলেছেন "মানবতা বরাবরই তার নিধনকারীদের প্রতি অতিরিক্ত দয়া পরবশ। মানবতার নির্দেশ হ'ল এই যে ক্ষমা করে দাও তাদের কারণ তারা জানে না তারা কি করছে"।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বক্তব্য শেষ। আপনাদের বিধান জানাতে আমি অনুরোধ করছি। কেবল একটি কথাই বলব যে. যদি করুণা স্থান পায় মনে, তবে তা যেন ক্রুশবিদ্ধকারীদের জন্য না থেকে ক্রুশবিদ্ধদের জন্য থাকে — তা যেন থাকে অতি সাধারণ অথচ সাহসী সেইসব মানুষদের জন্য যারা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন বা বিধ্বস্ত হয়েছেন। একমাত্র এক নবীন ইংল্যাণ্ড. সমস্ত রকম মহত্বে জেগে ওঠা ইংল্যাণ্ড, সর্বত্র স্বাধীনতার জন্য যার অগ্রণী ভূমিকা, সেই পারবে এই সব দুর্গত মানুষদের ক্ষোভ এবং বেদনা প্রশমিত করতে। □

---

টীকা

১। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৪ হিটলার জার্মানীর সাথে পোল্যাণ্ডের দশ বছর মেয়াদী অনাগ্রসন চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা ঘোষণা করেন। মারশাল পিলসুদস্কি-র একনায়ক-তান্ত্রিক শাসনাধীন পোল্যাণ্ড প্রায় সেই দিন থেকেই তার দীর্ঘদিনের রক্ষক ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাজী জার্মানীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করল। ফ্রান্সের কর্তৃত্বের অবসানকল্পে গৃহীত কৌশলে সফল হ'ল জার্মানী।

CENTRAL LIBRARY

২। ডাঃ এডুয়ার্ড বেনেস — তৎকালীন চেক প্রেসিডেন্ট।

৩। ফ্লানডিন পিয়েরে এতিয়েনে — ফ্রেঞ্চ বিদেশ মন্ত্রী।

৪। লাভাল পিয়েরে — তৎকালীন ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্টের বিরোধীপক্ষের নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড—ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী।

৫। মিঃ এমারি — লিওপোল্ড এমারি। ব্রিটেনের কনজারভেটিভ পার্টির তৎকালীন প্রতিনিধিস্থানীয় নেতা।

৬। ক্যাভুর (Cavour) — স্মরণকালে ইটালির বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

৭। মিঃ ইডেন — অ্যান্থনি ইডেন। ব্রিটিশ সরকারের একজন আমলা। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ব্রিটেনের বিদেশ সচিব হ'ন।

৮। বাস্ক — ফ্রান্স এবং স্পেন সীমান্তের উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত পশ্চিম পায়রেনিস (Western Pyrenees) এলাকার অধিবাসীবৃন্দ।

৯। পেটেইন — মার্শাল হেনরি ফিলিপ পেটেইন ফ্রান্সের খ্যাতনামা সামরিক জেনারেল একজন। ফ্রান্সের প্রশাসনের উচ্চতম কর্তৃত্বে তার বিশাল প্রভাব ছিল একদা। জার্মান-এর প্রতি আনুকূল্যে স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে এসেছিল।

১০। ডারলান — ফ্রান্সের এডমিরাল ছিলেন তিনি। আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনে তার মদত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়।

## সুধেন্দু মল্লিক

### আগমনী

আবেগে শপথে অঙ্গীকারে আর কিছু বলবো না
ঠিক করি। আমি যে দেখেছি নিস্পৃহ জগৎ
মৃত মানুষের মুখে নির্বিকার তাকায়, তারপরই
লক্ষ্য করে প্রেমিক প্রেমিকা তারা কি আনন্দে
বালুর দুর্গ গড়ছে।

আমি শুনেছি দুঃখের মূল্য দুঃখ অবহেলার মূল্য
অবহেলা। কাউকে দেখেছি হাটে জীবন কিনছে
দুঃখে অবহেলায় নির্মম চাবুকে। এসবই আমি
একটু একটু করে শিখেছি। চোখে আঙুল দিয়ে
আমাকে কৌশল শিখিয়েছে সময়।

সেই কবে গ্রাম থেকে এসেছিলাম শহরে। আজো আমার
গ্রামের মাটি তেমনই কোমল তেমনিই ভেজা। আর সেই
গাঁয়ের ছেলেটা ? আলো ছায়ায় মাটি আর আকাশ
যেন গৃহোন্মুখ উমা। আয়। আয়। গিরি এবার
উমা এলে আর উমা পাঠাবো না। আমি যেন মা —
নতজানু পথে দাঁড়িয়ে দেখছি জীবন উলঙ্গ
নিরাড়ম্বর ধুসর বালক কেউ তাকে খেলতে ডাকে না।
আমি তাকে বুকে তুলে আলোয় আলো হয়ে
মুছে যাই।

## তারক চট্টোপাধ্যায়

### ভারতের বাঙালি

দারিদ্র্যের নদীতে স্নান করেছি
ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থেকে ধোঁকা খেয়ে
কাটাচ্ছি বাঙালি !

## প্রদোষ দত্ত

### এখনও থাকে

রাতে তোমার রূপ মদির নেশার মত,
যৌবনের গান শোনাও।
সকালে শিউলি ফুল, স্নিগ্ধ প্রলেপ
সারা অঙ্গে মেখে নাও।
সমুদ্রের তীরভূমি, চোখে পড়ে —
বালুকাচ্ছন্ন সচল ঝিনুক।
নীলাভ মুক্ত সংরক্ষায় উষ্ণ অনুরাগ ছড়ায়।
দিশেহারা দূরভূমি, চোখে পড়ে —
তন্বী তমাল, সবুজের বীথি।
সুচারু প্রেমের অভিকর্ষ এখনও থাকে
পৃথিবীর বুকে!

## গৌতম মুখোপাধ্যায়

### সকাল

কয়েক সকাল ছিঁড়ে পড়ে আছে দেখেছি হঠাৎ
কিছুক্ষণ পরে পচে গলে শ্বাস বন্ধ করে
বাঁধাবে বিভ্রাট।
আরো পরে সুনীতি কুনীতি ফাঁসে
জলবদ্ধ বাষ্প দিয়ে ভেজাবে সকালতন্ত্র।
একগলা জলে সব ভ্রমণের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-যুবা
যাবে ডুবে, কেউ কেউ হবে অপহৃত

অগ্রজ রাত্রির হাত ধরে নতুন সকাল এসে
কখনো বা সব ভগ্ন তাড়াবে হঠাৎ,
শিশুর সারল্য নিয়ে দাঁড়াবে সূর্য কোলে করে।

# বিজয় কুমার দত্ত

## নিষেধ

লক্ষ্মণের গণ্ডীর মতো, একটা নিষিদ্ধ রেখার
কাছাকাছি ঘুরে মরছি
আমার মুক্তির কোনো
দরজা খোলা নেই
সারাজীবনই আমি তীর্থযাত্রী
হতে চাই
মাঠ পেরিয়ে দিগন্ত, সাগর পেরিয়ে
মহাকাশ, ভালোবাসা পেরিয়ে
নির্বিকল্প অনুভব।

এই অসম্ভব চাওয়াই হল
আমার কাল
নাকি আকাল !

মরীয়া স্বভাবে জীবনকে বাজি ধরে
লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে
পা রাখি
দেখি সে গণ্ডীর বাঁকানো রেখা
আরো দূরে, সরে সরে যায়
আমি লাফ দিয়ে আরো দ্রুত
ছুটে যেতে চাই
দেখি আবছা আলোয়
রামানুজ দাঁড়িয়ে রয়েছে
হাতে তার, আসমুদ্র হিমাচল ছোঁয়া
বিশাল ধনুক।

CENTRAL LIBRARY

# মতি মুখোপাধ্যায়

## শিকড় সম্পর্কিত

আলো নেই বায়ু নেই শ্বাসরোধী অন্ধকার ঘর
তোর কেন কারাদণ্ড যাবজ্জীবন
নিরুত্তর ইহকাল, কুয়াশায় ঢাকা পরকালও
অস্তিত্ব অর্থে শ্রম। শ্রমিকের দায়বদ্ধতা
জন্ম থেকে নিবেদিত সৃষ্টি কারুকাজে
কংসকারায় জন্ম, কৃষ্ণ তবু কেন যে হলিনা
ফসল তুলেছে যারা দুহাতে আঙুল বাকা করে
তাদের জন্য রোদ, তাদের জন্য আলো, গান
শ্যামলে শ্যামল যারা শিশুবৃক্ষ কিংবা মহীরূহ
যেই হোক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আকাশের দিকে
নেমে আসে মেঘপরী নটী বিনোদিনী
শীতাতপ কুঞ্জে চলে তাহাদের রাধাকৃষ্ণ কথা
আশেপাশে লীলাময়ী গোপিকা পাখিরা।

এসব তোমার জানা, পেশীর ক্রিয়ায়
তৃপ্ত তুমি সুখী তুমি হারকিউলিস
মহত্ত্ব তোমার দেহে বিজ্ঞাপিত থাকে
মহাশূন্য থেকে অগ্নিকণা একদিন
ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিল প্রাণ
সেই শুরু, অপার সময় গেছে অঙ্কুরোদগমে
বীজ থেকে কাণ্ড থেকে শাখায় পাতায় কত আলো
নিচে তুমি অন্ধকারে ধৃতরাষ্ট্র এক
নিছক শ্রমিক, যোদ্ধা, দক্ষ কারিগর।

## গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

### ফিরে যেতে হবে

এখনই ফিরতে হবে এই ভেবে
হঠাৎ ছুটে গেলে
বাইরের কলরব কখন গিয়েছে থেমে
তবু কাছে এলে দেখতে পাবে
মানুষের সম্মানে
আরও কত কথা লোকে ভাবে
তখন তোমরা কেউ থাকবে না এই ভিড়ে
শুধু কিছু মানুষ যাবে
যাদের ভিতরে আছে সামান্য জয়ের
আশ্বাস
তাদের জন্য একদিন কাছে আসে
দিনের আকাশ

তবু ফিরে যেতে হয় সব কিছু রেখে
রক্ততা ঝরে যাবে
নীরক্ত স্বভাবে
সবাই ছুঁতে চায় অনন্তের কাল
আমৃত্যু এভাবে

## শিপ্রা সেনধর

### ওহে দেবদূত

প্রতিবেশী ভালোবাসে যাঁরা
তার এক তালিকা করতে
যদি আসো তুমি ওহে, দেবদূত
— ভুল হবে।
কারণ
আবু-বেন-আদম নেই
এখানে এখন।

## প্রমোদ বসু

### পাহারাদার

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পাচ্ছি
পৃথিবীর প্রত্যেক পুরুষ পরম যত্নে আগলে রাখছে
তাদের নিজস্ব নারীকে।

কিন্তু, যে-নারীদের কোনও পুরুষই নেই,
কিংবা যাদের পাহারাদার পুরুষ
অকালে খোওয়া গেছে, —
তারা ভারী অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে
চলতে শুরু করেছে একাই।

আর, তাদেরই কেউ কেউ পাহারাহীন হয়ে
সন্তানের বদলে নিত্যই জন্ম দিচ্ছে
পরকীয়া নামক একটি সুযোগ বা পদ্ধতির।

হায়, দোষ হচ্ছে কেবল পুরুষের! পাহারাদার পুরুষের।

## জয়ন্ত বিশ্বাস

### সাদা পাতা

তোমাকে ঐশ্বরিক অনুভব করে ; হে সাদা পাতা
তোমার সামনে সাহসী
প্রার্থনায় গলে যায় সমস্ত পাপ।

জাগতিক তুচ্ছতা শেষ হলে, উড়ে চলি —
রূপালি মাছের মতো জলের ভিতর।

সাদা পাতায় ঢাকে শরীর। জ্বলে ওঠে
মহাজাগতিক আগুন।

ভুল হয় সমস্ত অভিশাপ।
মাটির ভিতর মেটে কোষ হয়ে
ঘুমিয়ে পড়ি সাদা পাতার বিছানায়।

# পরশুরামের রাজনীতিক গল্প : পুনশ্চ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পরশুরামের রাজনীতিক গল্প নিয়ে শারদীয় 'অর্কিড', ১৪০৬-এ কিছু আলোচনা করা হয়েছিল। তারই সূত্র ধরে আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই। আগের আলোচনার শেষে লেখা হয়েছিল : '… বিমূর্ত যুক্তিবাদ কখনও একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ জীবনদর্শন হতে পারে না।' কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

যুক্তিবাদের প্রধান লড়াই অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু সে-লড়াইও দেশ-কাল-পাত্র-পরিস্থিতি অনুযায়ী চালাতে হয়। তাকেই বলে 'কাণ্ডজ্ঞান'। শুধু ধর্মবিশ্বাস নয়, যে-কোনো ঘটনার বিচারে ঐ চারটি বিষয় সম্পর্কে যথার্থ বোধ না-থাকলে ব্যাপারটা অনেক সময়ে হাস্যকর হয়ে ওঠে। ধর্মের মতো রাজনীতিও চলে বিচিত্র পথে। শুধু যুক্তি দিয়ে, তর্ক করে ঠিক বা ভুল বোঝানো যায় না। দেশ-কাল-পাত্র-পরিস্থিতি অনুযায়ী অবস্থান ঠিক করতে হয়। সেই অবস্থানের পেছনে অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শ, অন্ততপক্ষে রাজনীতিক বোধ থাকবে। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র-পরিস্থিতি-নিরপেক্ষভাবে, শুধু শুভাকাঙ্ক্ষা আঁকড়ে থাকলে অন্ধগলিতে ঘুরতে হয়, নতুন রাস্তার সন্ধান মেলে না।

গোড়া থেকেই পরশুরাম-এর সমস্যা এই যে, তাঁর কোনো নির্দিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শ ছিল না। যেটা ছিল সেটা একটা নৈতিক মূল্যবোধ। তার মাপকাঠিতেই তিনি সবকিছুর ভালোমন্দ বিচার করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যখন ভাবতে শুরু করলেন, তখনও তিনি ভাবলেন 'বিশুদ্ধ' যুক্তিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, পরম, নির্বিকল্প নীতিবিদ্যার নিরিখে।[১] কী পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কী সমাজবাদী সোভিয়েত দেশ, কী কংগ্রেস, কী কমিউনিস্ট, কী একনায়কতন্ত্র কী সংসদীয় গণতন্ত্র — সবকিছুকেই তিনি আঁকেন ভুষো কালি দিয়ে। সবাই তাঁর চোখে সমান দোষী। নিউক্লিয় অস্ত্র তৈরি থেকে শুরু করে কালোবাজারি অবধি সবই তাঁর কাছে ক্ষমতা ও লোভের নৈতিক প্রশ্ন, এর সামাজিক-রাজনীতিক মাত্রাই তিনি ধরতে পারেন না — আর্থনীতিক দিক তো দূরের কথা। তার জন্যেই বারেবারে তিনি এমন গল্প লেখেন যার শেষে কোনো সমাধানের আভাসটুকুও মেলে না — যেখান থেকে গল্প শুরু হয়েছিল, শেষ হয় সেখানেই। প্রেতচক্র, শীর্ষসম্মেলন, চিরজীবীদের বৈঠক বা নেহাতই পার্কের আড্ডা —

যেখানেই আন্তর্জাতিক বা জাতীয় রাজনীতি নিয়ে কথা হোক, কোথাও কোনো নিস্তারের পথ বেরয় না। "শোনা কথা"-র শেষে দেখা যায় : এই গল্পের কথক 'আমি'-কে ভরদ্বাজবাবু বলছেন, 'কই মশাই, আপনি তো কিছুই বললেন না।' 'আমি' হাতজোড় করে উত্তর দেন, 'মাপ করবেন, কানে তালা লেগে গেছে, গলা ভেঙে গেছে। এখন যেতে হবে রণজিৎ ভটচাজ ডাক্তারের কাছে। বসুন আপনারা, নমস্কার।' গল্পের 'আমি' আর লেখক যে সবক্ষেত্রেই একই লোক হবেন — অবশ্যই এমন কোনো শর্ত নেই। কিন্তু এখানে 'আমি'-কে পরশুরাম বলে ধরে নিলে খুব একটা ভুল হয় না। এই 'আমি'-র মতো পরশুরামও কোনো ইতিবাচক মত দিতে পারেন না ; শুধু সব রাজনীতিক ধ্যানধারণা ও দলকে কাঠগড়ায় তুলেই যেন তাঁর কাজ শেষ।

এর থেকে একটা ব্যাপার বোঝা যায়। রাজনীতিক গল্প লিখতে গেলে লেখকেরও একটি রাজনীতিক প্রত্যয় থাকা চাই। অন্যের বিবেচনায় সে-প্রত্যয় ভুল মনে হতে পারে। কিন্তু প্রত্যয় একটা থাকা চাই। তার ওপর দাঁড়িয়েই নানা রাজনীতিক মত ও দলের সমালোচনা করা সম্ভব ; তবেই সে-সমালোচনা পাঠকের কাছে বিচারযোগ্য হতে পারে। তার বদলে, বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ও নৈতিক অবস্থান থেকে দেশ-কাল-পাত্র-পরিস্থিতির অতীত কিছু আপ্তবাক্য শোনালে, তা গ্রাহ্য হয় না।[২]

এই কাজটাই পরশুরাম করেছেন "সত্যসন্ধ বিনায়ক" গল্পে ( এটি, আর যাই-হোক, হাসির গল্প নয় )। "মাঙ্গলিক" গল্পটিও একই ধরণের — শুধু আপ্তবাক্যগুলি আরও উদ্ভট। অন্য কয়েকটি রাজনীতিক গল্পে হাসির ব্যাপার থাকে ঠিকই, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে কোনো গভীরতা লুকিয়ে নেই। চিন্তায় গভীরতা না-থাকলে গল্পের ভেতরে গভীরতা আসবেই বা কী করে ? শুধু ছোটো গল্প নয়, নাটক, উপন্যাস, চলচ্চিত্র ইত্যাদি যে কোনো শিল্পরূপের ক্ষেত্রেই কথাটা খাটে।

সংলাপের মাধ্যমে তত্ত্ব-আলোচনার ঐতিহ্য বেশ পুরনো। উপনিষদে, বৌদ্ধ সুত্ততে, প্লাতোন ( ইংরিজিতে প্লেটো )-এর 'কথোপকথন'-এ এর ব্যবহার দেখা যায়। আলোচনায় যতজনই হাজির থাকুন, যিনি যত কথাই বলুন, শেষ কথাটা বলেন একজনই — তিনি হয়তো যাজ্ঞবল্ক্য বা উদ্দালক, বুদ্ধ বা সোক্রাতেস। অন্য লোকদের কথা সাজানো হয় সেইভাবেই। পরশুরামের যেসব গল্পে নানা লোকের নানা মত শোনা যায় তার কোনটিতেই কিন্তু

লেখকের মুখপাত্র বলে কেউ নেই। যে-বিষয়ে পরশুরামের সুস্পষ্ট মতামত ছিল সেখানে কিন্তু এই সমস্যা হয় না। "গুরুবিদায়" গল্পে বিনোদ উকিল পরশুরামের মনের কথা বলে দেন; "জাবালি"-তে যেমন সে-কাজ করেন জাবালি।

কিন্তু রাজনীতির প্রশ্নে পরশুরাম নিজেই এমন প্রত্যয়হীন যে তাঁর পক্ষে কোনো মুখপাত্র খাড়া করা সম্ভব হয় না। অনেককটি গল্পে বহুলোকের গলা শোনা যায়। তার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো লেখকের মনের কথাও বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পথের সন্ধান দিতে পারেন না কেউই। ব্যাসের ("গন্ধমাদন বৈঠক") তুলনায় ভার্গব অনেক বাস্তবমুখী, কিন্তু সমাধান তাঁরও জানা নেই। রাজনীতিক শূন্যবাদ যে রাজনীতিক গল্পের সহায় নয় — পরশুরামের গল্প কটিই তার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ।

অন্তত একটি গল্পে পরশুরাম তাঁর নিজের এই সমস্যাকে একটু রেখেঢেকে হাজির করেছেন। "নিধিরামের নির্বন্ধ"-য় নামচরিত্রটি পরশুরামেরই অন্তরের ফটোকপি। গল্পটি শুরু হয় এইভাবে :

> নিধিরাম সরকার ভেবে ভেবেই মারা গেলেন। তাঁর শারীরিক ব্যাধি বা আর্থিক অভাব ছিল না, সাংসারিক শোকতাপও তিনি পান নি, তবু দুর্ভাবনায় তাঁর জীবনান্ত হল।
>
> নিধিরাম সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। তাঁর মনে নিরন্তর সংশয় উচিত — সুরেন বাঁড়ুজ্যে না বিপিন পাল, বেঙ্গলী না ইংলিশম্যান — কার উপদেশ ভাল? গান্ধীজী না দেশবন্ধু, নেতাজী না পণ্ডিতজী — কার মতে চলা উচিত? কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিস্ট আর সমাজতন্ত্রী দল কোনওটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। দেশের হিতার্থে তিনি বক্তৃতা দেন নি, ছেলে খেপান নি, ডাকাতি করেন নি, সুতো কাটেন নি, জেলে যান নি। শুধু মনে মনে মঙ্গলের পথ খুঁজেছেন, অবশেষে নৈরাশ্য আর চিন্তাবিষে জর্জর হয়ে দেহত্যাগ করলেন।[৩]

স্বর্গে বিধাতার সঙ্গে নিধিরামের দেখা হলো। সেখানেও নিধিরাম তাঁর কাছে মানুষের কল্যাণের পথ জানতে চাইলেন। যথারীতি কোনো ফয়সালা হলো না। নিধিরামকে বিধাতা বললেন, '... তুমি আবার জন্মগ্রহণ করে তোমার জাতভাইদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পার।' বেচারা নিধিরাম সিশ্চিত নন : কে তাঁর কথায় কান দেবে! তিনি শুধু একটি মন্ত্রণাই জানেন : 'আগে

বিনয় ও শিক্ষা তারপর কর্মপথ।' বিধাতা বললেন, 'বেশ তো, ওই মন্ত্রণাই দিও।' তবে বিধাতা নিজেও এতে খুব ভরসা করতে পারেন না। তিনি বলেন, 'তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করো, তাতেই তোমার জন্ম সার্থক হবে। এক বারে কিছু করতে না পারলে বার বার অবতরণ করো, যদি অনন্তকালেও কিছু করতে না পার তা হলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষতি হবে না।'

এই গল্পে নিধিরামের পদবি যদিও 'সরকার', তবু পুরো নামটা শুনলেই প্রবাদের সেই লোকটির কথা মনে পড়ে — 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার'। পরশুরাম নিজেও বোধহয় নিজের নিষ্ফল আদর্শবাদের এই নিরস্ত্র রূপটি চিনতেন। আর তার জন্যেই বেছে নিয়েছিলেন নায়কের ঐ নামটি।

পরশুরামের আসল সমস্যা হলো : তাঁর অভিপ্রায় খুবই মহৎ কিছু কী করে তা সিদ্ধ হতে পারে সে-বিষয়ে তাঁর ধারণা বড়ই ঝাপসা। শুধু তিনি নন, তাঁর প্রজন্মের বহু শিক্ষিত, স্বচ্ছল বাঙালি ভদ্রলোক এই সমস্যায় ভুগতেন। দলীয় রাজনীতিতে তাঁদের আস্থা ছিল না, অর্থনীতির ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন একেবারেই অবুঝ। মানুষকে বদলাতে গেলে যে আগে আর্থিক-সামাজিক কাঠামো আমূল, পালটাতে হয় স্রেফ নীতিশিক্ষা দিয়ে সব মানুষকে ভালো করা যায় না — এই সহজ সত্যটি তাঁরা বুঝতেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে কত কিছু ঘটে গেল : ভারতের স্বাধীনতা, চীনের বিপ্লব, পূর্ব ইওরোপের একের পর এক দেশে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আফ্রিকায় উপনিবেশ-বাদের উচ্ছেদ, মানুষের মহাকাশযাত্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর কিছুই পরশুরামের মনে দাগ কাটতে পারে নি। তিনি শুধু দেখতে পান দেশে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা, আর গোটা বিশ্বে নিউক্লিয় মারণাস্ত্র নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই। সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে তাঁর আস্থা ছিল না। নির্বাচনের সময়ে রাজনীতিক দলের মতাদর্শের চেয়ে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণের ওপরেই তিনি জোর দিতেন বেশি ("সত্যসন্ধ বিনায়ক")। আর, দেশের দুর্দশা ঘোচানোর জন্যে যে-পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসত তা সেই ম্যালথাসবাদের পুরনো ভূতকে চাগিয়ে তোলা। "সিদ্ধিনাথের প্রলাপ" আর "সাড়ে সাত লাখ"-এ তার প্রমাণ আছে।

স্থান-কাল-পাত্র-পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে, এক পরম (অ্যাবসোলিউট) নীতিবিদ্যার নিরিখে মানব-জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনা শেষ অবধি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আবার বলি : অভিপ্রায়ের দিক থেকে পরশুরাম কোনো অর্থেই প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। আসল গোলমাল ছিল পথের ভাবনায়।

চিন্তায় যে-স্বচ্ছতা থাকলে অভিপ্রায়কে কাজে পরিণত করা যায় সেটিরই অভাব ছিল তাঁর। ফলে তাঁর রাজনীতিক গল্পগুলি শেষ হয় কানাগলিতে ঘুরে ঘুরে। লিগ অফ নেশনস্-এর ঢঙে সর্বজাতীয় বৈঠক বসে ( "গামানুষ জাতির কথা", ১৩৫২ ব. ) রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের আদলে তিনিও দুটি শীর্ষ সম্মেলন বসান ("তিনি বিধাতা", ১৩৫৭ ব. ; "গন্ধমাদন-বৈঠক", ১৩৫৯ ব.)। কিন্তু যথারীতি ফল হয় শূন্য। মানুষের ভালো করতে চাইলে শুধু সদিচ্ছা আর শুভ বুদ্ধিই যে যথেষ্ট নয়—এর সবচেয়ে শিক্ষাদায়ী দৃষ্টান্ত পরশুরামের এই গল্পগুলি।

**টীকা**

১. বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ যে বাস্তব জীবনে — বিশেষ করে বউ বাছাই-এর ব্যাপারে — কতখানি অচল, পরশুরাম নিজেই তা দেখিয়েছেন "অক্রূরসংবাদ" গল্পে। নানা রকমের দাম্পত্য সম্পর্ক ( স্বামীপ্রধান, স্ত্রীপ্রধান, উভয়-প্রধান ) চেষ্টা করেও অক্রূর নদীর কোনো গতি হলো না। শেষে সমস্ত সম্পত্তি দান করে, দ্বারকাধামে তপস্বিনী জগদম্বা মাতাজীর আশ্রমে তিনি বাস করতে শুরু করলেন। ভদ্রলোক নিজেও স্বীকার করেছিলেন, '...আমার সংসারযাত্রার আদর্শ এত বেশী র‍্যাশন্যাল যে কোনও স্ত্রীলোকই তা বরদাস্ত করতে পারেন না।'

২. এ প্রসঙ্গে লুসিআন ( আনু. ১২০-১৮০ খ্রি. ) নামে গ্রীক ব্যঙ্গ-লেখকের কথা মনে করা যায়। এঙ্গেলস তাঁকে বলেছিলেন 'The Voltaire of classical antiquity'। কিন্তু তিনি এ-ও লক্ষ্য করেছিলেন : যে কোনো ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পর্কে লুসিআন ছিলেন সমান সংশয়ী। তাঁর কাছে তাই জুপিটার ও জিশুর উপাসকদের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। একেই এঙ্গেলস বলেছেন, 'তাঁর অগভীর যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ' (his shallow rationalistic point of view)। Frederick Engels, "On the History of Early Christianity," Marx-Engels, 'On Religion', Moscow : FLPH, n. d., p. 319.

৩. "অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা"-র নামচরিত্রের মধ্যেও পরশুরামের নিজের ছায়া পড়ে থাকতে পারে : 'তিনি ( অটলবাবু ) নানা বিষয়ে ঠোকর মেরেছেন কিন্তু কিছুই আয়ত্ত করতে পারেন নি। আজীবন সংশয়ে কাটিয়েছেন কিন্তু কোনও বিষয়ে নিষ্ঠা রাখতে পারেন নি। তাঁর মূলধন কি তাই তিনি জানেন না, লাভ-লোকসান খতাবেন কি করে ?'

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : রিঙ্কু চৌধুরী, অনুপ কুণ্ডু

# আধুনিক মৌল হিন্দুবাদের উত্থান ও কীর্তি

## মুরারি ঘোষ

ভারতে জঙ্গী হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর চমকপ্রদ উত্থান ঘটে গেছে গত নব্বই দশকে। নানা কায়দা কৌশলে ভারতের রাজনীতির শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে হিন্দুমৌলবাদ। অবশ্য কেবল হিন্দুত্ববাদ অবলম্বন করেই শীর্ষ স্থানাধিকারী হতে পারেনি। অন্য দল বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ তারা নিয়েছে। লোকসভার বিগত সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেছে সারা ভারতের তেইশ শতাংশের বেশি ভোট তারা পায় নি। বাকিটা তাদের বিরুদ্ধেই গেছে — এই ঘটনায় মৌলবাদ বিরোধী ভারতীয় জন সমাজ কিছুটা মানসিক সান্ত্বনা পেতে পার।

কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা হল গত দশকে তাদের উত্থান ভারতের মধ্যেই ভৌগোলিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতা ভেঙে রাজনৈতিক ক্ষমতাবাড়িয়ে ফেলেছে। এই পরিস্থিতি আগে ছিল না। গো-বলয় নামে যে অঞ্চল চিহ্নিত হয়ে রয়েছে ১৯৮৯ পর্যন্ত কেবল সেই অঞ্চলেই তাদের অবস্থান মূলতঃ সীমায়িত ছিল যদিও এই মৌলবাদের উত্থান মহারাষ্ট্র থেকেই বৃটিশ শাসিত ভারতে। তারপর যেভাবেই হোক রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ সংখ্যাধিক্যতা না পেলেও হিন্দু মৌলবাদের প্রসার ভারতের রাজনৈতিক চিত্রকে যথেষ্ট জটিলতা ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে এসেছে সন্দেহ নেই — বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক প্রাধান্যে গঠিত রাজনৈতিক চিন্তার সুবিধাবাদী দলবদ্ধতা এই সুযোগ তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। ক্ষমতালাভের সুযোগ তারা ব্যবহার করেছে যথার্থভাবেই মৌলবাদী স্বার্থে।

এই মৌলবাদী উত্থানের বিস্তৃত ক্ষেত্র অবশ্য স্বাধীন ভারতে তৈরী ছিল — যার আঘাতে ভারত ভেঙে দুটি রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়। ১৯৪৬/৪৭ সনের প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক আকাশে — বিশেষ করে দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় এদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার মতো ছিল না।

স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক ভাবে এই শক্তির প্রথম উত্থান লক্ষ করা যায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রথমে — হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘ নামের লেবেলে।

পরে আশি দশকে জনসঙ্ঘের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক মূল সংগঠন হল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বি জে পি।

ষাট ও সত্তর দশকে এদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব জনতার সমর্থন বিচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৮৯ সনের পর থেকে কেবল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আর লড়াই করতে হয়নি। তখন থেকেই শুরু হয়েছে শাখা বিস্তার বা প্রসার।

তবে লক্ষ্যনীয় এই প্রসার মূলত সমাজের উচ্চশ্রেণী ও ধনী গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতার লোভে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলে হিন্দু ছাড়াও কিছু কিছু অন্য ধর্মীয় নাগরিক ও নিম্নবর্গীয় মানুষেরা এই রাজনৈতিক জোটে সামিল হয়েছে। যারা আগে এদের শুভানুধ্যায়ী ছিল না। ফলে হিন্দুত্ববাদীদের সাংগঠনিক শক্তির প্রতাপ বেড়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নানা সমর্থনও তারা পাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক শাখা সংগঠন মারফৎ।

এখনকার হিন্দুত্ববাদীদের মূল সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ — যাকে অভিহিত করা হয়েছে সহযোগী সংস্থাগুলির জননীপ্রতিম। এই জননীর সন্তানরা হল, বজরঙ দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি। সকলের মূল চালিকা শক্তি আর এস এস। এরা সকলেই এক পরিবারভুক্ত বলে পরিচয় দেয় ও গর্ববোধ করে।

দেশভাগের পর প্রত্যেকটি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সঙ্গে এদের যোগাযোগ দু'লক্ষ্য নয়। এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেরও সাংগঠনিক বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্যনীয়। মূল সঙ্ঘ আর এস এস গড়ে ওঠার ( ১৯২৫ ) পেছনে রয়েছে ডঃ হেড গেওয়ার। তিনিই এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা — পরে যোগদেন বি এস মুঞ্জে, এল পি পরাঞ্জপে, বীর সাভারকর ও তাঁর ভ্রাতা বাবুরাও সাভারকর। পরে অবশ্য বড় ভাই ভি ডি সাভারকর হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

আর এস এস-এর জন্মের সময় থেকেই তাদের কেন্দ্রস্থিত ভাবনার মূল উপজীব্য 'রাম' — রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র। এদের ইংরাজী ভাষায় সরকারি প্রকাশনা সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার' পত্রিকার ১৯৭১ সনের বিশে জুনে প্রকাশিত সর্বোচ্চ পালনীয় সত্য বলে ঘোষিত ঃ

সমস্ত মুসলমান রামকে তাদের বীর নায়ক বলে মেনে নিক। সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটে যাবে।

আর এস এস-এর মূল প্রকাশনায় মুদ্রিত এই উক্তি হিন্দু অসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় আগ্রাসী মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই উক্তি থেকেই রাম জন্মভূমির তথাকথিত মুক্তির জন্য হিংস্র আন্দোলনের পটভূমিকা খুঁজে পাওয়া যাবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রাথমিক দাবি তারা রাজনীতি চর্চার জন্য সংগঠিত নয় সাংস্কৃতিক সংগঠন মাত্র। সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হলো হিন্দুত্বের বিকাশ ও প্রচার। সঙ্ঘের স্বীকৃত ঝাণ্ডা হলো গেরুয়া পতাকা। এদের মতে এটাই রামের নিজস্ব ঝাণ্ডা ছিল।

দৃশ্যত রামকে সামনে খাড়া করে হিন্দু মানসে প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টায় এদের উদ্যোগ শুরু হয় বিজয়া দশমীর দিনে। রামায়ণের গল্পে ঐ দিন রাবণ রামের কাছে পরাস্ত হয়েছিল। ১৯২৫ সনের বিজয়া দশমীতে আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠা। আবার, রামের পতাকা বলে গেরুয়া পতাকা গ্রহণের দিনটি ছিল রাম নবমী বলে প্রচলিত রামের জন্ম দিনে।

তবে আর এস এস-এর জন্মের সময়ে হিন্দু মহাসভাও ছিল। পরাধীন ভারতে কিংবা তার পরেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সব সময়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। তা বোঝা যায় হিন্দুত্ববাদীদের নিয়ে আলাদা আলাদা সংগঠন তৈরীতে। আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে যে চারজন মানুষের নাম উল্লিখিত হয়েছে এঁরা কিন্তু সকলেই কোনো না কোনো সময়ে আগে বা পরে হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন।

আর এস এস সম্পর্কিত ইতিহাসের গ্রন্থে পাওয়া যায় শুরু থেকেই স্বয়ং সেবকদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন ছিল। লাঠি খেলা, তরবারি চালানো, বর্শা ও ছোরা নিয়ে আক্রমণাত্মক খেলার প্রশিক্ষণ হত স্বাস্থ্য চর্চার নামে। তা ছাড়াও নিয়মিত বক্তৃতা শুনতে হতো সদস্যদের। আলোচনাও হতো। বিষয়বস্তু ছিল হিন্দুদের প্রাচীন গৌরব, শিবাজীর মোগল বিদ্বেষ, গান্ধীপন্থের ব্যর্থতা অর্থাৎ অহিংসানীতির বিরোধিতা, অহিন্দুদের কাল্পনিক ভারত বিদ্বেষ, কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি।

ফ্যাসিজম-এর মৌল নীতি থেকে আর এস এস-এর দূরত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। নীতি ছিল সাংগঠনিক কাঠামোয় একজন নেতাকে অনুসরণ করা।

ঠিক সেই নীতিতেই হেড গেওয়ারকে সারাজীবনের জন্য সঙ্ঘ পরিচালক — যাকে ওদের ভাষায় বলা হোত 'সরসঙ্ঘ চালক' ( প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ) হিসাবে আসন দেওয়া হয়েছিল। সঙ্ঘের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র আর রইলো না।

গণতন্ত্রের বদলে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত কাঠামো তৈরী হল। এই কাঠামো তৈরী করার ব্যাখ্যায় হিন্দু যৌথ পরিবারের সাংসারিক রীতিকে মেনে নেওয়ার কথা বলা হল। সংসারের কর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে সঙ্ঘের বাইরে কোনো সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সদস্যদের বা ক্যাডারদের যুক্ত থাকা চলবে না, যদিও হেড গেওয়ার নিজে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘকে ও তার সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবেও কংগ্রেসের কাজকর্ম ও প্রভাব থেকে দূরে রাখতেন। সঙ্ঘের যে ক'টি ইতিহাস লেখা হয়েছে কোনোটিতে সঙ্ঘের সদস্যদের ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা নেই।

১৯৩০ সনের ২৬ শে জানুয়ারী দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ ছিল কিন্তু ১৯৩০-৩১ সনের সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন থেকে সঙ্ঘকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। যদিও হেডগেওয়ার নিজে ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কিছুদিনের জন্য কারাবরণ করেছিলেন।

এই ঘটনায় অবশ্যই অন্য সন্দেহ মাথা চাড়া দেয় — হেডগেওয়ারের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিসের গোপন যোগাযোগ ছিল কিনা — কারণ তাঁর হাতে গড়া ক্যাডারদের তিনি আন্দোলন থেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য শুধু আর এস এস নয় অন্যান্য হিন্দুত্ববাদীদের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকার ঘটনা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের চোখে সন্দেহ সঞ্চার করে এবং ফলত মৌলবাদকে কংগ্রেসের ধার কাছ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণেও চেষ্টা ছিল। ১৯৩৪-এর জুনে কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ ক'রে সদস্যদের আর এস এস, হিন্দু মহাসভা বা মুসলিম লিগে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল।

জঙ্গী হিন্দুত্ববাদীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তৎকালীন গণতন্ত্রী উদারপন্থী কংগ্রেসের গৃহীত রাজনীতির মিলমিশ হবে না তা পরিষ্কার হয়ে যায়। হিন্দুত্ব-বাদের বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরুর প্রচণ্ড বিরূপতার কথা পাওয়া যায় পরবর্তীকালে ভারত সরকার প্রকাশিত চিঠি পত্রগুলিতে।

সাংগঠনিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের চোখে আর এস এস-এর স্বরূপ ধরা পড়েছিল কারণ সেই সঙ্গে বিরোধী মুসলিম মৌল-বাদের উত্থান জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে ফাটল ধরাবার ব্যবস্থা বলেই স্বীকৃত হয়েছিল যা ধরা পড়ে ১৯৩২ সালে ব্রিটেনে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে।

ত্রিশের দশকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সঙ্গে ইয়োরোপীয় ফ্যাসিবাদের মিল বা সাযুজ্য ধরা পড়ে। কংগ্রেস একটি গোপন সার্কুলার প্রচার করে দলীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ( ইকোনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি — ২২ জানুয়ারী. ২০০০ পৃ ২১৮ )। সেই সার্কুলারের প্রথম স্তবকেই লেখা হয় — 'আর এস এস একটি সাম্প্রদায়িক জঙ্গী সংগঠন ( কমিউনাল মিলিটারিস্ট অর্গানাইজেসন )। মহারাষ্ট্রীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা এই সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে। গোপনে যে পদ্ধতি আর এস এস অনুমোদন করে তা ফ্যাসিবাদের নামান্তর — যারা গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক ধারা অনুসরণ করে না — যাদের কার্যাবলীর কোনো রেকর্ড রাখা হয় না — প্রকাশ্যে সদস্য তালিকার নিবন্ধীকরণ নেই।'

হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদকে উস্কানি দিয়ে ১৯৩৬ সনের ব্রিটিশ ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান সভায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভিত্তিক যে নির্বাচন ব্যবস্থা রচিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের কাছে এই ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চিনিয়ে দেয়। কেবল মুসলিম লিগ নয়, আর এস এস ও হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক অভিযানকে ব্যবহার করা হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তা প্রকাশ্যে এসে পড়ে।

চল্লিশ দশকের শেষ দিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আবার অনুরূপ সার্কুলার কংগ্রেস সদস্যদের কাছে প্রচারিত হয়। সে সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে তা অস্বাভাবিক ছিল না। ১৯৪৬/৪৭ সালের অজস্র সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় আর এস এস-এর যোগাযোগ প্রকাশ্যে এসে যায়। তাছাড়াও সরকারে গদিয়ান কংগ্রেসের হাতে ছিল পুলিস রিপোর্ট — তখনো গান্ধী হত্যার ঘটনা ঘটে নি। পুলিসের অনুসন্ধানেই আরো গোপন তথ্য বেরিয়ে পড়ে ( ইকোনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, জানুয়ারী ২২. ২০০০ সন )। ইতালীয় ফ্যাসিবাদেদের সঙ্গে আর এস এস-এর এবং অন্য জঙ্গী হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের উপাদানগুলি জানা যায়, যার শুরু বিশ শতকের গোড়া থেকে।

হিন্দু সংগঠনগুলির কট্টর হিন্দুত্ববাদ ছাড়াও অন্য বড় মিল ছিল ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এদের প্রীতি ও সখ্যতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে নানা তথ্য ও উপাদান ভারতীয় পুলিসের হাতে আসে যা থেকে এই যোগাযোগ প্রমাণিত। সাধারণভাবে হিন্দুত্ববাদ সমর্থনকারী, মারাঠী সংবাদপত্র 'কেশরী' ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইতালীয় ফ্যাসিবাদের গুণগানে বিশেষ ভাবে আপ্লুত ছিল। বক্তব্য ছিল একটি পশ্চাদপদ অঞ্চল থেকে

দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসাবে ইতালির উত্তরণ। ইতালীয় একনায়কতন্ত্রের গুণগান ও প্রশংসা বারে বারে ছাপার আকারে দেখা যেত।

ফ্যাসিবাদকে রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত করে ইতালীতে তার প্রতিষ্ঠাকে বাঞ্ছনীয় বৈপ্লবিক উত্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মুসোলিনির রাজনৈতিক সংস্কারকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে — যে সংস্কার পার্লামেন্টে নির্বাচন বন্ধ করে মনোনয়ন মারফত সাংসদ মনোনীত করার ব্যবস্থা ( ১৯২৮ ) প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আর এস এস যেমন অনুরূপ ভাবে হেডগাওয়ারকে জীবিতকাল পর্যন্ত সঙ্ঘের প্রধান নেতা — তাঁর মৃত্যুর পরে গোলওয়ালকরকে একই পদে জীবিত-কাল পর্যন্ত স্থায়ীত্ব দেওয়া — সাংগঠনিক নির্বাচন এড়িয়ে এই প্রথা ইতালীয় ফ্যাসিজমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যে ভাবে জার্মানীর হিটলার বা ইতালীর মুসোলিনি জনজীবনে জবরদস্তি হাঙ্গামা ও রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মীয় ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে, হিন্দু মৌলবাদ সেই পথেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং জনসাধারণকেও দেখায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেই পথেই দিক নির্দেশ করে হিন্দু সমাজের জাতিগত ঐতিহ্যকে বৃহত্তর পটে স্থাপন করে।

ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জঙ্গী হিন্দু মৌলবাদের যোগাযোগের সূত্র গড়ে তুলে ছিলেন ডঃ বি এস মুঞ্জে। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় আর এস এস সূত্রে। হেডগেওয়ারের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তিনি। দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ডঃ মুঞ্জে ইয়োরোপ ভ্রমণে গিয়ে মুসোলিনির গড়ে তোলা মিলিটারি বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। মুঞ্জের অপ্রকাশিত ডায়রীতে ঐ সাক্ষাৎকারের বিবরণ রয়েছে। দেশে ফিরেই মুঞ্জে আর বিলম্ব করলেন না। জঙ্গী হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মানসে বেসরকারী চেষ্টায় সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করে দেন। মৌলবাদী হিন্দুত্বের রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় বাহুবল ও শক্তির প্রাধান্যই হবে মূল উপাদান যেভাবে জার্মানীতে নাৎসীবাদ ও ইতালিতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তৎকালীন বোম্বাইয়ের মারহাট্টা পত্রিকায় ( এপ্রিল ১২/১৯৩১ ) তাঁর মতামতসহ ভ্রমণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাঁর মতামতে জানানো হয়েছিল যে জার্মানী ও ইতালিতে যে ভাবে যুব আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে ভারতেও অনুরূপ আন্দোলনের প্রয়োজন। এমন কি ১৯৩৪ সনের ৩১ জানুয়ারী পুণায় মুসোলিনি ও ইতালির ফ্যাসিবাদ নিয়ে এক আলোচনা সভায় হেডগেওয়ার ও

মুঞ্জে — দুজনেই ফ্যাসিবাদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ( ইকোনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইক্‌লি / জানুয়ারী ২০০০ সন )।

তিন মাসের মাথায় ঐ অঞ্চলেই আরেকটি সভায় মুঞ্জে ও হেডগেওয়ার জার্মানী ও ইতালীয় পথে হিন্দু যুবকদের মিলিটারী প্রশিক্ষণের জন্য জনসমর্থন চাইলেন। ব্রিটিশ ভারতীয় তৎকালীন গোপন সরকারী রিপোর্টে (NAI. Home Poll Dept. 8/33, 1933) বলা হয়েছে।

It is perhaps no exaggeration to assert that the Sangh hopes to be in future India what the fascists are to Italy and the Nazis to Germany.

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত সত্য কথাই তখন বলা হয়েছিল এখন যা দেখা যাচ্ছে।

জার্মানীতে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ চালু হয়েছিল ন্যাশানাল সোসিয়ালিজম নাম দিয়ে। আর এস এস-এর জাতীয়তাবাদ নামে বাজারে চালু হল মৌল হিন্দুবাদ। জার্মানীর জাতীয়তাবাদে ইহুদীদের স্থান ছিল না। মৌল হিন্দু-বাদে ধর্মনিরপেক্ষতা বা নাস্তিকতা অনেক দূরের ব্যাপার। নাৎসীদের চিন্তায় ইহুদীদরা যেমন জার্মান দেশীয় নয় তেমনি মৌলবাদী হিন্দুত্বের মতে খৃষ্টতত্ত্বের বা ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অঙ্গীভূত নয়। যার ফলে ধর্মের নামে এরা তৈরী করেছে জাতি বৈরীতা।

ভিন্নধর্মীয় উপাসনা স্থলে হামলা, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের যাজক মিশনারী-দের খুন ও খৃষ্টীয়ানদের দলিত ও উপজাতি গোষ্ঠীর খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্ত-করণ — সবই চলছে জবরদস্তি মারফৎ। যে ধরণের ইতালী ও জার্মানীতে চলেছিল।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের প্রতি জঙ্গী হিন্দুত্ববাদী মমতা ও ভক্তির বন্যা টেনে আনা হয়েছে সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করেও। সুভাষচন্দ্রের কর্মকীর্তির প্রতি ভারতীয় জনতার গভীর শ্রদ্ধাবোধকে তারা স্বস্বার্থে কাজে লাগাবার সুযোগ নিয়েছে। প্রচার করা হয়েছে সাভারকরের পরামর্শেই নাকি তিনি হিটলারের জার্মানীতে গোপন অভিযানে যাত্রার জন্য মনস্থ করেছিলেন। অথচ সুভাষচন্দ্রের কোনো জীবনীতে বা তাঁর নিজস্ব চিঠিপত্রে বা সরকারী নথিপত্রে এমন কোনো তথ্যের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই।

হিন্দু মৌলবাদী জঙ্গী আক্রমণে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হলো। ঐ মসজিদের ভূমিতে নাকি রামমন্দির ছিল কারণ ঐ ভূমি রামের জন্মস্থান।

অবশ্য এই তথ্যের কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে জঙ্গী হিন্দু নেতারা স্থির নিশ্চিত। রামমন্দির ছিল কি ছিল না এই প্রশ্নে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ সন্ধানে তারা শেষ পর্যন্ত যেতে চায় নি।

রামমন্দির নিশ্চিতভাবে ছিল এটা হল বিশ্বাসের ব্যাপার প্রমাণ নিরপেক্ষ একটি বাস্তবময় সত্য। আর এস এস সংস্থার অর্গানাইজার নামের প্রত্রিকায় (অক্টোবর/১৯৮৯) কে এস লাল লিখিত রামজন্মভূমি নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল ঃ—"ধর্ম হল প্রমাণ নিরপেক্ষ বিষয়. কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র বিশ্বাসে ভিত্তি করেই খৃষ্টান সম্প্রদায় যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে করে। হজরৎ মহম্মদ যে আল্লার দূত মুসলমানদের তা বিশ্বাস করে নিতে হয়। সেইভাবে হিন্দু জনতাকেও বিশ্বাস করতে হবে অযোধ্যাই হল রামচন্দ্রের জন্মভূমি।"

রাম জন্মভূমি হিসাবে অযোধ্যাকে মেনে নেওয়ার পর বাবরি মসজিদের জমিতেই রামচন্দ্র জন্মেছিলন তাও স্বীকার করে নিতে হবে। এই জমিতে রাজা বিক্রমাদিত্য রামমন্দির নির্মাণ করেন ইতিহাসে তার প্রমাণ খুঁজে না পেলেও জঙ্গী হিন্দুবাদী সাহিত্যে তা বর্ণিত হয়েছে বলে এই বিষয়ে কোনও বিরোধিতা করা যাবে না। কেবল বিশ্বাসেই তা মেনে নিতে হবে।

ইতিহাসে যখন কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না — অতএব আদালতে ব্যাপারটি বিচারযোগ্য হতেই পারে। এটাই হল আধুনিক সভ্য সমাজের নীতি ও রীতি। কিন্তু এ ব্যাপারে আদালতের এক্তিয়ার কতোখানি তা প্রমাণ অভাবে তারা বেকায়দায়।

প্রশ্ন আরো রয়েছে। ঐতিহাসিক কে এস শর্মা জানিয়েছেন যে তিনি অযোধ্যায় ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানে গিয়ে দেখেছেন. ২৬টি মন্দিরের পূজারীরা জানিয়েছেন তাদের রামমন্দির সংলগ্ন জমিতেই রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তারাও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে রামচন্দ্রের পূজা চালিয়ে যাচ্ছেন (নিউ এজ, ৮ অক্টোবর, ১৯৮৯)।

সাত-ই এপ্রিল, ২০০০ খৃ. ইণ্ডিয়ান পোষ্ট নামের সংবাদপত্রে অটল বিহারী বাজপেয়ীর এক বিবৃতি প্রকাশিত হলো। বাজপেয়ী বলেন, "বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারে নিষ্পত্তি হবে না। মুসলিমরা মসজিদের উপর তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করুক। বিনা শর্তে মসজিদ হিন্দুদের কাছে সমর্পণ করতে হবে। বাবরি মসজিদ ঐতিহাসিক ভবন হিসাবে গৃহীত হবার নয়। এটি হিন্দুদের সাংস্কৃতিক অধিকারে রয়েছে।"

এই জাতীয় জবরদস্তি ভাবনা কেবল ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদী চিন্তায় সম্ভব।

নাৎসীবাদী চাপে একদা বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনকে এবং আরও অনেক মনীষীকে জার্মানী থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। সেই জাতীয় পরিস্থিতি ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকারের অংশীদারদের জঙ্গী আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। এই সেদিনের কথা — বিশ্বহিন্দু পরিষদের সভাপতি অশোক সিংঘল অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঘটনাকে খৃষ্টানদের চক্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। ভব্যতার সকল সীমা লঙ্ঘন করে উন্মত্ত প্রায় এই আচরণকে পাগলের প্রলাপ বললে কম বলা হবে — এই হলো মূলত ফ্যাসিবাদী বক্তব্য।

কেবল অশোক সিংঘল নন — সঙ্ঘ পরিবারের অনেকেই মনে করে, অধ্যাপক সেন ও মাদার টেরিজার মত মানুষের ভারতের প্রতি কোনও আনুগত্য নেই। ভারতের সঙ্গে এঁরা নাকি একাত্মতা অনুভব করেন না।

আসলে অধ্যাপক সেন নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। হিন্দুদের আচার আচরণে তিনি বিশ্বাসী নন বলেই এঁদের কাছে ডঃ সেন বাতিল এবং অভারতীয়।

# বিদ্যাসাগর ঃ বিভ্রান্তির জাল

আশিস খাস্তগীর

## এক

## গোপাল-রাখাল

'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে।..... নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নেই। এ ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।'[১]

বিভ্রান্তির উৎপত্তি এইখানেই। আমরা সবাই ধরে নিলাম গোপাল এবং রাখালের স্রষ্টা স্বয়ং বিদ্যাসাগর। 'বর্ণপরিচয়-১ম ভাগের ১৯ পাঠে গোপাল এবং ২০ পাঠে রাখাল বিদ্যাসাগর-আলোচক মহলে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। বিনয় ঘোষ গোপাল-রাখাল কাহিনীর মধ্যে 'সমাজ-পরিচয়' লক্ষ করেন।[২] ডঃ বিজিতকুমার দত্ত তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 'বিদ্যাসাগরের গোপাল আর ভুবনের কথা'।[৩] আর গবেষকের গবেষণাগ্রন্থের শিরোনাম হয় 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস ঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য'।[৪]

শেষোক্ত গবেষণাগ্রন্থে লেখক জানাতে দ্বিধা করেন নি — '...কর্মচারী জীবন-চরিতে প্রবেশের শ্রেষ্ঠ উপক্রমণিকা-ঋজু এবং নির্মেদ ভাষায় লিখিত বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'। ঔপনিবেশিক প্রতিশ্রুতিতে অকুণ্ঠ আস্থার প্রমাণ রয়েছে বইটির ছত্রে-ছত্রে, বর্ণে বর্ণে, .....'।[৫] ঔপনিবেশিক মনোভাব প্রমাণ করার জন্য লেখক প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বের সমাহার ঘটিয়েছেন। 'অবতরণিকা'-য় বলেছেন — 'বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে গোপাল ও রাখাল নানা নামে ফিরে ফিরে এসেছে; সুশীল ও যাদব, রাম ও ভুবন তাদেরই সগোত্র। ...'বর্ণপরিচয়'-এর বালকদের জন্য একই সঙ্গে দুই জগতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ...বিদ্যাসাগরের চোখে, ছোটোদের সঙ্গে বড়োদের সম্পর্কটা যেন এক ধরনের সামাজিক চুক্তি ; ছোটোরা নিতান্তই অসহায়, বাবা-মা-র করুণার ওপর নির্ভর না-করে তাদের গতি নেই। ... 'বর্ণপরিচয়'-এর জগতে ছোটোদের ওপর আরোপিত সব শর্ত অমোঘ, অনড়

এবং অনাপেক্ষিক। ..... বিদ্যাসাগরের 'গোপাল' ও 'রাখাল'রা কেবল 'বর্ণপরিচয়' নয়, গোটা বাংলা শিশু সাহিত্য ছেয়ে আছে : বিভিন্ন নামে, নানা বেশে, নানা চেহারায় তারা দেখা দিয়েছে।' [৬]

গোপাল ও রাখালের স্রষ্টারূপে বিদ্যাসাগরের স্বীকৃতি তো বটেই, তার কারণটিও বিনয়ভূষণ রায় সহজভাবেই নির্দেশ করেন — সু-অভ্যাস ও চরিত্র গঠনকে বিদ্যাসাগরও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। সেই জন্যই 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগের ১৯ ও ২০ নং পাঠে গোপাল ও রাখাল কাহিনী দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ..... বিদ্যাসাগর নিজের দিব্যদৃষ্টিতে তৎকালীন বাঙালি সন্তানদের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গোপালের আদর্শে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।' [৭]

আমাদের জিজ্ঞাসা — এই গোপাল ও রাখাল কি বিদ্যাসাগরের মৌলিক সৃষ্টি? না-কি এক ঐতিহ্যের অনুবৃত্তি? এ সম্পর্কিত অনুসন্ধানের ফল —

১. গ্রন্থ — 'নীতি কথা'-২
প্রকাশকাল — ১৮১৮
প্রকাশক — কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি
লেখক — জে. ডি. পিয়ার্সন

'সূর্যোদয়ের পূর্বে গোপাল নামে এক বালক শয্যা হইতে উঠিয়া পাতের তাড়ি বগলে করিয়া পাঠশালায় যাত্রা করিল ; সে অতি শিশু, কিন্তু পাঠশালা অনেক দূর, প্রায় এক ক্রোশের অধিক, তথাপি তাহার পাঠশালা যাওনের বাধা ছিল না ; কেন না তাহার মনে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিদিন অবাধে শিক্ষার্থে যাইব, এবং পাঠশালাতে না যাইয়া পথ মধ্যে দুষ্ট ও অলস পড়ুয়াদের সঙ্গে কখন খেলা করিব না। ..... গোপাল হইতে ভোলানাথ অধিক বয়স্ক হইয়াও অতি মূর্খ ; সে কখন পাঠশালায় যায় নাই, এবং এক অক্ষর কিম্বা এক অঙ্কও লিখিতে ও পড়িতে জানে না। কেবল খেলা ও মন্দ কর্ম ব্যতিরেক আর তাহার কোন যোগ্যতা ছিল না।' [৮]

একই গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ 'এক বৃদ্ধ মনুষ্য ও তাহার দুই পুত্রের কথা'। দুই পুত্রের বড়টি বদনচাঁদ। '..... সে অতিশয় দুরন্ত অধার্মিক, এবং সর্বদা পিতার অবাধ্য, ও পাঠশালায় যাইয়া শিক্ষকের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিত ; পরে সে যৌবনাবস্থাতেও এতাদৃশ কুক্রিয়ান্বিত হইল, যে তাহার প্রতিবেশিরা তাহার সহিত আলাপও করিত না, .....।' কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র। '... সে

অতি সুশীল বালক, এবং অন্য, দুশ্চরিত্র ও অলস বালকদের সহিত ক্রীড়া কিম্বা কুক্রিয়া এ সকল কিছুই করিব না ; প্রত্যহ দুইবার পাঠশালায় যাইত, আর সে বিদ্যাতে এমত মনোযোগ করিল, সে অন্য বালকাপেক্ষা শীঘ্র উত্তম স্থানে নিযুক্ত হইল।' [৯]

২. গ্রন্থ — বালকবোধকেতিহাস
প্রকাশকাল — ১৮৫০
মুদ্রাকর — চন্দ্রোদয় যন্ত্র
লেখক — কেশবচন্দ্র কর্মকার

'পঞ্চম বৎসর বয়স্ক গোপাল নামে এক সুশীল বালক ছিল। তাহাকে তাহার পিতা বড় ভালবাসিত। ··· সে প্রতিদিন প্রাতে অতিশীঘ্র করিয়া পাঠশালায় যাইয়া আপন পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করিত ; আর সে বিদ্যাভ্যাসে এমত যত্নবান হইল, যে অন্যান্য বালকাপেক্ষা অতি শীঘ্র উচ্চ পঁক্তিতে নিযুক্ত হইল। যে পাঠশালায় অন্য বালকের ··· সহিত বিবাদ কি গল্প কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে কোন শব্দ কিছুই করিত না,·····। যখন ঐ বালক পাঠশালা ( মুদ্রণ প্রমাদ ) হইতে বাটীতে আসিত, তখন পথের মধ্যে কাহারও সহিত বিবাদ করিত না। এবং ঘরে আইলে কোন বালকের সহিত ক্রীড়া কিম্বা কুক্রিয়াদি কিছুই করিত না ; প্রায় সর্বদাই কাগজ ও কলম লইয়া অন্য, লেখাপড়া করিত, তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।'[১০]

৩. গ্রন্থ — শিশু শিক্ষা—২
প্রকাশকাল — ১৮৫০
মুদ্রাকর — কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস
প্রকাশক — কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি
লেখক — মদনমোহন তর্কালঙ্কার

'মাধবের সদ্ব্যবহার' শীর্ষক কাহিনীতে ভাল ছেলে মাধবের সৎ বন্ধু গোপাল। তারা দুজনে পাঠশালা থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথ হারানো এক ছেলেকে খোঁজ করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

৪. গ্রন্থ — শিশুশিক্ষা—৩
প্রকাশকাল — ১৮৫০
মুদ্রাকর — সংস্কৃত প্রেস
লেখক — মদনমোহন তর্কালঙ্কার

॥ সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে ॥

'সুশীল ও সুবোধ বালক সর্বদা লেখাপড়া করে। সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। পাঠের সময় সে যেমন পাঠ বলিতে পারে আর কেহই তেমন পারে না। এজন্য গুরুমহাশয় তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকেন। সে কখনও মন্দ কর্ম করে না ও মন্দ কথা মুখে আনে না। গুরুলোকেরা তাহাকে যাহা কহেন সে তাহাই করে। কদাচ কথার অবাধ্য হয় না। তাহাকে যে কর্ম করিতে একবার নিষেধ করা যায় তাহা কখনও করে না। সুতরাং সে সকলের প্রিয় হয়।'[১১]

॥ দুরন্ত বালককে কেহ দেখিতে পারে না ॥

'বেণী বড় দুরন্ত বালক। কাহারও কথা শুনে না। অতিশয় অনাবিষ্ট। একবারও লেখাপড়া করে না। কেবল খেলিয়া বেড়ায়। পাঠশালা হইতে ঘরে গিয়া পাঠের পুঁথি কোথায় ফেলিয়া রাখে পরদিন তাহা খুঁজিয়া পায় না। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে কেবল গোলমাল করিয়া সকলকে বিরক্ত করে।.....

বেণীকে কেহ ভালবাসে না। বেণী সকলকে গালি দেয় ও সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, এজন্য কোনো বালক তাহার সঙ্গে খেলা করিতে চায় না। গুরুমহাশয় প্রতিদিন তিরস্কার করেন তবু একটি দিনও পাঠ বলিতে পারে না। কেমন মাধব! তুমি শুনিয়াছ গুরুমহাশয় সর্বদা বলিয়া থাকেন বেণীর বিদ্যা হবে না চিরকাল মূর্খ থাকিবে ও দুঃখ পাবে। দেখিও তুমি যেন বেণীর মত হইও না।'[১২]

'পরের দ্রব্যে লোভ করিও না' শীর্ষক পরিচ্ছেদে গোপাল পাঠশালার পড়ুয়া, মাতৃভক্ত এবং পরদুঃখকাতর। সবচেয়ে বড়ো কথা সে পরের দ্রব্যে লোভ করে না। পাঠশালায় সোনার হার কুড়িয়ে পেয়ে দারোয়ানের কাছে না রেখে সে মায়ের কাছে নিয়ে গেছে। পরদিন মায়ের কথামত পাঠশালায় গিয়ে ঐ হার ফেরত দিয়েছে এবং সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে।

রাখাল নামক চরিত্রটির আবির্ভাব এই গ্রন্থেই। 'সুশীল বালক সকলকে সমান ভালবাসে' পরিচ্ছেদে রাখাল লেখকের শ্রোতামাত্র। 'অন্ধজনে দয়া কর' পরিচ্ছেদে রাখাল দয়ালু ও পরদুঃখকাতর। অন্ধ ভিখারির প্রতি তার দয়া দেখে মা 'অতিশয় আহ্লাদিত' হয়েছিলেন।

৫. গ্রন্থ—বর্ণপরিচয়—১ম ভাগ
প্রকশকাল—১৮৫৫
মুদ্রাকর—সংস্কৃত যন্ত্র

লেখক— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৯ পাঠ

গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।

... ... ... ...

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরুমহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

.....সে একদিনও কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।

... ... ... ...

গোপাল কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে;.....

গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।'[১৩]

২০ পাঠ

'গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না; যা খুশি তাই করে; সারাদিন উৎপাত করে;.....

রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া; সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।.....

লেখাপড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে একদিনও মন দিয়া পড়ে না; এবং একদিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না।.....

খেলিবার ছুটি হইলে, রাখাল বড় খুশি। খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে, এই কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ছুটি হইলে বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না।.....

রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত

হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।'[১৪]

*　　*　　*　　*　　*

'নীতিকথা' — ২-এর লেখক পিয়ার্সন ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং শিক্ষাপ্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই বইটি ছাড়া আরও কয়েকটি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশে বই-ই ইংরেজি থেকে অনুবাদ। 'নীতিকথা'-২ রচনায় সহযোগী ছিলেন রেভারেণ্ড মে ও জন হার্সে। এই তিনজনই খ্রিষ্টীয় ভাবধারা প্রভাবিত শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী। গ্রন্থ রচনায় পাশ্চাত্য রীতি ও নীতি অনুসৃত হয়েছিল। 'নীতিকথা'-২-এর ১৪টি অধ্যায়ের মধ্যে ঈশপের গল্পের বঙ্গানুবাদ, আরবি গল্পের বঙ্গানুবাদ রয়েছে। এ কারণে আমরা অনুমান করতে পারি, 'একাদশ কথা'র বদনচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র এবং 'ত্রয়োদশ কথা'র গোপাল ও ভোলানাথ কোন বিদেশি আদর্শের অনুসরণ — যাদের ভারতীয় আবহে ও পোষাকে পরিবেশন করা হয়েছে।

ভালো এবং মন্দ — দুটি পৃথকবোধ, কিন্তু পরস্পরসম্পৃক্ত। একই মুদ্রার দুটি পিঠ। মানবচরিত্র নামক সেই মুদ্রায় দুই বোধেরই সহাবস্থান। ভালোর একটি নির্দিষ্ট ছক আছে, মন্দেরও আছে। ভালো 'অতি সুশীল', 'বড় সুবোধ', পড়াশুনায় গভীর মনোযোগী, পিতামাতার বাধ্য, দুষ্কর্মে মতি নেই, অলসতা ধাতে নেই, অযথা সময় নষ্ট করা, অসৎসঙ্গে মেলামেশা করা বা অসময়ে খেলা করা তার স্বভাব-বহির্ভূত। এর ঠিক বিপরীতে মন্দ। সে পিতামাতার অবাধ্য, অগোছালো, বিদ্যার্জনে অনাগ্রহী, খেলাধুলায় তৎপর, আলস্যপরায়ণ, শিক্ষকের অপ্রিয়, নানবিধ দুষ্কর্ম এমনকি চৌর্যকর্মেও সমান পারঙ্গম।

নীতির ক্রিয়কর্ম এই দুই ভিন্ন মডেলকে নিয়ে। ভালো আর মন্দের মডেলকে সামনে দাঁড় করিয়ে গ্রহণযোগ্যটি নির্দেশিত হয়। 'গোপাল', 'গোবিন্দ' ভালোর প্রতিরূপ। কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের দুটি। মহাভারতের মহাকূটনীতিক, ভাগবতের মহাদার্শনিক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কামপাগল বৈষ্ণব পদাবলীর গোবিন্দ বা গোপাল আধুনিক যুগের গদ্যভাষায় 'অতি সুশীল' বা সুবোধ' বালকে পরিণত। এ এক বিস্ময়কর পরিণতি!

মন্দের প্রতিরূপের অনেক নাম। কখনও সে ভোলানাথ, কখনও রাধানাথ, কখনও বেণী আবার কখনও সে রাখাল। অবশ্য মন্দ রাখালের আগে দয়ালু রাখালেরই দেখা মিলেছে। বাংলা গদ্যে উনিশ শতকের

প্রথমার্ধে 'গোপাল' বারবার আমাদের দেখা দিয়েছে। আর মন্দের মডেলটিও নামান্তরে একই চেহারায় ও চরিত্রে আমাদের সামনে এসেছে। আসলে ভালো মন্দের আদর্শটি স্থিরীকৃত হয়েছে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের 'নীতিকথা-২' — গ্রন্থেই। এরপর চলেছে সেই ঐতিহ্যের অনুবর্তন।

আমরা দেখিয়েছি, বিদ্যাসগরের, গোপাল ও রাখাল ধারাবাহিকতার ফসল। তারা 'নীতিকথা-২', 'বালকবোধকেতিহাস', 'শিশুশিক্ষা-২ ও শিশু-শিক্ষা-৩'-এর যোগফল। বিস্ময়ের ব্যাপার এই, ভালো ছেলের 'গোপাল' নাম করণের ক্ষেত্রও বিদ্যাসাগর কোন মৌলিকতা দেখান নি। গোপাল বরাবরের ভালো ছেলে। রাখাল 'শিশু শিক্ষা-৩'-এ ভালো ছেলে, এখানে খারাপ ছেলে।

'নীতিকথা-২' এর গোপাল সূর্যোদয়ের পূর্বে পাঠশালায় যায়, গোবিন্দ চন্দ্র প্রতিদিন দু'বার পাঠশালায় যায়, 'বালকবোধকেতিহাসে'র গোপাল প্রতিদিন প্রাতে অতিশীঘ্র করে পাঠশালায় যায় আর 'বর্ণপরিচয়'-এর গোপাল সকলের আগে পাঠশালায় যায়। 'নীতিকথা-২'-এর গোপাল পথে দুষ্ট ও অলস পড়ুয়াদের সঙ্গে খেলা করে না, গোবিন্দচন্দ্র দুশ্চরিত্র ও অলস বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া কিংবা কুক্রিয়া কিছুই করত না। 'বালকবোধকেতিহাস'-এর গোপাল পাঠশালায় কারও সঙ্গে বিবাদ বা গল্প করে না, পথের মধ্যে কারও সঙ্গে বিবাদ করে না এবং ঘরে এসেও কোন বালকের সঙ্গে ক্রীড়া কিংবা কুক্রিয়া কিছুই করত না। 'বর্ণপরিচয়'-এর গোপাল পথে খেলা করে না, একদিনও কারও সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারি করে না। 'নীতিকথা-২-এর গোবিন্দচন্দ্র পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগী, 'বালকবোধকেতিহাস'-এর গোপাল বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান এবং প্রায় সর্বদাই লেখাপড়া করে, 'শিশু শিক্ষা-৩'-এর 'সুশীল ও সুবোধ বালক' (শেষোক্ত বিশেষণটি লক্ষণীয়) সর্বদা লেখাপড়া করে আর 'বর্ণপরিচয়ে'র গোপাল কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না। 'শিশুশিক্ষা-৩'-এর সুশীল ও সুবোধ বালক অত্যন্ত বাধ্য, গুরুমশাই এবং গুরুজনের প্রশংসাভাজন ও এ কারণে সকলের প্রিয়। 'বর্ণপরিচয়'-এর গোপালও গুরুমশাইয়ের ও বাপ-মায়ের বাধ্য এবং সেজন্য সকলের প্রিয়। পিয়ার্সনের গোবিন্দচন্দ্র 'অতি সুশীল', কেশবচন্দ্রের গোপাল 'সুশীল', মদনমোহন এক 'সুশীল ও সুবোধ' বালকের কথা বলেছেন এবং গোপাল পড়ুয়া ও মাতৃভক্ত। সবশেষে বিদ্যাসাগরের গোপাল 'বড় সুবোধ'।

'নীতিকথা-২'-এ ভোলানাথের পড়াশুনায় মতি নেই। কেবল খেলা

ও মন্দ কর্ম ছাড়া তার আর কোন যোগ্যতা নেই। বদনচাঁদ অতিশয় দুরন্ত ও অধার্মিক, পিতা ও শিক্ষকের অবাধ্য। 'শিশুশিক্ষা-৩'-এর বেণী বড় দুরন্ত। একটুও লেখাপড়া করে না। শুধু খেলা করে। পড়ার বইপত্র কোথায় ফেলে রাখে পরদিন তা খুঁজে পায় না। সে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, একদিনও পড়া বলতে পারে না, শিক্ষকের তিরস্কার শোনে। তাই 'বেণীকে কেহ ভাল বাসে না।' শেষে লেখক বলেছেন — 'দেখিও তুমি যেন বেণীর মত হইও না।'

বিদ্যাসাগরের রাখাল বাপ-মায়ের অবাধ্য, পড়াশুনায় অমনোযোগী, একদিনও পড়া বলতে পারে না। খেলা ছাড়া আর কিছু ভালবাসে না। সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। এজন্য শিক্ষকের তিরস্কার শোনে। ছুটির পর বাড়িতে বইপত্র কোথায় ফেলে রাখে তার ঠিকানা থাকে না। এ কারণে 'রাখালকে কেহ ভাল বাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়।' — এখানে কি মদনমোহনের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে না ?

## দুই

## ভুবন ও মাসি

'বর্ণপরিচয়'-২য় ভাগের দশম পাঠের শিরোনাম 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়।' বিষয় — আমাদের বহুশ্রুত ভুবন ও তার মাসির গল্প। এই গল্পটিও কি বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি ? অধিকাংশ পণ্ডিত-সমালোচক অবশ্য মনে করেন এই গল্পের মাধ্যমেই ছোট গল্পকার বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। যেমন — ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় — 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ভুবনের গল্পটি মৌলিক সাহিত্যের ছোট একটি টুকরো বলে মনে করা চলে। সেটি কেবল নীতিশিক্ষা দেয় না, একটি সরস ও সার্থক ছোট গল্পের আভাসও দেয়।'[১৫] ড. প্রতিভাকান্ত মৈত্র — 'বর্ণপরিচয় ২য় ভাগের এই ১০ম পাঠ শুধু শিশুর পাঠ নহে, ইহা শিশুর অভিভাবক শ্রেণীর পাঠ। ইহাই বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক গল্প। ....বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গল্পের জনক এবং সে গল্পের জন্ম বর্ণপরিচয় ২য় ভাগে। .....বাঙ্গলা গল্পের প্রথম অনবদ্য চরিত্র ভুবন ও ভুবনের মাসী।'[১৬] খগেন্দ্রনাথ মিত্র — '... কিয়দংশ এই গল্পটির মতোই একটি প্রাচীন বিদেশী গল্পও আমরা পাঠ করেছি। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্পটি মৌলিক রচনা। কারণ তার সঙ্গে এটির অনেক অমিলও আছে। ইংরেজ আমলে বাঙলা সাহিত্যে মৌলিক ছোট গল্পের আরম্ভ এই। এমন শক্তিশালী গল্প খুব কমই পাঠ করা যায়। ... গল্পটির

প্লট ও সংলাপ সুন্দর। শিশু-সাহিত্য শাখায়ও এর পূর্বে এমন পূর্ণাঙ্গ মৌলিক ছোটগল্প রচিত হয় নি।'[১৭] এই মতের শরিক হাল আমলে চিত্রা দেব — 'এটি বোধহয় প্রথম বাংলা শিশু পাঠ্য মৌলিক গল্প।'[১৮] বিনতা রায়চৌধুরী — 'বর্ণপরিচয় ২য় ভাগের মাসির কানকাটার গল্পটিকে প্রথম দিকের বাংলা ছোটগল্পের নমুনা হিসাবে ধরা যেতে পারে।'[১৯]

আর বেশি উদ্ধৃতি না দিয়ে ঈশপের একটি গল্প দেখা যেতে পারে।

'এক ছাত্র, তার সহপাঠীর একটি বই চুরি করে তার মা-কে রাখতে দিল। মা, ওকে তিরস্কার না করে, বাহবা দিল। কালক্রমে সেই ছেলে যখন বড় হল তখন সে এক পাকা চোর হয়ে গেল। পরে একদিন যখন ধরা পড়লো, তখন তার কোমরে দড়ি বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। চোরের মৃত্যু দেখার বিরাট এক কৌতূহলী জনতা চোরকে অনুসরণ করতে করতে বধ্যভূমির দিকে যেতে লাগলো। জনতার মধ্যে চোরের মা-ও ছিল। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, হাহাকার করতে করতে যাচ্ছিল।

চোর তার মায়ের ঐ অবস্থা দেখে একজন প্রহরীকে অনুরোধ করলো, তাকে যেন একটিবার তার মায়ের কানে কানে একটিমাত্র কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রহরী চোরকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। তার মা, ছেলের কথা শোনার জন্য, তার কানটি এগিয়ে দিল ছেলের মুখের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই চোর তার মায়ের কানটা কামড়ে ছিঁড়ে দিল। চোরের মা যন্ত্রণায় চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। অন্যান্য সবাই তখন চোরের মা-কে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। বললো, লোকটা এমনিতে চোর আর পাজী, কিন্তু ওর শয়তানীর হাত থেকে মা-কেও নিষ্কৃতি দিলে না।

চোরটা তখন বললো — আমার অধঃপতনের কারণ হচ্ছে, আমার মা। যখন ছোটবেলায় আমি আমার সহপাঠীদের বই চুরি করেছিলাম, তখন যদি মা আমাকে বেশ করে ধমক দিতো — তিরস্কার করতো — মারধোর করতো, — তাহলে আজ আমার এমন দশা হত না।'[২০]

*　　*　　*　　*

'বর্ণপরিচয়'-২য় ভাগের দশম পাঠের প্রথম অনুচ্ছেদটি নীতিবাক্যের সমষ্টি। নীতিবাক্যের শিক্ষারূপে উদাহৃত ভুবন ও মাসির গল্প।

'একদা, একটি বালক বিদ্যালয় হইতে অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশবকালে ঐ বালকের পিতামাতার

মৃত্যু হয়। তাহার মাসী তাহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরাইয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনকে শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যতদিন সে বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই চুরি করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছুকাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহুকাল চোর হইয়াছে, এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসি হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন, এবং ভুবনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসি নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।'[২১]

*　　*　　*　　*

ঈশপের গল্প ও বিদ্যাসাগরের গল্পের তুলনায় একথা স্পষ্ট, বিদ্যাসাগরের গল্পটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়। গল্পের কাহিনী এক, পরিণতিও এক। শুধু ঈশপে চোরের কোন নাম ছিল না — এখানে তার নাম

ভুবন। চোরের মা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল. আর মাতৃহীন ভুবনের মাসিই প্রশ্রয়দাত্রী।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। 'শিশুশিক্ষা'-৩-এ 'চুরি করা বড় দোষ' শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদ আছে। সেখানে লেখক একটি গল্প শুনিয়েছেন। গল্পের প্রথমাংশ উদ্ধার করা হচ্ছে। 'দেখ গোপাল! ঐ যে বেড়ী পায়, গৌরবর্ণ, যুবা পুরুষ, মাটী কাটিয়া পথ বাঁধিতেছে। ও কে, তুমি জানিতে চাও? তবে শুন। ঐ হতভাগা তোমাদের পাঠশালাতেই পাঠ করিত। সকলে উহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসাও করিত। কিন্তু, চিরকালই একপাঠিদিগের ছুরী, কাঁচী, কাগজ, কলম, পয়সা চুরি করিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। উহার মা বাপ জানিয়া শুনিয়াও বারণ করিত না। ক্রমে ক্রমে উহার এমন কুঅভ্যাস জন্মিল যে কাহার কোন ভাল বস্তু দেখিলে চুরি করিতে ইচ্ছা হইত। এবং সুযোগ পাইলে চুরিও করিত।'[২২] এখানে ঈশপের গল্পের ছায়াপাত ঘটেছে। গল্পে 'হতভাগা' অনামা। তবে কিছুদিন পরে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তার নাম হয় 'ভুবন'।

ঈশপ এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে কাহিনীকে গ্রহণ করে কিছুটা পরিমার্জনা করেছেন। উপরন্তু, ঈশপের গল্পটি একটি ঘটনামাত্র। বিদ্যাসাগরের গল্পটি রসরূপ লাভ করেছে। যা ছিল নামহীন এক অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, বিদ্যাসাগরের হাতে তা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। সম্ভবত নীতিবোধের তাড়নায় বিদ্যাসাগর পুত্রের প্রতি মায়ের প্রশ্রয় এবং মায়ের প্রতি ভুবনের ভয়ংকর আচরণের দিকটিকে একটু সরিয়ে নিয়ে সেখানে মাসিকে স্থাপন করেছেন। চোরকে তার মা বাহবা দিয়েছে। বিদ্যাসাগর অতটা এগোন নি। মাসিকে নীরব রেখেছেন। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ হিসেবে দেখিয়েছেন! এটি অবশ্যই লেখকের রুচির নিদর্শন।

## তিন

## নাস্তিকতা

বিদ্যাসাগর নাস্তিক না আস্তিক, এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনা যেমন আছে, তথ্য দিয়েও অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন — বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেছেন বিদ্যাসাগর সে-অর্থে 'নাস্তিক' নন, আবার ঈশ্বর-ভক্তি নিয়ে বাড়াবাড়িও করেন নি।

বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর-ভক্তি

প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'বোধোদয়' গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন। আজীবন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, চিঠিপত্রের শিরোদেশে 'শ্রীহরি' স্মরণ করা মানুষ, জনক-জননীর পারলৌকিক ক্রিয়া যথারীতি নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন করা বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বর বিষয়ে ততটা ভাবিত ছিলেন না — এটা বোঝাতেই যেন 'বোধোদয়'-এর উল্লেখ। 'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর-বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ ছিল না — অপরের অনুরোধেই তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর-বিষয়ক একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করেন — বিদ্যাসাগর-জীবনীকারের বক্তব্য এ-ই।

"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে ( বিদ্যাসাগর ) অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। তিনি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বোধোদয় সম্বন্ধে বলেন, 'মহাশয়, অনেকে আমার নিকট বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ক কোনো কথা নাই কেন ?' বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।' ইহার পরবর্তী সংস্করণ হইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি পাঠ বোধোদয়ে সন্নিবিষ্ট হইল।"[২৩]

চণ্ডীচরণ বলেছেন — 'আমরা স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই বৃত্তান্তটি শুনিয়াছি।'[২৪] লক্ষণীয়, চণ্ডীচরণের উদ্ধৃতিতে 'ছেলেদের এবং 'বালকদের' শব্দ দুটি প্রযুক্ত। আমরা জানি, 'বোধোদয়' গ্রন্থটি 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের চতুর্থ ভাগ। প্রথম তিনটি ভাগ লিখেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার যথাক্রমে ১৮৪৯ ও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের ৫ম ভাগ লিখেছেন রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় — নাম 'নীতিবোধ' 'শিশুশিক্ষা'র পাঁচটি ভাগই লেখা হয় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য। পাঁচটি ভাগের আখ্যাপত্রেই মুদ্রিত ছিল 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' কথাটি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অংশটুকু বর্জিত হয়। 'শিশু-শিক্ষা'-৪-এর প্রথম দুটি সংস্করণের আখ্যাপত্র প্রয়োজনবোধে উল্লেখ করা হচ্ছে।

**শিশুশিক্ষা—৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫১**

**আখ্যাপত্র : ১ম সংস্করণ**

THE / INFANT TEACHER. / PART IV. / COMPILED FOR THE USE OF / FEMALE SCHOOLS IN BENGAL / BY ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR. / CALCUTTA : / PRIN-

TED AT THE SANSKRIT PRESS. / 1851.

শিশুশিক্ষা / চতুর্থ ভাগ / বোধোদয় / এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯০৭।

আখ্যাপত্র : ২য় সংস্করণ

RUDIMENT OF KNOWLEDGE / BY / ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR. / SECOND EDITION / CALCUTTA. / PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS. / 1852.

বোধোদয়। / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত / কলিকাতা। / সংস্কৃত যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। সংবৎ ১৯০৮।

'বোধোদয়'-এ ঈশ্বর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে অধিকাংশ পণ্ডিত সমালোচকই চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকে মান্য করেছেন। ফলে 'বোধোদয়'-এর ১ম সংস্করণে ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছিল না — এই ধারণাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিছু অভিমত আমরা তুলে ধরছি।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — '...একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর বিষয়ক কোন প্রসঙ্গই ছিল না। বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে ২য় সংস্করণে ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাবটি সংযোজন করিয়াছিলেন।'[২৫] অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন — 'বোধোদয়-এর প্রথম সংস্করণে নানা পার্থিব জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও ঈশ্বর সংক্রান্ত কোন কথাই নেই। থাকবার কথাও নয়; এখন যিনি পদার্থবিজ্ঞান বা অন্য কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন, তাতে কি তিনি পরম কারুণিক শ্রীভগবানের জয়ধ্বনি করেন?'[২৬]

ড. স্বপন বসু — 'বোধোদয়ে ঈশ্বর প্রসঙ্গ উপযুক্ত স্থান না পাওয়ায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে অনুযোগ করেন। পরবর্তী সংস্করণে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' ও অন্যান্য কিছু কিছু উক্তি বিদ্যাসাগর যোগ করলেও, তা ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ মানুষদের তৃপ্ত করতে পারেনি।'[২৭]

বদরুদ্দীন উমর — 'বালকদিগের বোধশক্তির বিকাশের জন্য যখন তিনি 'বোধোদয়' (মুদ্রণ প্রমাদ?) লিখেছিলেন তখন কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বর প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' — বালকের সাধ্য নেই এই সংজ্ঞা বোঝে। সেই জন্যই তিনি প্রথম বোধদয়ের (মুদ্রণপ্রমাদ?) মধ্যে ঈশ্বরের

স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে চাননি, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।'[২৮]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী — "তাঁর লেখা বালাশিক্ষা পুস্তকের ( শব্দটি লক্ষণীয় ) প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরের কোনো নাম গন্ধই ছিল না ; পরে, বিরূপ সমালোচনার মুখে, নিরুপায় বিদ্যাসাগর যোগ করেছিলেন ঈশ্বরের প্রসঙ্গ — 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা বিদ্যমান আছেন।'[২৯] শ্রী চৌধুরীর উদ্ধৃত উক্তিটি অসম্পূর্ণ ও ভুল।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ পড়েছি। প্রথম সংস্করণ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল — 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান ; এবং যাহা মনে ভাবি তাহাও জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন। তিনি যাবতীয় জীবজন্তুকে আহার দেন ও রক্ষা করেন অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম।'[৩০]

দ্বিতীয় সংস্করণে — 'এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন' অংশটুকু বর্জিত হয়, 'আমারদিগের' শব্দের পরিবর্তে 'আমাদিগের' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া 'এবং যাহা মনে ভাবি' অংশে 'এবং' শব্দটি পরিত্যক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ' অংশটুকু ১৮৫১ সালে তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রদত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার অংশবিশেষ।

## তথ্য ও উৎসনির্দেশ


১. বিদ্যাসাগর রচিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিবর্ধিত-সং, শ্রাবণ ১৩৬৫। পৃ. ২৬-২৭।

২. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, বিনয় ঘোষ। ১৯৮৪। পৃ. ৩৩০।

৩. প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা-বিমান বসু। ১৯৯১। পৃ. ১৭৮।

৪. গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস ঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯১।

৫. ঐ। পৃ. ১৪২।

৬. ঐ। অবতরণিকা। পৃ. ১১-১৩।

৭. বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষা, বিনয়ভূষণ রায়। পৃ. ২২৫। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর-সম্পাদনা বিমান বসু। ১৯৯১।

CENTRAL LIBRARY

৮. নীতিকথা-২। ১৪৩০ সং। পৃ. ২৫-২৬
৯. ঐ। পৃ. ১৭-২০।
১০. বালকবোধকেতিহাস। ১৮৫০। পৃ. ৭-৮।
১১. শিশুশিক্ষা-৩। ১৮৫০। পৃ. ১।
১২. শিশুশিক্ষা-৩। ১৮৫০। পৃ. ২-৩।
১৩. বর্ণপরিচয়—১ম ভাগ। ৬০তম সং।
১৪. ঐ।
১৫. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৩৬৬ ব.। পৃ. ১৩৩।
১৬. বিদ্যাসাগর স্মরণিকা, সম্পাদনা-হরিপদ চক্রবর্তী। ১৩৮১ ব.। পৃ. ১১৬।
১৭. শতাব্দীর শিশুসাহিত্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৯৬৭। পৃ. ৬১।
১৮. বাংলা শিশুসাহিত্য, চিত্রা দেব। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৮১।
১৯. 'দেশ। ২৪ জুলাই, ১৯৯৯। পৃ. ৮২।
২০. লোকসাহিত্যে ঈশপ, সুধীর করণ। ১৯৭০। পৃ. ৫১। ১০১ সংখ্যক গল্প।
২১. বর্ণপরিচয়-২য় ভাগ। ৬০ তম সং। ১০ম পাঠ।
২২. শিশুশিক্ষা-৩। ১৮৫০। পৃ. ১১-১২।
২৩. বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪০৪ সং। পৃ. ৪৬৬।
২৪. ঐ। পৃ. ৪৬৬। পাদটীকা।
২৫. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬[illegible]। পৃ. ৩২৪।
২৬. বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন ?, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর। পৃ. ১৬৪-১৬৫।
২৭. সমকালে বিদ্যাসাগর, স্বপন বসু। ১৯৯৩। পৃ. ১০৭।
২৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, বদরুদ্দীন উমর। ১৯৮৮। পৃ. ৫৪।
২৯. ঊনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ১৯৮৩। পৃ. ৩৭।
৩০. বোধোদয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১ম সং। পৃ. ২।

# কবিতার ভাষাবিধি ঃ প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ ঃ
# চল্লিশের চারজন / ৬

[ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ]

শান্তনু প্রামাণিক

চল্লিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত হিসেবে যাদের 'সমাজ-সচেতন' অথবা 'সমাজ-মনস্কতা' সম্পন্ন কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে দেখেছি নানা আলোচনায়, কিছুটা ঋজু ও সহজ ভাষাভঙ্গি যে এ বিষয়ে এ অভিধায় প্রচারিত হতে তাঁদের যে সাহায্য করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যখন আমরা পড়ি —

'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা.
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠ ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া

অথবা অন্যত্র —

'বাকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভাল বাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে !'

তখন এর চলনে এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রীতির বিপরীত বিশেষত্বটুকু চট করে ধরে ফেলতে কোন অসুবিধে হয় না। এবং প্রায় যুক্তভাবে রাজনৈতিক বিশ্বাসের ধারাবাহিক প্রবণতায় সংক্রামিত এঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন নিজেদের সুবিধে মত এক চলমান ভাষাপ্রণালী। আর তাতেই এরা পাঠকের কাছে ভিন্ন সম্ভ্রম আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাথমিক প্রস্তুতিটুকু এমনই।

যুগের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতায়, বিশ্বাসে অথবা চিন্তা প্রকরণে সৃষ্টি হয়ে পড়ে ভিন্ন ভাষা পদ্ধতি ও তার ব্যাকরণিক অনুশাসনাবলী। ভাষার যে সামাজিক চাহিদা পূরণও একটি শর্ত তা নিরূপিত হয় এভাবে। তাই ঈশ্বর গুপ্ত বা হুতোম প্যাঁচা প্রায় বিবর্ণ বাংলা ভাষাকে এক সময় বর্ণবহুল ( কথিত রীতি মত তাকে 'চটুল' বলাই সঙ্গত ) করে তুলেছিলেন যুগের চাহিদা অনুসরণ সাপেক্ষে। যাইহোক আমরা এই অংশের আলোচনায় বাংলা কবিতার আর

একটি Poetic diction-কে বুঝে নেব এই চার বিশিষ্ট বারপদ্ধতি ব্যবহার-কারী কবিদের কবিতার মধ্যে দিয়ে।

প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা —
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি.
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়ঃ
পূর্ণিমা—চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ॥

যে বিশেষ রীতি পদ্ধতি মত শব্দকে ব্যবহার করলে বাক্য রসাত্মক ও সনাতনী ধ্বনিময় হয়ে ওঠে সেই স্নিগ্ধ লাবণ্য এদের কাব্যে প্রায় নেই। এ প্রথা সনাতন। এই কবিরা সেই সনাতনী ধ্বনিবাদীদের মত কাব্যের কোথাও স্বাক্ষর রেখে বলেন নি 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। বরং এর প্রায় বিপরীত ভাবনাই প্রকাশ করেছেন নানা সময়ে। কবিতার সেই কথিত অথবা কাঙ্ক্ষিত স্নিগ্ধ সুবাস এদের কবিতায় কেউ কেউ জোর করে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রথমাবধি যে মৌল প্রেরণার বশবর্তী হয়ে এরা কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন এবং তার অনুকূলে প্রবহমান ভাষাবিধি নির্মাণ করে নিয়েছিলেন তা বারবার রক্তশাণিত আনুগত্য ও শৃঙ্খলা দেখিয়েছে। সুতরাং কোনভাবেই একে বিভ্রান্ত করে অন্যরূপ দেবার সামর্থ্য এরা দেখান নি। আগেই বলেছি বিষয়বস্তু ও চিন্তা পদ্ধতির বাসনা মতই ভাষা তার কাজ করে দেয়। এবং কবিরা তাদের স্বাধিকার রক্ষায় ভাষাকে সেভাবেই প্রস্তুত করে নেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত থাকতেই সত্যেন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখ কারো কারো ভাষা সংস্কার জরুরী হয়ে পড়েছিল তাদের কবিকর্মকে বিস্তৃত ও প্রবাহিত রাখার জন্য।

প্রথম মহাসমরের ধাক্কায় এদেশে তেমন কোন বিরাট পরিবর্তন না এলেও আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নেমে আসে এক স্থায়ী ও অপ্রতিরোধ্য অস্থিরতা। এতদিন পর্যন্ত স্বদেশচেতনার একটি বহির্মুখী আলোড়নে এদেশের কোন কোন কবি মুখরিত ছিলেন, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কেউ কেউ স্বাদেশিক অস্থিরতার একটি দুটি জরুরী স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের রচনায়। রবীন্দ্রনাথও কমবেশী তপ্ত-বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত বিদ্রোহের ধারাবাহিক সূচনা হয় আরো পরবর্তীকলে — নজরুলের কবিতায়-গানে। ভারত ভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করাল গ্রাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পাশাপাশি কমিউনিস্ট চিন্তা প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ, যুগপৎ এই দুটি বিষয়ের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ যারা করেছেন চল্লিশের এই চারজন কবি তাঁদের পুরোধা। এবং এদের কবিতার ভাষাবিধি আলোচনায় পাঠককে এই প্রসঙ্গটি

স্মরণে রাখতে হবে।

'লেখার ভাষা অবিকল মুখের ভাষা হতে পারে না। মুখের ভাষার স্থানকাল পাত্রের গণ্ডিটা থাকে ছোট; লিখতে গেলে এমন গড়নপিটনের দরকার যাতে লেখকের হাত ছেড়ে দিয়ে সে-লেখা যখন তখন যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে যেতে পারে। মুখের ভাষার কাছাকাছি থাকতে চাই, নিকট দূরত্বে।' ভাষার সংস্কার আকাঙ্ক্ষা এর কাম্য। তবে মৌখিক রীতিনীতির নিকটবর্তী হয়ে তাকেই বৃত্তাকারে আবর্তিত হতে হবে এমন একটি শর্ত তার আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথের পর অতিদ্রুত পরবর্তী আধুনিক কয়েকজন কবির হাতে কাব্যিক সংস্কার কীভাবে প্রকাশ্যে ও সগর্বে ঘটতে শুরু করেছিল। ভাষা পদ্ধতি তার ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। আসলে এ যুগের সঙ্গে অন্য যুগের কবিতার প্রাথমিক ভিন্নতা বা দূরত্ব সৃষ্টির মূল ও প্রধান কাজ ভাষার। পাশাপাশি আর সব অন্য দায়গুলি ভাষাকে কেন্দ্র করে বা জড়িত রেখে নিজেদের বিন্যস্ত করে দেয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই —

গঙ্গার জোয়ারে এসে লাগে
ভল্লার তীরের স্পর্শ
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে ;
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব,
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব

আবার সমর সেনের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনি —

অনেক ফিরেছি ধনীর পিছনে
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
বড়লোকে আস্থা নেই আর,
দেখেছি দেশের দুর্যোগে,
কি উপায়ে কাঁচ টাকা ভাড়ু দত্ত করে।
মাঠে মাঠে সোনার ধান,
কোথায় ধান !
সোনা জমে তাদের ভাণ্ডারে।

এই শব্দ ভাণ্ডারে একটিও অপরিচিত শব্দ নেই। কিন্তু যদি ওঠে

ধ্বনির কথা। অথবা বাকপ্রবাহ পদ্ধতির বিচার! তখন পুনরায় একবার নতুন করে ভাবতে হবে গোড়া থেকে। শব্দকে এমনভাবে ব্যবহার আমাদের কবি সমাজে এ যাবৎ ছিল না। শব্দকে তরল ও মিষ্টি, অন্তর্গূঢ় ও রহস্যময় অথবা স্নিগ্ধ, নরম এবং ঝলমলে করে পাবার সকল রহস্য এতকাল কবিরা আয়ত্বাধীন করেছেন। কিন্তু এ অন্যস্বভাব, অন্যবেশ, অন্য প্রবহ। উদ্ধৃত কবিতা দুটিতে শব্দগুলি তাৎক্ষণিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। বোঝা যায় শহুরে রুক্ষতা ও কঠিন কর্কশ স্বরলিপি এর করতলগত আছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্যভাষা প্রসঙ্গে যা বলতে চেয়েছেন তা অতি প্রাচীন সংস্কারের মত-একদা প্রায় একথাই উচ্চারিত হয়েছিল ইংরেজ কাব্যের সোনালী যুগে ওয়ার্ডসওয়ার্সের রচনায় — There neither is nor can be any essential difference between the langauge of prose and metrical Composition গদ্য ও পদ্যের ভাষার বিস্তৃত পার্থক্য ঘুচিয়ে ফেলার বাসনা উনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রয়োজনে সূচিত হয়েছিল একালে এই কবিদের আকাঙ্ক্ষা অন্যকারণে। গণচেতনাকে সংগঠিত করে মানুষের কাছাকাছি দ্রুত পৌঁছে যাবার সফল প্রয়াস এদের কাব্যস্পন্দনকে এমন গদ্যস্পন্দী করে তুলেছে। সে ইতিহাস এখানে বিস্তৃত আলোচনার কোন সুযোগ যদিও নেই, তবু সংক্ষেপে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে আমরা তা স্মরণ করব।

'মধ্যদিনে গান বন্ধ করে পাখি।
কারখানায় সংঘবদ্ধ জমে অনেকের ভিড়,
হাতে বিপ্লবের রাখী!
পোড়ামাটিতে অস্ত্রহাতে প্রহরী জাগে ক্ষুধিত কিষাণ।
ভয়াবহ রণক্ষেত্রে লাল সৈন্য ঢালে প্রাণের আবীর।
সহসা মধ্যদিনে বাজে কালের বিষাণ।'

যুগের ক্লান্তি, হতাশা তার বিবর্ণ বিকার এবং সমাজ শ্রেণী সংঘর্ষ ও বিপ্লবের সমগ্র সুর এর উপজীব্য। বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে শব্দের বিকাশ সম্ভাবনা। মন্ত্রের মত ক্ষমতাও সে রাখে। একই সঙ্গে বশীকরণ ও উত্তেজনা এই উভয় বিপরীত স্বভাব সামর্থ্য শব্দের জন্মসূত্র অধিকার। যে 'গান' শব্দটি রবীন্দ্র কবিতায় সর্বত্র মাধুর্য বিস্তারে সক্ষম, সমর সেনের কাছে তাই যান্ত্রিক যন্ত্রণায় বিবর্তিত হয়েছে। নাগরিক কোলাহল পরিপূর্ণতা পেয়েছে এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রের প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি শব্দের অর্থবিস্তারে। আর এইসব অব্যবহারী অবস্থায় আপাত নিরিহ ও নির্জীব শব্দগুলি এখানে যে উপায়ে যে ধ্বনির জন্ম

দিয়েছে, তা আমাদের কোন কোমল রসাতুর ও স্নিগ্ধ চিত্তের উদ্ভাস এনে দেয় না। এ দেয় যন্ত্রজর্জর নগর জীবনের রুক্ষ ও বর্ণহীন, ধূসর ও আনবিক ধ্বনির স্রোত। 'কারখানা' 'সংঘবদ্ধ' 'ভিড়' 'বিপ্লব' 'পোড়ামাটি' 'প্রহরী' 'ক্ষুধিত কিষাণ' 'রণক্ষেত্র' ইত্যাদি শব্দ বা পদবন্ধগুলি ক্রমান্বয়ে এবং ব্যবহারবিধির বিশেষ পদ্ধতি সূত্রে গদ্যের চলন রক্ষা করবার পাশাপাশি সৃষ্টি করেছে এক ধরণের নির্মম আবহ।

তুমি ব'সে কাজ করো।
আমি উঠি।
যাই
গিয়ে দেখে আসি
কোথায় আকাশটা খুব বড়ো।
দেখে আসি পড়ো-পড়ো
কোথায় কখন কোন্ খুঁটি।
যাই
গিয়ে দেখে আসি
কী বীজ বুনছে মাঠে চাষি।

এ ভঙ্গি আমাদের নিত্যকথনে আছে। অবিকল নেই। তবে এভাবেই ক্রিয়াপদে, অন্বয়ে, যতিচিহ্নে — আমাদের শ্বাসের আরাম ও আশ্বাস মতো। অবশ্যই ভিতর বুননে অন্য স্বাদ, অন্য গতি, ভিন্ন কোন প্রার্থিত লক্ষ্যভেদ সহায়ক। তবু চলিত ব্যাকরণের নিয়ম শৃঙ্খলাও মান্য হয়েছে। অভিধানের শব্দার্থ বিন্যাসও প্রায় যথাযথ। সুতরাং কবিতাকে সাধারণের কাছাকাছি আনবার ও সঠিক সংযোগ রক্ষা করে চলার প্রয়াস নিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছেন — 'আমি চাই কবিতা দিয়ে মানুষের হাতগুলোকে এমনভাবে কাজে লাগাতে যাতে দুনিয়াটা মনের মত করে আমরা বদলে নিতে পারি।' স্বীকারোক্তি হিসেবে এমন স্পষ্ট কথা কবিরা সচরাচার বলেন না। তিনিই বলতে পারেন —

আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাকটরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি —
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও ॥

খুব সহজভাবে ও শব্দকে বাক্যে যতদূর সম্ভব সরল বিন্যাসে বেঁধে তিনি কবিতা লেখেন। তাঁকে লিখতে হয়। কেননা আগেই বলেছি বিষয়ের সঙ্গে ভাষার যোগ নিবিড়। সমগ্র পৃথিবীকে শোষণ মুক্ত ও সাম্যতার নিরিখে প্রত্যক্ষ করা ও অন্যকে করাবার কামনায় সরাসরি হাতিয়ার হিসেবে তিনি কবিতাকে বেছে নিয়েছেন। সমর সেনেও তার স্বাক্ষর রয়েছে।

তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে

তবে সমর সেন শব্দ ব্যবহারে অতিরিক্ত রকম কষায়। একই ছত্রে যখন পাশাপাশি আমরা পাই 'গলিত গর্ভ' 'বিপ্লব' ধাত্রী, অথবা 'জীর্ণ' 'চূর্ণ', 'ভস্ম' তখন এক সঙ্গে এদের ধাতস্থ করে নিতে বেশ কিছু সময় নেয়। এবং কবিতার কাছে ইপ্সিত সেই সিদ্ধ রস স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। সমর সেন আপাদমস্তক নগর জীবনের কবি। তাই যুগের যন্ত্রণার, হতাশার নাগরিক কোলাহলের ছবি তার ছবি তার কবিতায় অতি স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। তিনি জানেন যে কী ধরণের যান্ত্রিক শব্দ ব্যবহার করলে তার শর্ত পূরণ সম্ভব হবে। শর্ত বলছি কেন না প্রত্যেক কবির নিজের আবেগ-ইচ্ছার খবর রাখতে হয়। যিনি স্বভাব মৃদু বা জন্মসিদ্ধ প্রণয়গ্রস্ত তিনি যুদ্ধের বা বিপ্লবের কথা বললে বেমানান হয়। আবার সংগ্রামী মন্ত্র যিনি আশৈশব জপ করেছেন তার হাতে তেমন রঙিন প্রণয় স্বপ্ন রূপ পায় না। এখানে একটি স্থূল বিভাগ চিহ্ন দেওয়া হলো মাত্র। আসল কথা প্রত্যেক কবিই তাদের প্রবণতা অনুসারে শব্দ নির্বাচন করেন। একেই কবির শর্ত চিহ্ন বলা হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে কবি তার সৃষ্টি মুহূর্তে মূলত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের যুগ্ম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি প্রবাহের কোন আংকিক সূত্র মত ব্যবহার বিধি তৈরি করেন না। তা সম্ভবও নয়। চলমান জগৎ ও জীবনের সামাজিক পথে জমে ওঠা ভাষার ধ্বনিগত কিছু সঞ্চয় থাকে তার সামনে। আর তাকেই প্রয়োজন মত ব্যবহারে — সজ্জায় তিনি দেন লৌকিক — অলৌকিক কোন এক স্ফূর্তি। অন্যদিকে সম্মতির প্রশ্নে, ক্ষেত্র বিশেষে বা বিশেষ তারতম্য হেতু তার বিবর্তন ও বিবর্ধন ঘটে।

CENTRAL LIBRARY

ও স্মৃতি, ও আশা
ও ঝিঁঝি ও ঝাউ,
ধোঁয়া ও কুয়াশা
বউনি ও ফাউ
যাচ্ছি

এখানে 'ও স্মৃতি, ও আশা' এবং 'ধোঁয়া ও কুয়াশা' এর সঙ্গে মিল রক্ষায় 'ও ঝিঁ' ঝি, ও ঝাউ, এবং 'বউনি ও ফাউ' ব্যবহারে পরোক্ষে মাত্রা বিধি নিয়ন্ত্রণ করেছে 'যাচ্ছি' শব্দটি। পাঠের ধরণ বা পদ্ধতিই বলে দেবে মাত্রার সমতা রক্ষায় কোন্ ধ্বনির দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব উচ্চারণ হবে। প্রথম দুটি চরণের ছয়+পাঁচ মাত্রা যুগ্মভাবে এগার'টি স্পন্দন সৃষ্টি করলেও পরবর্তী দুই চরণে ছয়+চার মাত্রা যুগ্মভাবে এগার'টি স্পন্দনই সৃষ্টি করেছে। যদিও প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে এদের মিল বিন্যাস রয়েছে। সেদিক থেকেও ছয়+ছয় এবং ছয়+চার-এর অসম মাত্রা বিন্যাসগত কোন ত্রুটি এখানে নেই। যাইহোক কবি যেভাবে শব্দগুলি সাজিয়েছেন তার ফলে একটা অদ্ভুত ধ্বনি বিন্যাস আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটা চলমান রেলগাড়ীর সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে হয় দুটো লৌহদণ্ডে সে যেমন অতি সড়গড়, তেমনি এখানে কবি ভাব ও শব্দের যুগ্মদণ্ডে এও সমান সক্রিয় থাকতে পেরেছে।

'The Verbal Icon' গ্রন্থে W. K. Wimsatts বলেছেন — In Literary art only the wedding of the alogical with the logical gives the formen an aesthetic value. The words of a rhyme with their curious harmony of sound and distinction of sence are amalgam of the sensory and the logical, or an arrest and precipitation of the logical insensory form, they are the icon in which the idea is Cought. আর কবিতায় অন্ত্যমিলের ব্যবহার প্রসঙ্গে অনেক প্রকার তাচ্ছিল্য শোনা যায়। কবিতায় মিল ব্যবহার আসলে যুক্তিহীন পরিশ্রম এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু কবিতা হচ্ছে বর্ণের উচ্চারিত ধ্বনি প্রবাহের অর্থপূর্ণ বিস্তার। প্রকৃতপক্ষে অন্ত্যমিল কবিতায় যুক্তি ও অযুক্তির সাঁকো বলায় দ্বিধা নেই। আর যুগে যুগে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এই মিল প্রসঙ্গে কম বিতর্ক হয়নি। তবু ফিলিপ সিডনির মত বলা সঙ্গত যে ছন্দ ও অন্ত্যমিল কবিতার পক্ষে জরুরী। আর স্মরণযোগ্য-তার অন্যতম হাতিয়ার কবিতার মিল পদ্ধতিকে অনুসরণে। আবার সফল সমিল কবিতায় বিভিন্ন শব্দউত্থিত ধ্বনিগুলি বেশিরকম লাবণ্য বিস্তারেও সক্ষম

হয়। যে কারণে প্যাটেনহাম বলেছিলেন — all the sweetness and harmony of our valgar poesic. উদাহরণ দিচ্ছি —

শঙ্কা বলে ফিরে চলো. ইচ্ছা বলে আরো আছে দিক,
সে বলেছে, প্রয়াসের ফলগুলি সমস্ত অলীক !
যত অর্ঘ্য আনো তুমি প্রণয়ের অর্গলিত দ্বারে,
ফিরে যেতে হবে ফের পিছু পথে, তীব্র হাহাকারে !

অথবা

সর্বত্রই এক ক্লান্তি. শোলোক ফুরুলে
চুলের আবির নিয়ে ঘুমায় স্বপ্নের শিশু ঠাকু'মার কোলে।
আকাঙ্ক্ষায় পুড়ে যায় রূপকথার নক্ষত্রের অদৃশ্য কপাল···
একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল।

কবিতায় মিলের ব্যবহার প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রত্যাশিত শব্দ দ্বারা মিল দেওয়ার সার্থকতা নেই। কেন না অনুরূপ আর একটি শব্দ পাঠকমনে পূর্বেই ক্রিয়াশীল হতে থাকে। কবিকে তাই প্রায় বিরোধী অথচ উদ্ভাস সৃষ্টিযোগ্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে মিল রক্ষা করতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় 'আরো আছে দিক' এর সঙ্গে পাঠক মনে এসে পড়বে 'তবু সব ঠিক' জাতীয় কোন অন্ত্যমিল। কিন্তু এক্ষেত্রে 'সমস্ত অলীক !' বলে মিল রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার অবস্থানের ধরণটিকে আমাদের চিনিয়ে দিলেন। প্রমাণিত হলো এই কবি উচ্চশ্রাব্য নন। এর শব্দ নির্বাচন ও অবস্থা মত বিন্যাস পদ্ধতিই বিকশিত করে দিচ্ছে কবির বিলম্বিত মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে বাকরীতি-টিকে। একইভাবে দ্বিতীয় উক্তির শেষ দুই চরণে যথাক্রমে 'অদৃশ্য কপাল···' ও 'দুর্ভিক্ষের চাল' এই বিষম বিপরীত মিলের প্রয়াসে কবি-ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট স্বাক্ষর। দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন বিচরণ সক্ষম সোজাসুজি এভাবে বলে ফেলার ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে এক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্পৃহা।

কবিতায় মিলের যেহেতু একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে. অর্থাৎ মিল অর্থ-প্রবাহমূলক সমাপ্তি চিহ্ন টেনে দেবার সামর্থ রাখে, তাই পদগঠনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবহমান ধ্বনি ও কবি ভাবের সঙ্গেও তাকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে হয়। তাই মিল কোন বিচ্ছিন্ন প্রয়াস বলে বিবেচিত হয় না। মিলের বিশিষ্টতা সমগ্র কবিকর্মের ওপর সচেতনভাবে ক্রিয়াশীল। মিল যে কোন বিচিত্র এবং জটিলভাব ও অনুভূতির সঙ্গে সক্ষম সম্পর্কযুক্ত একটি প্রক্রিয়া। তাই যথাযথ ধ্বনির বিন্যাসকে পাঠকমনে বিকশিত ও উদ্ভাসিত করে দিতে

মিলের প্রয়োজন যাকে যুগে যুগে কবিরা নানা উপায়ে অনুভব করেছেন। কেননা মিল প্রকৃতপক্ষে কবির ভাবনার বিকাশের মন্ত্র। যাকে আমরা 'বন্ধন' বলে জেনে এসেছি — তার ভিতরই লুকিয়ে থাকা সমূল সম্ভাবনা আছে মিল রক্ষায়। ক্লোদেল যাকে বলেছেন — 'জৈবিক ঐক্য'।

কোথায় যেন চাঁদ উঠেছে চাঁদ
মড়ার মতো সাদা
একলা ঘরে তোমার মূর্তি গড়ি,
মূর্তি গড়ি বুক ভর্তি কাদা।

মনে হয় 'সাদা' ও 'কাদা' এই দুটি বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত শব্দ দুটির জন্য নয়, এমন সম্ভাবনাপূর্ণ মিল ছাড়া এই কবিতাটি অসম্পূর্ণ প্রয়াস বলে বিবেচিত হত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এই সার্থক মিলের প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। সুভাস মুখোপাধ্যায় বা দিনেশ দাসও মিলবিহীন কবিতার চেয়ে মিলযুক্ত কবিতায় বেশী স্বচ্ছন্দ। অর্থাৎ এদের Poetic diction-এর প্রশ্নে অন্য আর সব সফল কবির মত মিল নির্মাণ পদ্ধতিও বিচার্য হবে।

'পূর্বাশা পত্রিকার মাঘ' ১৩৫৮ সংখ্যায় একজন অজ্ঞাতনামা আলোচক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন — 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন একজন কবি যিনি বুদ্ধদেব বসু এবং জীবনানন্দ দাশকে সামনে রেখেও নিজে নিজে খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছেন।' একথা ঠিক যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বক্ষেত্রে নিজের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। এবং সেটা ছিল তার প্রাথমিক পর্বের চেতনা ও ভাবনার বিশিষ্টতায়। ঐ আলোচনারই অন্যত্র আলোচক আরো লিখেছেন — জীবনানন্দ দাশের যে সব কবিতাকে আমরা সুর-রিয়্যালিজম্ আখ্যা দিতে ইচ্ছা করি সে সব কবিতারও আবির্ভাব মনের অবচেতন স্তর থেকেই আর তার জন্য জীবনানন্দ এক আশ্চর্য ভাষাও তৈরি করেছেন। সেই তৈরি ভাষাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক কবিতায় ব্যবহার করে গেছেন।' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দীয় ভাষাবিধিগত সাদৃশ্য ঠিক নেই। সে প্রচেষ্টাও নেই। তবে ভাষার ধরণগত কোন সাদৃশ্য কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য সেকারণে তিনি স্মরণীয় কবি-ব্যক্তিত্ব নন। কবির সংবেনশীল সমাজমনস্ক কবিমন ও তার নিখুঁত সরল প্রকাশভঙ্গিই তাকে স্বতন্ত্র বাক্‌রীতি সৃষ্টিতে ও তার প্রতিষ্ঠা দিতে, স্মরণীয় হতে সাহায্য করেছে। যদিও —

মাথার ভিতর শুধু স্মৃতি ঘোরে। শিয়রে, পায়ের কাছে

ইচ্ছেগুলি সাপের মতো অন্ধকার, আর ঘুমের ভিতর স্বপ্নগুলি পারে না নিঃশ্বাস নিতে।

পড়তে পড়তে জীবনানন্দের কোন কবিতা মনে পড়ে যেতে পারে। সে সাধারণ সাদৃশ্যমাত্র। কিন্তু তাকে কবির diction হিসেবে ধরে নিলে ভুল হবে। আমরা আগেই দেখেছি যে, কোন কবির Poetic dictionটি স্থিরকৃত হয় কবির মেজাজ, সংস্কার ও বিশেষভাবে চিন্তাপ্রবাহের ওপর। এবং সে ক্ষেত্রে কবি তার অনুকূলেই শব্দকে ব্যবহার করে পদগুলিকে বিন্যস্ত করে দেন। বিশেষ রীতি সৃষ্টি করে ধ্বনিপ্রবাহ নির্মাণ করেন। বর্তমান কবিতা প্রসঙ্গে যেটুকু ধরণ — তা জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তি —

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয় — প্রেম নয় — কোন এক বোধ কাজ করে।

তার অতিরিক্ত কিছু নেই। আর পদ নির্মাণকল্পে ভাষারীতি ও ভাষাপ্রকৃতিতে দুই কবিতে বিস্তর ব্যবধান নয় — অন্যস্বাদ, অনাতৃপ্তি, ভিন্ন প্রবহ। জীবনানন্দ যেখানে নরম করে প্রবহমান রাখেন একই চিন্তার অস্থির কণা-অনুকণা, এবং যা শেষপর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এনে দেয় না প্রায়ই। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেখানে সরাসরি উদ্দিপীত করে তোলেন ও দ্রুত সমাপ্তি ঘোষণা দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ করেন। আর সে কারণে এই কবি — ভাষাকে হতে হয়েছে সরল ও প্রায় আভিধানীক অর্থনির্ভর।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় উত্থিত ধ্বনিগুলি রেশহীন এবং বিচ্ছিন্ন। প্রবহমান কখনই হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ কোন একটি শব্দের সঙ্গে পরবর্তী শব্দটি ধ্বনিগত সংযোগ রক্ষা করে না। অথবা একটির জন্য নির্দিষ্ট অর্থ অতিক্রম করে পরবর্তী শব্দটিকে তেমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে প্রভাবিত বিকশিত ও আলোকিত করে না। শব্দের সঙ্গে শব্দের গোপনীয় কোন চুক্তি সাধিত হবার লক্ষণবিহীন। কবিতায় শব্দ তার অভিধানের নির্দিষ্ট অর্থ অতিক্রম করে না অনেক সময়ই। এ তার শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা। অবশ্য তার জন্য কবিতাগুলি ব্যঞ্জনা হারায় না। আসলকথা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্মল ও সরল বাক্যবিন্যাসে বিশ্বাসী।

মনে রাখতে হবে কবিতায় উপস্থিত সমস্তরকম ধ্বনি-নিয়ন্ত্রিত ভাবে কবিতার ভাবের ব্যঞ্জনার দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এবং কবি সর্বদাই অর্থযুক্ত শব্দকে নিজের উপাস্য ভাবনার অনুকূলে সজ্জিত করে ক্রমে লক্ষ্যে স্থির হন।

শ্রাব্যতীত ধ্বনিই আমাদের হৃদয়ের কান দিয়ে শুনতে হয়। এবং সংলগ্ন ধ্বনিটির সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিলে তখনই ব্যঞ্জনার সঠিক অবস্থানে পৌঁছন যায়। আবার ধ্বনিগত আবেদনে গ্রীষ্মকালীন দাহকে লাবণ্যবিজয় বিবর্তিত করেছেন কেউ কেউ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের একজন। উদাহরণ দিচ্ছি —

তোমরা ফিরে যাও! কোথায় দ্বারকায়
নারীর দেহমদে পশুরা লুব্ধ;
কোথায় শিশুকেও জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়
আহত নেকড়েরা, এমনি যুদ্ধ!
কি হবে ঘুম থেকে সে-হেঁটে গেলে?
সুদর্শন আমি দিয়েছি ছুঁড়ে ফেলে।

*  *  *

বলো না কথা পাখি, আস্তে ঝরো ফুল,
ঘুমের রাত আসে। শান্তি শান্তি!

দিনেশ দাস প্রথম যৌবনে গান্ধীবাদকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম পাঠ নিলেও পরবর্তী একটি বিস্তৃত কালখণ্ডে তিনি মার্কস-ইজমের দ্বারা সরাসরি পরিচালিত ছিলেন। অবশ্য শেষ জীবনে এই দুই মতবাদই তাঁর কাব্যপ্রেরণার বহুদূরবর্তী ছিল। পার্থিব সরলীকরণ অনুভূত হতে থাকলেও তা হলো বিচার বিশ্লেষণহীন। চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় খুব দূরগামী হতে চান না তিনি, পাঠকের কল্পনা ও মননশক্তির খুব বেশি প্রসারও দাবি করেন নি।' তার কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

কবে তুমি চকচকে তলোয়ারের মতো
ভোরের আলোয় জ্বলে উঠবে,
অন্ধও দেখতে পাবে সেই আশ্চর্য আলো,
দেখা যাবে ছড়ানো আমের মতো
একটি টসটসে নিটোল সকাল।

উদ্ধৃতির শেষ দুইচরণে যে চিত্রকল্পটি আমাদের সামনে বিকশিত হতে দেখি, তার স্মরণ সামর্থ থাকলেও বিস্তৃতি নেই। জৈব আকর্ষণের ইশারা শূণ্য একটি আদর্শায়িত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এখানে। যার জন্য এই বাক্‌রীতি চালিত কথা-ভঙ্গির মত শোনায়। তবে কাব্যিক ইশারাটুকু তিনি অনায়াসে পাঠকমনে

প্রবেশ করিয়ে দিতে যে, পছন্দ করেন তাও বোঝা যায়। সে জন্যই কোন একটি মতাদর্শের আশ্রয়ে বিশ্বস্ত থেকেও পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তিনি প্রতিবাদী অথচ নির্জন —

কাস্তের মুখ ভ'রে ওঠে আজ ফসল কাটা-গানে
তোমারই নামেতে
কামারশালার হাতুড়ি উঠেছে মেতে
তোমার নামে
আকাশ জুড়ে কে রামধনু আঁকে তুলির টানে,
শত বছরের বাঁকা পথ বেয়ে স'য়ে কত হয়রানি
রাশিয়ার রেড স্কোয়ারের কাছে কখন এসেছি আমি,

কমরেড, তুমি কবরে ঘুমিয়ে আলো করে কাঁচঘর —
স্বপ্ন তোমার পেরোয় তেপান্তর,

সাময়িক উত্তেজনাটুকু কমে গেলে — অনেক কবিতাই মাধুর্য হারায়। স্মরণীয় থাকে না। কবিতার চিরন্তনত্বের প্রশ্নে ভাষা অন্যতম উপাদান। ভাষার অমিত শক্তি হারাবার নয়। সেই উদ্দেশ্য মত কবিরা স্বেচ্ছাচারী ও নিষিদ্ধ আয়োজনেও শব্দকেই অনুগত করে রাখেন, প্রয়োজন যাই থাক। শব্দ বা বাক্যবন্ধ অনুগত দাসত্ব স্বীকার করে বার বার। আর এই সুযোগমত কবিরাই পারেন নিজের উদ্দেশ্যে অনুগামী করতে। আর এসব অবশ্যই শিক্ষিত কবিকর্ম। অশিক্ষিত কবির যা অনায়াত্ত থাকে চিরদিন। দিনেশ দাশ নিঃসন্দেহে শিক্ষিত কবি। ( এই শিক্ষা শুধু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নয়, নয় অন্যের মুখস্থ পাতে বসে খাওয়ার পরিকল্পনা ) শুধু উদ্দেশ্যমত লিখে যাওয়া কবিকর্ম নয়। সেই নত কবির দায়িত্ব থাকে ভাষার সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা-অনুশাসনাবলী জেনে নেওয়া। দিনেশ দাশ তা জানেন —

দক্ষিণ দিক যত ইঙ্গিত দিক
দক্ষিণ হাওয়া দিক যত হাতছানি,
ও পথে বন্ধু হবে জানি রাহাজানি
উলটো মড়কে চ'লো ঠিক নির্ভীক।

এই পদবন্ধে শব্দের, বাক্যবিন্যাসের পদ্ধতি বয়নে অতিরিক্ত ইশারাটুকু নেই। যা আছে তা স্পষ্ট নির্দেশ। সরাসরি সংক্রামিত করার স্পৃহা। অথচ অতিরিক্ত বন্ধনের ভিতরই ফুটে উঠেছে কবির Poetic diction-এর বিশেষত্বটুকু। তিনি

প্রধানত শব্দকে মেপে ব্যবহারে বিশ্বাসী। আবার তা সাধারণের জানা বোঝার অর্থের বাইরে নিয়ে যাবার প্রত্যাশাহীন। তার কবিতায় শব্দকে শাসিত করবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টাও নেই। যা আছে তা প্রতিদিনের কথা বলাবলি — প্রেমের প্রকাশেও অবিকল নিত্যকথন।

আমি তোমার পাশে নিঃশব্দে বসেছিলাম।
তখন বিকেলের কনে-দেখা আলো
পড়েছিল তোমার মুখের ওপর।
আমার বুকের ঢেউগুলি ছন্দের ভঙ্গিমায়
ওঠা-নামা করছিল
যেন এক পবিত্র স্তোত্রের মত।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি মন্তব্য এমনই 'বর্তমানকে প্রতিবিম্বিত করার নামে এ যুগে অধিকাংশ কবিতা বাক্‌চাতুর্যের অর্থহীন অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সেই নিষ্ফল আতিশয্যের অরণ্যে দিনেশ দাশের এক একটি বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদের মতো। জটিল আধুনিক মনের সমস্ত প্রশ্ন, প্রেরণা ও প্রত্যাশা তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত কিন্তু তার সকৃতা কোথাও ক্ষুণ্ন নয়।' দিনেশ দাশ প্রায় সময়ই তার কাব্যভাবনার ও চেতনার সহজ প্রকাশের ভিতর শব্দকে পাইয়ে দিয়েছেন নতুন সময়ের — নতুন রকমের অর্থদীপ্তি। স্মিত উচ্চারণে তিনি অভ্যস্ত বলে, ভাষা ব্যবহারেও শান্ত। উদ্ধত, ক্ষিপ্র শব্দগুলিকে নাড়াচাড়া করেছেন পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে, অর্থ অভ্যাস মেনে ও নীচুস্বরের কোমল প্রবহমানতায়। যখন পড়ি —

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।
চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির-মাটির যুগ উর্দ্ধে।

দিনেশ দাশ নাগরিক কবি হয়েও সমর সেনের মত সব অর্থে নগর কবি নন। আর তাই যান্ত্রিক ধ্বনির ব্যবহার তার কবিতায় অন্যমাত্রায় এসেছে। সৃষ্টি করেছে এক সুরেলা পরিমণ্ডল। □

## বাসুদেব দেব

### পুরী ভ্রমণ

বালির ভিতর থেকে উঁকি মারে লাল কাঁকড়া-টি
যেন বায়োপসি রিপোর্ট থেকে উঠে আসে
ছুটির সমুদ্র দিন খেয়ে নিতে
খেয়ে নিতে ঘিলু মজ্জা স্বপ্ন শাঁস
সমুদ্রের পারে আর অসুখের কথা কেন তোলে।

শিল্পের ভিতর থেকে উড়ে গেল কাঠঠোকরা পাখি
এইবার এসো সব প্রতীক রূপক ফেলে রেখে
সমুদ্রের পারে শাড়ি জামা
খুব কাছাকাছি হোক দেখাশোনা জন্ম ও মৃত্যুর
তৈরি হোক ভালোবাসা নক্ষত্রের থেকে দূর
চোখের তারার মতো কাছে

এখনো চূড়ান্ত নয় ফেরার টিকিট
কথা আছে আরো কিছু কথা বাকি আছে

## শ্যামল কুমার নাইয়া

### ওরে মন

যত দূরেই যাও আকাশ বলে না কথা
শুধু নীল..... নীল নীরবতা
তবে কেন ? কেন এত ব্যকুলতা

যত কাছেই যাও মূঢ়, মূক
স্থবিরতা ছাড়া কিছু নেই তার
তবে এত আকুলতা কিসের ?
ওরে মন, মনরে আমার
তোকে নিয়ে যত দ্বন্দ্ব জটিলতা।

## রবীন্দ্র গুহ

### এ-শহরের কবি

কলকাতার কোন ব্যাপারেই 'না' নেই, ধর্মের পুরোহিত সিগারেট ফুঁকে
খানিকটা ঈর্ষায় খানিকটা লোভে, প্রাথমিক বিস্ময়ে, লাবণ্যলুপ্ত
কলকাতার মেয়েদের ছায়া মাপে। সদ্য তাজা মাংস পিণ্ড
পাখির ঠোঁটে তুলছ। গঙ্গার জলে লোধ্ররেণু. ঢেউ জড়ো হচ্ছে হোক
ছবি তুলবে কেন ? যাও, গন্ধে ছিন্নভিন্ন হও আম্রমুকুল নিয়ে বুকে।
তোমার কালোহলুদ কপালে অনেক পুরস্কারের চিহ্ন আছে,
খয়রি দু পাটি দাঁত ছিদ্রহীন — সামলাও তা।
এক্ষুনি ধর্মের পুরোহিত আসবে — তোমার নাম ধরে ডাকবে,
মেয়েরা হাসতে হাসতে বলবে : এ-শহরে কদাপি আসেনি সালমান রুশডি
এলে আমরা নির্বিঘ্নে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতাম. শহর শ্রেষ্ঠ
এ-শহর কবিদের মেজবাবু সেজবাবু আর্দালীবাবুদের।

## চন্দন চট্টোপাধ্যায়

### উদ্বেগ

১.

কালো চোখ ধুয়ে এসো ; প্রতীকী ফেনায় জেনো
প্রবাহের চোরাস্রোত নেমে আসে গালময়।
দুহাতে পিছল নীল — মানবাধিকার যেন
মিশে যাবে উঠোনেই, ওগো ভরাট সময় !

২.

সাগরের ঢেউ, তুমি কখন বলবে — আঁকো
পৃথিবীর লোনামুখ কাউকে ফেরায় না।
ঝিনুক ছড়ানো পথে দুপাশেই জল-সাঁকো
আমি হাঁটি তুমি হাঁটো কাউকে মানায় না ॥

CENTRAL LIBRARY

বসু ভদ্র

## দাঁড়ের ময়না

দাঁড়ের ময়না কথা তো কয় না
একটা বুলি-ই জানে
ঘুম ভাঙাতে, ঘুম পাড়াতে
সেটাই বলে সাঁঝ-বিহানে।

উচ্চকিতে কেউ যদি বা
হাসে কিম্বা কাঁদে
ময়না শুধুই বুলি আওড়ায় ঃ
রাধে কৃষ্ণ রাধে !

মানুষ মরে, বাজার জ্বলে
পোড়ে হাজার গঞ্জ-গ্রাম
জনরোষের বেলুন ফাঁসে
আন্দোলন তো লুঠের নাম।
লুঠেরা আসে বখরা নিতে
লোভের ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে
পোষা ময়না কথা কয় না,
বুলি আওড়ায় ঃ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রাধে।

সেপাই আসে উঁচিয়ে ডাণ্ডা
শান্ত্রী সবায় করবে ঠাণ্ডা
বখরায় যেন ঘাটতি না হয়
হয় নাকো ভুল ভ্রান্তি
ননী ও মাখন মুরগী আণ্ডা
ভাগ করা চাই কড়ায় ক্রান্তি।

দাঁড়ের ময়না কথা তো কয় না
দেখে না কে হাসে, কাঁদে, —
আপন মনেই বলে অবিরাম
রাধে কৃষ্ণ গো রাধে !

CENTRAL LIBRARY

# মৃণাল বসুচৌধুরী

## অন্তিম যাত্রার দৃশ্য

কিছু ফুল
কিছু মালা
মাথায় অস্পষ্ট এক চন্দনের টিপ
শবদেহ ঘিরে
নতমুখ শশ্মান বন্ধুরা
বিদায়ের এমন আবহে
নেই কোন স্মৃতিময় শোক
শরীর ফুঁপিয়ে ওঠা
অন্তহীন কান্নার আওয়াজ
নেই হরি ধ্বনি
নেই ছড়ানোর মতো খই
দীর্ঘশ্বাস
থমথমে দুঃখ মাখা মুখ
শব্দহীন চরাচর শুধু কিছু মালিন্য ছড়ায়

নিস্পন্দ শরীর থেকে
ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে
নিজের বিষণ্ণ ম্লান
অন্তিম যাত্রার দৃশ্য দেখে আজ
কষ্ট হ'ল খুব
আড়ম্বরহীন জীবন যাপনে পটু
হতভাগ্য
পরাজিত মানুষটার জন্য কেন যেন
কান্না পেল আজ

আর্কিড/১৭৪

## দেবব্রত দত্ত

### বনে যাই যদি

আমি কি তা' হোলে যাবো বনে ?
বনে যাই যদি
সেখানে কি জুড়াবে হৃদয় ?
না যদি জুড়ায় ?
সে বনেও বাঘ থাকে যদি ?
মৃতকে কি খায়, কোনো বাঘ ?
যদি খায়, তবু
মৃতের সম্বিত থাকে নাতো !
রক্ত মাংস খাওয়া হোলে পর
যা থাকে তা' শুধুই জঞ্জাল ;

তারপর আবর্জনা হয়ে
ঝলসাবো দারুণ রোদ্দুরে।

## দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

### অবলুপ্তি

না থাকার শর্তগুলো চেপে
অপ্রেমের তাপে-উত্তাপে পুড়ছে শরীর
সেই মুখে পর্দা টেনে শূন্যতার ব্যালকনি
ঘিরে আছে প্রৌঢ় রোদ্দুর।
সেইখানে মাঝে মাঝে ভ্রমর এসে বসে।

অভ্যাসের হাত ছুঁয়ে দেখে আরো এক ধৈর্য্যচ্যুত রাত
কিভাবে ঢুকে যায় দিনের গুহায়।
আর হঠাৎ বৃষ্টির মত ইচ্ছে শক্তি ঝরে।
পুরনো অভ্যাসে জ্বলে ওঠে থাকার অপেক্ষা।
শর্তহীন অন্তরীক্ষে পাশাপাশি ভিন্ন অন্ধকার
আজো ভেঙে ভেঙে জমাট পাথর !

কিছুটা তফাতে দিন গোনে অযান্ত্রিক ভিটে।

## মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

### সময় ও সূর্যের কাছে

বুকের গোপন রক্তে উজ্জ্বল মৌসুমী খেলা করে···

ঝড়ের প্রহরে তাই আগুনের বিষুব রেখায়
বাঘের চোয়ালে বসে স্বপ্ন দেখি
স্বপ্ন দেখে দেখে শিল্প ও শস্যের কাছে পৌঁছে যাই
আমাকে বুকের ভালবাসা ঢেলে দেয় ধান আর নারী।
জীবন তো জেনে গেছে সব কিছু পদ্ধতি প্রক্রিয়া রাজনীতি।

সময় ও সূর্যের কাছে তাই আজও দায়বদ্ধ আমি
প্রকৃত অঙ্গীকারে
ফুলের পাপড়ি থেকে তুলে নিই গানে
যে গানে নিহিত আছে ভ্রূণ বীজনের মন্ত্র
সুন্দরের স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ।

আমার ভুবন স্বপ্নের বিস্তৃতি আনে শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময় স্নিগ্ধতা।

## মানসকুমার চিনি

### যে কবি

যে কবি অসহায়
তার হয়ে একটা অক্ষর আকাশ
কিছু শাদা পাতা রেখে গেছে
আর অতি সব বিষাদে ঢাকা মেঘ।

উড়ে যায় পাতার ওপর দিয়ে
মেঘের ভেতর
কবির শরীর জুড়ে যতটুকু
শ্বাস প্রশ্বাসে ফাঁক থেকে গেছে
সে শুধু বিভ্রম তরবারির মতো।

CENTRAL LIBRARY

# রাণা চট্টোপাধ্যায়

## 'উত্তরা' দেখে

দু'জন লড়ছে ধুলো মেখে
নির্বোধ লড়াই
পর্ণমোচি গাছ পাতা ঝরায়
প্রতিদিন পাতা ঝরা দেখে সকাল।

এ-সব দেখতে দেখতে
ট্রেন যায়
নিতাই আর বলরাম গ্যাংম্যান
ফিরে এসে আবার কুস্তি লড়ে
দিন যায় রাত যায় তারা নিজের মনে থাকে
লড়াই ছাড়া কিছুই জানে না

এরই ভেতর সে আসে 'মেয়ামানুষ'
বলরামের সঙ্গে নিতাই ফোঁসে
পাদরীবাবা দেখে ছোঁ-নাচের দল দেখে
আদিম সুর ওঠে
তারা লড়ে নির্বোধ লড়াই।

একদিন পাদরীবাবার শরীরে
শহর থেকে আসা সমাজ বিরোধী
কেরোসিন ঢালে
'উত্তরা' দেখে এ সময় স্টেইনস্-এর কথা
মনে হলো
মনে হলো কেউই কোন কথা শুনবে না
শুধু নির্বোধ লড়াই করে যাবে
নিতাই আর বলরাম অকারণ পরস্পর
আর পর্ণমোচি গাছ থেকে
প্রতিদিন পাতা ঝরে যাবে।

CENTRAL LIBRARY

উত্তরাও মারা যাবে
পাদরীবাবার মতো, নাকি খুন ?
কেউ বাধা দেবে না
মুখোশ পরা লোকগুলোও দেখবে
ধুলো মেখে লড়াই করবে
নিতাই ও বলরাম ।

এসব আমরা দেখি প্রতিদিন
কোন প্রতিবাদ করি না
এ দেশে আমরাও পর্ণমোচি গাছ বুদ্ধদেব,
তবে, চার বুড়োর মতো
আমরা আমেরিকা যাব না
এখানেই থাকব
শত-শত পাদরীবাবা আর উত্তরা নিহত হলেও
একদিন নিতাই ও বলরামের নির্বোধ লড়াই
বন্ধও তো হ'তে পারে !

## মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

### পথ চিনে চিনে

যে তন্বী একদিন তীর ছেড়ে
ভেসে গেছে ভুল ঠিকানায়
দীর্ঘ পথের বাঁকে ।

সে আবার ফিরে আসবে
কোন একদিন
তীর ভূমি ঢেউয়ে ঢেউয়ে খয়ে গেছে
এখন নদী

তবুও কিছু স্মৃতি পড়ে আছে
ফিরে আসবে সেই পথ চিনে
নোঙর বাঁধবে এই ঘাটে ।

# দীপেন রায়

## অন্ধকারের সুড়ঙ্গ

মানুষকে যে ভালোবাসেনা, তেমন মানুষের আঁচলায় জল ঢালতে আসে
একজন মানুষ।

অন্ধকারের ভিতর তো ফুটে ওঠার যন্ত্রণা :
কুঁড়ি থেকে ফুলে,
অন্ধকারই তো লুকিয়ে রাখে মানুষের গুণ ও গুণাবলী :
এক বিদ্যাসাগরের হয়ে ওঠা।
আমাদের অনেক মানুষের ভিতর সেই দম আঁটা অন্ধকারের কিলবিল
আর অন্ধকারের শিকড় ধরেই তো আমাদের ঝুলন
সেই বটের ঝুরিতে দোল খাওয়া
ন্যাঙটো বয়স থেকে।

জ্যোৎস্না উঠতে পারে — আবার নাও পারে
ও-সব ভেবে কি আমরা উৎস থেকে হাঁটা দিয়েছি :
ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে।
পুকুর তো আর নদী নয় যে তার জলে, উঠবে নামবে ঢেউ !

আমরা এবার নদীর পথে যাবো
জোয়ার ভাঁটার জলে, পাশে পাশে,
পৃথিবীর একদিক থেকে আরেক দিক :
আঁতুর ঘরের দরোজার মাটি থেকে চাঁদের ওপর, পাথরে।
অন্ধকার থেকে আলোয়
নীরবতা থেকে কোলাহলে
বালি-পাথর-বরফের পথ ভেঙে মাটির ওপর, ঘাসে
কুমড়ো আর ঝিঙ্গে ফুলের পাশাপাশি পুঁই মাচা
আঙুর, আপেলের পাশে উইলো আর আখরোট
ভেড়াল পালের দরাজ ছোটাছুটি
এ সব একদিন মানুষের হাত, জল পেয়ে ফুটে উঠতো ঋতুতে ঋতুতে

তা, মানুষের হাতের ছোঁয়ায় আদর পেয়ে যত্নে সে আবার বাড়ুক
কাশ্মীরের মানুষের হাতে তোলা কাজের মতো
শীতের পশম বুনে শাল
পূর্ব-পশ্চিম থেকে দক্ষিণের শীত ঢাকতে
বরফপাহাড়ের
আবার ওই মানুষগুলো নেমে আসবে সমতলে প্রবাহের মতো।
ধৈর্য আর বিচক্ষণতা ফুটিয়ে তুলবে হাতের কাজের সঙ্গে কাশ্মীরের মন
সেই মন বড়ো দুঃখের টানেল···

মা শেষ হয়ে গেছে
তাকে পুনর্স্থাপিত করা
আর মা শেষ হয়নি
তাকে ফিরিয়ে আনা।
মানুষের হাতই তো সদুত্তরে সুর তোলে
শালের ওপর কারুকাজের ধৈর্য
তাকে উন্নীত করেছে শিল্পে।

ভিজে মনের ওপর পড়ছে ক্রমাগত
কাজ ডাকার শব্দ,
ধ্বসে ভেঙে পড়ছে বাড়ি
বসতি ও মানুষ,
শিল্পীর আঙুল থেঁৎলে পড়ছে রক্ত
কে তার সান্ত্বনা এ মুহূর্তে
কে ফিরিয়ে দেবে স্তব্ধতার চূড়ো
কবর ও শ্মশানের পর
এ প্রশ্ন করছে মাটি ও জ্যোৎস্না
একই প্রশ্ন বরফ ও রৌদ্রের
আর এই প্রশ্নেই তো ঝিলামের জল শুকিয়ে নুড়ি!

# সাগর চক্রবর্তী

## একুশ শতকে এসে

পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গ্যালো আমি এই কলকাতায় আছি। অথচ জানি না এই কলকাতা-দেশে, রাস্তায় রাস্তায় রোজ কতো লুচি ভাজা হয়! বলো, জানা কি সম্ভব? তা ছাড়া, কি হবে জেনে সেই সব লুচি বা কচুরি-পরোটা কারা খায়! ক্রেতা বা বিক্রেতা সব মানুষের যথার্থ ঠিকানা, বিশ্বাস করবে কি, আমি এ বিষয়ে খোঁজখবর কিছুই রাখিনা, যাতে করে সেই সব তত্ত্বতথ্য গুলে পেটমোটা গবেষণা গ্রন্থ লিখতে পারি।··· অথচ মানুষই এরা সব। ঠিকানা আছে কি নেই? কার পকেট ভর্তি অতো সময় রয়েছে, বলো! সত্তার আলোকহীন অনাত্মীয় অন্ধকারে কে কার ঠিকানা ধরে রাখে!

অনেক ঘুরেছি আমি কলকাতার রাস্তায় গলিতে। অনেক চড়েছি আমি ট্রাম-বাসে অটোরিক্সায়। লোকের মুখের দিকে চেয়ে, শোনো, অপলক চেয়ে, বুঝতে চেয়েছি আমি কে কতোটা সুখী কিম্বা দুঃখী। তাদের কথার টুকরো, হাসি, স্পর্শ, গন্ধ কিম্বা দ্রুততা ব্যস্ততা জুড়ে জুড়ে, প্রত্যক্ষ ঠিকানা কিছু প্রমাণিত হয়নি মানুষের। না, পরোক্ষ ঠিকানাও নয়। নিজেকে অনর্গল খুঁড়ে শুধু এটুকু বুঝেছি — বস্তু, স্রেফ বস্তু বনে গেলে মানুষের হৃদয় বলেতো আর কিছুই থাকে না। কাজেই, গভীর সূর্যোদয়, পণ্যের স্বভাব নিয়ে রহিত আনন্দ বোধ বোধির বিষয়ে।

যে সব মিছিল যায় সৃজনের অথবা ধ্বংসের দাবী নিয়ে, যে সব মিছিল গ্যাছে, যাবে — মিছিলের ফেটে পড়া শব্দগুলো কারো কি চেতনা থেকে আগুনের বাণী প্রত্যয় ও বিশ্বাসের মূল থেকে উৎসারিত ছিলো! সে আগুন শুদ্ধ করলো না তো। বদলে দিলো না তো দৃশ্য-বাস্তবতা ভিতরে বাইরে! ভিতরে বাইরে শুধু প্রলাপী সোনালি রুপোলি ঝঙ্কার। কারেন্সী নোটের ডানা মেলে উড়বার খসখস শব্দের আকাশ। শত শত মানুষের রক্তে তৈরী হলো নদী··· দুই ধারা··· কালো আর শাদা··· সমান্তরাল! তাই কি প্লাবন হয়ে মানুষের সাবেকি আশ্রয় তার সমস্ত শিকড় খেয়ে নিলো!

ঐ যে তরুণী সুসজ্জিতা, প্রমোদভবন তলে ওকি কোনো মনের হরিণী! সজ্জিত পুরুষ দেখে কুমারীর লজ্জা নিয়ে মোহন হাসির ঢেউ ছড়িয়ে ইশারা দিলো। সে কি অগ্রসর মান ঐ পুরুষের প্রেমিকা-দয়িতা! আদি মাতা কি এই ভাবেই একদিন আদিম পিতার দিকে গিয়েছিলো সভ্যতা বানাতে! বিশ্বাস করবে

কি. আমি স্থির কিছু বলতে পারবো না। আমি শুধু দেখে যাই কোন্ দৃশ্যে কার কি ভূমিকা। নাটক দেখতে দেখতে নাটকের চরিত্র হয়ে ওঠা. আমার তো আজতক সম্ভব হলো না। আমাদের শৈশবের পাঠশালা বিদ্যালয়গুলি বুঝি অন্য রকমের ছিলো !

কিন্তু দ্যাখো. ভাঙা ফুটপাতে ছেঁড়া ফাটা কলকাটা ভোঁকাট্টা একটা ঘুড়ি নিয়ে ঐ ন্যাঙটো শিশুটি. নর্দমায় ফেলে দেওয়া ভাত খুঁটে এনে টিপে টিপে ভাতের আঠায় জুড়তে চাইছে সেই ঘুড়ি. আমি ওকে জন্ম জন্মান্তর ধরে চিনি জানি। আমি ওর হাতে একটা খর মাঞ্জা দেওয়া সুতোর ভোমা লাটাই আর পেটকাট্টি-ঘয়লা-চাঁদিয়াল-চৌরঙ্গী ঘুড়ি গোটা কয় তুলে দিতে পারি। দিলেই ও ভিকিরী হয়ে যাবে. ভারতবর্ষ ! কোনো সংবিধান কিম্বা রাষ্ট্রপতি ওকে বাঁচাতে পারবে না। মন্দির-মসজিদ-গীর্জে বলবে না — মানবপুত্র. এসো. পবিত্র নির্মল শুদ্ধ হও। এই নাও তথাগতের পরমান্ন !

আমি ভাবছি ওর হাতে তুলে দেবো বাল্যশিক্ষা-বর্ণপরিচয়-বোধোদয়-ধারাপাত। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ওর প্যান্ট জামা জুতো আর খাদ্য ভরা টিফিনের কৌটো হলে. বাবুদের ছেলেদের মতো. ফুটপাতের শিশুটিও স্কুলে নিয়মিত যাবে। টেবিল চেয়ারে বসতে শিখে ফেলবে দুদিনেই। কিন্তু তবে. কয়লা-ময়লা কাগজ-প্লাস্টিক শাকপাতা কুড়োতে. ঠ্যালা ঠেলতে. মোটর ট্যাকসী মুছে সাফ করতে কে যাবে. বলো ?

তার চেয়ে ওর হাতে তুলে দিই দিশি বা বিদেশি মারণাস্ত্র ! অস্ত্রই যথার্থ হলে একদিন ও ঠিক ঠিকানা পেয়ে যাবো।

## অমরেন্দ্র গণাই

বাঙ্‌লা ভাষা

শতরূপা. তবু তার শতছিন্ন শাড়ী ;
তোমারি চোখের জলে ভেজে রাজ বাড়ী।
তুমি দুয়োরানী —
পাতারা সে কথা জেনে করে কানাকানি।
চলে যেতে হয় বনবাসে —
তোমার পায়ের চিহ্ন ঢাকা পড়ে মধুকুপী ঘাসে।
সকলেই ভুলে যায় কাঠ কুড়ানীকে —
ভালবাসা জেগে থাকে পাতার প্রতীক্ষে।

CENTRAL LIBRARY

# অনন্ত দাশ

## যে আগুনে…

যে আগুন দীর্ঘদিন গুহার ভিতরে
যে আগুনে সব জ্ঞান হয়ে আছে স্থির
এ-আগুন সে আগুন নয়
এ-আগুনে ঝলসে যায় সমস্ত শরীর…

যে আগুন ক্ষুধা জ্বালে পেটে
যে আগুনে ঘেমে ওঠে চাষী ও শ্রমিক
এ-আগুন সে আগুন নয়
একমাত্র নারী তার জেনে গেছে স্বরূপ সঠিক

যে আগুন চিতার মত জ্বলে অহর্নিশ
এ-আগুন সে আগুন নয়
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে
সেই নারী খুঁজে যায় জলের হরিণ

যে আগুন বৈশ্বানর, বিরাট পুরুষ
যে আগুন সত্যমন্ত্রে ধরেছে আকাশ
এ-আগুন সে আগুন নয়
এ-আগুনে দেখি তার হৃদয়ের ক্ষুদ্র প্রতিভাস

যে আগুন জ্বলে ওঠে বজ্রের ভিতর
যে আগুনে ফেটে যায় আকাশ চৌচির
এ-আগুন সে আগুন নয়
তবু দেখি পুড়ে যায় তিলে তিলে গড়ে তোলা সুখস্বপ্ন ঘর…

## সুভদ্রা ভট্টাচার্য

### শব্দবিপ্লবী

বাতাস কোনদিক থেকে বইলে
কবিতার ধুলো আসে চোখের পল্লব ছুঁয়ে
মাপার জন্য কোন যন্ত্র আছে কিনা জানি না
শুধু জানি নিরুত্তর শব্দ প্রতারণার যুগে
শব্দবিপ্লবী দু'একটা পাখীর মৃত্যুদণ্ড হয় কেন না
তারা জানে না শব্দের প্রতারণা কাকে বলে
শুধু উঁচু ঢিলার থেকে ছুঁড়ে দেয়
সংকেত শব্দবান যা ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে
যেহেতু শব্দকে পাহারা দেওয়ার কেউ নেই
শব্দ ডাকাত লুট করে নেয় শব্দের সৌন্দর্য
তাই মরা ঘাসের ডগায় শব্দ লুকোবার জায়গা খোঁজে
যেন শব্দকে লুকিয়ে রাখার দিন আজ এসেছে

## প্রদীপ পাল

### সংবাদপত্র

চতুর্থ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে যাবার আগেই
নিষ্ক্রমণে চলে যাযাবর পাখি, মানিব্যাগ, ফাইল
চতুর্থ পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে রাজনীতি-সমাজনীতি
ভালো করে আসন পিঁড়ি হবার আগেই
নজরুল-জীবনানন্দ-শক্তি-সামশেরের পুস্তানি মাখাধুলো
শচীনের পিতৃবিয়োগ, সোনিয়ার অভিমান, মুচ্‌কি পদত্যাগ
ভারত হেরে গেলে রাগেনা কেউ আর
অপমানে লাল হয়ে ছেঁড়েনা জামা, কম্বলকাগজ
বড় জোর গালমন্দ-মালাজুতো, আহা, উহু
ততোক্ষণে দরোজায় এসে দাঁড়ায় ঢাকা-বাংলা বাস

খুলে যায় জানালাসকল, জ্বলে ওঠে বাতিদান
ধুলো ময়লা সরিয়ে নিভৃতে ডাকে হৃদয়কলঙ্ক

CENTRAL LIBRARY

# অজিত বাইরী

## বলো, ধর্মপুত্র

বলো, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলো, ক'জনাকে
টানিয়েছো হাজতের ঘানি ?
ক'টি নারীর শ্লীলতা করেছো হানি
থানা-গারদে
সত্যের প্রতিভূ তুমি, মিথ্যাচার, শুনি
তোমার ধর্মবিরুদ্ধ।
তবু মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে টেনে আনো
নির্দোষীদের কাঠগোড়ায়।
নিরস্ত্র নিরীহকে অন্যায় পীড়নে
খুন করতে বাধেনি তোমার।
লক-আপে বন্দিনীর উপর বলাৎকার
করতেও পিছু-পা নও তুমি।
মিথ্যা কেস সাজিয়ে কত জনের গলায়
পরিয়েছো ফাঁসির দড়ি ?
সিগারেটের ছ্যাঁকায় নির্যাতন চরমে তুলে
তারপর করেছো পাশবিক ধর্ষণ ?
আর এসবই ঢাকতে চেয়েছো মিথ্যা কৈফিয়তে
সাক্ষ্য প্রণাম লোপাটে ?
এরপরেও তুমি ন্যায়ের দণ্ড হাতে
ধর্মের ধারক ?
বলো, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলো তবে
প্রকৃত অধর্ম কি ?

# প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়

## চেয়ার

যতো পেরেছো
বেছে-বেছে নামকরা চেয়ারগুলি দখল নিয়ে
বসে আছো — সেই কবে থেকে।

যতো পেরেছো
ভালো-ভালো নক্ষত্রগুলি
আকাশ থেকে পেড়ে নিয়ে সাজিয়ে দিয়েছো
গানের গাছপালা, দিক্-দর্শনের মাঠ-ঘাট
আর কথাশিল্পের আকাশ।

যতো পেরেছো
দামি-দামি আয়না-বসানো জলাধারগুলিকে
ফুস-মন্তর দিয়ে ডেকে এনেছো বুকের কাছে —
তারপর নিজেদের নিমজ্জিত মুখ দেখতে-দেখতে
মেতে গেছো শীতল মৌতাতে।

যতো পেরেছো
আমাদের নির্বোধ মাথার ওপর দিয়ে
খালি পেটের মধ্যে দিয়ে
উড়োজাহাজ আর রেলগাড়ি হাঁকিয়ে
সপরিবারে পৌঁছে গেছো
মানচিত্রের বিখ্যাত-বিখ্যাত নির্জন অঞ্চলগুলিতে।

যতো পেরেছো
তার চেয়ে পারোনি অনেক কিছু।

## দেব ভট্টাচার্য

### জীবন

হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে অনুভব
করার নাম জীবন।
মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি
খেলার নাম জীবন ?
দুঃখের অন্ধকারের তলদেশে শুয়ে
স্বপ্ন দেখার নাম জীবন।
লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড়িয়ে
আর কষাইখানার পশুর
নিশ্চিন্তে জাবর কাটার নাম জীবন।
ভুখা পেটে ফুটপাথে শুয়ে
খালি আকাশের বুকে
চেয়ে থাকার নাম জীবন।
এই জীবনটাকে দুপায়ে মাড়িয়ে
সুখের 'এল ডোরাডো' খুঁজতে
আমাদের আমৃত্যু লংমার্চ।

## অরূপ পান্ডী

### অন্য ব্যাকরণ

তুমি এ কোন আলো দেখালে ?
রঙীন আভায় ডুবে যায় গৃহকোণ
সব স্বপ্নেরা মিথ্যা হয় না, এক উপমাবিহীন
মিলন মুহূর্তে শরীরীভাষা মনে হয় চিরচেনা
সমস্ত আকাশ নেমে আসে ছোট্ট ঘরে
শব্দেরা আসে বহু ভঙ্গীমায়, লাজুক রোদ।
নৈঃশব্দ নুপুর বাজিয়ে কেন ফিরে যাও ?
মনে হয় মায়ার হরিণ হয়ে টেনেধরি আঁচল
মৌন ইচ্ছায় ও আমার নিজস্ব মনস্তাপে।

CENTRAL LIBRARY

# অভিজিৎ ঘোষ

## রমণের আসঙ্গ লিপ্সায়

"মধ্যদেশ স্ফীত যার, সে নয় জীবন রঙ্গের
নায়িকা রঙ্গিনী…
পৃথুলা নারীকে কোরো না,
তন্ত্রের সাধন সঙ্গিনী…
এক রাশি, একই নক্ষত্র হলে
লিঙ্গ ও যোনির তাপমাত্রা থাকে স্থির…"
সেই পাবে স্থিতি, যে জানে সুলুক সন্ধান…

এইসব গূঢ় তত্ত্বকথা
বলেছেন বহু সুধী, গুণী মহাজন…
যৌবনের উন্মাদনায়, আসঙ্গ লিপ্সায়
গ্রাহ্য করিনি এই জ্ঞানগর্ভ বীজ…

নিজে অন্ধ অভাজন বলে, যত্নে বুঝিনি,
কত শত অন্ধ কামনার অগ্নিস্রোত, লাভা —
কত বিচিত্র মাধ্যাকর্ষণী মনমোহিনী মায়া —
লুপ্ত নয়, গুপ্ত আছে পৃথুলার
অতলে, তলাতলে…

একদিন,
মহানায়িকা মহাদেবী কালিকাকে
মানবীর সামান্য রূপ দিয়েছিলেন
কোনো এক সৃষ্টিধর মহাযোগী…

সম্ভবত তিনিই জানতেন,
এই অতলান্তিক ত্রিপথগামিনীর চোরাস্রোত
কখন কিভাবে টেনে নেবে
শিববিন্দু-বিন্দুরূপ প্রাণরস ধারা…

নিত্য মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাবে
কামরূপা মৃত্যুকন্যারা —

এভাবেই নষ্ট হবে পঞ্চতন্মাত্রের ক্ষুদ্র নশ্বরতা
নষ্ট হবে জাগতিক মায়া···
সৃষ্টিধর সাধক সম্ভবত জানতেন,
শিবকে শবরূপে দলিত করে
কখন এই শিবানী, সহাস্যে শোভনা
এসে দাঁড়াবেন দক্ষিণা মূর্ত্তিতে···

নিজে তুচ্ছ অন্ধ অভাজন বলে
সেদিন বুঝিনি এই গুহ্য-সার কথা···

যৌবনের উন্মাদনায়,
রমণের আসঙ্গ লিপ্সায়

টের পাইনি, কামরূপা মৃত্যুকন্যার
গুপ্ত অট্টহাসি···
কানে বেজেছে সেই হাসি, 'ভালোবাসি,ভালোবাসি···'

## অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

### বাড়ি

রোজ রাত্তিরে দরজায় কড়া নাড়ি
কেউ খোলে না ;
একা একা ফিরে আসি। বাড়ি ?

লোকে তাই বলে। বাড়িকে বলতে হয় বাড়ি।

২.

লোকটা একা ছিল, তেমন কথা নয়
সকলেই একা একা, সকলে বোঝে না তবু।

৩.

খোলার সময় এলে ডাকলে দরজা খুলে যায়।
বাইরে তখন আবছা কুয়াশা,
খোলা দরজা ঢুকে যাচ্ছে শীত।
শীতের ভয় কি ?

# পিনাকী রায়

## কবির জন্যে লিখবো বলে

যার জন্যে কেউ লেখেনি
একটি লাইন, কবির জন্যে
লিখবো বলে সেই কথাটা
আকাশ আমি ছুঁতে পারি।
একপলকে হাতের মুঠোয়
ধরতে পারি সেই গ্রহকে
যে গ্রহতে এখনও কারো
দৃষ্টি আলো বৃষ্টি দিয়ে
শোনায়নি তো নতুন রকম বীজমন্ত্র।

যার জন্যে কেউ লেখেনি
একটি লাইন, কবির জন্যে
লিখবো বলে সেই কথাটা
সারা শহর তন্ন তন্ন
ছুটতে পারি জেট গতিতে।
যে বালিকার চোখের পাতা
ভুরুর পাতায় আঠারো বছর
তার জন্যে রাখতে পারি হৃদয়বাজি
ডার্বি জেতা ঘোড়ার মতো।

সেই লাইন-ই, শুধু সেই লাইন-ই
লিখবো বলে নতুন কলম
সুদূর বনে, যেতে পারি
বুক চিতিয়ে।
যে কথাটা কেউ লেখেনি
কবির জন্যে কেউ লেখেনি
সেই কথাটা লিখবো বলে
কবির জন্যে লিখবো বলে..... ।

## অদীপ ঘোষ

### একটা ট্রাজিক গল্প

লোকটা অনেকদিন ধরে দূরের পাঁচিলখানা টপকানোর কথা ভেবেছে
ছোটবেলায় মা আর বড়বেলায় বৌ পাঁচিলটাকে ভেবেছে শত্রু
অথচ নাভিতে আর হৃদযন্ত্রে ফুসফুসে অসহ্য যন্ত্রণা

নগরীর দৈনন্দিন মৃত্যুদণ্ড কাঁধে নিয়ে সে এবার ঠিক পাঁচিলটা টপকাবে
শীতঘন কুয়াশার ষড়যন্ত্রে সে ভীষণ একা
ফলতঃ তার পা দ্রুত পাঁচিলের দিকে হেঁটে যায়
ওপরে ধরার কিছু নেই
নিচে পা রাখার মত কিছু নেই
তবু গোধূলির ম্লান আলো বেয়ে তার তালু পাঁচিলের শেষ
প্রান্ত ছোঁয়ার আগেই —
পাঁচিলের গল্প শেষ
অনেক পাহাড়, বাড়ি ঘন রাত পার হয়ে সৌরমন্ত্রে লোকটার
ছায়া স্পষ্ট হয়

## অশোক কুমার দত্ত

### ফিনিক্স

প্রাত্যহিকতার বৃত্ত থেকে নেমে আসছে
আরও একটি দিন —
আমাদের প্রিয় শহরে আজ মহামিছিল ।
আজ অবসর ! আজ ট্যুইশান !
ওহে নীলাঞ্জন জানো তো ক্রিয়ার
বিপরীতে প্রতিক্রিয়া —
প্রতিক্রিয়া ! প্রতিক্রিয়া ! প্রতিক্রিয়া !
বল তো প্রতিক্রিয়া কি ক্রিয়া ?
প্রতিক্রিয়া অসমাপিকা ! সবলের লাঠি !
অনুধ্যানে কিশোর ছিঁড়ে ফেলে জপতন্ত্রমালা ।
আগুনের পাখি তুমি !
তোমাকে মন্ত্র শেখায় কোন্ শালা ?

CENTRAL LIBRARY

# বৃন্দাবন দাস

## ফিরে যাবো

পর্যটক ভেবে
দরজা ফাঁক করে কৌতুক দেখবে
ঠিক নয়

অনেক মানুষ
এভাবে আসে না

সারা রাত হু-হ্লোড়ে
মেতেছিলো যারা
এখন গাড়ি বারান্দায়
বে-সামাল ঘুম দেয়

তুমি ঠিক
আমাকে চেনোনি

রাজার বার্তা বইনি ঠিকই —
ভিক্ষুক নয় মোটেই
নোনা সমুদ্রে জলফেলি —
সে আমার নয়

নিভৃতে দাঁড়িয়ে।

চিনে নিতে চাই
মানুষের জন্যে ঠিক কতোখানি
কোল পেতে রেখেছো সত্যি

না হলে ফিরে যাবো
সটান
কানামাছি খেলা
শিখিনি কখনো……

# রমেশ পুরকায়স্থ

## শুধু দু'মুঠো গরম ভাত

আকাশে ঘন-মেঘ, চকিত বর্ষণে আড্ডাটিও জমে ছিল বেশ
অনাবাসী বন্ধু বলে, আমস্টার্ডাম্ এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁয় তাকে
বেঙ্গল মেসিনের বাগদা দিয়ে রাঁধা যে বস্তুটি দিয়েছিল পাতে
নাইন্টিন এইট্টি-ফাইভ কিংবা সিক্স, তার নাকি তুলনা মেলে না।
প্রবল আপত্তি তোলে দ্বিতীয় বন্ধুটি ঃ শিকাগোর পিজা
এক যুগ কেটে গেছে আজো তার স্বাদ, আহা, লেগে আছে জিভে !
ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় তৃতীয় বন্ধুটি ঃ স্বাদ বস্তুটি যে কি
ফরাসীরা জানে ঠিক-ঠিক — পারীর রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখো একবার।

আমাদের সেকেলে বাড়ি — খোলামেলা, চারদিকে সাজানো বাগান
জানলার চন্দ্রাতপে হাসনুহানার পুষ্পিত পল্লব হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে
চুপি চুপি ছড়িয়েছে মিষ্টি গন্ধ আড্ডার আসরে ;
রেকর্ডপ্লেয়ারে বাজে মৃদুশব্দে বিঠোফেন — বিখ্যাত সিম্ফনি
বউঠান ঢুকলো ঘরে গরম গরম চিকেন-পাকোড়া নিয়ে প্লেটে
কোন্‌টি যে কখন দুনিয়ার সেরা খাদ্য কেউ কি তা জানে ঠিক-ঠিক !
সহসা থমকে যায় মিষ্টি গন্ধ হাসনুহানার ঝোপে ঃ 'দুটো ভাত দে মা,
দুটো ভাত দে, সারাদিন একটাও দানা পড়ে নি এ-ছেলেটার পেটে।'

ক্ষণিকের রসভঙ্গ, আবার সবাই ফেরে পুরনো আড্ডায়
আমারই হল না শুধু ফেরা ; বিষণ্ণ চেতনা ঘিরে পাক খায় মিষ্টি গন্ধ
পৃথিবীর যাবতীয় স্বাদু খাদ্যের মনোহরা-ঘ্রাণ ছাপিয়ে
শূন্য জঠরের দাউ-দাউ অগ্নিশিখায় জ্বলে ওঠে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
পাকস্থলি-মোচড়ানো দুঃসহ জ্বালার মধ্যে যখন সারা দুনিয়া
টলমল করে বাষ্পহীন চোখের তারায়
ক্ষুধার্ত ছেলেটার স্বপ্নের আকাশ থেকে নেমে আসে
হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধে ভরা পাপড়ির মতো সেরা খাদ্যের কণা —
দু'মুঠো গরম ভাত, শুধু দু'মুটো গরম ভাত।

CENTRAL LIBRARY

# সঞ্জয় রায়

## সরিসৃপ

আমার দুচোখ বাঁধো এইবার সময় হয়েছে
সময় হয়েছে স্থির চোখ ফেরাবার
বিবরণ দিও, যদি পারো নাগরিকতার, আমি
অক্রান্ত বৈভব থেকে সরে আসতে চাই
আমার দুচোখ বাঁধো এইবার হয়েছে সময়।

এইখানে আছে সব কিছু
ইঁদুরের দৌড় আছে সমানুপাতিক
কালীঘাটে প্রতারক বিবাহের মত
মানুষ রয়েছে ভীড়ে ঘনিষ্ঠ গোপনে
রমণবিপনি আছে সতিসাধ্বি ঘরে
সারমেয় আকাঙ্ক্ষায় বেওয়ারিস অন্বেষণ আছে।

এইখানে আছে সব কিছু
হাভাতে প্রেমিক যায় মরালীর পেছন পেছন
লাথি খায় নির্বাচনে অকর্মন্য কমরেডের মত
এইখানে ঘোলা জলে প্রতিবাদ আছে
অন্ততঃ প্রতিবাদ আংশিক পণ্য হয়েছে।

এইখানে রয়েছে নজির
দেখেছি আমন্ত্রিত কারকে ফেরাতে দূরে দানবের মত
কবি কি নির্লজ্জ ফুল ভেসে যাবে ঠিকানাবিহীন।

এইখানে আছে সব কিছু
শুড়িখানা আছে। রাজা ও উজীর শূলে চড়াবার
গল্প আছে প্রতি সন্ধেবেলা।

লাশ আছে জননীর। আততায়ী সন্তানের মত
অদ্ভুত বৈকল্য নিয়ে দাড়িয়ে সময়
পরিশ্রান্ত অন্তর্বাস পড়ে আছে খোলসের মত বিছানায়
সরিসৃপ হয়েছে উধাও।

সরিসৃপ উধাও হয়েছে।

## কানাইলাল জানা

### ও লোকাল একটু থামো

আজ আর থালায় কোনো খাবার নেই, হাহাকার লেপ্টে আছে। একটু একটু হাহাকার গলাধঃকরণ করে দোথ পা টল্‌ছে মাথা টল্‌ছে। এদিকে তর সইছেনা ক্যালেণ্ডারের তারিখ। শিস দিতে দিতে হাঁকছে ঃ বনগাঁ লোকাল, বনগাঁ লোকাল। কিন্তু আমি তো জানি এই ট্রেন গদ্য লিখতে লিখতে অন্ধকারকে কেমন শাঁসালো করে। এবং যে আমার পকেট থেকে সমস্ত সঙ্গতি তুলে কেবল শূন্য ভরে। আমার একটিমাত্র ঘর ভরপুর শূন্যে শূন্যে। তাই বলিঃ ও লোকাল একটু থেমে আমাকে থামাও।

## চন্দন সেন

### কাছে রাখিনি

[ বুদ্ধি বাহাদুর বাপাকে মনে রেখে ]

ভেণ্টিলেটার থেকে চাতালে
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
একটা মরা পায়রা,

আকাশের অধিকার নিয়ে
যে ডানার জন্ম
সেই ডানা কুঁকড়ে যাচ্ছে
সারি সারি পিঁপড়ে রাক্ষস।

বড় বিপন্ন এই সব দৃশ্য।
সঙ্কোচ আর সঙ্কোচনে
দিক্‌ভ্রষ্ট এইসব নষ্ট বিকেল।
যদি ফিরে যেতে হয়
ছিলায় বাঁধিনি শর তাই
বাসি ফুল, শুকনো মালা
প্রেমের উৎসবে ছাই-দানি,
তাই ভালোবেসে ভালোবাসা
কাছে রাখিনি।

# মিহির সরকার

## একলা আসিস বৃষ্টিরে…

বৃষ্টিরে তুই একলা আসিস
এই বয়সে
মন খারাপের গল্প দেব
রাত্রিবেলা চুপি চুপি একলা আসিস ।

আলো নেভার আগের পর্ব
তোর কাছেই বলে যাব ।
আর কি দেব এই বয়সে
খোলস ছেড়ে প্রতীক ফেলে
দ্যাখনা কেমন বাউল ঘরে
পারাপারের খুঁজছি নদী
বেহুঁশ থাকি গভীর জ্বরে ।

একলা আসিস বৃষ্টিরে
তুই একলা আসিস
একটা কথা মন গহনে বোল তুলেছে
তোকেই দেব —
মুঠো মুঠো মোহর দেব
ওসব আবার আমার নাকি
এখন আমি খুঁজে মরি
এক পোশাকে দেশের মাটি

একলা আসিস বৃষ্টিরে
রাত্রিবেলা চুপিচুপি একলা আসিস ।

## রফিক উল ইসলাম

### মৎস জীবন : ২

দু'ধারে নারিকেল-বীথি. মধ্যিখানে শানবাঁধানো চাতাল, কুলবধূ অপরাহ্নে আলো। জলে-ডোবা ঘাটে উঠে মিটিমিটি দেখি। ঈষৎ পিচ্ছিল হয়েছে গা, গুঁড়িগুঁড়ি শ্যাওলা ঠুকরে খাই। পুব থেকে হাওয়া যায়' পারে। আমিও হাওয়ার সাথে উড়ি. আবার আছড়ে পড়ি জলে। তবুও আমাদের কোনো স্নান নেই! শুধু ওই রৌদ্রের ঝিকিমিকি ধরে ভাসা। একে কি স্নান বলা যায়? অথবা যখন কুলবধূ এক ডুবে অতলের গানে, আমি তাঁর বিচ্ছুরিত শরীর থেকে মায়ের গন্ধ পাই। সে এক অনিয়মিতের ডুব। একে কি স্নান বলা যায়!

## সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

### চিত্রকলার গদ্যপদ্য

১.

রোদে ভেজা, বৃষ্টিতে শুকানো একটি চমৎকার দিন কাটলো বোটানিক্যাল বাগানে। যেন আমরা ছিলাম স্বর্গচ্যুত ইভাদম। সেই চমৎকার দিনে কবিতার মতো সকাল, গানের মতো দুপুর, ছবির মতো বিকেল, স্মৃতির মত সন্ধ্যা। যেন কুয়াকাটা থেকে দেখলাম — চুলের ঝর্ণা, শোনালাম — তোমার রবীন্দ্র পাঠ। তুললাম — পদ্মপাতার থালা. দেখলাম — রোদ-বৃষ্টির খুনসুটি। প্রকৃতিতে চললো — পাখি ও বৃক্ষের পরকীয়া। আর তোমার শরীরের ড্রইং মুখস্ত করতে করতে হয়ে উঠি নেশাগ্রস্ত। এভাবেই আমার কলমে আঁকি তোমাকে।

দ্বিপাক্ষিক দৃষ্টিতে কিংবা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তুমি যদি তোমার তুলিতে তুলে ধরো সেই স্মৃতিমধুর একটি হারানো দিনের আউটডোর ইনডোর ; তাহলে কবিতার মতো রৌদ্রোজ্জ্বল সকলের কী রঙ দেবে, গানের মতো অপরূপ দুপুরের রূপ কিভাবে সাজাবে? ছবির মতো বেদনাক্রান্ত বিকেলের এবং স্মৃতির মতো শূন্য সন্ধ্যার নীরব হাহাকারে কিভাবে আঁকবে আমাকে?

২.

কবে হবে তোমার প্রদর্শনী? তোমার ছবি কিনবো, তোমাকে কিনবো. কিনবো তোমার স্বপ্নসমূহ। শিল্পকলা একাডেমী. জাতীয় যাদুঘর, জয়নুল গ্যালারি সেই অপেয় আছে। যদিও আঁলিয়স ফ্রসেস. লা গ্যালারি কোনটাই ধারণ করতে পারবে না তোমার রূপকলা সমৃদ্ধ শিল্পবোধ।

তোমার স্বপ্নমিশ্রিত চিত্র প্রদর্শনী কোন গ্যালারিতে নয়, তোমার চিত্র প্রদর্শনী হোক কবির চিত্তে। কবিতা কি বুঝবে ছবি তা। ছবি এবং কবিতার সমন্বয়ে সবুজ স্বপ্নে আমরা ভুলে যাব জটিল জীবনের মৌলিক চাহিদা।

## নিখিল ভৌমিক

### ছেড়ে যেতে চাই

কত তো হাত ছাড়িয়ে যেতে চাই
তবু ছাড়ে না
ত্রিশ বছরের জড়াজড়ি
শীতে গ্রীষ্মে বসন্তে
তবু ছেড়ে যেতে চাই
কে আর দিচ্ছে যেতে
স্কুল কলেজের দিনগুলির পর
জড়িয়ে গিয়েছিলাম
নেহাৎ-ই অনিচ্ছায়
জৈবিক প্রয়োজনে
ভালোবাসা গড়ে ওঠে নি
এত দিনের সাজুজ্যেও

আকাশে আকাশে মুক্তি খুঁজি
আনন্দের অখণ্ডতা ?
যে দিয়েছে জীবনের পরিপূর্ণতা
রসদ. জুগিয়েছে নিরাপত্তা
ছাড়তে চাই তাকেই
আত্মনির্ভর হতে হবে
বন্ধন মুক্তিরস্বাদ
ছেড়ে যেতে চাই
বিচ্ছিন্ন হবার আগেই

## অমরনাথ বসু

### পৃষ্ঠা ভরে যায়

রাতের বিশ্রামে ঘুমে সেই রং যেন ঘুমে মুছে গেল
কতকিছুই তো ঘটে যাচ্ছে জীবনে……
কত দুঃখ কত ভুল
জীবনটাকে গোড়ার থেকে শুরু করলে
নতুন করে ভুল হ'ত না
কি এক অলৌকিক মন্ত্রে যেন জীবনের
একটা বিষম অনুপাতের অংক তৈরী করে
জটিল স্রোতে
দীর্ঘদিনের প্রশ্ন আর যন্ত্রণার উত্তরের সামনে
কখন এক গভীর অন্ধকার ছিনিয়ে নিয়ে যায় এ জীবন
অহমিকা. অধিকার. স্বত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে…
গভীর গোপন স্বপ্ন লেখবার খাতা আবার জেগে ওঠে.
পৃষ্ঠা ভরে যায়

## গণেশ ভট্টাচার্য

### ভূমিকা

শুরু থেকেই তোমাকে দেখছি
শুরু থেকেই তোমার বিশুদ্ধ সাদা হাত
মনের স্বচ্ছ জলে ভাসিয়ে রেখেছি।

দেখা কি একভাবে হয়. বল!
যে কোন দেখাকেই এদিক-ওদিক করে
নেওয়া যেতে পারে
যদি ইচ্ছা থাকে
যদি সামর্থের ঘর ভরে ওঠে
তেঁতুলগাছের নিভৃত স্মৃতিতে
শুরু থেকেই তোমাকে দেখছি
ছোট ছোট আলোড়ন
তোমাকে আয়না হতে দিল না একবারও।

## বিশ্বনাথ মাঝি

### সময় নিয়েছে বাঁক

সময় নিয়েছে বাঁক স্রোত বিপরীত মুখী হ'তে চায়
ঘণ্টা বাঁধা বিড়াল এখন এঘর ওঘর ঘোরে
ভাগীরথীর জল মেপে বন্দরের জাহাজেরা সুদূরে হারায়
সমুদ্র উত্তাল দেখে নাবিকের গা-হুম-হুম করে।

ভিজে বিড়াল কিছুই জানতো না
ঘণ্টা বাঁধার লোক ছিল না আগে
মানা বলে কেউ কারেও মানতো না
এখন দেখি তারাই আগে ভাগে।

সময় নিয়েছে বাঁক ধন্বন্তরী এসেছে হালে
কালের দরোজা ঠেলে ঢুকে পড়েছে রোদ
শতমুখী ধারা বয়ে গেছে এক তালে
মেঘেদের আনাগোনা বেড়েছে নির্বিরোধ।

## ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়

### অমৃত ভাগ

এখন বন্ধ থাক অমৃত পান
কিছুটা তৃষ্ণার্ত থাকা ভাল,
ঈষিকার মুখ সরিয়ে
নুড়ি পাথরের উপর বোস,
বহুদিন মেঘ জমেনি আকাশে,
জল শব্দে প্ররোচিত হতে হতে বিক্ষুব্ধ রাত
একা নিঃসঙ্গ
লবণাক্ত সমুদ্রমন্থনে অমৃত-বিষ মাখামাখি,
মনস্ক অন্ধকারে ডুব দিই খাঁড়ির ভিতর
দুই হাতে তুলে ধরি বিষভাণ্ড,
শেষবারের মত নীলকণ্ঠ হয়ে যেতে যেতে বলি
"আমাদের মধ্যে অমৃত বণ্টন করা হোক,
আমরাও অমৃতের পুত্র।"

## তরুণ গোস্বামী

### প্রাকৃত আনন্দ রূপে

১.

তুমি কি নিজেও, কম্পিত ?
পাতা, তুমি অসময়, কি কথা…
বোঝালে যেতে যেতে ?

২.

সে কথা ঈষৎ বুঝে…
অন্য অন্বেষণে, বাউল হৃদয় ;
রোহিনী রাতের আলো ছায়া !
তুমি তার কতটুকু জানো।

৩.

প্রাকৃত আনন্দ রূপে একাকার…
লাবণ্যের রঙ ; জেনে জেনে—
বেনে বউ কবিতা নির্যাস !

৪.

মোমের ভিতর থেকে গলে যাওয়া মোম…
কথা বলে, স্মৃতি রেখে, কাল চলে যাবো।

## শ্যামল কুমার বিশ্বাস

বাদুড়ের ডানার নীচে চামচিকের আর্তি
এটা নয়-কি ভালো
— হুঁ।…
এটা ইস্ কী বাজে
— সত্যি।
তোমার কথায় উঠি বসি যতদিন প্রতিপত্তি
তুমি বললে তবেই সুধা
তুমি মানলে তবেই ক্ষুধা
তুমি থাকতে আমার আবার কীসের নিজের শক্তি ?

কিন্তু প্রভু একটু ভেবে
একটিবার কি জবাব দেবে —
আমার কাছে কী-চাও তুমি,
ভয়, না ভাবের ভক্তি ?
সত্য সে-তো সোনাই
তোমার কথায় কি তার গতি ?

তুমি প্রভু অম্বুনিধি
তবু আমিও তো এক রক্তি ?
একটু ডানা সরাও — বলি :
স্বস্তি ! স্বস্তি ! স্বস্তি !

## নিভা দে

### এই সব মেঘরুচি দিনে

এই সব মায়া-দুপুরে তোমারই তো
আসার কথা ছিল — আরো অনেকেরই—
যখন মেঘেরা শুধু ভিড় করে থাকে—
আকাশের কার্নিশে — ভাবে শুধু
গালে হাত দিয়ে — এক্ষুনি কি—
নেমে পড়া যায় নূপুর বাজিয়ে—
নাকি আরো অনন্তের প্রতীক্ষায়
থাকা ভালো — আরো অনেক—

এই সব মেঘরুচি দিনে — তোমাদের
অনেকের আসার কথা ছিল
তারপর থইফোটা জ্যোৎস্নার ইচ্ছা নিয়ে
ভিড়ে নির্জনে — দেবদারু ছায়া তলে মঞ্জুভাষ
ওষ্ঠে শান্ত করতলে রাখা যায় ওষ্ঠ করতল

তোমরা তো এলে না কেউ — এলো যারা
তারা সব অপছন্দের নষ্ট কেউ—
আমার সকল পূজা আর ব্রত পাঠের
ফলাফলে ঢেলে দিল ক্ষুধিত ব্যথার দুঃখজন— !

## রফিক আলাম

### এ্যালবাম

কিছু সুখ তুলে রাখি,
কিছু ব্যথা মেখে নিই ভাঁড়ার থেকে,
দুধের সর।

সোজা রাস্তার দূরত্ব কমাতে
কানাচের দরজা খুলি,
একদিন বসন্ত এসেছিল গুটি পায়ে,
মন ভালো ছিলনা বলে—
চালতা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিই হৃৎপিণ্ড।

এখন এই দিনান্তে
সিঁদুরে আকাশ দেখে রঙ লাগে মনে,
কার কাঁকন বাজে মাঝরাতে ?
সে যদি ফিরে আসে,
গুপ্ত ঘরের দরজা খুলে
বের করে আনব সুখের চাদর।

## সেখ মোজাম্মেল

### সেই অট্টহাসি

এক ধরনের মাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মদ্যপান যাদের সহজাত প্রবৃত্তি।
চক্‌চকে গ্লাস দেখলেই
ডেকে নেয় পেলিংয়ের মাটিতে।
পুরানো ভালো লাগে না,
রেখে দেয় আলমারীতে,
আবার নতুন···
খিদে লাগলে
চোখ বন্ধ করে হাত বাড়ায়।

CENTRAL LIBRARY

গাছের আড়াল থেকে
তারাই প্রত্যেককে ডেকে দেখায়
দেখ্-দেখ্ সাদা পায়রা দুটো
কেমন বিড়ি খাচ্ছে !

মুখে ব্রণ দেখে সেই অট্টহাসি।

## আব্দুস শুকুর খান

### অনুসন্ধান পর্ব

অন্বেষণের দিন প্রতিঘাতময় বিস্তৃত, বিশাল,
এই বোধাক্রান্ত হয়েছি তোমার চরম শূন্যতায়।
অনেকেই জানে — তুমি যে পথে যাও সে পথে
কিছু দৈহিক ঘ্রাণ রেখেই যাও, কখনও বা অজান্তে
ধূসর পালক ছড়িয়ে রহস্যঘন আবহ সৃষ্টি করো
আর শব্দ-অক্ষরে শূন্য খেলায় নিজেকে খুঁজে ফেরো।

অথচ এবারে শূন্যতা এমন স্বাতন্ত্র যে, অনেকেই
দিশাহীন সমুদ্র ভেবে স্থগিত রেখেছে অনুসন্ধান পর্ব
অনেকেই পথ-ধুলায় নিশ্চিহ্ন মিশেছে, ঘটনাক্রমে।
শুধু আমার সজাগ ইন্দ্রিয় থেকে অনারকম সংকেত
তোমার শূন্যতায় দাঁড়াতেই অনুভূত হল আলোর দ্যুতি
ছড়ালো পালকের সংকেতে হারানো মেঘ-অনুনয়গুলি।

সেই সংকেতে জীবনভর অন্বেষণে অন্বেষতে আত্মক্ষত পান্থর
পথ-ধুলায় ঘুমন্ত শব, জীবাশ্ম সুন্দর-আজও তোমার
গরিমায় জন্মান্তরের বাউল, অনন্তের পথিক-সুন্দর।

সুদূরে কোন বাউলের একতারায় ধ্বনিত হলে ক্ষতগান
আমার অন্তর্মনে বেজে ওঠে অন্বেষণের আলোক-গান
একটি ধূসর দিন শব্দ-নূপুরে করে জন্মের সন্ধান।

## সিদ্ধার্থ সিংহ

### চেনাজানা

ও যে চোখের নিমেষে চূড়ায় পৌঁছে গেল !

জয় মা কালী, তোকে আমি জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবো,
ঝড়ের ঝাপটায় তুই ওকে ফেলে দে মা ।
পাহাড়ে কি আর কোনও মানুষ নেই
যে উঠে ওর পা ধরে ছেঁচড়ে খানিকটা নামিয়ে দিতে পারে ।
আরেকটা চাঁই কী করে ওর সামনে খাড়া করে দেবো
যাতে আরও বড় চূড়া ও ছুঁতে না পারে ।

যা লাগে আমি দেবো
দরকার হলে সারা জীবন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকব
যত পিছু হটতে হয়, হটব
তবু ওকে একবার আটকানো চাই ।

কারণ ওকে যে একদিন দারুণ ভাবে চিনতাম !

## অশোক কুমার রায়

### উদ্ভিন্ন তালপাতার পাখায়

ভিজছে দুপুর—
ভিজছে খেয়া ঘাটের ওপাশে
শ্মশানের ধারে পানকৌড়ি ।
বনের গভীরে এখন
অদৃশ্য নৌকো পাল তুলে
সামলে চলে কালবৈশেখী ঝড় ।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘপুঞ্জ শিল্পীর তুলির মত
ঢুকে পড়ে মানুষের ঘরের ভিতর ।
বালিশের সঙ্গে মিলে মিশে স্বপ্ন এখনো
বর্ষশেষের হিসাব কষে
এই দুপুরের দুপুর ভেজা দুঃখ পাড়ে গিয়ে ।

## স্বপ্না ঘোষ

### ভুলতে পারে কেউ

আকাশ হতে বাতাসের কানে আজও তুমি কথা
বলো সময়ের, হাপরের মতো বুক ছুঁয়ে ।

যে জীবন ছিল এখানে, দেশলাই ঠুকে কতবার
আগুন জ্বালালে নিজেদের মুখে ।

অগ্নিময় হয়ে আলোকিত হল চারিদিক
একাত্তরের অবশেষে সুপরিকল্পিত অন্ধকার নামে,
নিকষ অন্ধকারে হলুদ ধানেরা পরাজিত পরাধীন
চাবুকের ঘায়ে বাবু সাহেবের গোলায় গিয়ে ওঠে—

প্রেমিক কবুতর সেদিন প্রেমিকার ঠোঁটে চুম্বন
সরিয়ে কত না কষ্টের কথা ঢালে ।
যে জীবন ছিল, তা আমি গুছিয়ে রাখিনি
এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে গেল কয়েকটা বছর যেন
চিরায়ত দিক্‌চক্রবালে ।

যেন ওর অঙ্গুলিহেলনে হাপরের মতো বুকের শব্দ
শেষ হবে যৌবনের আকাল ।

হে যুবা, আকাশ দেখেছে শব দেহের ঢেউ
সময় ভোলেনি, আমি ভুলিনি,
ভুলতে পারে কেউ !

## সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়

### আমার পৃথিবী সবার পৃথিবী

আমি এমন এক পৃথিবীতে থাকতে চাই—
যেখানে কোনো দুঃখ নেই
যেখানে কোনো ব্যাধি নেই — যেখানে কারো মৃত্যু নেই—
যেখানে দুজন মানুষের সেতু শুধু ভালবাসা — তার মঙ্গল কামনা চাওয়া
যেখানে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি নেই
যেখানে দুচোখ তাকালেই শুধু ঘন নীল আকাশ আর মেঘ ভেসে যাওয়া দেখা

যেখানে চারপাশে খালি বড় বড় গাছ — গাছে সবুজ পাতা
আর গাছে গাছে রঙ বেরঙের ফুল
যেখানে গাছের ভেতর থেকে ভেসে আসে নানান পাখির কলতান
যেখানে সন্ধ্যে হয় শাঁখের ধ্বনিতে
মন্দিরের আরতির কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে — পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণে—
যেখানে ঘরের আঙিনায় পা রাখলেই সবুজ নরম ঘাসে পা ডুবে যায়
পাশে পাশে হেঁটে চলে পাখিরা — তারা পায়ের শব্দে উড়ে যেতে এখনও শেখেনি
যেখানে শব্দ যন্ত্রণার কথা কেউ শোনে নি
যেখানে কাউকে মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে হয় নি
যেখানে মানুষ বাঁচে প্রকৃতির কোলে
পরম নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে, সুখে শান্তিতে ।

## মুরারী মান্না

### জল ছুঁতে

আজ বুঝেছি
ছুঁয়ে যেতে পেরেছি
কিছুকে

ছুঁতে পেরেছি
কিছুটা সময়

এখন
এই শীতে
জল ছুঁতে তাই
হাত কাঁপে
ভয় হয়
হৃদয়ের ওম নিতে
তাপ বেড়ে চলে
ভয়ংকর শব্দের ঢেউ
বেজে ওঠে
অন্তরীক্ষে ।

## রাজকুমার শেখ

### এই তো সময়—রাম দিয়ে দুঃখ ধুয়ে নেবার

ডুবে আছি ইরার দশটি আঙুলের
আঁচড়ের যন্ত্রণায় ! ভালোবাসায়…
রামের নেশায় বুঁদ হয়ে আছি-জীবন যন্ত্রণায়
শতাব্দীর ঘুম ভাঙুক
আমার কবিতার ছটফটিয়ে ওঠা ব্যাকুল শব্দে !
এসো ইরা, এই রাতে তোমার বুকে মুখ গুঁজে
রাম দিয়ে তোমার চাঁদ মুখ ধুয়ে দিই
ধুয়ে দিই সূর্যকেও ।
তোমার রক্ত হৃদয় রামে পূর্ণ হলে
রাম দিয়ে ধুয়ে নেব আমাদের যাবতীয়
দুঃখ-কথা ।

## শামসুল ইসলাম

### সংসার আঙ্গুরলতা

পুষ্পচয়নে অধিক সাধ নেই, কুড়াব পল্লব,
পল্লবে পল্লবে জ্বেলে অগ্নিকুণ্ড সংসার পোড়াব ।
সংসার আঙ্গুরলতা, শত্রুপুঞ্জ আছে মজ্জমান
নিবিড় নিরবভাবে ; নিস্তরঙ্গ ঘন ঝাউবন ।

এবার শীতের ঋতু দূরে নয়, লাফানো বলের
স্বভাব গতির বেগ সঞ্চিত রয়েছে অঞ্জলির
গভীর গহন কোণে, বাদর হাসিত তীর্থস্থানে ।
পাতাকুড়োনির দল এবার পাবে না পাতাদের ।

এবার শীতের কাল কেটে যাবে অনিদ্র বিলাসে
মাঘের মধ্যম অব্দি খেজুরের রস ঘন হবে ।
বসে বসে ভালবেসে শুষ্কপত্রে আগুনে ফুঁ দেব
ঠিক সন্ধেবেলা আমি এই শীতে সংসার পোড়াব ।

## সুদেব সাহা

### প্রকৃতির সাধ

ঋতু নিয়ে কচ্ কচানি—
অনেক হয়েছে জেন—
শীতকালেও বৃষ্টি হয়
একথা সত্যি মেন।
বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়না
খরায় পোড়ে ক্ষেত
শরৎকালে বর্ষা নামে
রেখনা মনে খেদ।
গ্রীষ্মকালে গরম হবে
এটাই সবার জানা
সুযোগ পেলে যখন তখন
দেয় সে যে হানা।
ঋতুর বিভাগ যতই হোক
কড়া নিয়মে বাঁধা
নিয়ম বিহীন অনিয়মই
প্রকৃতির সাধ হাঁ।

## বাসন্তী গঙ্গোপাধ্যায়

### সেঁজুতি নিভন্ত

সেঁজুতি নিভন্ত, ফুল
কচিত হীরে ঝরে পড়ে
পৃথিবীর ভিজে মাটি কাদার উপর
মানুষের কত দুঃখ-সুখ
— অবান্তর এ প্রশ্ন !
জীবনের কাদাজলে
অবঘূর্ণনের মাঝে দ্রুত সন্তরণ।
বিশ্বস্ত কলোঞ্চটান তটিনীর নয়
শুধু অনাহূত দ্রুত
ক্রমাগত অনন্ত অবধাবন

## গোপাল দে

### জাগাও গাণ্ডীব

গাণ্ডীবের টঙ্কারে পুড়ে শেষ হয়েছিল
খাণ্ডববন।
তবু অতৃপ্ত
আরও আহুতি চায়
উপোষী জঠর,
কারোর রেহাই নেই,
অনন্তের ক্ষুধায়
ভেদ নেই রক্তরসে—
কেউ বেওয়ারিস নয়
সকলেই কৃষ্ণের দান।
দেবতার ভোগ্য হ'লে মোক্ষ পাবে ;.....
কিসের দ্বিধা — জাগো—
অর্জুন গাণ্ডীব নাও ;
আরও খাণ্ডবের লেলিহান চাই,
বড় ক্ষুধা — বড় তৃষ্ণা — বড় জ্বালা
বাসনা তৃপ্ত করো,
এ পৃথিবী দেখুক গাণ্ডীবী শিহরণ।

## সাগ্নিক দেব

### ইতিহাস এলোমেলো

আমার দু'টি হাত যেই ছুঁয়েছে—
আমার মেয়ের খেলনা পুতুল
তখনই, সে কেঁদে উঠলো।

একটা ঘর চাইলো, চাইলো.....
অ. আ. ই, ঈ.....

CENTRAL LIBRARY

আমার দু'চোখ. তখন আড়ালে
ঝরিয়ে দিল অশ্রু.....

আমাদের স্বার্থ. আর খেলনা পুতুলের
অবৈধ্য কান্নায় মিশে আছে
আমাদেরই যোগ্য অপমান

আমাদের স্বপ্ন নেই. ইতিহাস এলোমেলো।

## উৎপলকুমার গুপ্ত

যাই

ধুলো জমে যাচ্ছে ক্রমশ নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে
ফুল
কেউ কি ডাকল ? সে আজ—
এলোমেলো বইছে বাতাস
মৌন নীরবতা ঢেকে ফেলছে স্বর
ঝুরঝুর ঝরে পড়ছে মাটি ঝরে পড়ছে বালি
বেজে উঠছে ডিংডং ঘণ্টা

তবে যাই, দেখে নিই পরিধি তার
আলো অন্ধকারে যার অপার মহিমা
তার কেন্দ্রবিন্দু
তারপর যদি কিছু থাকে তাই নিয়ে
সে কোনও মন্দিরের সমকক্ষ কিনা
একবার দেখে নিই

ধুলো জমে যাচ্ছে ক্রমশ নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে
ফুল—
যাই

অর্কিড/২১১

CENTRAL LIBRARY

# অলোককুমার ঘোষ

## শীতের সাদা রোদ

উঠোন জুড়ে শুয়ে আছে সাদা রোদ
শুকোচ্ছে গৃহস্থের লেপ তোষক বালিশ
সময়টা শীতকাল মাঘের মাস
পিঠেতে তেল মেখে বাড়ির হাঁপানি রুগী
বয়স্ক কর্তা রেখেছে ধরে সমস্ত রোদ পিঠে
সুখ নিদ্রায় যাবে সারা রাতের প্রত্যাশায় ।

এখন উঠোন জুড়ে সাদা রোদ
খেলছে দুরন্ত শিশুদের হাসিতে
বয়স্ক লোকেদের ঠাট্টা তামাশায়
সোনালী ক্ষেতে উড়ন্ত পাখিদের ডানায় ।

সময়টা শীতকাল যেহেতু
উঠোন জুড়ে সাদা রোদ
আমেজ এনে দেয় — গৃহস্থের বিশ্ব সংসারে
শীতের সাদা রোদ শুয়ে থাকে উঠোন জুড়ে
কিছুতেই সে রোদ ভুলেও ওঠে না
গৃহস্থের দাওয়ায় ঢোকে না ঘরে ।

অর্কিড/২১২

# বিকেলে শিউলির ঘ্রাণ

## জীবন সরকার

**ছেলেবেলা**

আমাদের বাড়ীর সামনে ঢোকার মুখে একটা বিশাল শিউলি গাছ আছে। কত বছরের যে কেউ তা জানে না। আমার পিতৃদেবও বলতে পারেন নি কে এই গাছটা লাগিয়েছিল। পিতৃদেব জিগ্যেস করেছিলেন পিতামহীকে সেও নাকি বলতে পারেন নি এই গাছটা কে লাগিয়েছিল। তার মানে বাড়ীর এই গাছটা বহু পুরানো। হয়তো বা গাছটা কেউ লাগায়নি. অমনি অমনি হয়েছে। হয়তো বা কেউ লাগিয়েছে। এই বংশের কোন পূর্ব-পুরুষ। সেই পুরুষটি পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। সেই সময়কার কোন মানুষ আর এই পৃথিবীতে নেই। এই শিউলি গাছের সামনেই হয়তোবা বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ পার হয়ে গেছে। মূল গাছটা হয়তো নেই। তার শাখাপ্রশাখাই মূল গাছ হয়ে গেছে। এই গাছটায় বারো মাস ফুল ফটে। তবে শরৎকালেই বেশী. গাছের একটা ডগাও বুঝি বাদ নেই। ফুলে ফুলে ভরা গাছের নীচটায় ফুলের বিছানা যেন পাতা। গন্ধে সারা বাড়ী ম. ম. করছে। বোঁটাগুলি হলদে লালচে। গাছের আশেপাশে গাছ হলে পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে যায়। কারণ এই জাতের শেফালিকা খুব একটা দেখা যায় না। অনেকে বোটাগুলি নিয়ে রঙ তৈরী করে। সাদা কাপড়ে লাগায়। সেই রঙ শত ধুলেও ওঠে না। শিউলি ফুলের গন্ধে সাপ চলে আসে। মৌমাছি তো আছেই। প্রজাপতিও আসে। গাছের নীচটা আমার মা গোবর দিয়ে ভাল করে ধুয়ে রাখতো। যাতে করে ফুলগুলি পড়লে নষ্ট না হয়ে যায়। উত্তর পাড়ার রাঙামাসি আসতো ফুল নিতে, মালা বানিয়ে ঠাকুরকে দিত। রাঙামাসির সঙ্গে বাসন্তিও আসতো। লম্বা সোজা, পামশু পায়। মাথায় বড় রকমের রুমাল বাঁধা যেহেতু আশ্বিন মাস শীত শীত রয়েছে। তাছাড়া দুর্গাপূজা সামনেই। ওরা কলকাতা থেকে এসেছে। আমি মার আঁচল ধরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। কি যে দেখতাম কে জানে। শিউলি ফুলের দিকে না তাকিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকতাম। মা আমাকে সরিয়ে দিয়ে বলতো। গাছে উঠে ঝাঁকিয়ে দে। ফুলগুলি পড়ুক। ওরা তো কলকাতায় এই রকম ফুল দেখে না।

আমি কিন্তু ভয়ে লজ্জায় জড়োসড়ো। কিছুতেই মার আঁচল ছাড়তাম না। রাঙামাসি ডাকতো —বৌঠান। ও স্কুলে যায় না। যায়, না যাওয়ার মতো।

ফুটফুটে বাসন্তী মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে বলল। ওমা স্কুলে যায় না। এত বড় ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরেছে।

তাড়াতাড়ি মার আঁচলটা সরিয়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত বাসন্তীও আমাকে বলল। আমি দেখছিলাম, বাসন্তী যখন কথা বলছিল ওর ঠোঁট দুটো শাপলাফুলের মতো নড়ছিল। চোখ দুটো কালো মেঘের পাতার মতো। নাকটা যেনো কলকি ফুল। গায়ে যেনো সরষে ফুলের বিছানা। টুকটুকে পুতুল যেনো দাঁড়িয়ে আছে। চট করে গাছে লাফ দিয়ে ওঠে ঝাঁকি দিতেই আরো অনেক ফুল টুপটাপ খই ফোটার মতো পড়তে লাগল। বাসন্তী হরিণের মতো ছুটে ফুল তুলতে লাগল জামার কোচড়ে। আমার আনন্দ দেখে কে। আমি গাছে উঠতে পারি। ফুল পাড়তে পারি। বাসন্তী দেখল, সেটাই আমার কাছে আনন্দ। বিরাট একটা কিছু করে ফেলেছি এটা বুঝতে পারছি। বাসন্তীও খুশি। ওর জামার কোচড় একদম ভর্তি হয়ে গেছে। ফুল পাওয়ার তো একটা আনন্দ আছেই। এক সঙ্গে এত ফুল তো কলকাতায় দেখে না। রাঙামাসি বলল, বৌঠান যাই। বিকালে আসবো দুধ নিতে। ওরা কলকাতা থেকে আমাদের বাড়ী থেকে রোজ দুধ নিত। এটা প্রতিবারের ঘটনা। তার মানে ওদের বাড়ীর সঙ্গে আমাদের একটা সুসম্পর্ক ছিল। বাইরের লোকেরা বুঝতে পারতো না ওরা আমাদের আত্মীয় নয়। আমাদের পুকুরের মা মাছ দিয়ে আসতো। রাঙামাসি কলকাতার বিস্কুট। লজেন্স দিত। ঐ বিস্কুট লজেন্স আমাদের দেশে চল ছিল না। বিস্কুট লজেন্স পেলে সহজে খেতাম না। প্যান্টের পকেটে রেখে দিতাম। ছেন্টু, বনা সুবোধ কে দেখাতাম। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে মুখ টিপে হাসতো। কেন হাসতো সেটা বুঝতে পারতাম না। বাসন্তীকে নিয়ে কিছু কথাও বলতো। আমি সেসব কথায় কান না দিয়ে বিস্কুট লজেন্স পকেটে নিয়ে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় ছুটাছুটি করতাম।

বাসন্তীদের বাড়ীতে পূজা হতো। পূজার কদিন বেশ মজা। ওদের বাড়ীটা বিশাল। বাইরের উঠনে পূজামণ্ডপ। ওখানে গণকঠাকুর এসে একমাস আগে থেকে মাদূর্গা তৈরী করতো। স্কুল যাওয়ার নাম করে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বাসন্তীরা আগে আসেনি। আসবে বলে বাড়ীকর্তা চিঠি দিয়েছে। ঠাকুর বসানো দেখতে গিয়ে বাড়ীর ভিতরে চোখ রাখতাম। দেখতে চেষ্টা করতাম

বাসন্তী এসেছে কি না। ওদের বাড়ীতে দালান ছিল। বাইরের দিক টিনের ঘরের চালা। সাথে দূর্গামণ্ডপ। পাশের ঘরে নাটকের মহড়া চলতো। পূজার কদিন নাটক, যাত্রা, কবিগান হতো। পূজা উপলক্ষে বাড়ীর উঠনে মেলা বসতো। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহুলোক মেলায় আসতো। আমাদের গ্রামের আর কোন বাড়ীতে পূজা হতো না। একটাই পূজা। সেই জন্যেই আনন্দ বেশি।

রাঙামাসি বাল্য বিধবা। বাসন্তীর মার পাতান বোন এই রাঙামাসিই ওদের বাড়ীতে সব সময় থাকে। সকলেই জানে রাঙামাসির বাড়ী। রাঙামাসি নিজের বাড়ী মনে করেই বাড়ীর কাজকর্ম করে থাকেন। কখনোই মনে করেন না বোনের বাড়ী। শুধু কলকাতা কেন! আরো বিভিন্ন জায়গা থেকে আত্মীয়স্বজন বাইরে থেকে আসে। তাদের সকলের দেখভাল রাঙামাসি করেন। রাঙামাসি এমনিতে খুব কাজের মানুষ। সব সময় কাজ করেন। কখনোই মন খারাপ করেন না। সব সময় হাসি খুশিতে থাকেন। অল্প বয়সে আরো নিশ্চয়ই সুন্দর ছিল। এতো সুন্দর। কথা নয় যেনো মিষ্টির ফুলঝুরি। এই রাঙামাসি আমাকে অনেকবার ডেকেছে। কখনো আঁচাড় দেওয়ার জন্য। কখনো পড়বার জন্য। কখনো মাছ ধরবার জন্য আমি কিন্তু কাছে যেতাম না। ভয় পেতাম আসলে আমরা গরীব ছিলাম। আমাদের বাড়ী ওদের মতোন সাজানো সুন্দর ছিল না।

ওদের বাড়ীর সব ব্যাপারটাই আমার কাছে মোহময়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। কি বিশাল বাড়ী। বাইর বাড়ীর ঘর। ভিতর বাড়ীর ঘর ব্যবধান অনেকটা। এই বাড়িতে রাঙামাসি একা থাকেন। আর থাকেন আবলা। বাড়ীর বাইরের কাজকর্ম করেন। ও যে ঐ বাড়ীর কেউ নয়। এই ধারণা আমার তখন ছিল না। ভাবতাম রাঙামাসির আপনজন। আপন না বলে বাড়ীতে কেন থাকে। কে আত্মীয় কে আত্মীয় নয় এই বোঝার বয়েস তখনো হয়নি। মার আঁচল ধরে সব কিছু অবাক বিস্ময়ে দেখা। এই কদিন আমাদের গ্রামে আনন্দের ঢেউ। তা যত্ন করে কাঠমালিতি, গন্ধরাজ, কলইতা, ঘুঁই ফুল তুলে বাসন্তীকে দিতাম। বাসন্তী ফুল পেলে খুব খুশি হতো। বাসন্তী ও হাতে করে নিয়ে আসতো কলকাতার লজেন্স, লিলিবিস্কুট। সহজে খেতাম না হ্যাফ প্যান্টের পকেটে অনেকক্ষণ লুকিয়ে খেতাম। ছেন্টু, বনা, সুবোধ, বীরা ওদের থেকে আমাকে দিত বেশি। আমি তো ভাবতেই

পারতাম না কেন আমাকে দেয় ।

রাঙামাসি এসেই মার কাছে এসে বললেন ঃ বৌঠান, মুড়ি খই । এ সব তো ভাজা লাগে আপনে বাড়ীতে না গেলে কেমনে হয় । আমি মার দিকে তাকিয়ে রইলাম মা কি বলে মা যদি যায়, তাহলে আমিও যেতে পারবো । বাসন্তী তাহলে অনেক অনেক লজেন্স বিস্কুট দেবে । ছেন্টু বনা ওরা পাবে না ।

বাসন্তী শুধু আমাকেই ডাকবে । আমার সঙ্গে কথা বলবে । এটাই আমার আনন্দ । বাসন্তীর সঙ্গে সব সময় খেলা যাবে । সেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম ।

কিন্তু বাসন্তীর বাড়ীতে পুজোর সময় যাওয়া হয়নি । আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে ঘটে গেল বিশাল দুর্যোগ । উত্তর পাড়ার মুসলমানদের সঙ্গে জমি নিয়ে কাজিয়া লেগে গেল । সেই কাজিয়ায় আমাদের গ্রাম ছত্রখান হয়ে গেল । সকলের বাড়ীতেই আগুন লাগিয়েছিল । যে যার প্রাণ নিয়ে পালাল গ্রাম থেকে । রাঙামাসিরা চলে গেল কলকাতায় । মা চলে এল দিদির বাড়ী হোসেনপুর । ছেন্টু, বনা সুবোধ ওরা যে কোথায় গেল, কে জানে । কেউ কারোর খবর রাখল না । তারপর তো দাঙ্গা, দেশভাগ আরম্ভ হয়ে গেল । আমরা আর বাড়ীতে গেলাম না । হোসেনপুর থেকে কলকাতায় চলে এলাম । শিউলি গাছটা শেষ বারের মতো দেখা হল না । শিউলি গাছটার কোন ক্ষতি হয়নি । মা কার মুখে শুনেছিল ঐ কথাটি । মা বাড়ীর জন্য সব সময় চোখের জল ফেলতো আর দেশের লোকের কথা জিগ্যেস করতো । মার তো আর কেউ ছিল না, আমি ছাড়া । রাঙামাসি বাসন্তীরা কোথায় গেছে তা জানা যায় নি । কলকাতা তো ছোট জায়গা নয় ।

মা কিন্তু সব সময় রাঙামাসির কথা বলতো বাসন্তীর কথা বলতো । মা প্রায়ই ওদের খোঁজ নেবার চেষ্টা করতো । কারণ ওরা নিশ্চয়ই মাকে একটা কাজ দিতে পারতো । মা দূর সম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে উঠেছিল । ঐ বাড়িতে রান্না থেকে সব কাজ করতে হতো । মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব সহ্য করতো । ততদিনে মা একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে । আমি স্কুলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু বই নেই । খাতা নেই । কলম নেই । সব চেয়েচিন্তে আমাকে পড়তে হতো । এই ভাবে বেশিদিন পড়া যেতো না । ক্লাস সেভেন থেকে এইটে ওঠার সময় আমি ক্লাশের ফাষ্ট বয় হয়ে গেলাম । স্কুলের প্রধান শিক্ষক একদিন ডেকে সব কিছু জিগ্যেস করলেন । বাড়িতে কে কে

আছে। সব বলার পর মাস্টারমশাই বললেন ঃ তোমার খাতা, বই যা লাগে আমি দেবো। তুমি ভাল করে পড়বে। ভাল রেজাল্ট করা চাই। তোমার যখন কিছু দরকার লাগবে। আমাকে বলবে। হ্যাঁ. তোমাদের দেশ ছিল কোথায়।

— বিক্রমপুর।

নাম শুনেই মাস্টারমশাই লাফ দিয়ে উঠলেন। তাই তো বলি এত ভাল স্টুডেন্ট কোথা থেকে এল। মাস্টারমশাই বললেন। আমার বাড়ীও বিক্রমপুর।

বলেই আমাকে টেনে কাছে বসালেন।

বাড়ীতে এসে মাকে সব কথা বলাতে মার চোখে জল এসে গেল। মা কাঁদছে। এতদিন পর আমাকে কাছে টেনে খুব আদর করলেন।

আমি ভেবে পেলাম না। মাস্টারমশাই-এর কথা শুনে মা কেন কাঁদলেন। দেশের লোক তো অনেকেই ছিল। তারা যে কে কোথায় ছিটকে গেছে। মার পক্ষে তাদের খোঁজা সম্ভব ছিল না। আমি যে স্কুলে পড়তে পারছি সেই জন্য মা খুব খুশি। নিজের যতই কষ্ট হোক, ছেলের জন্য মুখ বুজে সহ্য করবে। ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করবে সেটাই ছিল প্রতীজ্ঞা। মার দুঃখ দেখে বলতাম, মা, চলো, এখান থেকে কোথাও চলে যাই।

মা এদিকে ওদিক তাকিয়ে আমাকে অভয় দিয়ে বলতোঃ। না, না, ও কথা মুখে আনতে নেই। আর তো কয়েকটা বৎসর, তুই তো বড় হয়ে যাবি। কলেজে যাবি। চাকরি করবি। তখন আমরা চলে যাবো।

— কোথায়। দেশের বাড়ীতে। আচ্ছা মা শিউলি গাছটা কি এখনো আছে। কারোকে চিঠি লিখে জানলে হয় না। আমার কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল — বলল। ওখানে যেতে হলে পাশপোর্ট লাগবে। ভিসা লাগবে। ওসব করতে অনেক হাঙ্গামা। ওখানে যাবো। তাছাড়া গ্রামে তো আগের কোন লোকই নেই, সবতো চলে গেছে। কোনদিন এখানে একটা জায়গা কিনবো। বাড়ীর সামনে একটা শিউলি গাছ লাগাবো। তুলসী গাছ লাগাবো। করবী গাছ লাগাবো।

— আমাদের বাড়ীর মতোন শিউলি গাছ হবে কি।

— একদিন হবে।

— বাড়ী তো করবে। আশেপাশের লোকগুলি কোথায় পাবে।

তাছাড়া ধনেশ্বরী নদী কোথায় পাবে। রাঙামাসি, হরিদাস কালুশেখ, নিশিমাস্টার কোথায় পাবে।

— ধনেশ্বরী নদী তো আর বানাতে পারবে না। রাঙামাসি, বাসন্তী, ছেন্দু, বনা, সুবোধ, বীরাকে তো আর পাবো না।

— চিরদিন কি সবাই থাকে নাকি। আমরা যেখানে বাড়ী করবো। সেখানকার লোকগুলি আপন হয়ে যাবে। তাদের জন্য মন খারাপ হবে একদিন।

— না। এখানকার লোকেরা কেমন কেমন।

ছেণ্টু, বনার মতো নয়। রাঙামাসির মতো নয়।

— আচ্ছা মা, পাড়ায় তো কতলোক যায় আসে ওদের সঙ্গে কেন দেখা হয় না। ওরা কি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল।

— আসলে নতুন জায়গা। মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। এতো চট করে মেলামেশা করা যাবে না।

— কেন।

— আমার কাজ আছে। তোর সঙ্গে গল্প করলে চলবে না।

বলেই মা কাজে চলে গেল। অনেকদিন পর মার সঙ্গে কথাবার্তা হল। এখন অবশ্য মার আঁচলে মুখ লুকাতে হয় না। লজ্জাও লাগে। তবে এখনো ইচ্ছে হয়, মার কোলে উঠি। ভাবলেও পারি না। তাছাড়া মার তো আগের শরীর নেই। আমাকে কোলেও নিতে পারবে না। খাটতে খাটতে মার শরীরটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। কবে যে মাকে সুখ দিতে পারবো সেই কথাই ভাবছি। মার কষ্ট সহ্য করা যায় না। আমাদের কপালে এতো দুঃখ ছিল। দুঃখ না থাকলে বাবা এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন কেন? কপালে খারাপ বলেই চলে গেছেন। যা যায় সে তো ফিরে আসে না।

যুবকবেলা

স্কুলের শেষ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। সব ছাত্রের মধ্যে আমি দ্বিতীয় থেকে আমার বারো নম্বর মাত্র কম। আর চতুর্থ হয়েছে বাসন্তী রায় বলে বেথুন স্কুলের ছাত্রী। বাসন্তী নামটা পড়ে আমি একটু চমকে গেলাম। বাসন্তী আমি প্রায় সমান সমান, কিংবা আমি দুই এক বৎসরের বড়। বাসন্তী কলকাতায় ছিল বলে পড়াশুনায় অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিল। আবার কোন বাসন্তী কে জানে। এক নামে তো অনেক লোক আছে। এই মেয়েটাই যে

আমাদের বাসন্তী হবে কে জানে। মনের মধ্যে একটা খোঁচা লাগছেই। বাড়ীতে মার খুব আনন্দ। পাড়ার লোকেরা-বাড়ীর লোকেরা আমাকে নিয়ে নাচছে। বাড়ী মাথায় করে নিয়েছে এক ভদ্রলোক। নিজের টাকা দিয়ে রসগোল্লা কিনে সকলকে বিলি করেছে। মার চোখে তখনো জল। শুধু কাঁদছে। কান্না আর থামছে না। আমি মার কাছে গিয়ে বললাম, — মা, তুমি কাঁদছ কেন!

আমি যেই ডেকেছি, আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল চীৎকার করে। ঐ বাড়ীর এক বয়স্কা মহিলা, আমি তাকে দিদা বলি, সে এসে মাকে বলল, বউ কাঁদছিস কেন? ছেলে পাশ করেছে। এত কষ্ট করে পড়িয়েছিস, নিশ্চয়ই ওর বাপ আকাশ থেকে দেখছে। তোকে আশীর্বাদ করছে। তুই কাঁদছিস কেন। এই সময় মাস্টারমশাই স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশাইরা দলবেঁধে এলেন। মাকে প্রণাম করলেন প্রধান শিক্ষকমহাশয়।

প্রণাম করতে গিয়ে থমকে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বৌঠান না। আপনাদের বাড়ী তো বালিয়াকান্দা। আমি মেঘু সাহার ছেলে। মার কান্না আরো বেড়ে গেল। সেই কান্না আর থামেনা। এতদিন পর একজন গ্রামের মানুষ দেখলেন, যেনো কত পুণ্যের ফলে এই মিলন। মা কথা বলবে কি। চোখের জলই বন্ধ হয় না। মার চোখে যেনো অনেক জলেরধারা। জানেন বালিয়াকান্দার আর একটি মেয়ে চতুর্থ হয়েছে। নাম যেনো কি? কাগজে বেরিয়েছে। আমি চট করে বললাম —

— বাসন্তী।

— হ্যাঁ, বাসন্তী চতুর্থ হয়েছে। বেথুনে পড়ে।

— কোথায় থাকে ওরা।

— হরি ঘোষ স্ট্রীট। কত নাম্বারটা যেনো ও মনে পড়েছে। ছয় নম্বর। আমার কাছে ও কিছুদিন পড়েছিল, তাতেই জানি। আমি ছটফট করছি। কখন যাবো হরি ঘোষ স্ট্রীট। হরি ঘোষ স্ট্রীট আমি জানি। আমাদের বাড়ী থেকে বেশি দূরে নয়। দিদাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ট্রামে করে। পরক্ষণেই ভাবলাম সত্যি সত্যি যদি না হয়। তাছাড়া এত বৎসর-পর চিনতে পারবে কিনা। রাঙামাসি থাকলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। কেউ ভুলে যায় না। ভুলে যাওয়ার ভান করে। সব মানুষের স্মৃতি ভীষণ প্রখর।

কখনো কখনো ভুলে যায় কিংবা বলা যায় ভুলে যাওয়ার ভান করে। অনেক সময় মনে রাখতে পারে না নানান কারণে। বাসন্তীর কথা যেমন আমার মনে আছে কিন্তু মনেই আছে কিন্তু প্রকাশ নেই। পরের আশ্রয়ে বাস করে কারোর কথাই মনে রাখা যায় না। পরিস্থিতিও জটিল ছিল। দেশভাগের ফলে একটা সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়ে গেল। নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে হল। অচেনা অজানা জায়গায় চলে আসতে হল। চারপাশেই অচেনা মানুষ। একটা নতুন দেশের আবহাওয়া. পরিস্থিতি লোকজন বুঝতেই সময় চলে গেল। দেশ ছাড়ার তো একটা দুঃখ আছেই। জন্মে যে গাছপালা দেখেছি। যে নদী দেখেছি। যে আকাশ দেখেছি। যে মানুষ দেখেছি এক মুহূর্তেই সে সব পাল্টে গেল। দুটো ভাতের জন্য. নিজের প্রাণের জন্য ছুটতে হল। ছোটার আর রেশ নেই। কেন যাচ্ছে কিসের জন্য যাচ্ছে। সে সব চিন্তা করার সময় নেই। ছিন্নমূল জনস্রোতের সঙ্গে চলছে কোথায় যাবে। এই হতভাগোর মিছিল যে কোথায় শেষ হবে তা কেউ বলতে পারবে না। ঐ কারণেই বাসন্তীদের কথা মনে থাকলেও খোঁজ নেওয়া যায়নি। এই শহর. বড় বৃক্ষ। এই শহুরের লোকেরা কেউ কারোকে চিনে না। কেউ কারোকে জানে না। পাশের বাড়ীতে কে আছে তার খবরও রাখে না কেউ। দেশের বাড়ীর লোকেদের যেমন চোদ্দ পুরুষের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক তো একদিনে গড়ে ওঠে নি। তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। সেই আত্মীয়তার টান এখানে কোথায় পাবে। এখানেও গড়ে উঠবে তবে সময় লাগবে। তবে কতটা সময় তা কেউ বলতে পারবে না।

বাসন্তীকে নিয়ে আমি যে এত ভাবছি বাসন্তী কি আমাদের নিয়ে এত ভাবছে হয়তো চিনতেই পারবে না। যদিও বা চিনতে পারে কিন্তু সেই আগেকার মতো কি টান থাকবে। না গেলে তো বোঝা যাবে না। কিন্তু যাবো কোন মুখে। কি বলবো। মাকে নিয়ে যাবো। না. আমি আগে বাসাটা দেখে আসবো। তারপর মাকে নিয়ে যাবো। যদি ভাল ব্যবহার করে তাহলেই যাওয়া যেতে পারে। এই সব ভাবছি। মাস্টারমশাই যাবার সময় বললে — তুমি আমাকে চিনতে পারনি। আমি উত্তরপাড়ার লোক ছিলাম। গণ্ডগোলের সময় তুমি খুব ছোট ছিলে। তোমরা আমাকে চিনবে না। আমি তোমাদের চিনি। আমার বাবা মেঘু সাহা পাটের কারবার করতো। বর্ষাকালে নৌকা করে পাট কিনতে গ্রামে গ্রামে যেতে হতো। বাবার সঙ্গে আমিও যেতাম। সেই সময় তোমাকে দেখেছি। তোমার মাকে দেখেছি। তোমাদের

পাটও আমরাই কিনতাম। এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পাটের নাও বোঝাই ঘাসি নাও। একটা কালো বেঁটে খাটো লোক পাটের ওপর বসে থাকতো। নৌকার সামনে টানানো থাকতো দাঁড়িপাল্লা। কোমরে গোঁজা থাকতো কাপড়ের টাকার থলি। নৌকার পাচার দিকে বসে থাকতো পাটের ব্যবসায়ীর ছেলে। সেই ছেলে এখানে স্কুলের মাস্টার।

দেশভাগের পর এখানে এসে খুব উন্নতি করেছে। মা দূরে দাঁড়িয়ে দেশের লোককে দেখছিল. চোখ ছলছল। হঠাৎ মা বললেন. আবার আসবেন।

— আপনারাও যাবেন। এই তো কাছেই থাকি। মা আপনাকে দেখলে খুশি হবেন. বাবা নেই। যাই। আর একদিন আসা যাবে।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ধনেশ্বরী নদী। পাট বোঝাই ঘাসি নাও লাল. নীল পাল টানিয়া ভেসে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জে। সব পাট যেতো ঐ বন্দরেই।

মাস্টারমশাই কে যতক্ষণ দেখা গেল ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি মাকে বললাম। মা, রাঙামাসির বাড়ীটা দেখে আসবো। তারপর তোমাকে নিয়ে যাবো।

— তুই যেতে পারবি।

— পারবো। এখন আর অজানা নেই। কলকাতার অনেক বাড়ীই চিনি। আমি ঠিক খুঁজে বের করতে পারবো।

— পারবি তো। খুব সাবধানে যাবি।

— ঠিক আছে।

বলেই চললাম আর এক ঠিকানার খোঁজে। যেখানে শিউলি ঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে।

শেষ বেলা

অনেক খোঁজাখুজির পর বাড়ীটা পেলাম। বাড়ীর দরোজা বন্ধ। কাকে ডাকবো। কি নামে ডাকবো। রাঙামাসি বলে ডাকবো। বাসন্তীকে ডাকবো। বাসন্তীর বাবা নিশ্চয়ই আছেন। তার নামতো জানি না। কিংবা বাসন্তীর কোন ভাই আছে কি না, তাও জানি না ইতঃস্তত করছি। কি করবো। পুরানো আমলের বাড়ী। সরু ফুটপাথ তারমধ্যে দোকান, লোক

চলাচলের অসুবিধা। এখন তো আমি ছোট নই। তবু কেমন যেনো একটা ভয়। কি ভাবে ডাকবো। কি নামে ডাকবো। এই সব ভাবছি। এমন সময় এক ভদ্রলোক ঐ বাড়ীতেই ঢুকছে। ঢোকার মুখে আমাকে দেখে জিগ্যেস করল, কাকে চাই।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু না দিলেও বিপদ। চোর-টোর যদি ভাবে। ভদ্রলোক একটু দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমার সামনে এসে বললঃ কাকে খুঁজছেন। কত নম্বর। আমি কোনরকমে বললাম, রাঙামাসিকে।

— কোথা থেকে আসছেন।

— সুকিয়া লেন থেকে।

ভিতরে আসুন এই রকম একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে মহিলার গলা শোনা গেল। ভদ্রলোক ততক্ষণে দরজা খুলছেন। ভিতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। বললেন, কে।

আমি এতক্ষণ মুখ নীচু করে ছিলাম। আস্তে আস্তে তাকালাম। আমার শরীর কাঁপছে। পা টলছে। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছি না। কেমন যেনো ভয় ভয় করছে। তবু সোজা হয়ে তাকালাম।

রাঙামাসির! কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে! চোখ বসে গেছে। চুলে পাক ধরেছে। সেই গায়ের রঙ নেই। গাল ভাঙা। রাঙামাসি এসে বলল, — তোমায় তো চিনতে পারলাম না। তুমি কে! চুপ করে থাকলে বিপদ, বললাম। বাইলাকান্দার শিউলি গাছের কথা মনে আছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, আয়, আয়, কেমন আছিস। কোথায় আছিস, মা কই।

বাঁচা গেল, চিনতে পেরেছে। যদি চিনতে না পারতো তাহলে কোথায় যেতাম। ছেলেবেলায় দেখা রাঙামাসি আর নেই। দেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীঘর, জমিজমা সব চলে গেছে রাঙামাসির চেহারাও নষ্ট হয়ে গেছে। স্যাঁতস্যাঁতে ঘর, ভাঙা উঠোন। দেওয়াল খসা একটা বাড়ী। রাঙামাসিদের কি সুন্দর বাড়ী ছিল। কি বিশাল বাড়ী ছিল। আর এখানে তার কোন তুলনা হয় না। বোঝাই গেল কোনরকমে বেঁচে থাকা। আমার চোখ চারিদিকে ঘুরছে। একজনকে খুঁজছে। তাকে কিরকম দেখবো কে জানে। ঘরের ভিতরে একটা সাদামাটা চৌকি। পাশে একটা ছোট চেয়ার।

আমাকে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল। রাঙামাসিদের অবস্থা দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। যদিও আমরা এর চেয়ে খারাপ ভাবে থাকি। খারাপ লাগছে এইজন্য যে আমাদের তো কিছু ছিল না। রাঙামাসিদের তো অনেক কিছু ছিল, তাদের এই অবস্থা চোখে দেখা যায় না। মাথা নীচু করে ভাবছিলাম। এমন সময় কাপড় পরা মেয়ে ঘরে ঢুকল, আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পিছনে রাঙামাসি চা বিস্কুট নিয়ে। রাঙামাসি ঘরে ঢুকেই বলল, চিনতে পারছিস। আমি বাসন্তীর দিকে তাকাতে পারছি না মুখ নীচু করে রয়েছি। আমার মুখে কোন কথাই এল না। কি বলবো। কোনদিন তো সেভাবে কথা হয়নি। শিউলি গাছও নেই, যে শিউলিফুল দেবো। সেই সময়ও দেখা ছাড়া কিছু ছিল না। সেই দিনের ফ্রক পরা মেয়েটি কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। রাঙামাসি বললেঃ মাকে নিয়ে আসবি তো। তোরা ভাল আছিস। মাকে নিয়ে আসিস।

আমি কোনরকমে বললাম — নিয়ে আসবো। সেই সময় বাসন্তীর চোখে চোখ পড়ল, মনে হল ওর মুখে হাসির রেখা। সর্বশরীরে রূপের ঢল নেমেছে। রাঙামাসি আবার বলল, পড়াশোনা করছিসতো ? না ছেড়ে দিয়েছিস ?

— এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

— পাশ করেছিস ? বাসন্তীও উত্তর দিয়েছিল, ফোর্থ হয়েছে।

— তাই। আজ উঠি। আমি মাকে নিয়ে আসবো। বের হয়ে আসার সময় বাসন্তী বললে—তুমি কোন স্কুল থেকে, পরীক্ষা দিয়েছিলে।

— ওরিয়েন্টল অকাডেমী।

— ঐ স্কুল থেকে তো তৃতীয় হয়েছে, তুমি তাকে চেনো ?

কোন উত্তর না দিয়ে রাস্তায় নামলাম। রাঙামাসির মুখে চোখে বয়সের ছাপ পড়েছে। বাসন্তী যে এত বড় হয়েছে কম্পনাই করতে পারিনি। আমিও তো বড় হয়েছি। তাও বুঝতে পারিনি। সময় মানুষকে বদলে দেয়। সবকিছু বদলে যায়। আমি ভাবছি বাসন্তী কেন আমার সঙ্গে কথা বলল না। কি বলবে। দেশের লোক। আর তো কিছু নয়। আমি যে তৃতীয় হয়েছি সেটা বলতে পারলাম না। কেমন যেনো লাগছিল। অন্য কোনদিন মা বলে দেবে। আমাদের ঠিকানা তো রাখল না। আমিও ইচ্ছে করে দিলাম না। কারণ আমরাও আরো খারাপ ভাবে থাকি। মা অন্যের

CENTRAL LIBRARY

বাড়ীতে কাজ করে। সেই বাড়ীর একটা ছোট্ট ঘরে আমাদের থাকতে দিয়েছে। ঠিকানা দেবার মতো কিছু নেই। আবার ভাবছি না এলেই ভাল হতো। কেন যে এলাম। স্বপ্নের মধ্যে যেটা ছিল। তা স্বপ্নেই থাকলে ভাল হতো। স্বপ্ন ভাঙাটা উচিৎ হয়নি।

মাকে গিয়ে সব কথা বলতে হবে। মা নিশ্চয়ই খুশী হবে। হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে সেই শিউলি গাছটার কথা বার বার চোখের সামনে ভাসছে। এই রকম গাছ আর কোথাও দেখতে পাবো না। সেই বাড়ীও পাবো না। স্বপ্নের মধ্যেই থাকবে সেই শিউলি গাছ। □

# বাবা হওয়া

## অনিল ঘড়াই

নদীটা এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে গ্রামের পাশ দিয়ে।

নদীর ধারের গ্রামগুলোর পরিবেশ সাধারণত ঠাণ্ডা হয়। গ্রামের নিরীহ মানুষগুলো নদীর জলের চেয়েও আরো সরল, সাদাসিধে।

লাটু সিং ডিউটি থেকে ফেরার পথে পাম্প-হাউসটার কাছে এসে জু' নিল। গাঁ থেকে তার হাজিরা দেওয়ার অফিস তিন মাইলের বেশি পথ। ঘরে সাইকেল আছে তা সে ছুঁয়েও দেখে না। পরমা বারবার করে বলে, ঘরে চাল আছে অথচ জাউ ভাত কেন খাও বুঝি না? সাইকেলটা যদি না চালাবে তাহলে কিনেছিলে কেন? মেশিনের ব্যবহার না হলে তাতে মরচে ধরে।

পরমার কথা লাটু সিং আজকাল এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। বেশি বকলে সে পরমাকে বলে, যা বোঝ না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। সাইকেলটা দায়ে-আদায়ে কাজে লাগে। রোজ চালালে লিক-বাস্ট হলে সারানোর পয়সা কে দেবে শুনি।

দিনরাত পরমার চিন্তায় লাটু সিংয়ের মাথা গরম। তার একার আয়ে ঘরে বসে খায় চারজন। ছকার বিয়ে দিয়ে বউ এনেছে। বছর না ঘুরতেই নাতির মুখ দেখেছে লাটু সিং। পরমা তো হেসে বাঁচে না, ঠোঁট টিপে বলেছে, এখনকার ছেলে-মেয়েদের ধৈর্য কম। আমি মা হয়েছিলাম পাক্কা চার বছরের মাথায়। অথচ এরা দেখ কেমন বেপরোয়া। লাজ-লজ্জার কোন বালাই নেই।

পাম্প-হাউস থেকে ঘাড় সোজা করে তাকালে নজরে পড়বে লাটু সিংয়ের গ্রামখানা। সেখানে এত গাছপালা, দেখে মনে হবে যেন সবুজ কাপড়ে মোড়া আছে পুরো অঞ্চল। শাল থেকে সজনে গাছ সব আছে সেখানে। এছাড়াও আছে দুটো ভুষিমালের দোকান। গ্রামের মধ্যিখানে মহুয়া গাছের ছায়ায় বড় একটা মাচা বাঁধা। কেউ দোষ করলে বিচার হয় সেখানে। যারা চাকরি করে তারাই গ্রামের সর্বেসর্বা। ফলে লাটু সিংয়ের কথার ওজন আছে গ্রাম সমাজে। এছাড়াও তার আছে বিঘে সাতেক জমি আর ঘর লাগোয়া বারোটা মহুয়া গাছ। দুটো কুসুমগাছে বছরে যা ফল হয় পাড়াপড়শীদের দিয়ে-

CENTRAL LIBRARY

থুয়েও সমবছরের মাথায় মাথার তেল হয়ে যায়। লাটু সিং কুসুম তেল মাখে না, তার মনে অসময়ে চুল উঠে যাওয়ার প্রবল দুঃখ। ছকার বউ টুসু মাথায় কুসুমতেল মাখে না চুল চ্যাটচ্যাট করে বলে। তার জন্য চাই বিশুদ্ধ নারকেল তেল। টুসুর বাবা টাটা কোম্পানীর চাকুরিয়া, ঘরে তাদের মোটর সাইকেল আছে। এছাড়াও আছে চার কামরা বিশিষ্ট পাকা বাড়ি যা টুসুর ভেতরের অহঙ্কারের বেলুনটাকে ফুলিয়ে দেয়। লাটু সিংয়ের চাকরির বয়স পঁচিশ বছর তবু সে খাপরার বদলে টিন লাগাতে পারল না স্রেফ পয়সার অভাবে। সে যা বেতন পায় সব ঘর চালাতে সাবাড় হয়। টুসু তাই প্রায়ই খোঁচা মেরে বলে, এখানে এসে আমার চেহারা অর্দ্ধেক হয়ে গেল! এখানে যা খাওয়া-দাওয়ার ঘটা টি. বি. না হলে বুঝতে হবে ভাগ্যের জোর। ছকাকে শুনিয়ে বললেও কথাটা কানে যায় লাটু সিংয়ের। পরের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া তার ধাঁৎ-এ নেই। সবাই সুখে থাকলে তারও সুখ। তবু সে কারোর মন পেল না! পরমা রাগ করে বলে, সমুদ্রের মাছ আনবে না, বউমা খেতে পারে না। মাছ আনলে টাটকা দেখে এনো। লাটু সিং ঘাড় নাড়ে। নদীর জলে তার ছায়া পড়েছে। এই নদীতে ছোটবেলায় সে কত জল দাপিয়ে সাঁতার কাটত। খরানীতে জল কমে গেলে বাপের সাথে আসত মাছ ধরতে। এখনও ফি-বছর জল কমে যায় নদীর। ছকাকে মাছ ধরার কথা বললে সে নাক কুঁচকায়। ওসব আমার দ্বারা হবে না।

— কেন হবে না, চেষ্টা করে দেখ। লাটু সিং মোলায়েম স্বরে বোঝাতে চায় ছকাকে। মাঝখানে ফোড়ন কাটে টুসু. বাবা, সবার দ্বারা কি সব কাজ হয়? আমি যদি তোমাকে বলি ইংরেজীতে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে — তুমি কি তা পারবে? পারবে না। কেন না তুমি শুধু সই করা ছাড়া আর কিছু লিখতে পারো না।

দুম করে মুখ কালো হয়ে যায় লাটু সিংয়ের। বউমা কথাটা মন্দ বলেনি। আজকালকার মেয়েরা কত কথার ফুলঝুরি বানায়। অথচ পরমার মুখে এখনও তেমন কোনো কথা নেই। লাটু সিং মনে মনে হাসে। টুসুর দিকে তাকাতে তার ভয় লাগে। এ মেয়ের মুখে কোন কথা আটকায় না। এদের ছোট বড় জ্ঞান নেই। এরা নিজেকে ভাবে মহাচালাক।

নদীর জলে মুখ ধুয়ে ডাঙায় উঠে এল লাটু সিং। তার কালো-রোগা শরীরের ছায়া পড়েছে নদীর জলে। খাকি প্যান্ট-জামা জলের আয়নায় চকচকিয়ে ওঠে। চুল কমে যাওয়া মাথার টাকটায় রোদ পিছলে যায়

হামেশা। অথচ ক'বছর আগেও তার মাথায় থাক থাক কোঁকড়ান চুল ছিল। তখন চেহারাও ছিল চোখে দেখার মতন। এখন সব গিয়েছে সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে। ছকা বিয়ে পাশ করেছে তিন বছর আগে. প্রতি সপ্তাহে সে তিনটে করে ফর্ম ভরে. চাকরির খবর পড়ে মন দিয়ে। ঘরে বেকার ছেলে থাকলে কোন বাপের মন ভাল থাকে! লাটু সিং ছকাকে কিছু বলতে পারে না. বেশি কিছু বললে মুখের উপর কথা শুনিয়ে দেয়, আমি তো বিয়ে করতে চাইনি, তোমরাই তো আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে! এখন সব দায়-দায়িত্ব তোমার। আমি কোথা থেকে টাকা পাব. আমি কি চাকরি করি?

গ্রামের বেশির ভাগ ছেলেগুলোই পাশ করে বসে আছে। ওদের কেউ আবার চাকরির আশায় টাইপ শিখতে যায় শহরে। কেউ আবার কম্পুটার কোর্সে ভর্তি হয়েছে। তবে ছকা এদের সবার থেকে এগিয়ে। সে কলেজে পড়ার সময়ে টাইপের কোর্সটা সেরে নিয়েছে। সে এখন শর্ট-হ্যাণ্ড শেখে। ইংরেজী খবরের কাগজ গড়-গড়িয়ে পড়তে পারে। তার এই বিদ্যাবুদ্ধির বহর দেখে টুসুর বাবা আর কথা বাড়ায়নি. এক কথায় মেয়ের হাত হলুদ করে দিল। কিন্তু মেহেন্দির রঙ না মুছতেই টুসু বুঝে গিয়েছিল তার কী ভাগ্য! প্রতি রাতে সে ছকাকে উসকে দেয়, বাবার চাকরি চলে গেলে আমাদের না খেতে পেয়ে মরতে হবে। কেন মিছিমিছি অপুকে আনলাম! অপু এত সাত তাড়াতাড়ি না এলেই বুঝি ভাল হোত। এখন এক কৌটো গুঁড়ো দুধ আনতে গেলে বাবার কাছে হাত পাততে হয়। বাবা কেন কারোর কাছে চাইতে আমার লজ্জা লাগে। আমি তো এমন পরিবেশে কোনদিন মানুষ হয়নি। ছকা অন্তর দিয়ে বুঝতে পারে টুসুর দুঃখ। সব স্ত্রীই চায় তার স্বামী সাবলম্বী হোক। মাসের শেষে সে যেন কিছু কামিয়ে আনতে পারে। টুসুর দাবী তাই কোন ভাবে অগ্রাহ্য করতে পারে না ছকা। তার চোখে ঘুম আসে না দুঃশ্চিন্তায়। একের পর এক রিটিন-পরীক্ষায় সে পাশ করছে. কিন্তু ইণ্টারভিউ দেওয়ার সময় তার মাথাটা ঠিক কাজ করে না। সে আগে থেকেই ঘাবড়ে যায়। তার মুখ দেখে কর্মকর্তারা বুঝে ফেলেন একে দিয়ে চলবে না। একের পর এক চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ছকা এখন ক্লান্ত। সে টুসুর মুখের দিকে তাকাতে পারে না লজ্জায়। ইদানিং ইণ্টারভিউ দিয়ে ফিরে এলে সে টুসুকে বলে, মোটামুটি হয়েছে. জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে! অথচ আগে বলত পরীক্ষা ভালই দিয়েছি, দু-নাম্বারী না করলে চান্স আমারই হবে। তখন শুরু হোত টুসুর স্বপ্ন দেখা। ছকার চাকরি হলে আলাদা ঘরভাড়া নিয়ে শহরে উঠে

যাবে তারা। এখানে থাকলে টুকাই মানুষ হবে না। আর সে নিজেও গ্রামের খারাপ জলবায়ুতে তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবে। বাপের বাড়িতে গেলে তার বন্ধুরা বলে। ইস, তুই কি রোগা হয়ে গিয়েছিস? খেতে পাস না বুঝি? কী কালো হয়ে গেছিস রে তুই, ওখানে কি ফেরারনেস ক্রীম পাওয়া যায় না? এসব কথায় কান জ্বালা করে টুসুর; সে বানিয়ে বলে দেয়, জ্বরে পড়েছিলাম। জ্বর থেকে উঠেই এখানে বিশ্রাম নিতে চলে এলাম। দু-চার দিন থাকলেই আমার চামড়া আবার আগের মত তেলতেলে হয়ে যাবে।

বন্ধুরা ফ্যাকাসে হেসে চলে গেলেও টুসুর মনের জ্বলন কমত না। সে তার ফাঁকা ভাগ্যকে দোষ দিত। তার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারের সাথে। পুলক ও. এম. জি. সি-তে কাজ করে, মোটা মাইনে পায়। তুয়া যখন ঘরে আসে তার সাজ-পোষাকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে টুসু। চোখ ফেটে জল আসলেও লুকিয়ে ফেলতে হয়। ছোট বোনের কাছে সে যেন আরো ছোট হয়ে যায় যখন তুয়া শুধায়, দিদি, জামাইবাবুর কিছু হলো? সত্যি, এবাজারে চাকরি না থাকলে কোনো স্ট্যাটাসই মেইনটেন করা যায় না। তবে তুই যদি বলিস তাহলে আমি ওকে বলে যে কোন প্রাইভেট ফার্মে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

ছোট বোনের কথাগুলোয় টুসুর চোখ-মুখ এমন কী কানের লতি লাল হয়ে উঠলেও সে ফাটা বাঁশে আটকে যাওয়া যন্ত্রণাকাতর চোখে তাকায়, নিজের উদ্‌গত দুঃখকে আড়াল দিতে সে জোর করে হাসে, তোর জামাইবাবুর কল-লেটার এল বলে। স্টেনোগ্রাফারের চাকরিটাতে বেশ ভালই মাইনে। সরকারী চাকরি, ছুটি ছাটা পাবে। — তাহলে তো খুব ভাল হয়। তুয়া লাফিয়ে উঠল আনন্দে, জামাইবাবুর চাকরি হলে তোরা একটা ফ্ল্যাট কিনে নিস। এখন যেখানে থাকিস, সেখানে যাওয়া যায় না — একেবারে অখাদ্য জায়গা। তুই ওখানে কীভাবে আছিস আমি তাই ভাবি। টুসু কাজের অজুহাতে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচায়। তুয়ার উপরে তার বেজায় রাগ হয়। রাগ হলেও কিছু করার নেই। পুলকের সাথে সে কিছুতেই ছকাকে মেলাতে পারে না। ছকা ঘরে ফিরে এলে শুরু হয় তাদের নিত্যকার ঝামেলা, ঝগড়া। টুসু রাগ ঝাল করে বলে, তুমি একটা ঢ্যাঁড়শ। বাবা আমাকে এর চেয়ে গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দিলে ভাল করত। আমাকে আর কারোর কথা হজম করতে হোত না।

ঈষৎ অপমানিত, নিষ্প্রভ ছকা টুসুকে বোঝাবার চেষ্টা করে, চাকরি তো ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে জোর করে কেড়ে নেব ! শুধু ভাল ইণ্টারভিউ দিলে চাকরি হয় না, চাকরি পেতে গেলে ভাগ্যেরও দরকার ।

— যদি জানতেই চাকরি পাবে না তাহলে আমাকে কেন বিয়ে করতে গেলে ?

ছকা রেগে উঠল, আমি বেকার জেনেই তোমার বাবা বিয়ের কথা পাকা করেছেন । এখন আমাকে বললে কি হবে, যা বলার তোমার বাবাকেই বলো ।

— আর আমি কাউকে কিছু বলব না । খুব অসহ্য লাগলে আমি মরব ।

ভয়ে আঁতকে উঠল ছকা, তুমি মরলে অপুর কি হবে ? আর আমাকেই বা কে দেখবে ?

— তোমার বাবা-মা আছে, তারা দেখবে । বিছানায় চোখের জল মিশে যেতেই পাশ ফিরে শুলো টুসু । ছকার সারারাত আর ঘুম আসে না । তার মাথায় টুসু যেন সমস্যার বিরাট পাথর বেঁধে দিয়েছে । বাইরের আকাশে শুরু হয় তখন ঝড়ের তাণ্ডব । মেঘ ডেকে ওঠে ঘনঘন । বজ্র-বিদ্যুৎ-এর শব্দে কেঁপে ওঠে মাটির ঘর । তেঁতুলগাছের মগডালে বৃষ্টিতে ভিজে চেঁচিয়ে ওঠে শকুন । লাটু সিং আর পরমা বারান্দায় শোয় । ওরাও জেগে উঠেছে । ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর থেকে ওদের আর ঘরে জায়গা নেই । একটা মাত্র ঘর । আর সেটাই পরমা ছেড়ে দিয়েছে ছেলে-বউয়ের জন্য । বুড়োবুড়ি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা দাওয়াতেই 'চট' টাঙ্গিয়ে নেয় । বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগলে পরমা উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, এবার অফিস থেকে লোন তুলে আর একটা ঘর বানাও । এভাবে আর চলে না ! লাটু সিং হাই তোলে, ফাঁকা মুখে অভ্যাস মতো তুড়ি মেরে বলে, টাকা তো তুলেছিলাম কিন্তু সে টাকা তো ছকার চাকরির জন্য চলে গেল । যাকে দিলাম সে আর টাকা ফেরত দেবে বলে মনে হচ্ছে না । কী যুগ পড়ল বলো দেখি ? সব বেইমান ।

বৃষ্টি থেমে গেলে উঠোনের জলে জ্যোৎস্না খেলা করে ।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছকার শরীর গরম হয়ে ওঠে, সে টুসুর মুখটা জোর করে ঘুরিয়ে আনতে চায় নিজের দিকে, টুসু ঘোরে না — কাঠের মত দম তার পড়ে থাকে । ছকা তাকে ডাকে, টুসু, এই টুসু ! কী হলো, কথা বলো ? আমি একটা প্ল্যান ভেবেছি । শুনবে ?

অনেকক্ষণ ডাকা ডাকির পর টুসু মুখ ভার করে তাকাল ।

ছকা বলল, আমি ভাবছি — স্টেশনারী গুড্‌সের ব্যবসা করলে কেমন হয় ?

টুসু জ্বলে উঠল, ব্যবসা করবে টাকা কোথায় ? আমি তোমার জন্য আমার বাবার কাছে ভিক্ষা চাইতে পারব না । এর চেয়ে তুমি শুকনো মহুয়া বেচো — কম পয়সায় হয়ে যাবে ।

—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ ?

—ঠাট্টা করব না তো কি বিজয়মাল্য পরিয়ে দেবো ? ছিঃ, ব্যবসা করার কথা ভাবলে কি করে ? এমনিতে মুখে চুনকালি লেগেছে, তুমি কি আরো বেশি করে চুনকালি লাগাতে চাও ?

—কেন ব্যবসায়ীরা কি বেঁচে নেই ?

টুসু ফস্ করে জ্বলে উঠল, আমাকে ঘুমোতে দাও । তোমার আর কি ! সকাল হলেই আমাকে গাধার খাটনি খাটতে হয় । তুমি তো নবাব-বাহাদুর, কুটোটি ভেঙে দুটো করো না ।

অশান্তির মেঘ ক্রমে ক্রমে ছেয়ে ফেলল পুরো আকাশ । সবুজ প্রকৃতিতে টুসু যেন একমাত্র কাঁটা গাছ । অনেকদিন পরে লাটু সিং তাকে বলল, বউমা, মনে দুঃখ পুষে রেখো না । আমি ডালভাত খেলে তোমারও দুটো জুটবে মনে রেখো । তুমি এ বাড়ির বউ, তোমাকে একটা কথা বলি — মন দিয়ে শোনো । দিনরাত ছেলেটার সাথে ঝগড়া করো না । আমার দশটা নেই, এ কটাই ছেলে । ও তোমার জন্যে মদ খাওয়া ধরেছে — এ খবর কি জানো ?

—মদ খেল কি বিষ খেল তা জেনে আমার কি লাভ ?

লাটু সিং অশান্ত হয়ে উঠল টুসুর কথা শুনে, মনে রেখো ছটার বউ হয়ে তুমি এ ঘরে এসেছ । আমি মানছি ছটা বেকার । আমাদেরও অভাব আছে । তা বলে এ ঘরে কোনদিন অশান্তি ছিল না । তুমি আসার পর থেকে ছেলেটা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে । তুমি ওকে একটু শান্তি দাও । দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে ।

—আমি যদি অশান্তির গাছ হই তাহলে আমি চলে যাচ্ছি —

—সে তোমার ইচ্ছা । লাটু সিং গজগজিয়ে দোকানের দিকে চলে গেল । তার মনেও সুখ নেই, সেও কাঁদছে ভেতরে-ভেতরে । এ অশান্তি তার ভাল লাগে না ।

পরমা তাকে বোঝাল, বউমাকে অত কড়া কথা না বললেই পারতে । কাঁচা বয়স । ওরা এখন ওরকম একটু-আধটু হয়ে থাকে ।

লাটু সিং চিন্তিত মনে চলে গেল ডিউটিতে। টুসুকে সে মেয়ের মত দেখে। ঘরের বউমা তেমন লক্ষ্মী হয়। তাকে এত বকাঝকা না করলেই ভালো হোত। চিরদিন যে মেয়েটা শহরে মানুষ হয়েছে, এই অজগাঁয়ে এসে সে-ই বা মানাবে কি ভাবে? ডিউটি থেকে ফিরে লাটু সিং ভাবল বৌমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কাজে তার মন বসল না। দুপুরে ছুটি নিয়ে ফিরে এল ঘরে।

ঘরের দাওয়ায় পা দিয়ে সে বুঝল কিছু একটা অঘটন ঘটে গেছে অভিমানী টুসু আবার কিছু করে বসল না তো? সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাউ-হাউ করে ছুটে এল পরমা, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি নদীতে গিয়েছিলাম চান করতে। ফিরে এসে দেখি বউমা নেই। অপু একা একা খেলা করছে উঠোনে।

—কোথায় গেল সে? লাটু সিংয়ের কপালে ঘাম ফুটে উঠল। সে আবার ছুটে এল পাম্প-হাউস পর্যন্ত। ডিজেল অপারেটর মোহন তাকে পাগলের মত ছুটতে দেখে সুধোল, কি হয়েছে লাটুদা, অমন করছো কেন?

—আমার ঘরের বউমাকে কি দেখেছ? লাটু সিংয়ের কেঁপে উঠল, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কী সর্বোনাশ কাণ্ড বলো তো?

মোহন তাকে আশ্বস্ত করে বলল, তোমার বউমা তার বাপের বাড়ি চলে গেছে। আমার সাথে পাওয়ার হাউসের কাছে দেখা হয়েছিল। দেখা হয়েছিল। দেখা হতেই সে বলল, বাবার শরীর খারাপ তাই ঘর যাচ্ছে।
তিন মাস হয়ে গেল তবু শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এল না টুসু। ছহা একা একা ঘোরে। তার ভীষণ মন খারাপ। অপু রাতে মা-মা করে কাঁদে। তার দুধ খাওয়ার অভ্যাস। পরমা তাকে নিজের দুধ ধরিয়ে দেয়। অপু চোষে। চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সবাই ঘুমোয় কিন্তু ঘুম আসে না লাটু সিংয়ের। মদের ঠেকের বুস্তমের কথা মনে পড়ে। তার বাবার চাকরিটা সে পেয়েছে! বুস্তমের বাবা ফকির মারা গেল অন ডিউটিতে ট্রেনে কাটা পড়ে। বুস্তমের তারপর আর সরকারী চাকরি পেতে কোনো অসুবিধা হল না। ছেলেটি এখন দাঁড়িয়ে গেছে। রোজ ফিটফাট বাবু হয়ে অফিসে যায়। লাটু সিং বুস্তমের মধ্যে দেখতে পেল ছটাকে। ধীরে ধীরে সে হয়ে গেল ফকির।

টুসু ফিরে এসে কাঁদল লাটু সিংয়ের জন্য মনে মনে ভাবল, বাবা হওয়া কত কঠিন কাজ! □

# ডাইনিং টেবিল

## শম্ভু চক্রবর্তী

— মেয়ে নয়, শালীও নয়। তবে কে ?

— ঐ··· মেয়েরই মতো। ছোটবেলা থেকে আমাদের কাছে আছে।

— তাই বল। আজকাল বাবুদের বাড়ীর কাজের মেয়েকে চেনা দায়। তোর বয়সটা আমি জানি। নইলে তোর প্রেমিকা বলে ভুল করতেও পারতাম।

ডাকঘরের কাউন্টারের পেছনে নিজের কুঠুরীতে বসে সুশান্ত খিক্ খিক্ করে হাসল, "অবশ্য কোন কোন বাবু বা দাদাবাবু এসব মেয়েদের সঙ্গে ইয়েটিয়ে করে। খবরের কাগজে সে সব খবর বার হয়।"

সুশান্তর কথায় বিধান-এর গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। ওর এই ফিচেল হাসির শব্দতরঙ্গ সুশান্তর শরীরে কেন্নো বেয়ে যাওয়ায় শিরশিরানী তোলে। ছি ছি। কোন সুস্থ রুচির মানুষ এরকম কদর্য ইঙ্গিত করতে পারে ! বিধান কাউন্টারে থেকে পিছলে যেতে চাইলেও পারল না। প্রসঙ্গ পাল্টে সুশান্ত তাকে গেঁথে রাখে। "তোর চেহারাটা একই রকম আছে। স্কুল কলেজে যেমনটি দেখেছি। স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম, দিলীপকুমার। আর আমাকে দেখ। চল্লিশ পেরোতে না পেরোতে কেমন বুড়িয়ে গিয়েছি।····· তোর কাছে সিগারেট আছে ?"

বিধান হাতে ধরা এটাচি খুলে দামী ব্র্যাণ্ড-এর একটা সিগারেট ও লাইটার কাউন্টারের ফোঁকর দিয়ে গলিয়ে দেয়। সুশান্ত লাইটারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। জ্বালানোর চেষ্টা করে। পারে না।

চশমার মোটা লেনসের পিছনে সুশান্তর চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। বিধানের আঙুলে পরা শ্বেতপ্রবালের মতো। কয়েকবার চেষ্টা করে জ্বালাতে না পেরে লাইটার ফেরৎ দেয় সুশান্ত। "এসব দামী জিনিস। আগুন বার করতে পারলাম না। আমার খ্যাঁচাকলই ভাল।"

কি করে এমন এঁটুলি পোকার মত একদা সহপাঠীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, ভাবছিল বিধান। রক্ষা পেল সুশান্তর রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে একগাদা চিঠি নিয়ে জনৈক অফিস পিয়ন এসে দাঁড়তে। "দেড়টা বাজে। যাই-রে। আমার কাউন্টার-এ ভিড় কমে গেছে। মনে হয় আমার

টার্ন এসে যাবে।"

"ঠিক আছে। এদিকে কোনদিন এলে ঘুরে যাস। স্কুল-কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে তো দেখাই হয় না। কত কথা জমে আছে। বলার লোক পাই না।"

মেধাবী ছাত্রী সুশান্তর অনেক বড় চাকরি পাওয়ার কথা। সে এখানে ধুঁকছে. আর বিধান! সুশান্তর তুলনায় ফেকলু ছাত্র হলেও আজ ঝাঁ চকচকে ব্যাঙ্কে বসে। প্রমোটি অফিসার। সুদৃশ্য অফিসের মতই তার বেশভূষা। নিটোল নির্মেদ কাউবয়মার্কা শরীরে. আধুনিক পোষাক। সামনের চুল আর দু'ধারে জুলপিতে পাকা চুলের মিশেল বিধানকে আরো সুন্দর এবং অভিজাত করে তুলেছে। অথচ সুশান্তর স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা. ঈর্ষণীয় রেজাল্ট এখন এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পোস্ট অফিসে চিঠির পর চিঠিতে ধাতব মোহরে তারিখ ছেপে যাচ্ছে। প্রতিদিন তারিখ পাল্টালেও ওর জীবনে কিছুই পাল্টানর প্রত্যাশা নেই। ছাদের আনাচ-কানাচ থেকে ঝুলের ঝালরে সজ্জিত. যত্রতত্র ডাঁই করে রাখা নোংরা পোষ্টাল ঝোলা আর তিলে পড়া চেয়ার টেবিলের মাঝে বসে থেকে থেকে সুশান্তর জীবন এখন বদ্ রসিকতা, দারিদ্রের হাহাকার আর বাঙালপনায় পর্যবসিত হয়েছে।

আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে নিজের সামাজিক অবস্থান বা সাফল্যের পরিমাপ করা যায় না। আজ একটু আগে ঝর্ণা পোষ্ট অফিসের করিডোরে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিধান লাইনে দাঁড়িয়ে। ঝর্ণাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে বিধানকে নিজের কাউণ্টারের সামনে হাজির করিয়েছিল সুশান্ত, "কি রে বিধান। চিনতে পারিস? বলতো. আমি কে?"

এভাবে সুশান্ত না ডাকলে বিধানের জানা হ'ত না। এইসব সুশান্তর থেকে সে এখন কতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজের সাফল্যের জন্য বড় সুখ অনুভব করে সে। এমনকি তাদের বাড়ীর কাজের মেয়ে ঝর্ণা-ও ঐ সুশান্তর থেকে থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। সুশান্ত তা বুঝতেও পারে নি।

শেষ বৈশাখের মধ্যদিনে ঠা ঠা রোদ্দুরে ডাকঘর থেকে দুজনে বেরিয়ে এলো। বিধান জিজ্ঞাসা করে। "সইসাবুদতো তুই করলি। কত টাকা পেলি? জানিস?

আমি জেনে কি করব? তবে মা-কে টাকাগুলো দেবার আগে আমাকে কিছু টাকা দিও। মাকে কিন্তু কথাটা জানানো চলবে না।

"বাঃ। টাকা নেবে তুমি। আর আমি সরলাদির কাছে তা চেপে যাব! পাপ হবে না?" বিধান মৃদু হাসে, "কত টাকা তোর দরকার?"

ঝর্ণার মুখেও হাসি। তবে তা লজ্জার না অপ্রতিভ হবার অথবা আবদারে গলে যাওয়ার — তা বোঝা যায় না।

ঝর্ণা বলল, "মামা। একটা খেলনা মেশিনগানের কত দাম হবে?"

## দুই

দেখতে দেখতে ঝর্ণা সুন্দরী যুবতী হয়ে উঠেছে। বছর ছয়েক আগে কি বিশ্রী চেহারা ছিল তার! লম্বা, রোগা ডিগ্‌ডিগে। বাবুই বাসা চুল। ত্বক পরিচর্যা না করায় শরীরের নানা স্থানে খড়িমাটির সাদাটে দাগের মত ছোপ ধরা। বিট্টুর জন্মের পর পরই সরলা তার মেয়েকে বিধানের সংসারে জুটিয়ে দিয়েছিল। অতসীকে টুকটাক্ কাজে সাহায্য করবে। বাচ্চা সামলাবে। তখন ঝর্ণার কতই বা বয়স। দশ-এগারো হবে। এরই মধ্যে তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। নিয়মিত মাজা-ঘষায় শরীরে গর্জন তেল লাগানর জৌলুষ। আলো ঠিকরে পড়ে। অতসীর একটা পরিত্যক্ত অথচ নিটোল শাড়ীতে আজ বর্ণাকে দেখাচ্ছে পরিণত শাল বৃক্ষের কাণ্ডের মত সুঠাম, ঋজু এবং মনোহর।

ঝর্ণা কাজে লাগার পর প্রথম দিকে বিধান অতসীর কাছে আপত্তি জানিয়েছে, গরীবের মেয়ে। তাকে এত সাজিয়ে গুজিয়ে রাখার কি দরকার? ওকে ওর মতো থাকতে দাও। ওর জন্য আলাদা করে স্নো-পাউডার, সাজার জিনিস, ভালো জামাকাপড় আনাবার দরকার কি?

অতসী বলত, "আমার বাড়ীতে কাজ করে। বিট্টুকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে। রোজ বিকেলে বেড়াতে যায়। ওকে নোংরা রাখা যায়! তাছাড়া — ও গরীব বলে কি সাধ আহ্লাদ থাকবে না। পাঁচজনের জন্য তো কিছু করতে পারা সম্ভব নয়। একজনের জন্য না হয় একটু খরচ করলাম।"

মেয়েকে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে দেখে সরলাদির গেরস্ত বুদ্ধি জেগে উঠেছিল, "দাদাবাবু। মাসে মাসে যে মাইনে ওকে দাও — তা রাখতে পারি না। বরং মেয়ের নামে পোষ্ট অফিসে টাকাটা জমিয়ে রাখো। মেয়ের বিয়ের সময় কাজে লাগবে।"

রেকারিং ডিপোজিট-এ সেভাবে মাস মাস টাকা রেখে আজ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বারো হাজার টাকা তোলা হ'ল। টাকাটা মলঙ্গা লেনে তার

পৈত্রিক বাড়ীতে কর্মরত সরলাদির হাতে তুলে দিতে চলল বিধান। তারপর ফিরে যাবে নিজের বাড়ীতে।

পাতাল রেলের জন্য চিত্তরঞ্জন এভিনিউ খোঁড়াখুড়ি করা। রাস্তায় হাঁটা যায় না। বৌবাজার ডাকঘর থেকে বেরিয়ে ফিরিঙ্গি কালিবাড়ীর দিকে এগোচ্ছিল দু'জনে। সর্টকাট রাস্তায় পৌঁছে যাবে মলঙ্গা লেন-এ। হঠাৎ ঝর্ণা হাত ধরে বিধানকে টানে। চমকে ওঠে বিধান, 'কি হল ?'

"ঐ দেখো মামা। কত চেয়ার, ডাইনিং টেবিল সাজিয়ে রেখেছে। চলো না। দেখবে। মামী সেই কবে থেকে বলছে। ডাইনিং সেট কেনো। তুমি না কি দোকানে আসার সময় পাও না। এখন দরদাম করে নাও। তারপর না হয় একদিন মামীকে নিয়ে আমি অর্ডার দিয়ে যাব।"

কয়েক হাত পেছনে মোড়ের মাথায় মেট্রো রেল-এর বিশাল ক্রেন নেমে এল। মাটি কাটা এবং তোলার হাঙর মুখো নৌকোটা সর সর করে পাতালে ঢুকে গেল। শব্দ উঠল "ঠক্।" শব্দটা বিধানের মধ্যেও ধক্ করে ওঠে। কি করে ঝর্ণাকে এড়াবে বিধান। একদিকে দোকানদার ডাকাডাকি করছেন, অন্যদিকে ঝর্ণা হাত ধরে টানছে। পরিত্রাণ পেয়ে যায় বিধান, রিষ্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলে, "সর্বনাশ করেছে। আড়াইটা বাজে। একবার ও বাড়ীতে ঢুকলে বৌদিদের হাত থেকে সহজে ছাড়া পাব না। তুইও তোর মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলবি। এখানে দোকানে দেরী করলে বাড়ী থেকে বের হতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। তোকে নিয়ে তখন বাসে ওঠা যাবে না। বুঝলি। তোর তো আর ভিড় বাসে ওঠার অভ্যাস নেই। এখানে দাঁড়াস্ না, চল্·· চল্···।"

মলঙ্গা লেনের পৈত্রিক বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে বিধান ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। একবার দরদাম করলেই হ'ত। কেনা না কেনা তো পরের ব্যাপার। আজ ঝর্ণা যদি বলে দেয় অতসীকে। পথের দু'পাশে অজস্র ফার্ণিচারের দোকানের কথা। নিশ্চয়ই অতসী বিধানকে দু'চার কথা শোনাবে, অথচ ঝর্ণাকে যে কথাটা চেপে যেতে বলবে — তা শোভন নয়। স্বামী-স্ত্রীর এই লুকোচুরি খেলায় তৃতীয়পক্ষকে আনা ঠিক নয়।

ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে জমি-বাড়ী করেছে বিধান। যাদবপুর-সন্তোষপুরে। ধারের টাকায় কুলোয় নি। বাইরেও কিছু ধার দেনা হয়েছে। সে সব শোধ করতে বিধানের প্রাণান্তকর অবস্থা। কিছুদিন যাবৎ অতসী

বায়না তুলেছে। আধুনিক ডিজাইন এবং সুসজ্জিত তার বাড়ীতে ডাইনিং টেবল নেই। ডাইনিং রুম-এর ইজ্জত রইল কোথায়? অতিথি-অভ্যাগতদের মাটিতে বসিয়ে খাওয়ালে সমাজে মান-সম্মান থাকে!

অতসীর সব ভালো। কিন্তু মাঝে মাঝে তার এমন গোঁ চেপে ধরে। এবং গোঁ চাপলে তাকে নিরস্ত করা দুঃসাধ্য। বিধানের হাতে এখন টাকা নেই — একথা বললে অতসী শুনবে না। হুট করে ধনী বাপ-দাদার কাছ থেকে টাকা ধার করে নিয়ে এসে বলবে, "এই নাও টাকা। নিয়ে এসো ডাইনিং সেট। এর আগে বেশ কয়েকবার এমন ধার করেছে অতসী। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ঘর ভরিয়ে তুলেছে। এবং অতসীর এই সাধ্যের বাইরে খরচ করার দায় বহন করতে করতে বিধান কুঁজো হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রকৃত সত্য গোপন করে মাস দুয়েক যাবৎ টালবাহানা করে যাচ্ছে বিধান। দোকানে গিয়ে দরদাম করে অর্ডার দিয়ে আসার সময় পাচ্ছে না সে। একদিন অফিস থেকে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে ফার্ণিচার-এর বড় বাজারটায় খোঁজ নিয়ে আসবে বলে সে ধোঁকা দিয়ে গেছে।

পৈত্রিক বাড়ীর সামনে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে বিশ্রী এক গন্ধে বিধানের নাক কুঁচকে যায়। তাদের ছোট্ট, আখাম্বা অতি পুরনো এবং জীর্ণ বাড়ী থেকে সোঁদা গন্ধ আসছে। চারদিক ঘিরে আকাশ ছোঁয়া বাড়ী ওঠায় এ বাড়ী সঠিক আলো বাতাস পায় না। সমস্ত বাড়ীটা ঘিরে দারিদ্র্যের ছাপ। শ্যাওলা আর আগাছায় মোড়া অতি দীর্ণ হতশ্রী, আলো বাতাসের দুয়োরানী এই বাড়ীর তুলনায় বিধান এখন অনেকগুণ শ্রেয় ভদ্রাসনের মালিক।

এক লহমায় বিধানের মনে গর্ববোধটা ফিরে আসে। সে শুধু ডাকঘরের সুশান্তর থেকে অনেক বেশী ভাল নেই। এ বাড়ীর বাসিন্দা তার দাদা বৌদিদের থেকেও অনেক গুণ বেশি ভাল আছে সে।

বৌদিদের কথার ঝাঁঝেও যেন ঈর্ষার উঁকিঝুঁকি দেখা দেয়। "তুমি যে··· হঠাৎ··· গরীব দাদা বৌদিদের কথা মনে পড়ল··· এক বছরের মধ্যে এই প্রথম পায়ের ধুলো পড়ল। বৌদিরা তো কম সেবা-যত্ন করে নি··· সব ভুলে গিয়েছো।

ঝর্ণা কলতলায় বসে তার মা সরলার কাছে এক ঝুড়ি কথা নিয়ে বসেছে। কলকল করে চলেছে ঝর্ণা।

বাড়ীর সকলের খোঁজ খবর দেওয়া নেওয়ার ফাঁকে সময় বয়ে যায়।

বড় বৌদি তার রান্না ঘরে ডিমের ওমলেট ভেজে ঝর্ণার হাত দিয়ে মেজো বৌ'র ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঝর্ণা নিজের প্লেটটা হাতে করে ফিরে যায় কলতলায়। মেজো বৌদি বলেছিল, "এখানে বসে খেয়ে যা। কলতলা তো নয়। আস্তাকুড়। ওখানে দাঁড়িয়ে খেলে তৃপ্তি হয়!

ঝর্ণা মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে ফিরে যায়।

মেজো বৌদি গেল চা বানিয়ে আনতে। বৌদিরা অনুযোগ-অভিযোগ যাই করুক না কেন। তাদের আন্তরিকতায় কোন ঘাটতি নেই। একথা ভাবতেই বিধানের বুকের ভেতরটা খচ্ করে ওঠে। সামাজিক অবস্থান পাল্টে যাওয়ায় সে কি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার নাড়ীর টানের সঙ্গে এ বাড়ীর টান জড়িয়ে আছে। তবে কেন এ বাড়ী ছাড়ার পর বারো মাসের মধ্যে একবারও এ বাড়ীতে ঘুরে যায় নি! ডাকঘরে দেখা সুশান্তকে দেখে বিধান স্বোপার্জিত সাফল্যের অহমিকায় সুশান্তকে অনেক ছোট করে দেখেছে। যে বাড়ীর দোড়গোড়ায় তিরিশটা বছর অর্বুদ-নির্বুদবার দাঁড়িয়েছে বিধান, আজ কেন সেখানে দাঁড়িয়ে বদ্ গন্ধ পেল সে। ভেতরে ঢুকতে যে অস্বস্তি হচ্ছিল, তা কি তার উচ্চম্মন্যতার সফল!

কিন্তু ঝর্ণা তো তার শ্রেণীচেতনা বিলুপ্ত হয় নি। কলতলার সামনে বড় বৌদির প্রাগৈতিহাসিক গুহার মত রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কেমন অনায়াসে তৃপ্তি ভরে ওমলেট খাচ্ছে ঝর্ণা। মধ্যবিত্ত স্বাচ্ছন্দে ও পরিচর্যায় মানুষ ঝর্ণা তার সঠিক শ্রেণীগত অবস্থান জেনেই আস্তাকুড়-সদৃশ কলতলায় তার মা-এর সঙ্গে কথা বলছে।

হাতের কাজ সারা হ'তে সরলাদি বিধানের সামনে এসে দাঁড়ায়। "ঝর্ণা বলছিল, ওর নামে জমানো বারো হাজার টাকা আজ তুলেছো। ও টাকা এখন আমি নেব না। আমার ছেলে দুটো মানুষ না। মেরে ধরে কেড়ে নিয়ে নয়তো চুরি করে সব টাকা ফুঁকে দেবে।... আমি বরং মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজি। টাকাগুলো তোমার ব্যাঙ্কে রেখে দাও। বিয়ে ঠিক হলে তুলে দিও।"

বিধান আপত্তি জানায়, "এখন আমার খরচের মরশুম। এত টাকা গচ্ছিত রাখছ। আমার হাতে থাকলে খরচা হয়ে যেতে পারে।"

সরলা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, "হয় হবে। তুমি তো আর টাকাটা মেরে দেবে না। বিয়েরও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। দরকারের সময় ঠিকই দিতে পারবে। কত বড় চাকরি করো, তা কি আর জানিনে।"

## তিন

দরজায় কলিংবেল বাজানোর আগেই ঝর্ণা দরজা খুলে দেয়। ঝর্ণার উপহার দেওয়া মেশিনগান তাক্ করে বিট্টু আদেশ দেয়, "হ্যাণ্ডস্ আপ।" মেশিনগান থেকে শব্দ ওঠে, "কট্ কট্ কট্ কট্……। বিধান তড়িঘড়ি হাতের ক্যারী-ব্যাগ ও এ্যাটাচি মাটিতে নামিয়ে দু'হাত তুলে দাঁড়ায়। অবশেষে সে হাটু গেড়ে বসে। মাথাটা কাঁঠের একপাশে কাত্ করে বলে, "আমি খতম্। এবার তোমার কটকটানি বন্ধ হোক। কান তুড় তুড় করছে।

বিট্টু বলল, "জানো বাবা। আজ কজন লোক এসে বাড়ীতে ডাইনিং চেয়ার, টেবিল দিয়ে গেছে। কি সুন্দর দেখতে। আর কেমন সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে ওগুলো থেকে।"

বিধান যেন অবাক হয়েছে, "তাই না কি ? আচ্ছা। আজই দিয়ে গিয়েছে! অফিসে বসে আমিও গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাই ফেরার পথে মাংস নিয়ে এসেছি। ঝর্ণা। বাজারটা কিচেন-এ নিয়ে যা। আজ রাতে গ্রাণ্ড ফিষ্ট হবে।"

ঝর্ণা কিচেনের দিকে চলে যায়। পেছন পেছন বিট্টু। স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছে, "আমাদের বাড়ী আজ মাংস খাওয়া হবে। কি মজা! মাংস হবে। মাংস।"

বসবার ঘরে অতসী কপট রাগে ফেটে পড়ে, "ছি ছি। মানুষকে এমন অপ্রস্তুত করতে আছে! দুপুরবেলা একটা টেম্পো বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বলে, "আপনাদের বাড়ীর ফার্ণিচার।" আশেপাশে বাড়ীর জানলা দিয়ে কেউ কেউ উকিঝুঁকি মারছে। লোকটাকে বললাম, "আপনি ঠিক বলছেন তো। আমি তো এ ব্যাপারে কিছু জানি না। তখন লোকটা তোমার চিঠি দিল। বলল, "এটা পড়ে দেখুন।"

— কেমন চমক দিলাম…বলে। আনন্দ হচ্ছে না! আগে ভাগে জানলে এমন আনন্দ হ'ত ?

— আনন্দ না ছাই! তখন আমার বুক দুরদুর করছে। এমন সুন্দর ডাইনিং সেট। বোধহয় ভুল করে আমাকে দিতে চাইছে। ভাবছিলাম — নিতে তো পারব না। এমন কষ্ট হচ্ছিল।

শনিবারের সন্ধ্যার টিউশনি করে বাড়ী ফিরল বিধান। দেখল, বাড়ীতে উৎসব লেগেগেছে। ডাইনিং রুমে বিট্টু একটার পর একটা চেয়ার পাল্টে

CENTRAL LIBRARY

পাল্টে বসছে। থেকে থেকে আয়নার মত ঝকঝকে টেবিল-টপ-এ নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছে। গন্ধ শুঁকছে নতুন বার্নিশ রং-এর। কিচেন থেকে রান্না মাংসের সুঘ্রাণ ভেসে আসছে।

এতদিন অতসীর আলমারীতে চায়না ক্লে-র ডাইনিং সেট যক্ষের ধনের মতো আটক ছিল। সেগুলো ধুয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল ঝর্ণা। শুকনো কাপড় দিয়ে সেগুলি নতুন করে মুছতে মুছতে ঝর্ণা বিট্টুকে সাবধান করে, "ভাই, এখন লাফালাফি করবে না। টেবিলে ধাক্কা লাগলে প্লেটগুলো ভাঙবে। বিট্টু শান্ত হয়। অতসী রান্নাঘর থেকেই বলে, "তুমি স্নান করে এসে টেবিলে বসে যাও। খানা রেডি, গরম গরম খানা।"

কিন্তু জ্যৈষ্ঠের এই অসহ্য গরমের রাত্রে গরমখানা যে কি আত্মপ্রতারণার পটভূমি তৈরী করে রেখেছিল, বিধান তা কল্পনা করতে পারে নি।

রোজ রাতে এ বাড়ীর সকলে গোল হয়ে বসে। প্রথমে অতসী তিনজনকে খাবার পরিবেশন করে। ঝর্ণা বিট্টুর ভাত মেখে দেয়। নিজে খেতে খেতে কোন সময় বিট্টুর পাতের মাছ থেকে কাঁটা বেছে দেয়।

আজও তেমনি বসেছিল তিনজনে। একদিকে ঝর্ণা আর বিট্টু, উল্টো দিকের চেয়ারে বিধান। বিধান মজা করে বলেছিল, "এক নম্বর কেবিন-এ চারটে স্পেশাল মিল লাগাও।"

ভাতের 'বাউল' টা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে অতসী গম্ভীর স্বরে বলে, একী, ঝর্ণা' তুই এখানে বসেছিল কেন? তোকে তিনটে প্লেট বার করতে বলেছিলাম, চারটে নামিয়েছিস্ কেন? যা রোজকার মতো মেঝেতে গিয়ে বস।

একী অবিশ্বাস্য উচ্চারণ, এও কি সম্ভব! অতসী আজ এই আনন্দঘন মুহূর্তে এমন কথা কেন বলবে? কি এমন করেছে ঝর্ণা!

ঘরময় অদ্ভুদ নীরবতা। মাথার উপরে টপ স্পীডে ঘুরছে ফ্যান। ফ্যান এর ব্লেডগুলি বাতাস কাটছে। শব্দ উঠছে···শন্···শন্···শন্···।

জমাট নীরবতা ভেঙে অতসী তার কণ্ঠস্বরে আরো দৃঢ়তা আনে, "কি হল? হবার মতো বসে রইলি যে, ওঠ। আসন নিয়ে আয়।"

বিট্টু প্রতিবাদ করে, "না, দিদি আমার পাশে বসবে। আমার ভাত মেখে দেবে।"

অতসী ধমক দেয়, "চুপ করো, পাকামি করতে হবে না, এবার থেকে

আমিই তোমার ভাত মেখে দেব।”

বিধান এতক্ষণের বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠে, তুমি কি ঠিক বলছো ? কি বলছো, তা কি তুমি জানো ? ভেবেচিন্তে বলছো না মাথা গরম হয়েছে।”

—মাথা গরম হবার কি দেখলে ? মাথা আমার ঠিকই আছে, গরীব ঘরের মেয়ে, এত বাবুয়ানি ভাল নয়। গরীবের ঘোড়া রোগ !”

বিধান ঝর্ণাকে দেখল, তার উজ্জ্বল অথচ সরল দুই চোখে বিষাদের ছায়া। অমন বোবা বিষন্ন — চোখের মতই বিধানের বিচারশক্তি অবুঝ। অতসী কেন এমন করছে। হঠাৎ ক্ষেপে যায় বিধান, “না ঝর্ণা এখানেই বসবে, আমাদের সঙ্গেই খাবে।”

অতসী ঠেস মেরে আঁতে ঘর মেরে বলে, “হ্যাঁ, এভাবেই কাজের মেয়েকে আস্কারা দাও,…আজবাদে মেয়েটার বিয়ে হবে, ওর মা কোন জমিদারের ঘর থেকে জামাই আনবে ! যদি কোন হাভাতের হাতে পড়ে, কোথায় পাবে এমন ডাইনিং, চেয়ার, চিনেমাটির বাসন ! তখন ছেঁড়া চ্যাটাইও জুটবে কিনা — কে জানে ?

বিধান তার স্বাভাবিক মিতভাষী নম্রতা ভুলে চিৎকার করে ওঠে, তবে কেন এতদিন ওকে সেটা বুঝতে দাও নি, এতোদিন বলে এসেছো — ও বাড়ীর মেয়ের মতো। আজ উল্টো সুর। রাখো নি কেন ওকে ওরই মতো করে ? কোনদিন ওকে বুঝতে দিয়েছো, ও গরীব, ওরা হত দরিদ্র। ওর সাজগোজ, প্রসাধনী যা দিয়ে এসেছো … ওর, ওদের শ্রেণীর মানুষ তা জোগাড় করতে পারে ? এতদিন এ সব না ভেবে এখন তোমার জ্ঞানোদয় হয়েছে ! ! যতো সব হিপোক্র্যাট !!!

অতসী বিধানের কথার তোড় পাথুরে শীতলতায় অগ্রাহ্য করে। পোষাক-আশাক একটা বাইরের অভ্যাস। প্রয়োজনে তার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যায়। অবস্থার ফেরৎ-এ মানুষ সেই অভ্যাস কাটাতেও পারে, কিন্তু সাহেবি কেতায় টেবিলে বসে খাওয়ার অভ্যাস ওর মজ্জায় ঢুকে যাবে। স্বামীর ঘর করতে গিয়ে ওকে যদি প্রথমেই নীচে নামতে হয় … পারবে সেই লোকটাকে মেনে নিতে ? শ্রদ্ধা ভক্তি করতে পারবে ? পারবে তার ক্লাসকে প্রথম দিন থেকেই মেনে নিতে ?

অতসীর যুক্তিহীন যুক্তিতে বিমূঢ় বিধান। অতসী এতদিন বিট্টুর সঙ্গে ঝর্ণার কোন তফাৎ রাখে নি। ভাই বোনের মত দুটিতে বেড়ে উঠেছে … তাদের এই ছোট সংসারের একজন হয়ে উঠেছে। আজ সহসা তাকে এমন

ভাবে নীচে নামিয়ে দিয়ে যেন হতমান করতে চায় অতসী। এক সেট ডাইনিং টেবিল আর চেয়ার নির্মম এই বিভেদ এনে দিল ? শ্রেণীগত বিভেদ !

অথচ অতসীতো জানে না। জানবেও না কোনদিন। একটা লুকানো দুষ্ট রাতের যন্ত্রণা আজীবন বয়ে বেড়াবে বিধান সে ডাইনিং চেয়ার থেকে আজ ঝর্ণাকে নামিয়ে দিতে চাইছে। অতসী — তা যে ঝর্ণারই জমানো টাকা ভেঙে কেনা। সরলাদি টাকাটা নেয় নি বলেও অকালে কিনতে পেরেছে এগুলো।

মাংসের বাটিগুলি রান্নাঘর থেকে এনে অতসী টেবিলের উপর রাখছিল। বিধান অস্ফুটে অনুরোধ করে "অতসী, প্লিজ, অন্তত আজকে…।"

ঝর্ণা এতোক্ষণ মাথা নীচু করে বসেছিল। হঠাৎ উঠে পড়ে সে। "থাক মামা, আমি নীচেই বসছি।"

বিট্টু শরীর কুঁকড়িয়ে টেবিলের কাণায় চিবুক ঠেকিয়ে বসেছিল। অতসী ধমকায়, "বিট্টু ঠিক হয়ে বসো।"

পাশে বসে ছেলেকে ভাত মেখে খাইয়ে দিচ্ছে অতসী। হঠাৎ বিধানের খাওয়া লক্ষ্য করে অতসী জিজ্ঞাসা করে, "কি হল ? অমন দু-চারটে করে ভাত ভেঙে খাচ্ছ কেন ? রান্না ভাল হয় নি ?"

বিধান ঘোবা চোখে অতসীর দিকে তাকায়, এমন সুন্দর সন্ধ্যার যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি ঘটেছে — তাকে আরও তিক্ত না হবার প্রচেষ্টায় বিধান গলা ঝাড়ল। এ ভাতে তার কণ্ঠনালীতে জমে থাকা বায়ু-গোলা বিরূপতা… অসহায়তা সে সরিয়ে দিতে চায়। ভাতের চূড়া ভেঙে প্লেটের উপর ছড়িয়ে নেয় সে।

খেতে খেতে পিছনে মেঝের এককোণে ভোজনরত ঝর্ণাকে আড়চোখে দেখল বিধান। ঝর্ণা তার থালায় মাখা অন্নপিণ্ডকে আঙুল দিয়ে অবহেলাভরে কেটে কেটে ভাগ করছে। স্টেনলেস স্টীলের থালায় আঙুল ঘষায় শব্দ হচ্ছে। শব্দটা কি ঝর্ণার থালা থেকে উঠছে না হৃদয় থেকে। কেটে খান্ খান্ হয়ে যাবার শব্দ। যে শব্দের প্রকাশ কোন অক্ষর সাজিয়ে করা যায় না।

শব্দটা বিধানের মধ্যেও বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে ছুটোছুটি করতে তাকে অবশ করে ফেলে। □

# আজ-কাল পরশুর গল্প

## প্রবীর জানা

বাবলি এত দেরী হল তোর আসতে ? প্রশ্ন করে অপর্ণা। বাবলি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে — যা ট্রাফিক জ্যাম ! আবার তোর জামাইবাবু অর্থাৎ আমার ঐ পতিদেবতার ডিউটি থেকে ফিরতে দেরী হল — তাই ! বাবলির স্বামী অর্থাৎ সমীর — অপর্ণার দিকে দু'হাত জড়ো করে বলেন — নমস্কার ! আপনার সম্বন্ধে অপর্ণার বন্ধুর কাছে কত কথা শুনেছি। দীর্ঘদিন হল এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছি। হঠাৎ সেদিন টেলিফোন গাইডে আপনাদের ফোন নাম্বার দেখলাম। — তাই যোগাযোগটা হয়ে গেল। আজ সামনাসামনি দেখার সুযোগ হল।

বাবলি হাসতে হাসতে বলল সমীরকে — তুমি আবার অপর্ণার প্রেমে পড়ে যেওনা কিন্তু। একসময় অপর্ণাকে সকলে বলত সুন্দরী — বিশেষ করে যখন সে কলেজে পড়ত। কী অসাধারণ ছিল ওর রূপের জৌলুষ। সমস্ত কলেজের ছাত্ররা ওর বুকের দিকে..... ।

—কী যা তা বলছিস বাবলি ! — লজ্জায় মুখ নীচু করে অপর্ণা। বাবলি বলতে থাকে — ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছোটবেলা থেকে। একই সঙ্গে স্কুলে পড়েছি কলেজেও। অপর্ণা ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হল মাস্টার ডিগ্রি পড়তে আমার ঐ সময় বিয়ে হয়ে গেল। তারপর আমাদের আর দেখা হয়নি। কত বছর কেটে গেল। আবার আজ··· ।

—অপর্ণা হাসল — সত্যি মনের টান এরকমই হয়। হঠাৎ আমি তোর কথা ভাবছি তখন। ফোনটা পেলাম। যেন টেলিপ্যাথি হয়ে গেল।

বয়স ত্রিশের বেশী হলেও বাবলিকে দেখে তা বোঝা যায় না। গায়ের রঙ আগে যেন এতটা ফর্সা ছিল না। এখন শরীর থেকে ওর কেমন দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে। মেদহীন শরীর যাকে বলে স্লীম ফিগার। ভ্রূ-প্ল্যাক, স্টেপ কাট মাথার চুল ঘাড়ের ঠিক নিচে পিঠের ওপর ঢেউ খেলছে। রুজ মাখা গালের টোলে কী অপরূপ ওর হাসির ঝিলিক। অপর্ণা বলে — বাবলি তোর যে বয়স হয়েছে একেবারেই মনে হয় না। তুই কী কোন ওষুধ-টোষুধ ! বাবলির মুখে সেই চিরপরিচিত হাসির রেখা ফুটে ওঠে — আজকাল অবশ্য

অনেকে হর্মন ইন্‌জেকশান নেয়। আমি জিম, ফেসিয়্যাল, ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সার-সাইজ করি। তা না হলে যে যৌবন তাড়াতাড়ি গুডবাই করবে। মেয়েদের শরীরের জৌলুষ চলে যাওয়া মানে তারা পুরুষদের কাছে নারকেলের ছোবড়া। তাছাড়া এসব এ্যারিস্টোক্রাসি। আমার স্বামীর ইচ্ছা, ক্লাবে যাই পার্টিতে যাই। মানুষের আয়ু কখন ফুরিয়ে যাবে কেউ জানে না। তাই যত পারিস লাইফকে এনজয় করে যা।

সমীর এত সময় অর্পণাদের বসার ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। —তিনি শুধু. হাসলেন।

অপর্ণা বলল — জামাইবাবু. আপনি এই পেপার ম্যাগাজিন পড়ুন। আমরা দু'বন্ধু ঐ ঘরে গিয়ে গল্প করছি।

সমীরের গায়ের রঙ তামাটে। খর্বকৃতি মুখ। ভোঁতা নাক। লম্বা ছয় ফুটের মত। কম কথা বলেন। হাতের পেশির দিকে তাকালে মনে হয় যেন কোন মল্ল যোদ্ধা। — অপর্ণা ও বাবলি ওদের শোবার ঘরে খাটের ওপর আরাম করে বসে। অপর্ণা বলে — জামাইবাবুকে দেখলে মনে হয় ভীষণ রাশভারী মানুষ তাই না? কথা কম বলেন।

—হওয়াটা স্বাভাবিক। ওর চাকুরিটা যে সেরকম। এখন সে থানার ওসি। সামনে তাকায় বাবলি — সে অবাক চোখে তাকায় খাটের পাশে ইজেলে আটকানো ছবির দিকে। সে চেঁচিয়ে ওঠে — একী! আমার ফ্লাটের বারান্দার ছবি। — আমি বারান্দার গ্রীল ধরে এলোচুলে দাঁড়িয়ে আছি।

রোগা ছিপছিপে শরীর যেন পেটা লোহা. মাথায় ঝাঁকড়া চুল গোঁফ ভর্তি মুখ আধময়লা পায়জামা পাঞ্জাবী পরা এক যুবক ওরা যে ঘরে বসে আছে তার দরজার কাছে এসে বলল — অপর্ণা, এদিকে এস।

কিছু সময় পরে অর্পণা সিঙাড়া মিষ্টি চপ ভর্তি প্লেট বাবলির সামনে এনে রেখে বলল — জামাইবাবুকে খেতে দিয়েছি। তুই কখন সেই দুপুরে খেয়েছিস। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। খেয়ে নে. চা একটু পরে দিচ্ছি।

বাবলি খেতে খেতে বলে — আমরা একটা পার্মানেণ্ট কাজের লোক খুঁজছি। ঐ লোকটা তোদের টেম্পোরারি বাজার সরকার না ··· !

—তুই ভুল করছিস বাবলি। উনি আমার হ্যাজবেণ্ড তারক। বাবলির মুখে ওপর যেন বিদ্রুপের ভাব ফুটে ওঠে। সে বলে—তোদের কাজের লোক নেই।

—আমরা নিজেরাই সব কাজ করে নিই।

তা বলে রান্না করা, ঘরমোছা, বাসন মাজা··· ।

—আমার হ্যাজবেণ্ড ভীষণ ভালো মানুষ। দরকার হলে সে আমাকে সাহায্য করে। কোন অসুবিধা হয় না !

অপর্ণার এই কথাগুলো বাবলির যেন পছন্দ হয় না। তার কপালের কয়েকটা রেখা ফুটে উঠতে দেখে মনে হয় তাই। সে বলে — তোর স্বামী কী করেন ?

—তেমন কিছু না। — বলে অপর্ণা।

বাবলি বলে—তোকে বললাম না একটা কথা, হয়তো কষ্ট পাবি শুনলে।

—অপর্ণা বিস্মিত হয়ে বলে — কী এমন কথা।

বাবলি তাকিয়াটাকে কোলের ওপর সরিয়ে এনে আরাম করে বসে বলতে থাকে— কাল তোদের বাড়িতে আসার কথা ছিল। ড্রয়িং রুম থেকে সকালেই আমার পছন্দের ক্যামেরাটা চুরি হয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে যায়। তাই এলাম না। কাল সকালেই একটা লোক আমাদের ফ্ল্যাটের ঠিক সামনে রাস্তার ধারে বসে হাঁ করে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল। তারপর ক্যামেরাটা খুঁজে পাচ্ছি না। এখন চোর কে তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু···।

কিন্তু কী ? — প্রশ্ন করে অপর্ণা। বাবলি বলে — আজ থাক। অন্যদিন বলব।

অপর্ণা ও বাবলি এসে দেখে তারক ও সমীর পাশাপাশি বসে জমিয়ে গল্প করছে। সমীরকে এভাবে গল্প করতে দেখে বাবলির মেজাজটা যেন বিগড়ে যায়। সে বলে — গল্প পেলেই যেন মজে গেলে। বাড়ি যেতে হবে না ? সমীর তার স্ত্রীকে ভালো করে চেনে। কতবার সে রেগে কাপপ্লেট রেডিও টেপ এমন কী একবার রঙিন টিভিটাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। থানায় গেলে চোর ডাকাত খুনী সবাই তাকে ভয় করে। কিন্তু বাড়িতে এসে সে স্ত্রীর ভয়ে একেবারে কেঁচো। সমীরের মুখটাকে দেখে মনে মনে হাসে অপর্ণা। সমীর হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যায় একজন মাঝ বয়সী লোককে দরজার সামনে দেখে। সে চেঁচিয়ে ওঠে — বঙ্কা তুই !

শীর্ণ শরীর ছেঁড়া জামা ও ধুতি পরা বঙ্কা বলে — স্যার, কাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করি। থানায় এলাম। আপনাকে পেলাম না। আপনার ফ্ল্যাটে এসে বসার ঘরে গেলাম। কেউ নেই। এই ক্যামেরাটা পড়ে আছে। ওটা নিয়ে গেছিলাম। আজ ফেরৎ দিতে এসেছি।

সমীর বলল — তুই বোম কেসের ক্রিমিন্যাল। ছাড়া পেয়েছিস। চুরির কেসে আবার তোকে জেলে ভরে দেব।

বঙ্কা বলে স্যার, — আপনি আমাকে দিয়ে দীর্ঘ বছর প্রক্সি প্রিজনারের কাজ করিয়েছেন। কুখ্যাত ডাকাত ভাইকা, ছোট নেপলা, হাত কাটা নেড়া যখন ধরা পড়ে জেলে গেছে ওদের ছেড়ে দিয়েছেন। আমি ওদের হয়ে জেলে প্রক্সি দিয়েছি। অবশ্য ওদের ডাকাতির ভাগ আপনি যেমন নিয়েছেন আমাকেও দিয়েছেন। রাত্রে ডিউটিতে বেরিয়ে আপনি আরামে গাড়ির মধ্যে বসে থেকেছেন। আমাকে দিয়ে লরি থেকে তোলা আদায় করিয়েছেন। একবার গভীর রাতে এক লরির ড্রাইভারকে টাকা চাইলাম। সে কিছুটা দূরে গিয়ে লরি দাঁড় করাল। হাতে টাকা বের করে আমাকে ডাকল। টাকা দেওয়ার অভিনয় করতে করতে আমার মুখে মারল লাথি। সেই লাথির দাগটা এখনও আমার গালে স্পষ্ট। আমি প্রক্সি প্রিজনার ছিলাম। কেউ উপর মহলে খবরটা পাচার করে দেয়। তদন্ত হলে আপনি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কেস দেন যে আমি বোম সমেত ধরা পড়ি। আমার সত্যি সত্যি জেল হল। ছাড়া পেয়ে কাল আপনার বাড়িতে এসে ক্যামেরাটায় চোখ পড়তেই মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। থানার সবাই আমাকে চেনে। তারা জানে আমি আপনার লোক। কেউ আমাকে সন্দেহ করেনি। আমি থানার ভেতরে গিয়ে আপনি যে বোমাগুলো গোপনে রেখেছেন তার ছবি তুলি। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পরেই খবর পেলাম কলেজের কিছু ছাত্র — আপনি নানা দূর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এই অভিযোগ এনে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। আপনি নাকী কোন একটি ছাত্রকে বিনা কারণে রাস্তা থেকে তুলে এনেছেন। তার হাতে একটি বোম ধরিয়ে দিয়ে বলেন যে সেই বোমটা নিয়ে থানায় এসেছিল। আসলে ওর কাছ থেকে কিছু তোলা আদায়ের চেষ্টায় আপনি ছিলেন। মাঝে মাঝে এরকম আপনি করে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ বোমটি ফেটে ছাত্রটির মৃত্যু হয়। একটি তরুণ তাজা প্রাণ এভাবে চলে গেল। খবরটা শুনে থানায় গেলাম দেখতে। সে কী রক্ত! মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

সমীর থানার বড় বাবু। বঙ্কার কথা শুনে রাগে তিনি গজরাতে থাকেন। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্কার ওপর। তার কাছ থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে বলেন — হারামজাদা! আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিস্। এবার তুই কী করে প্রমাণ করবি থানায় বোম মজুত ছিল।

বক্তা মাথা চুলকাতে চুলকাতে শান্ত গলায় বলে — স্যার, আপনি না কি রিপোর্ট করেছেন যে থানায় কোন বোম ছিল না। থানায় বোম থাকেও না। ঐ ছাত্রটি বোম নিয়ে থানায় ঢোকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে। নিজের বোম ফেটেই সে ঘায়েল হয় এবং মারা যায়। ঐ কথা শুনে আমি চিৎকার করে বললাম এসব কথা মিথ্যা। সাজান কেস। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করল না। আমি জানি বোমগুলোকে আপনি সরিয়ে ফেলেছেন। প্রমাণ স্বরূপ ক্যামেরার ছবিগুলো রিপোর্টারের হাতে তুলে দিয়েছি। আপনি আমাকে দিয়ে মিথ্যা কেসে জেলের ঘানি টানিয়েছেন। নিরীহ ছাত্রটির মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী। সারা জীবন আমি পাপ করেছি। আসলে প্রেসিডেন্সি জেলে যখন আমাকে কিছুদিনের জন্য রাখে তখন আলিপুরের ঐ জেলে ঋষি অরবিন্দ যে জেলে থেকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান সেই জেলের সামনে যেতেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। ঋষি অরবিন্দ এক সময় বিপ্লবী ছিলেন। বিপ্লবীদের কাজ মানুষ খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি। তাঁর মত মানুষের জীবনে যদি পরিবর্তন আসে আমার কেন আসবে না! মনে মনে তাই ভাবি।

তারক বলল — ঈশ্বর বা এরূপ কোন শক্তি আছে কিনা আমার জানা নেই। আমি অপর্ণার সঙ্গে বাবলি দেবীর কথার সময় বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকেই বাবলিদেবীই চোর সন্দেহ করেছিলেন। কারণ কাল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল বাবলিদেবীদের ফ্ল্যাটে। ভারী সুন্দর বাড়ি-খানা। বাবলিদেবীকে এলোচুলে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ ভালো লাগে। তাই সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কেচ করে নেই। উনারা ভাবলেন, যেহেতু আমি ঐ ফ্ল্যাটের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে ছিলাম এবং তার পরেই ক্যামেরাটা চুরি হয়েছে তাই আমি ওটা চুরি করেছি। সমীরের মুখে কোন কথা নেই। বাবলি বলে — ভাবতে পারিনি এভাবে তোদের সামনে···।

— অপর্ণা বাবলির কথা থামিয়ে বলে — লজ্জার কী আছে। ঝি-চাকর, কালার টিভি, ফ্রিজ গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন — গর্ব করার তোদের কত কী আছে। আমার তো এসব নেই।

— আমার গর্ব এই শিল্পী স্বামীকে নিয়ে। বেচারী ভীষণ সরল। তাই ওকে কেউ বুঝতে পারে না সহজে।

— সারা ঘর নিঃস্তব্ধ। শুধু দূর থেকে একটা টিকটিকির তিনবার টিক টিক টিক শব্দ ভেসে আসে। □

# বাবার ফাঁসি হবে

## চুনীলাল রায়

বাড়িটা এখন কেমন জানি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু এই বাড়িটার এরকম হবার কোনও কারণই নেই। কোনও কারণই থাকতে পারে না। কেননা এই বাড়িটা যে পাড়ায় সেই পাড়াটা সব সময়ই জমজমাট। লোকজনের চলাচল শুরু হয় গভীর রাত থেকেই। আর কখন যে সেই চলাচল শেষ হয় কেউ তা জানেও না। জানতেই পারে না। বোধহয় কেউ জানতেও চায় না।

অথচ সেই পাড়াটা সেই বাড়িটা আজ এখন একদম চুপ হয়ে গিয়েছে। পাড়াতে কোনও সাড়াশব্দই নেই কারো। পাশের বাড়ির দুধের বাচ্চাটাও যেন কাঁদার কথা ভুলে গিয়েছে। পাড়ার মাস্তান কুকুরটাও চুপচাপ। এমন ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছে সবাই যে বলার নয়। মজা এই সময়টা কিন্তু শীতকাল নয়। গরম। এখন গরমের সময়। গরমকাল।

আমাদের বাড়ি। আমাদের পাড়া। নাঃ তা কখনোই আগে এরকম ছিল না। এরকম হবার কথাই নয়। যদিও আমাদের বাড়িটা পাড়ার একদম শেষ মাথায়। বলা ভালো কানাগলির শেষ বাড়িটাই আমাদের। পেছনে একটা ডোবা। মশা। সাপের আড্ডা।

কিন্তু আমার এই মামাবাড়ি। তিনতলা। প্রকাণ্ড। সব ঘরে ঘরেই আলোর রোশনাই। বড়োমামা মেজোমামা ছোটমামা। এক এক তলায় জমিয়ে বসেছেন। টিভি ফ্রীজ ওয়াশিং মেসিন ফোন সবই চলছে সারাদিন ধরে। দাদু অবশ্য এতসব দেখে যেতে পারেন নি। তবুও তারই তো হাতে গড়া এই বাড়ি। দিদা আছেন। তিনতলার ছাদের ওপর একঘরে. তার রাধামাধব নিয়ে। পাশের একটা ঘরেই আমি আছি এখন। আমার পড়ার বই। খাতাপত্তর। জামা কাপড় সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে সেখানে। কাজের মেয়েটা প্রতিদিনই সকালে ঘরের বাইরে গিয়ে গজগজ করে। তার বড়ো জ্বালা। আমার ঘর সাফাই করতে তার নাকী অসহ্য লাগে।

কিন্তু ঐ মেয়েটা ছাড়া আমার ঘরে আর কেউ এখন আসে না। মামীরা না। মামাতো ভাই বোনেরাও নয়। অথচ ক'দিন আগেও ওদের

সবার সঙ্গে কেমন খাতির ছিল আমার। মামার বাড়িতে বেড়াতে এলে খেলাধুলোয় গানে গল্পে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেতো বোঝাই যেতো না।

বুঝতে পারি আমি বড়ো একা হয়ে পড়েছি। আমার কাছে আমার সামনে আমার সঙ্গে এখন কেউ নেই।

তাছাড়া এখন স্কুলও নেই। টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আগে কচিং ক্লাশে যেতাম। প্রাইভেট পড়তেও। কিন্তু এখন আর যেতে ভালো লাগছে না। যেতে ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি না গেলেও এখন যে কেউ আর বলার নেই আমার।

দিদা মাঝে মধ্যে বকেন। আপশোষ করেন। বলেন "হায়রে কী কপাল করে এসেছিলি। আর আজ কি হ'ল তোর ?" আমি দিদার হা হুতাশ শুনি। চুপচাপ। কি আর বলব তাঁকে ? তবে এও বুঝি দিদা মরলে এ বাড়িতে আমার জায়গা নেই। মামারা চাইলেও মামীরা চাইবেন না। আর দাদুর সম্পত্তির ভাগ পেতে কেস কামারী করাও আমার পোষাবে না। তাছাড়া কেস যে লড়ব তার টাকা কোথায় ? কেস করে জিতে সম্পত্তির অংশ বুঝে পেতে পেতে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে।

আর তাছাড়া কেন ওসব ঝুটঝামেলায় যাব আমি ? দাদুর অংশে মার ভাগ আছে। কিন্তু মা কোথায় ? আমি ঝগড়া করব কার সঙ্গে ? কোন্ অধিকারে ?

আমার মা থাকলে এসব আজেবাজে কথা আমায় এখন চিন্তাই করতে হত না। আমি এতক্ষণ পরীক্ষার পড়া পড়তাম। মা একটু কমপ্ল্যান করে আনতেন। আমি খেতে চাইতাম না। মা বলতেন, "পরীক্ষার পড়া। শরীর একটু ভালো না রাখলে চলবে ?"

মার কথা শুনে মাকে জড়িয়ে ধরতাম আমি। মা বলতেন, "নাও এবার পড়তে বোসো। রাতে তোমার জন্যে চিকেন করেছি।"

আমার মা আমাকে সব সময় আগলে আগলে রাখতেন। কিন্তু কী যেন ভাবতেন তিনি। আমি মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করতাম "মা কি এ্যাতো ভাবছো তুমি। এই দ্যাখো না দেখতে না দেখতেই আমার স্কুল কলেজ সব পড়া কেমন শেষ হয়ে যাবে। আমি ডাক্তার হয়ে বেরোব। তোমায় আর কিছু চিন্তাই করতে দেবো না আমি।"

আমি এসব স্বপ্ন দেখাতাম মাকে। ভাবতাম মা বুঝি খুব আনন্দ পাবেন।

কিন্তু আমার কথা শুনে মার চোখে মুখে কেমন যেন একভয় এক বিষাদের ছায়া দেখা দিত। মা মুখে কিছু বলতেন না। আমার মাথায় হাত বোলাতেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিতেন। বলতেন "বাঃ খুব হয়েছে। লক্ষ্মীসোনা আমার। তুমি পড়ো। আমি নিজের কাজ সারি।"

এরকম কথা বলেই মা চলে যেতেন। আমার মনে হ'ত মা যেন পালিয়ে যেতেন আমার কাছ থেকে। আমি কিছু বুঝে উঠতে পারতাম না। তাছাড়া পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। ডাক্তারি পড়তে হবে। অন্য কোনও দিকে নজর দেবার সময়ই ছিল না আমার।

আসলে মার সঙ্গে মা আর ছেলের সম্পর্কের থেকেও যেন বেশি আদরের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল আমার।

কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। বাবা আমার স্কুলের মাইনে দেওয়া মাস্টারমশাইদের মাইনে দেওয়া আমার বই খাতা কেনা সবই ঠিক ঠিক করে দিতেন। অথচ তবুও বাবাকে কেমন যেন বাইরের লোক বাইরের লোক বলে মনে হয় আমার।

আসলে বাবাকে তো আমি সবসময় কাছে পেতাম না। আমার যখন তাঁর সাহায্যের দরকার তখন তিনি নেই। বাবা স্কুল কলেজে ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আমার দরকারে তাঁর দেখাই পেতাম না আমি। তাছাড়া বাবা অনেক রাত করে ফিরতেন। অনেকদিন ফিরতেনও না।

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল এরকমই। ছাড়া ছাড়া। মাখো মাখো নয়। আসলে তেমনটা হতেই পারিনি কখনও। তাই আমার বাবা ভালো লোক কী খারাপ লোক সে কথা আমি কখনও ভেবে উঠতে পারিনি।

কিন্তু পাড়ার লোক আমার এই বাবার সম্পর্কে খুব আজেবাজে কথা বলত। চোর জোচ্চর বলে গালাগালিও দিত। ওসব কথা শুনে আমার খুব মন খারাপ হ'ত। আমি চুপচাপ থাকতাম। চোখে জল দেখা দিলে চট্ করে মুছে ফেলতাম। মা যদি দেখতে পান তবে মার যে খুব মন খারাপ হবে। আমি অনেক কথা ভাবতাম। চিন্তা করতাম। তবে মার কাছে যে কোনও দিন ধরা পড়ে যাবো তা' আমি কখনও ভেবে উঠিনি।

অথচ আমি এ্যাতো সাবধানে থেকেও সেদিন মার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আসলে আমার মনে হ'ল এ ফ্ল্যাটের লোকগুলো মহা ত্যাঁদড়া।

আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমার বাবার সম্বন্ধে মিথ্যে মিথ্যে অনেক কথা না বললে ওদের বোধহয় পেটের ভাত হজম হয় না। কিন্তু সেদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন তাতে আমার চোখ কান মুখ লাল হয়ে উঠল। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আমি চোখে মুখে অন্ধকার দেখলাম। আমার ভয় হ'ল আমি বোধহয় এখনই মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমি কিছু ধরতে চাইলাম। কিন্তু আমার তো এ পাড়ায় সঙ্গী সাথী কেউ নেই যে আমি তাকে ডাকব। তাকে ধরব। অথচ যে লোকেরা গুলতানি করছিল, গালমন্দ করছিল কেউ একটু এগিয়ে এল না আমাকে ধরতে। উল্টে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল। হাসতেই লাগল।

আমি কোনরকমে নিজেকে সামলে ছিলাম সেদিন। কিন্তু চোখের জল আর মুছে উঠতে পারিনি।

আমার মার কাছে সেদিন তাই ধরা পড়ে গেলাম। আমার চোখে জল দেখে আমার মা আমাকে কাছে টেনে নিলেন। মার কোলে মুখ রেখে আমি ফুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

আমার মা সেদিন কিন্তু আর আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন না। দেখি তিনিও চোখের জল ফেলছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "জানো মা ওরা ওই লোকগুলো আমার পেছনে খুব লাগে। আমাকে ক্ষ্যাপাতে চায়। আমি যাতে ক্ষেপি সেজন্যে ওরা বাবার নামে যাতা কথা বলে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে।"

আমার এ্যাতো কথাতেও আমার মার চোখের জল কিন্তু বন্ধ হল না। শুধু বললেন "আজ আবার কোন কথা বললে ওরা ?"

আমি বললাম "সে কথা তুমি শুনতে চেয়ো না মা। সে কথা আমি তোমায় বলতে পারব না। খুব আজেবাজে কথা।"

মা আমার কথা শুনে বেশ রেগে গেলেন এবার। আমাকে বুক থেকে ঠেলে একটু সরিয়ে দিলেন। বললেন "তোকে আজ বলতেই হবে। যতই খারাপ হোক। আমাকে শুনতেই হবে। আসুক তোর বাবা আজ। একটা হেস্তনেস্ত করব। দাদাদের ডাকব। একটা ফয়সালা করব।"

কথা বলতে বলতে মার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। আমার মা দেখতে খুব সুন্দর। মাথাভর্তি চুল। গায়ের রঙ ধবধবে দুধের মত সাদা। সেই মা যখন আমার ওপর অভিমান করতেন তখন মা-কে দেখতে খুব সুন্দর লাগত। কিন্তু এখন মার রাগের চেহারা দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম।

একি হ'ল আমার মার ? আমি মাকে আঁকড়ে ধরলাম। ভয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। আমি কেবল বলছিলাম "মা, মা কি হ'ল তোমার ? আমার যে বড়ো ভয় করছে।"

আমার কথা শুনে মার কী যে মনে হল কে জানে ? আমার মা আমাকে ছেড়ে দিলেন। বললেন "ঠিক আছে। কিন্তু তোমার বাবার নামে কে কি কথা বলছে তা' জানতে হবে না আমায় ? লোকে মিথ্যা কথা বলে বেড়াবে আর আমরা তাই শুনে চুপ করে থাকব ? একি অন্যায় আবদার !"

মার এসব কথা শুনে আমার মনে হল আরে মাতো আমার দারুণ বুদ্ধিমতী। সত্যিই তো কথাগুলো যদি মিথ্যাই হয় তবে তো তার একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। দরকারে বাবা মানহানির মামলাও করতে পারেন।

আমি আমার মার মুখের দিকে তাকালাম। ভালো করে দেখলাম আমার মাকে। আমি একটু হাসলাম। মা আমার গাল টিপে দিলেন। মার চোখে মুখে এক চিলতে হাসি দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

আমি বললাম "মা ওরা একটা মেয়ের নাম করে বাবার সম্বন্ধে...."

আমি আর কথা শেষ করতে পারলাম না। মা আমার মুখ চেপে ধরলেন। বললেন "তোমায় আর কিছু বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। সব বুঝেছি।"

কথা বলতে বলতে মার মুখ আবারও গম্ভীর হয়ে গেল। মা আর কোনও কথা বললেন না। আমাকে বললেন "তোমার পড়া কি শেষ ? তাহ'লে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।"

আমি বুঝতে পারলাম না মা ঠিক কী বলতে চাইছেন। আমি বোকার মতো হুঁ-হাঁ বলে ঘাড় নেড়ে দিলাম।

মা আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আমার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। আমার ঘুম এলো না। আমি মটকা মেরে চোখ বুজে শুয়ে থাকলাম।

বাবা এলেন রাত করেই। যেমন অন্যান্য দিন আসেন। বাবা ঘরে ঢুকতেই আজ কিন্তু মা ঝাঁপিয়ে পড়লেন "এখানে এলে কেন ? কমলার কাছে থাকলেই তো পারতে ?"

বাবা এই হঠাৎ আক্রমণে প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। কিন্তু একটু পরেই দেখি বাবা মার একটা হাত মোচড় দিয়ে ভেঙে ফেলার

জোগাড় করেছেন। মা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন। বাবার মুখে এক অস্বাভাবিক হাসি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। অথচ অবাক কাণ্ড বাবা মার ঐ কষ্ট দেখে একটুও চিন্তা করলেন না। ভাবলেন না। বাবা কি করলেন ? বাবা ঐ অবস্থাতেই মাকে লাথি মারলেন তার বুট জুতো পরা পায়ে। মা হুড়মুড় করে এসে পড়লেন বিছানার ওপর। বাবা এবার এসে মকে সেখান থেকে টেনে তুললেন চুল ধরে। আর মা কিছু বোঝার আগেই মাকে এলোপাথাড়ি চড় ঘুষি মারতে লাগলেন। মা যতো কাঁদেন বাবা ততো মারেন। আমি কি করব কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

কিন্তু বাবা একসময় থামলেন। বললেন "শোন্ আবার যদি কমলার সম্বন্ধে তুই কোনও কথা বলিস্ তবে তোকে খুন করব।"

বাবার মুখে অমন কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমি ভয় পেলাম। বাবা এমন অসভ্য ইতর নীচ। এমন কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দেন। আর কোথাকার এক মহিলার জন্যে তাঁর বিয়ে করা বৌ-কে দেন খুনের হুমকি ?

আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না। আর চিন্তায় চিন্তায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়ালই নেই আমার।

কিন্তু পরের দিন সকালে অন্যদিনের মতো ঘুম ভাঙ্গেনি আমার। মা অন্যদিন আমার ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন গোপাল ওঠে, গোপাল ওঠে, সোনা মানিক ওঠে বলে। আর সেদিন ঘুম থেকে ডেকে তুললেন আমার বাবা। বললেন "একী এখনও ঘুম ? আটটা বাজে। পড়বেই বা তুমি কখন ? আর স্কুলেই বা যাবে কখন ? ফাইনালের ছাত্র। মা-র আসকারাতেই এসব হয়েছে।" বলে রাগে গজগজ করতে করতে বের হয়ে যান তিনি।

ওদিকে আমি একলাফে বিছানা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে লক্ষী ছেলের মতো খাবার টেবিলে। দেখি মা পাউরুটি টোস্ট করে জেলি লাগাচ্ছেন। আমি খুব খুশি। কিন্তু মা-র মুখের দিকে তাকিয়েই আমার ভয় হয়ে গেল। মা-র চোখে মুখে কালো কালো ছোপ পড়েছে। একরাতেই আমার মা যেন হারিয়ে গিয়েছেন কোথাও। আমি খাবার খেতে পারলাম না। উঠে এসে মা-কে জড়িয়ে ধরলাম। আমার মা-ও আমাকে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছিল।

আমি মা-র চোখের জল মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখি

মা তার আগে নিজেই আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলেছেন। বাবার চটি জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। আর এক মনে খেতে লাগলাম মুখ নিচু করে। একটু পরেই বাবা ঘরে ঢুকলেন।

বাবা খাবার সময় কোনও কথা বললেন না। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করলেন। যাবার আগে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন "তাড়াতাড়ি করো। খেতে এতো সময় নষ্ট করলে চলবে ?" এবার মা-র দিকে তাকিয়ে বললেন "আমার ফিরতে দেরি হবে। পার্টি আছে।"

মা কোনও কথা বললেন না। আমিও চুপ করেই থাকলাম।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে আকাশের তারাদের দেখছিলাম। মনে হ'ল একটা তারা খসে পড়ল। আমি সঙ্গে সঙ্গে সাতটা ফুলের নাম মনে করতে চাইলাম। কিন্তু কী কাণ্ড! কিছুতেই আর কোনও ফুলের নামই মনে করতে পারি না।

ওদিকে দিদিমা অনেকক্ষণ ধরে বক্‌বক্ করে গিয়েছেন। বার বার বলেছেন "হায়রে কী কপাল করে এসেছিলি। আর আজ একি হ'ল তোর ? কিন্তু কেন তুই এসব মেনে নিবি ? আমার মেয়ে তোর ফুলের মতো সুন্দর পবিত্র মা-কে যে খুন করল তার শাস্তি কি তুই দিবি না ?"

আমি আবারও আকাশের দিকে তাকালাম। কী বিরাট কী বিশাল ! কোটি কোটি তারা জ্বলছে নিভছে। জ্বলছে নিভছে। শান্ত স্থির নিঃস্তরঙ্গ। ওখানে নেই কোনও কোলাহল। খুনোখুনি। হলাহল। অথচ তার নিচে এই মাটির পৃথিবীতে এত পাপ এল কোথা থেকে ?

আমি কিছু ভাবতে পারছিলাম না। আমি এখন কার কাছে যাবো ? কার বুকে মুখ লুকাব ? আমার মা কোথায় গেলেন ? আমার মা কেন খুন হলেন ?

আমার মামারা হাই কোর্টের বড়ো বড়ো উকিল নিয়ে এসেছিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝালেন। বললেন। আমার মা-র খুনীর শাস্তি হওয়া দরকার। খুনীরা সমাজের কলঙ্ক। আর আমার মা-কে যে খুন করেছে সে পাপী। তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই নেই।

উকিল ব্যারিষ্টাররা এলেন। একদিন নয়। দু'দিন নয়। পরপর ক'দিন। আসলে মামা বাড়িতে আসার পর থেকেই মামারা, উকিলবাবুরা

আমাকে পাখি পড়া করে বোঝাচ্ছেন। আসলে আমার মা-র খুনের মামলায় আমিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষি। ঘটনাচক্র কার্য কারণ যাইহোক্ না কেন আমি সবকিছুর মূল যোগসূত্র। আমার বক্তব্যর একটু গরমিলেই আমার মা-র খুনী জাল কেটে খুব সহজেই বেরিয়ে যাবেন।

আমি ওঁদের অতোশত কূট কাচালি উকিলীবুদ্ধি বুঝতে পারি না। দিদিমা মামারা সবাই চাইছেন আমার মা-র খুনী শাস্তি পাক্। ধরা যখন তাকে গিয়েছে তখন তাকে ফাঁসির কাঠে ঝোলাতে আর কতক্ষণ।

আমি বেশ বুঝতে পারি মা মারা গেলেন, বাবাও থাকবেন না, আর তখন এই বিশাল পৃথিবীতে আমি একা। ঐ এক বাড়ি ছাড়া আমার কিছুই নেই। সহায়হীন সম্বলহীন। কার ওপর ভরসা করে আমার জীবন কাটবে। আমার কাকা জেঠা ভাইবোন বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। বন্ধু বলতে আশ্রয় বলতে কেবল ছিলেন আমার বড়ো আদরের বড়ো আপনার মা।

কিন্তু সেই মা-তো নেই। তাহলে থাকছেন বাবা। কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বড়ই ঠাণ্ডা। বড়ই ছাড়া ছাড়া। তাই বাবা থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ? অবশ্য বাবা আমার থাকা খাওয়ার পড়াশোনার টাকা জোগাতেন। সেকথা অস্বীকার করি কি করে ? বাবা যখন থাকবেন না তখন ওগুলোও তো আর থাকবে না। আমি তখন কি খাব কি পরব ?

নাঃ মনে হয় মা-র মতো আমার জীবনে বাবার থাকাটাও জরুরী। বাবা মদ খেতেন। বাবা মা-কে মারধোর করতেন। আমি নিজে দেখেছি। বাবা অন্য সব আজেবাজে মেয়েমানুষদের সঙ্গে ঘুরতেন। থাকতেন। বুঝতে পারি বাবা অনেক অন্যায় করেছেন। কিন্তু তাই বলে বাবা খুন করতে যাবেন কেন ? আর কেনই বা তিনি খুন করবেন আমার মা-কে ? তাঁর বিয়ে করা বৌ-কে ?

কিন্তু ছোট মামার কোনও রাখঢাক গুড়গুড় নেই। তিনি বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলেন "তোর বাপ একটা লম্পট। আমার বোনকে পেয়েও সন্তুষ্ট হয়নি। তাকে খেয়েছে। আবার রাস্তার মেয়েমানুষদের নিয়ে ফুর্তি করেছে। ঐ হারামী মেয়েমানুষ কমলাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়েছে। পথ পরিষ্কার করতে প্ল্যান করে আমার বোনকে খুন করেছে। ফাঁসি হলেই ওর সে সাধ ঘুচবে।"

আমি অবাক হয়ে শুনেছি আমার ছোট মামার কথা। দেখেছি তাঁর

লক্ষ ঝক্ষ। দিদিমা এসে বকা দিতেই ছোট মামা একদম চুপ। কিন্তু দিদিমা-ও বলতেন। আমাকে বোঝাতেন "তুই একটু বললেই উকিলবাবুদের সুবিধা হয়। আমাদের উকিল অনাদিবাবুও বলছিলেন সেকথা। পুলিশও বলেছে। তোর মা চেনা লোকের আওয়াজ শুনেই দরজা খুলে দিয়েছিল। তখন সকাল দশটা। তোর বাবা তার একটু আগেই তার স্কুটারে তোকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েছেন। সবাই দেখেছে। তিনি তার অফিসের ইউনিফর্মেই ছিলেন। তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি অফিসেও হাজিরা দিয়েছেন। আর ডাক্তারি রিপোর্ট বলছে তোর মা খুন হয়েছেন ঐ দিনই সকাল দশটা পনেরো থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে।"

আমি চুপচাপ দিদিমার কথা শুনেছি। দিদিমার বয়স হয়েছে। এক সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে তাঁরও হাঁফ ধরে। তিনিও চুপ করেই থাকেন। পানের ডিবে থেকে পান বের করে মুখে দেন। একটু জর্দাও মুখে পোরেন।

আমি এই সুযোগে বলি "এর সবই তো সত্যি। কিন্তু মা নেই। বাবাও চলে যাবেন। আমি একা একা থাকব কোথায়? কে দেখবে আমায়?"

দিদিমা বলেন, "হা ভগবান! এসব কি একটা কথার কথা হ'ল? তুই আমার কাছে থাকবি। মামার বাড়ি। কত লোক মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। তেমনি তুইও থাকবি।"

আমি বললাম, "বেশ ভালো কথা। কিন্তু কে দেখবে আমায়? তোমার টাকায় আমার কি অধিকার?"

আমার কথা শুনে দিদিমা মাথায় হাত দেন!

বলেন "হায় হায়! একী অলক্ষুণে কথা? তোর মামা মামীরা আছেন কি করতে? তাঁরা তোকে দেখবেন?"

আমি দিদিমাকে থামিয়ে দিই। বলি "আগেকার কথা ছাড়ো। তুমি চোখ বুজলেই আমাকে ওঁরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন। আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে তখন।"

দিদিমা আমার কথা শোনেন মন দিয়ে। কী যেন ভাবেন। তারপর বলেন "আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু আমার সম্পত্তি। আমার টাকা। তা' তোকে দেব। উইল করব।"

আমি বলি "দাদুর এ সম্পত্তিতে তোমার ভাগ আছে। মা নেই। আমি

দাবী করতে পারি। তোমার টাকাও পেতে পারি। মানছি। কিন্তু তাঁর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তার পয়সা পাব কোথায় ?"

দিদিমা রাগ করে বলেন "তার মানে ? তুই কি চাস ?"

আমি এবার গম্ভীর হয়ে বলি "বাবাকে বাঁচতে দিলে হয় না ?"

দিদিমা আমার কথা শুনে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকান।

আমি বলি "প্লীজ দিদা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।"

দিদা রাগের চোটে গজর গজর করতে করতে নিজের ঘরের দিকে চলে যান।

আমি উঠে পড়ি। ছাদে একটু পায়চারি করি। আকাশের দিকে তাকাই। সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। এখন তো বকুল ফুল ফোটার সময় নয়। গন্ধরাজ বেল রজনীগন্ধা কোনও ফুলই তো ফোটে না এখন। তাহ'লে এই গন্ধটা এখন আসছে কোথা থেকে ?

আমি ছাদের কার্নিসের দিকে যাই। একটু এদিক্ সেদিক্ উঁকিঝুঁকি মারি। কিন্তু কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। পাড়াটা আজ অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা তো এ পাড়ারই মেয়ে। মা-'র জন্ম এখানে। বড়োও হয়েছেন এখানে। মা মারা যাওয়াতে সবারই খুব মন খারাপ। মার খুনের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আগামীকাল। কালই আমার সাক্ষী। আমিই বলব আমার বাবা সেদিন আমায় স্কুলে পৌঁছে দেননি। স্কুলের অনেক আগেই আমায় স্কুটার থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। সামনেই একটা অটোতে তুলে দিলেন আমায়। বললেন—"অফিসে একটু তাড়া আছে।" ব্যাস বলেই বাবা চলে গেলেন। তখন ঘড়িতে সময় দশটা পাঁচ। এরপর বাবা নাকী বাড়িতেই ফিরেছিলেন। আমাদের পাড়াটা নির্জন। লোকজনের চলাচলও নেই। শেষ বাড়িটা আমাদের। কে আসে কে যায় কেউ নজরই করে না। বাবা কিন্তু স্কুটার নিয়ে বাড়িতে ফেরৎ আসেন নি। সেটা অন্য একটা চেনা দোকানের সামনে রেখেছিলেন। একটা সাইকেল রিক্সায় চেপে পাড়ার কাছে আসেন। কিন্তু তিনি সাধারণ পোষাকে ছিলেন। অফিসের ড্রেসটা খুলে নিজের ব্যাগে রেখেছিলেন। ব্যাস্ সাধারণ পোষাকে তিনি পাড়ায় বাড়িতেই ফিরে এলেন। আমার মা বাবাকে অসময়ে বাড়ি ফিরতে দেখে অবাক। কিন্তু মার সেই অবাক হবার ঘোর কাটার আগেই বাবা তাঁকে গলা টিপে ধরেন। আর গলা টিপেই খুন করেন। তারপর ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করেন। আলমারির লকার ভেঙে টাকা গয়না নেন। যাতে মনে হয় টাকার লোভেই তাঁকে খুন করা

হয়েছে। এবার বাবা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন। আর পেছনের ডোবা পেরিয়ে পালান। তারপর ভালো মানুষের মতো অফিসের কাজে যোগ দেন।

পুলিশ এমনি ভাবেই কেস সাজিয়েছে। বাবা অবশ্য একে মনগড়া আর মিথ্যাকথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন "আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অফিসে হাজিরা দিতে গেলে খুনের সময় তিনি বাড়িতে থাকতেই পারেন না।"

আমার বাবার উকিল এমনি ভাবেই নিজের যুক্তি খাড়া করেছেন।

ব্যাস্ এখানেই আমার প্রয়োজন। মামাদের দরকার আমাকে। বাবার উকিলের দরকার আমাকে। সব থেকে বড়ো কথা আমার নিজেরই দরকার আমাকে। আমি বাঁচব কী মরব তা' আমাকেই ঠিক করতে হবে।

বাঁচা মরার প্রশ্নে আজ আমি কার পরামর্শ নেব? মা নেই। বাবা জেলে। আমি ছাদে আবারও পায়চারি করলাম। আকাশের দিকে তাকালাম।

আকাশ সেই আগের মতোই ঘন নীল। কোটি তারা জ্বলছে। ঝিক্-মিক্ করছে। সেই মৃদুমন্দ মধুর হাওয়া ভেসে বেড়াচ্ছে সারা জগৎময়। কিন্তু এছাড়া প্রকৃতি ঠাণ্ডা। নিঝুম। চুপচাপ। শান্ত সমাহিত। আমি একাই কেবল চঞ্চল।

আমার মা খুন হয়েছেন। মা নেই। বাবা জেলে। বাবা এখন থেকেও নেই। দিদিমা আর মামাবাড়ির সবাই চান বাবার চরমতম শাস্তি হোক্। আমি কি করব?

আমার বাবা মাকে কেন খুন করলেন? বাবা মা-কে ডির্ভোস করতে পারতেন। কমলা, রমলা, বিমলা যাকে খুশি বিয়ে করতে পারতেন। আমার মা কি অপরাধ করেছিলেন? মা বলেছিলেন, একটা বিয়ে করা বৌ থাকতে তুমি তাকে অবহেলা করে অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘুরবে না। এতো আমাদের সমাজেরই কথা। বিদেশে অবশ্য আকছার হচ্ছে। সেখানে মা বাবার বিয়ে ভাঙছে প্রতিদিন। বাচ্চারা না পাচ্ছে স্নেহ, না পাচ্ছে মায়ামমতা। ফলে সেইসব ছেলেরা সমাজ সংসার মানবে কেন? তারা তো সমাজ ভাঙতেই চায়। দেশে বিদেশে টাকা নিয়ে ভাড়াটে সৈন্য হয় তারা।

আমার মা বাবাকে একথা বলতেন। আমাকেও বলেছেন। আমি সব কথা বুঝতে পারতাম না। হাঁ-করে তাকিয়ে থাকতাম মার মুখের দিকে। কিন্তু আজ? আজ আমার অবস্থা কি হবে? আমিও কি সমাজের স্নেহমমতা

ভালোবাসা না পেয়ে এক খুনী হব ? অথবা এক ভাড়াটে সৈন্য ?

বাবার ওপর ভীষণ রাগ হ'ল আমার। বাবা আমার জীবনটাকে নষ্ট করলেন কেন ? আমি যে ডাক্তার হ'ব ভেবেছিলাম। তার কি হবে ? বাবা তো শুধু মা-কেই খুন করেন নি। তিনি যে আমাকেও খুন করলেন। একটা সামাজিক সুন্দর ব্যবস্থাকেও খুন করে তছনছ করে দিলেন।

আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার বাবা আজ আমার একমাত্র অবলম্বন। আমার সেই বাবাও যদি আজ না থাকেন। তবে ? তবে আমায় কে দেখবে ? মা-যে চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। তার কি হবে ? টাকা কে যোগাবে ? দিদিমা ? হুঁ। দিদিমা মরলে মামা মামীরা আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। এখন। এখন এই বিপদের দিনেই তারা কেউ আমার কাছে এসে দাঁড়াল না। তারা এবার আমাকে দেখবে ? কথা বলবে ? খুনীর ছেলে। এছাড়া সমাজে আমার আর কি পরিচয় ?

আমার বাবা আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব একনষ্টা মহিলার মোহে আমার আদরের মা-কে খুন করলেন। আর আমি ? আমি তাঁদের ছেলে। আমি কি করলাম ? আমি কি করব ?

আমার মনে হ'ল এই তিনতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ি। মরে যাই। দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাই, সবার অগোচরে। কেউ আর ধরতে পারবে না আমায়। আমি বাঁচব। আমার বাবাও বেঁচে যাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ কোথায় ?
আমি আবার আকাশের দিকে তাকালাম। দূর থেকে পথের একটা কুকুরের ঘেউ ঘে-উ-উ আওয়াজ শোনা গেল !

আমি চমকে উঠলাম। আমার স্নেহময়ী মার কথা মনে পড়ল। আমার বাবা কেন অকারণে তাঁকে খুন করলেন ? তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমরাতো কেউ কখনই তাঁকে কিছু বলিনি। পাড়ার লোকেরা আজেবাজে কথা বলাতেই তো মা তুলেছিলেন কমলার কথা। মাতো তা বলতেই পারেন।

বাবা কিন্তু সেকথা শুনেই রেগে গেলেন। তবে বাবা কি মাকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না ? তিনি কি মার সঙ্গে ঘর করে তৃপ্তি পান নি ? কিন্তু তাই বা কি করে হয় ?

উঃ। না আমি আর কিছু ভাববো না। মা, বাবা, আমি। বাবার জন্যে

আমার, মার জন্যে আমার, বাবার জন্যে মার। মার জন্যে বাবার। আমাদের সবারজীবনই ছারখার হয়ে গেল।

আমি কাকে দায়ী করব? আমার ভাগ্যকে? আমার মা-কে? না আমার বাবাকে?

নাঃ। এর কোনও কিছুই নয়। আমি এর প্রতিশোধ নেবো। আমার জীবনে আজ হাহাকার আর কান্না ছাড়া কিছুই নেই। কিছুই থাকবে না।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। বাতাস। বাতাস হাওয়া। এখন আমার কেমন শীত শীত করছে। মা নেই। কেউ আর বলবে না, "ঠাণ্ডা লাগাস্ না। সর্দি হবে, কাশি হবে। মা নেই। কেউ আর গায়ে চাদর দিয়ে দেবে না। কিন্তু এখন যে গরমকাল। চাদরের কথা আসছে কেন? ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডাই বা লাগছে কেন?

আমি কাঁপছি। অমার কেমন যেন ভয় করছে। আমি মার কান্না যেন শুনতে পাচ্ছি। বাবা মাকে বুটজুতো দিয়ে লাথি মারলেন। অকারণে। মা কাঁদছেন। আমি বিছানায় মটকা মেরে শুয়ে আছি। আমি কেন তখনই বাধা দিলাম না?

আমি চুপ করে গেলাম। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আর এবার আমি কেঁদে ফেললাম। হাউ হাউ করে। হাওয়া। সুন্দর হাওয়া বয়ে গেল আমার মন আমার শরীরের ওপর দিয়ে।

ওদিকে আমার কান্নার আওয়াজে আমার দিদিমা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আমার কপালে হাত রাখলেন।

আমি কোনোও কথা বলতে পারলাম না। আমি দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম। আর তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, "দিদিমা আমি তোমার কথা শুনব। আমি বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবো।"

দিদিমা আমার কথা শুনে আমাকে আঁকড়ে ধরলেন। তিনিও কেঁদে ফেললেন।

আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। আমি কাঁপতে থাকলাম।

বুঝলাম আমার বাবার ফাঁসি হবে। □

# আঁধারে আলোর ফুল ঝুরি

## অশোক কুমার রায়

শ্রাবণের শেষ। গত দু'দিন ধরে বৃষ্টি হয়নি। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। সারাদিন সূর্যের তেজে বিষণ্ণতার প্রভাবই বেশি ছিল। বিকেল গড়িয়ে আসার পূর্ব মুহূর্তে একটা বিরাট কাল মেঘের পাহাড় উড়ে এসে পৃথিবীতে অন্ধকারের পর্দা মেলে ধরল। বটুক দু'হাত দিয়ে মাথায় এবং শরীরে জমে থাকা ছাই এর আস্তরণ ঝাড়তে ঝাড়তে চিতার অনতিদূরে বাঁধানো বট গাছটার কাছে এসে দাঁড়ালো। বিধু সেই তখন থেকেই বাঁধানো সানে মাথা গুঁজে বসে আছে — এখনো ঠিক তেমনই আছে। বটুক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিধুর উদ্দেশ্যে বলল — যাক বাবা ভালয় ভালয় হয়ে গেল। আকাশে যা মেঘ এসে হাজির হয়েছে আর একটু দেরী হলেই কাম পণ্ড করে দিত। ইতিমধ্যে চিতার কাজ শেষ করে হরিবল ধ্বনি দিয়ে অন্যান্য সাথীরাও বিধুর কাছে ফিরে আসে। বিধু অনুমান করে সব শেষ! সে দু'হাতের বাহুতে গুঁজে থাকা মাথাটা টেনে তুলে দেখে চিতায় তার দিদির উপর থাক্ থাক্ করে সাজানো খড়িগুলো নেই-। দিদিও নেই। সব যেন অগ্নির স্পর্শে মাহা ব্যোম-এ বিলীন হয়ে গেছে। চিতার নিচে পড়ে আছে কিছু ছাই-এর গাদা। আরও বেশি কিছু ছাই-এর গাদা হয়তো ছিল। বন্ধুরা ধুয়ে দিয়েছে। যেটুকু আছে ওটা বিধি মতে তাকেই ধুয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

বটুক বিধুকে তাগাদা দেয় — এই যা যা তাড়াতাড়ি যা। শেষ কাজটা সেরে আয়। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। কাল থেকে শালা তোর দিদির হেপা সামলাতে সামলাতে যেন যুধিষ্ঠিরের কলজে করে ফেললাম। কাল থেকে একেবারে নিরামিষ। আর পারা যাচ্ছে না মাইরী। নে তাড়াতাড়ি কাজ সার। তারপর চল্ যাই বিনোদ মাহাতোর বাড়ী গিয়ে চুল্লু দিয়ে কলজেটা আগে ভেজাই। তার পরে যা হয় হবে।

শোকে মুহ্যমান বিধু সাথীদের উদ্দেশ্যে বলে, যা, তোরা এগিয়ে যা। বিনোদ মাহাতোর ওখানে গিয়ে টেনে-ফেনে তাজা হ'তো। আমি যাব না। ভাল লাগছে না। চিকলু তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠে কৌতূহল প্রকাশ করে — কিরে কাজই শেষ হল না আমাদের চলে যেতে বলছিস। নে, নে আগে জল ঢেলে আয় তারপর যা করার করা যাবে।

বিধু ধীর গলায় বাধা দিয়ে বলে — তোদের কোন চিন্তা করতে হবে না। তোরা তোদের মত চলে যা। আজ একা একটু থাকতে দে। কাল ফের ভেট্ হবে। সাথীরা সব একপা দু'পা করে এগিয়ে কেটে পড়ে। কারণ বিধু গোঁয়ার গোবিন্দ। ও যা ভাবে তাই করে। বিধুকে একলা ছেড়েই সকলে চলে যায়।

সাথীরা চলে গেলে বিধু অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ায়, ওকে এক্ষুনি চিতা ধুয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। কারণ একটু বাদেই হয়তো আবার কোন লাশ এসে হাজির হবে।

*　　*　　*　　*　　*

টুপটাপ করে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা যেন সিউলি ফুলের মত আকাশ থেকে ঝরতে লাগল। অজান্তেই বিধু দু'হাত প্রসারিত করে হাতের পাতায় বৃষ্টির ফোটাগুলো স্পর্শ করে অতীত স্মৃতির সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগোতে থাকে।

বৃষ্টি আরও জোরে এসে বিধুকে যেন ধুয়ে দিতে লাগল। শরীরে জমে থাকা অনেক কালি ছাই। রক্তের দাগ যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হতে লাগল। হৃদয়েও কোথাও যেন পচন ধরেছিল। সেই পচন থেকে গলা পুঁজ যেন ধুয়ে মুছে ক্ষতকে সাফ করে দিচ্ছে। সে যেন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের এক বোঝা যেন তার শরীর থেকে সরে যেতে লাগল।

হ্যাঁ, এই বোঝা তার কবে থেকে মনে পড়ে। মা হীন সংসারে বাবা কাশীনাথ একশত পঁচিশ টাকা পুঁজি করে লটারীর টিকিট বিক্রির ব্যবসা করে। পশ্চিমবঙ্গ, ভুটান, সিকিম ইত্যাদি কত রকমের রাজ্য লটারীর ছোট্ট একটা স্তূপ কখনো ডান হাতে কখনো বা বাঁ হাতে ধরে দোকানে দোকানে, মানুষের ভীড়ে বিক্রির আশায় ছুটে বেড়ায়। এ ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেলে বাজারের কোন চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। এক কাপ চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করে। টিকিট বিক্রির আশায় শুরু হয় আবার ঘোরা। এ-ভাবে সারা দুপুরে কয়েক কাপ চা গিলে পেটের আগুন নেভায়। বাবা ফেরে সেই পড়ন্ত বেলায়। সঙ্গে থাকে পাঁচশ গ্রাম চাল, সামান্য আনাজ। তা দিয়েই দিদি সন্ধ্যের মধ্যেই কোন রকমে সেদ্ধ ভাত অথবা কোন কোন দিন তেল লবণ হলুদ দিয়ে পানসে তরকারি রান্না করে। এর বেশি বাবার কাছে আমরা কোনদিন আশা করি নি। অনুযোগও ছিল না। তবে ভাল মন্দ যে কপালে জুটতো না এমন নয়। পাশের বাড়ীর কাকিমার দয়াতে প্রায় দিন দুপুরের খাওয়াটা হয়ে যেত।

দিদি আমার থেকে পাঁচ বছরের বড়। মোটামুটি হাতের কাজ সে সামলে নিতে পারে। তাই পড়সী কাকিমার কাছে দিদির খাতির ছিল। দিদি কাকিমার হাতের কাজ করে দিত। বিনিময়ে বাসি ভাত কিংবা উচ্ছিষ্ট খাবার থালা ভর্তি করে নিয়ে আসত। তা দিয়েই ভাই-বোনে অনিশ্চিত দুপুর থেকে পরিত্রাণ পেতাম। বাসিই হোক উচ্ছিষ্টই হোক এভাবে দিনে দিনে কাকিমার বরাদ্দের উপর যেন আমাদের অলিখিত অধিকার জন্মে যায়। অবশ্য বিনিময়ে দুপুরটা কাকিমার বাড়ীতে দিদিকে ফাইফরমাশ খেটে দিতে হত। বাসনকোসন মেজে দিতে হত। দিদির উপর কাকিমারও এই দাবীটুকু চেপে বসল। অভাবের দিনে এটাকে আমরা কখনোই শর্ত হিসাবে মেনে নেই নি। আজকের দিনে হলে হয়তো হিসাব করতাম। অবশ্য একটা বাসনা মনের মধ্যে ইদানিং মাঝে মাঝে জেগে উঠতো। দিদির বিয়ে হলে কাকিমাকে চাপতাম। — কিছু দাও কাকিমা। এতদিন চাঁপা অর্থাৎ দিদিতো তোমার মেয়ের মত তোমার কাছেই থেকেছে। ফাইফরমাস খেটেছে। ঠিকে ঝি রাখলে তাকে মাইনে দিতে। দিদির ক্ষেত্রে তো এ সবের বালাই ছিল না।

সকাল হলেই দিদি উদাম গায়ে ছুটতো কাকিমাদের বাড়ী। সারা সকাল সেখানেই সে কাটাতো। বাবা বেরিয়ে যেত লটারীর টিকিট হাতে ভাগ্যের অন্বেষণে। আর আমি সারা সকাল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম। দিদির ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকতাম। দিদি এলেই যেন উদর শান্তি হবে। এটা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এভাবেই হঠাৎ একদিন আবিস্কার করলাম দিদির বুকে ছোট্ট সাইজ এর ঢিপি। তারপর থেকে দিদিকে আর উদাম শরীরে দেখিনি। আগে দিদির দু'টো প্যান্ট, একটা ফ্রক ছিল। এখন বাবা আর একটা ফ্রক কিনে দিয়েছে। কাকিমাও তার কোন আত্মীয়ের বাড়ী থেকে পুরনো একটা ফ্রক যোগাড় করে দিয়েছে।

দিন দিন দিদির শরীরটা যেন ভারি হয়ে উঠছে। ফ্রকের নিচে লুকিয়ে থাকা ঢিপি দু'টো যেন আরও উঁচু হয়ে উঠছে। দিদির এরকম পরিবর্তন কখনো কখনো লুকিয়ে হঠাই জরিপ করে ফেলতাম। দিদির শরীরের লাবণ্যও যেন প্রস্ফুটিত রক্ত পলাশ। দিদি আমার চাঁপা দিদি ফুলই বটে।

ক'দিনেই দিদি এক লাফে যেন আমার থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে।

এর মধ্যে বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়। চার পাঁচজন দরদী মানুষ বাবাকে কোলপাঁজা করে বাড়ীতে নিয়ে আসে। সেদিন সঙ্গে কমলেশবাবুও এসেছিলেন। উঁচু দরের নেতা। শহরের সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কমলেশ-কাকু আমাদের বাড়ী আসায় খুব ধন্য মনে হল। এসব লোকের চরণধুলি আমাদের মত গরীব লোকেদের বাড়ীতে পড়া মানে ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যিস বাবার সেদিন বাজারে স্ট্রোক হয়েছিল বলেই এ-বাড়ীতে কমলেশ কাকার মত নেতার আবির্ভাব ঘটল।

তিনি সান্ত্বনা দিলেন। দিদির জ্ঞান হারাবার উপক্রম প্রায়। কমলেশ কাকা দিদির শরীর স্পর্শ করে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ভেঙ্গে পড়না মা। আমি তো আছি। সব ব্যবস্থা করে দেব।

বাবা সুস্থ হবার জন্য সেরকম ব্যবস্থা না করলেও কমলেশকাকা প্রায় প্রতিদিনই এ বাড়ীতে আসতেন। সঙ্গে অনেক ষণ্ডাগণ্ডা। এরা সকলেই আমাদের দুরাবস্থার জন্য যেন দরদে ভেঙ্গে পড়ত। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের বাড়ীটা যেন কমলেশ কাকার পার্টি অফিস হয়ে গেল। তার দয়াতে এ বাড়ীতে শুরু হল চায়ের পাট। ইদানিং তিনিই প্রায় সব রকম খরচ খরচা চালাতেন। তার ষণ্ডাগণ্ডারাও যখন তখন দিদিকে দিয়ে চা তৈরী করে নিত। দিদিও আস্তে আস্তে কমলেশ কাকার পার্টির সদস্য হয়ে গেল। দিদি ইদানিং কাপড়পরা ধরেছিল। খুব সুন্দর লাগত দিদিকে। তার শরীরে অভাবের চিহ্ন যেন মুছে গিয়েছিল, এক পলকে দিদিকে দেখলে মনে হত দিদি যেন কোন অভিজাত ঘরের মেয়ে।

আমিও কমলেশ কাকার ভক্ত হয়ে গেলাম। ইদানিং আমারও পেশী-গুলো বেশ শক্ত হয়ে গেছে। যৌবন ছুঁই ছুঁই করছে। রাস্তা দিয়ে কোন যুবতীর দল গেলে, না তাকালে যেন নিরামিষ নিরামিষ মনে হয়। বরং সেই সময় এমন কোন ঘটনার প্রত্যাশায় থাকি যেন পেশীগুলোর পৌরুষত্ব রাস্তার যুবতীদের দেখাতে পারি। আর এরকম ক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটাতে ভয়ও পেতাম না। কারণ পিছনে কমলেশ কাকাতো আছেনই। তাছাড়া কমলেশ কাকার বাহিনী আমারও হাতের মুঠোয়। এভাবে কি করে যে আমি কমলেশ কাকার পয়লা নম্বরের মাসেল ম্যান হয়ে গেলাম আজও ভেবে কুল পাই না।

এখন আমিই অন্যদের বস্। কমলেশ কাকার কোন অ্যাক্সানের আমিই সেনাপতি।

এভাবে যখন অসহায় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর পথ ভাগ্যদেবী পাল্টে

দিয়ে কমলেশ কাকার আবির্ভাবে ও কল্যাণে আমরা জমে উঠেছি। আমাদের বাড়ীটাকে চাঁদের হাট মনে হতে লাগল — তখন হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। কমলেশ কাকাও যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল।

কমলেশ কাকার চাঁপা মা এখন প্রায় তারই সঙ্গে পার্টির বিভিন্ন প্রোগ্রামে যায়। আগের সেই বোকা হাঁদা সরল দিদিটা যেন অনেক চতুর হয়ে গিয়েছে। স্মার্টও কম হয়নি। কথার ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজী শব্দ বেশ সুন্দর করে চালিয়ে দেয়। এই অবস্থায় দিদিকে দেখতে খুব ভাল লাগত। ভাবতাম আর যাইহোক কমলেশ কাকা যখন পাশে আছেন অন্ততঃ পক্ষে একটা ভাল জামাইবাবু তিনি যোগাড় করে দেবেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে দিদিকে চুপি চুপি জরিপ করতে গিয়ে দেখি দিদির বুকটা আগের তুলনায় উঁচু হয়ে শাড়ী ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিতম্ব যুগল বেশ ভারি হয়ে গেছে। তারপরই দিদি কেন যেন অসুস্থ হয়ে যায়। শরীর থেকে প্রচুর রক্ত চলে গেলে মানুষ যেমন ফেকাশে হয়ে যায় দিদিও ঠিক তেমনি হয়ে গেছে। দুর্বলও যথেষ্ট। তারপর থেকে এক চাপা প্রশ্ন মাঝেমধ্যে মন থেকে বেরিয়ে আসে। তোলপাড় করে এক কালবৈশেখী ঝড়ে। সেই ঝড় থেকে পরিত্রাণ পেতে ছুটি চোলাই গিলতে। হ্যাঁ, চোলাই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু।

আস্তে আস্তে দিদি সাবেক চেহারা ফিরে পেল বটে। তবে কিছুদিন বাদে আবিষ্কার করলাম দিদির পেটটা আবার ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠছে। আবিষ্কার করলাম দিদি ও কমলেশ কাকার মধ্যে এক বোঝাপড়ার শর্ত খেলাপের চাপা উত্তেজনা। মনোমালিন্য।

এ সবের জন্য বেচারা গোরার শরীরে নিপুণ ভাবে ক্ষুর চালালাম। অপরাধ গোরা চুল্লুর নেশায় আমাকে বলেছিল — 'তোর দিদিটাকে কমলেশ রাহা শেষ করে দিলরে।'

তারপর শুরু হল দিদির সঙ্গে আমার বোঝাপড়া। ফলে পরেরদিন দেখলাম দিদির শরীরটা চার মাসের ভারি পেট নিয়ে ঝুলছে। হয় লজ্জায় না হয় প্রতারকের খাঁচা থেকে মুক্তি পেতে।

বৃষ্টির ধারা আস্তে আস্তে কমে আসে। বিধু হাঁটতে হাঁটতে অজান্তেই তার কব্জি উল্টে দেখে ভাবে. বাড়ী পৌঁছানোর আগেই কি পুলিসের হাতকড়ি তার কব্জিতে লটকাবে। গোরা খুনের দায়ে? নাকি আর একটু সময় সে পাবে?

# জন্মদিন

## চণ্ডী মণ্ডল

বার্ধক্যের, ব্যাধির শারীরিক কষ্ট আর নিঃসঙ্গতার, নিঃসহতার মানসিক যন্ত্রণা — যন্ত্রণা, অবসাদ, উদ্বেগে, বেঁচে থাকার বিড়ম্বনার, আনন্দহীন, অর্থহীন অস্তিত্বের কথা ভেবে ভেবে অদ্ভুত কষ্টে অন্য দিনগুলোর মতো আগামীকালটাও কাটত তাঁর।

কদিন আগে তাঁকে বেশ বিস্মিত, বিহ্বল করেই আমেরিকা থেকে সুদীপ্তর চিঠিটা এলো।

চিঠিটা পড়ার পর থেকে, সেদিনের সেই অদ্ভুত আবেগময় উদ্বেল মুহূর্ত থেকেই মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে আশ্চর্য এক সুখের, আনন্দের অনুভূতির উচ্ছ্বাস। কেন, কিসের আশায়, কিসের কারণে ঠিক বুঝতে পারেন নি তিনি। সেই আশ্চর্য অনুভূতির মধুর আস্বাদ পেয়েছেন তবু। সকাল সন্ধে সারাদিন সারাক্ষণ অনির্বচনীয় আনন্দ মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে।

তাঁর পঁচাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষেই সুদীপ্ত আসছে, চিঠিতে সুদীপ্ত এই কথা একবারও লেখেনি।

নিখিলেশকে চমকের, বিস্ময়ের আনন্দে মুগ্ধ অভিভূত করে দেবে বলেই লেখেনি।

একটা মৃদু অভিমান, একটু দুঃখও জেগেছিল নিখিলেশের মনে। সুদীপ্ত লিখেছিল সে কলকাতায় আসছে, বাড়িতে আসছে লেখে নি।

আট বছর আগে মার মৃত্যুর খবর পেয়ে সুদীপ্ত বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে এসে দশদিন এই বাড়িতেই ছিল। তার দু'বছর পরে আবার বউ ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়ে এসে এই বাড়িতেই ছিল ; চার দিন থেকে তারপর বউ ছেলে-মেয়েকে হিমালয় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল — রাণীক্ষেত, আলমোরা, কৌশানী ঘুরে দিল্লী গিয়ে সেখান থেকেই আমেরিকা চলে গিয়েছিল। দু'বছর পরে আবার এসেছিল সুদীপ্ত। সেবার হোটেলে উঠেছিল সবাইকে নিয়ে।

এবারও নিশ্চয়ই হোটেলে উঠবে সুদীপ্ত।

এই বাড়িতে থাকতে সুদীপ্তদের কষ্ট হবে নিখিলেশ জানেন।

একতলার ঘরগুলোয় আলো বাতাস কোনদিনই তেমন ঢুকত না, এখন ঘরগুলো ভীষণ স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে, দেয়ালের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গেছে, মেঝেও নষ্ট হয়ে গেছে ঘরগুলো পরিস্কারও করা হয় না। নিখিলেশ নিজে তো নিচে প্রায় নামেনই না। দোতলায় তাঁর ঘরটাতেই পড়ে থাকেন সারাদিন: দোতলার ঘরগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। প্রত্যেকটা ঘরের দেয়ালে বড় বড় ফাটল। প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। আলো বাতাসও তেমন আর আসে না। কোনদিনই তেমন আলো-বাতাস ছিল না বাড়িটাতে।

বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরু গলির মধ্যে বাড়িটা নিখিলেশ যখন কিনেছিলেন তখনই বাড়িটা চল্লিশ বছরের পুরোনো হয়ে গেছে। প্রায় নিখিলেশেরই বয়েসী বাড়িটা। চারদিকে গায়ে গায়ে সব পুরোনো বাড়ি। ফাঁকা জমি নেই একটুও। গাছপালা নেই। শুধু আকাশটাই ছিল। তারপর আশে পাশের অনেক বাড়ি ভাঙা হল, নতুন বাড়ি তৈরী হল, চারতলা পাঁচতলা সাততলা উঁচু উঁচু বাড়িগুলো নিখিলেশের বাড়ির আলোবাতাসটুকু তো কেড়ে নিলই, আকাশটাকেও কেড়ে নিল।

বাড়িটা নির্জন, নিঃঝুম হয়ে যেতে লাগল। প্রাণের স্পন্দন হারিয়ে যেতে লাগল বাড়িটা থেকে।

সুদীপ্ত ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে দু'বছর কলকাতার একটা নামী কোম্পানীতে চাকরি করার পর আমেরিকা গিয়েছিল ছ'মাসের জন্যে কি একটা ট্রেনিং নিতে; আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কোম্পানীতেই চাকরি করতে করতে, বছর চারেক পরে, আমেরিকা থেকে, সেখানকার একটা নামী কোম্পানীর চাকরির অফার পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

প্রদীপ্ত ফিজিক্স নিয়ে এম. এস. সি পাশ করে কলকাতায় একটা কলেজে অধ্যাপনার চাকরি শুরু করেছিল, কী একটা সাবজেক্টে রীসার্চও শুরু করেছিল; বছর দুই পরে দিল্লী থেকে একটা খুব ভালো চাকরির অফার পেয়ে যায় — মাইনে, কলকাতার কলেজে যা মাইনে পায় তার প্রায় তিন গুণ বেশী, থাকার কোয়ার্টারও পাবে। প্রদীপ্তর মা শুধু একবার বলেছিল — তুইও আমাদের ছেড়ে চলে যাবি ছোট!

সীমাও তারপর চলে গেল। হিস্ট্রীতে এম এ পাশ করেছিল সীমা খুব ভালোভাবে। দেখতেও তো খুব সুন্দরী সীমা, যৌবনে তার মা যেমন ছিল, সোনার মত রঙ, তীক্ষ্ণ মুখ চোখ; কলেজে অধ্যাপনা শুরু করবে না স্কলারসিপ নিয়ে রীসার্চ করতে শুরু করে দেবে — সে সব কোন কিছুই করা হল না আর

সীমার ; খুব ভালো একটা সম্বন্ধ এসে গেল, কলকাতারই এক বিখ্যাত বনেদী বাড়ির ছেলে, খড়্গপুর থেকে এম টেক পাশ করে চাকরি করছে পুণায়, কোম্পানী সাজানো ফ্ল্যাট দিয়েছে, গাড়ি দিয়েছে — সীমা চলে গেল পুণায় ।

তারপর তো তাদের মাও চলে গেল ।

তারপরও আটটা বছর কেটে গেল ।

বাড়িটা তো জীর্ণ হয়ে যাবেই । দেয়ালে বড় বড় ফাটল, প্লাষ্টার খসে খসে পড়ছে । নতুন করে প্লাষ্টার করে কোন লাভ নেই আর । ভেতরের আসল জায়গায় ইটেই ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে । চুন বালি সিমেন্টের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে । বাড়িটা এখনো যে ভেঙে পড়ে নি, এত বছর আছে, টিকে থাকার, আরো কিছু দিন থেকে যাওয়ার অদ্ভুত মোহে, হয়তো শুধুই থেকে যাওয়ার অভ্যাসে, হয়তো অন্তর্গত, হৃদপিণ্ডের রক্তের গভীরে, হয়তো আরো গভীরে কোথাও নিগূঢ় কোন সুতীব্র কোন আকাঙ্ক্ষা আছে তারই অদ্ভুত জোরে আজও বেঁচে আছে আশ্চর্যরকম ভাবে ।

আপনার জন কাছাকাছি কেউই নেই । আত্মীয় বন্ধু পরিজন পরিচিত কারো সঙ্গেই তেমন যোগাযোগ নেই । একটা কাজের মেয়ে সকালে এসে ঘণ্টাখানেক থেকে কাজ করে চলে যায় । একজন রান্নার লোক একটু বেলায় এসে তাঁর দু'বেলার খাবার তৈরি করে দিয়ে চলে যায় । তারপর সারাদিন সারারাত নির্জন নিঃঝুম নিঃশব্দ বাড়িটায় নিখিলেশ একা । দুটো খবরের কাগজ আসে । বেশীরভাগ দিনই কাগজ দুটো খুলেই দেখেন না নিখিলেশ । রঙিন টি ভি আছে — সুদীপ্তই কিনে দিয়ে গেছে, সাত দিনেও একবারও সেই টিভির ঢাকা খোলা হয় না । ইতিহাসে অনার্সে ফার্স্টক্লাশ পেয়ে এম এ-তে ভর্তি হয়েই সীমা ইতিহাসের বই কিনতে শুরু করেছিল, দুবছরেই দুটো আলমারি ভরে গিয়েছিল তার সংগ্রহে । বইগুলো সবই রেখে গিয়েছিল সীমা । সরমা চলে যাওয়ার পর যখন নিখিলেশের দিন আর কাটে না, রাত আর কাটে না, কোন কিছুই আর ভালো লাগে না, মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা শূণ্যতা — আর ভাঙ্গা শরীর, তাঁর গোটা অস্তিত্ব জুড়ে দারুণ ক্লান্তি, একটা অদ্ভুত অবসাদ । থেকে থেকেই মনের মধ্যে একটা দারুণ ভয়, একটা আশঙ্কা, আর উদ্বেগ, অস্থিরতা ।

সেই দুর্বিসহ দিনগুলোয় — তাঁর দিনগুলো, রাতগুলো যখন শুধুই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, একবিন্দু আলোও নেই কোথাও — একদিন হঠাৎ একটু আলো দেখতে পেয়েছিলেন সীমার বই-এর আলমারি দুটো দেখে — কিন্তু তাঁর দুটো চোখের আলো যে তখন অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ পড়ার পর

অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে হয়ে তারপর একেবারে মুছে যায়, বই-এর পাতা অন্ধকারে ঢেকে যায়। নিজের করুণ ইতিহাসের সামনে অন্ধকারে অসহায়ভাবে বসে থাকেন নিখিলেশ।

সেই ভাবেই তাঁর দিন কাটে রাত কাটে। এতগুলো বছর কেটে যায়।

একটা সময় নিখিলেশের ভয় হয়েছিল এই নিঃসঙ্গতার, এই অসহায়তার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে, আত্মরক্ষা করতে দিল্লীতে প্রদীপ্তর সংসারে তাঁকে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে নাকি!

খুব আন্তরিকভাবেই প্রদীপ্ত তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

সুদীপ্তও খুব আন্তরিকভাবে চেয়েছিল তাঁকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখতে।

সীমাও সমান আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে পুণায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

নিখিলেশ খুব ভালো করেই জানতেন সুদীপ্ত, প্রদীপ্ত, সীমা — তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের সংসারে নিজেদের মতো করে এক একটা জগৎ তৈরী করে নিয়েছে, ছোট ছোট সব সুখের সংসার — নিখিলেশ যদি কারো সংসারের মধ্যে গিয়ে পড়েন, যেতে পারেন যদি শুধু দু'দিনের জন্যে অতিথি হয়ে যান — অতিথি যদি অনির্দিষ্টকাল কারো সংসারে থাকতে চান তাহলে তাদের সেই সংসারের শান্তি নষ্ট হবে, অতিথিরও সম্মান নষ্ট হবে, হবেই।

নিখিলেশ বলেছিলেন, আমি যদি তোদের কারো কাছে গিয়ে থাকি, তাহলে এই বাড়িটার কি হবে — আমি এখানে থাকলে তোরা তবু মাঝে মাঝে এখানে আসবি — যেখানে যত দূরেই থাকিস তোরা, হাজার কাজের মধ্যে যত ব্যস্তই থাকিস, এই কলকাতার কথা, তোদের ছেলেবেলার কথা, তোদের মার কথা, এই পুরোনো বাড়িটার কথা কখনো কখনো তোদের মনে পড়বে, পড়বেই মনে, আর তখন তোদের মনে হবে যাই, ছুটে যাই — মনে হবেই ; হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও কদিনের ছুটি নিয়ে তোরা আসবি ছুটে।

দিল্লীতে ফ্ল্যাট কিনেছে প্রদীপ্ত। সে প্রত্যেক বছর নিয়ম করে আসতে পারে না। তবে দু'বছরের মধ্যে একবার সে আসে তার সুযোগ সুবিধা মত। এলে সে তার বউ আর তাদের একটি মাত্র সন্তান মেয়েটিকে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়িতেই থাকে। সাতদিন যদি কলকাতায় এসে থাকে তার মধ্যে দুটো দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নিখিলেশের কাছে কাটিয়ে যায়। সীমারা পুণায় বাড়ি করেছে। প্রদীপ্তর মতোই দুবছরে একবার কলকাতায় আসে সীমা। কলকাতায় সে তার শ্বশুর বাড়িতেই থাকে। দশ দিন যদি থাকে তার মধ্যে

দু তিন দিন দু তিন ঘণ্টা করে কাটিয়ে যায় নিখিলেশের কাছে।

সকলেই — সবাই অতিথি হয়ে গেছে।

প্রাণের চেয়ে প্রিয় আপনজন সবাই বড় হয়ে দূরে চলে গিয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে অতিথি হয়ে গেছে। অনাত্মীয়ের মত হয়ে গেছে!

## দুই

ব্যাগ সুটকেস নিয়ে সরাসরি এয়ারপোর্ট থেকে চলে এসেছে সুদীপ্ত।

নিখিলেশ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — বউমা, বাপ্পা ওরা কোথায় — এবার কি ওরা আসে নি?

সুদীপ্ত বলল, আসতে পারল না এবার — বাপ্পার কলেজের একটা পরীক্ষা সামনে —। বাপ্পা আপনার জন্যে একটা গিফ্‌ট্ পাঠিয়েছে। বাপ্পার মা একটা ফুল হাতা শোয়েটার বুনে পাঠিয়েছে। তবে এখনো যা গরম দেখছি এখানে — বর্ষা শুরু হতে আর কত দেরি?

বৈশাখই তো এখনো শেষ হল না, তারপর জ্যৈষ্ঠ, তারপর তো আষাঢ় — বৃষ্টি নামতে এখনো অনেক দেরি। আর বৃষ্টি হলেই বা কি — আরো তো দুর্ভোগ, রাস্তায় জল কাদা আর ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গুমোট। তোদের ওখানে এখন কোন ঋতু?

সামার। সানফ্রানসিসকোর সামার এখানকার গ্রীষ্মের মত নয়, খুব প্লেজেণ্ট কুল সামার — বৃষ্টিও হয় মাঝে মাঝে, তখন আরো সুন্দর, মনোরম হয় আবহাওয়া। আপনি তো গেলেন না একবারও।

নিখিলেশ বললেন, তুই দুপুরে এখানে খাবি তো, স্নান করে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর তো যাবি। — কোন হোটেলে এবার উঠবি ভেবেছিস?

এক হাতে ব্যাগ আর এক হাতে সুটকেস নিয়ে সুদীপ্ত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বলল — কোন ঘরটায় আমি থাকব বাবা?

নিখিলেশ বেশ অবাক হয়েই বললেন, তুই কি এবার এখানেই থাকবি ঠিক করেছিস।

হ্যাঁ —।

তোর কষ্ট হবে তো। ঘরগুলোর কোনটার অবস্থাই ভালো নয় — দেয়ালে ফাটল ধরেছে, ড্যাম্প ধরে গেছে সব জায়গায়। আলো হাওয়া নেই।

চারপাশের পরিবেশ খুব খারাপ হয়ে গেছে. শুধু জঞ্জাল আর্বজনা। তুই পারবি না থাকতে।

সুদীপ্ত বলল, একটা ঘর তো খুলে দিন। চাবি দিন, আমিই খুলে নিচ্ছি।

নিখিলেশ বললেন — আমিই দিচ্ছি খুলে।

আগে সুদীপ্ত যে ঘরটায় থাকত সেই ঘরটাই।

ঘরটার দেয়ালে কয়েক জায়গায় বড় বড় ফাটল। প্লাষ্টারও অনেক জায়গায় খসে গেছে। মেঝের অনেক জায়গা থেকে সিমেন্ট চটে গেছে। সুদীপ্ত দেখে একটু বিস্মিত হল, জীর্ণ ঘরটাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জানালায় নতুন পর্দা। খাটের ওপর সুন্দর নকশি চাদরে ঢাকা পরিপাটি বিছানা। পুরোনো কাঠের আলমারিটা মেজে-ঘসে পরিষ্কার করা হয়েছে। সুদীপ্তর সেই কতদিন আগের পড়ার টেবিলটা. তার ওপর ফুলকাটা খুব সুন্দর একটা কভার পাতা। টেবিলের মাঝখানে একটা পিতলের ফুলদানিতে একগুচ্ছ টাটকা, সতেজ রজনীগন্ধা। এই রজনীগন্ধা তার প্রিয় ফুল ছিল বাবা ঠিক মনে রেখেছেন এখনো।

সুদীপ্ত দরজার দিকে ফিরে দেখে চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নিখিলেশ দাঁড়িয়ে আছেন।

খেতে বসে সুদীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, বাবা, প্রদীপ্ত, সীমা — ওরা কবে আসছে —।

নিখিলেশ সুদীপ্তর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়েই বললেন — আসছে নাকি ওরা।

আপনি চিঠি পান নি ওদের!

চিঠি — না, ওদের কারো চিঠি তো পাই নি। ওরা আসবে — তোকে কি জানিয়েছে ওরা?

না না, আমাকে জানায় নি কেউ —। আমার মনে হয়েছিল ওরা আসবে।

আসবেই! প্রদীপ্ত, সীমা — ওরা যে আসছেই নিশ্চিতভাবে জানা হয়ে গেছে নিখিলেশের।

সুদীপ্তর সেই চিঠি পেয়েই অনুমান করেছিলেন নিখিলেশ। তাঁর মনে হয়েছিল সুদীপ্ত হয়ত চিঠিতে বা টেলিফোনে প্রদীপ্ত আর সীমার সঙ্গে

যোগাযোগ করেছে।

নিখিলেশের কেমন মনে হয়েছিল তাঁর পঁচাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে সুদীপ্ত কিছু একটা পরিকল্পনা করেছে।

বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর মনের যে আকাঙ্ক্ষাটা তাঁকে মাঝে মাঝেই খুব অস্থির করত সেই আকাঙ্ক্ষাটা হঠাৎ এত তীব্র হয়ে উঠেছিল — ছেলে মেয়েদের সকলকে একসঙ্গে দেখার জন্যে তিনি এত অস্থির হয়ে পড়লেন — তাঁর আগামী জন্মদিনটির প্রতীক্ষায় এত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন তিনি — তাঁর দিন কাটে না. দিন যদি কোনভাবে কেটে যায় — রাত কাটে না।

সন্তানদের সকলকে একসঙ্গে একবার কাছে পাওয়ার জন্যে তাঁর এত তীব্র আকুলতা।

শুধু একবার তাদের চোখের দেখা দেখতে চান।

তাতেই তাঁর অন্তরের সব তৃষ্ণার তৃপ্তি। তাঁর প্রাণের পরম পরিতৃপ্তি।

তারপর আর কিছুই তাঁর চাওয়ার নেই।

শনিবার, তাঁর সেই জন্মদিনের আগের দিন, সকালের কিছু পরে নটা নাগাদ এসে পৌছল প্রদীপ্ত, স্ত্রী প্রতিমাকে নিয়ে। তাদের মেয়ে প্রীতি, তার খুব আসার ইচ্ছা ছিল, সামনেই তার কলেজের একটা পরীক্ষা বলে সে আসতে পারে নি।

প্রদীপ্তরা আসার ঘন্টা খানেক পরে দশটা নাগাদ সীমা এসে পৌছল তার বারো বছরের আধফোটা স্বর্ণচাঁপার মতো কিশোরী সোহিনীকে নিয়ে।

প্রদীপ্তর মতো সীমাও এসেই বলল — বড়দা কোথায় ?

সুদীপ্ত বেরিয়েছে খুব সকালেই।

তিন দিন আগে আসার পর থেকে রোজই খুব সকালে সে বেরিয়ে যায়। ফিরতে রোজই দুপুর গড়িয়ে যায়। স্নান খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে বিকেলের আগেই আবার বেরিয়ে যায়।

সীমা বলল — বড়দা কোথায় গেছে তুমি জানো বাবা ?

না রে, আমাকে তো সে বলে নি কিছু।

কখন ফিরবে তাও বোধ হয় বলে নি ?

না তাও বলে নি।

নিখিলেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন — সুদীপ্ত কোথায় যেতে পারে তোরা কিছু জানিস না ?

সীমা একটু হেসে বলল — আমরা — আমরা কি ভাবে জানব —। আমি অন্তত কিছুই জানি না। ছোড়দা যদি কিছু জানে — তুমি জানো নাকি ছোড়দা ?

আমি ! — না-না ! প্রদীপ্ত সীমার মুখের দিকে ফিরে একটু হাসল। — তুই যদি না জেনে থাকিস তাহলে আমিই বা কি ভাবে জানব !

প্রতিমা হেসে বলে উঠল — তোমরা কেউ কিছুই জানো না, শুধু আমি জানি —।

প্রদীপ্ত প্রতিমার মুখের দিকে ফিরে একটু অবাক হয়ে বলল — কী — কী জানো তুমি ?

প্রতিমা হেসে বলল, জানি যে দাদা যেখানেই যান না কেন, আজ তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন — এসে পড়লেন বলে !

দুপুরের অনেক আগেই সত্যি ফিরে এলো সুদীপ্ত।

সীমাদের দেখে সুদীপ্ত খুব অবাক হয়ে বলল, তোরা ! কখন এলি তোরা ! — একই দিনে, প্রায় একই সময়ে একজন দিল্লী থেকে একজন পুণা থেকে — কী ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সীমা একটু হেসে বলল, আমি তো আমার মতো এলাম, এসে আমি তোমার মতই অবাক হয়ে দেখলাম ছোড়দা এসে গেছে ! তারপর শুনলাম তুমিও এসেছ। আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না !

প্রতিমা মুখ টিপে হাসছিল।

প্রদীপ্ত মুখের হাসি লুকোবার চেষ্টা করছিল।

সুদীপ্ত সীমার চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল। বলল — বাবাকে সব বলে দিয়েছিস তুই।

সীমা হাসতে হাসতে বলল, জিজ্ঞাসা করো বাবাকে — আমি কিছুই বলিনি !

নিখিলেশ হেসে বললেন, ওরা তোর কথা মতো কেউ কিছু বলে নি — আমি-আমিই ওদের সব বলেছি। বলেছি যে সুদীপ্তর চিঠি পেয়েই আমি বুঝতে পেরেছি তোরা কিছু একটা ষড়যন্ত্র করেছিস — সুদীপ্তই নাটের গুরু।

কত দিন পরে পুরোনো জীর্ণ বাড়িটা মুখর হয়ে উঠেছে কথায় কলরবে হাসিতে খুশীর উচ্ছ্বাসে। অভিভূত হয়ে গেছেন নিখিলেশ। নিবিড় প্রসন্নতায় ভরে গেছে তাঁর মন প্রাণ।

কত দিন — কত দিন পরে।

জীবনের শেষ বেলায় তাঁর জন্যে এত সুখ এত বিস্ময় এত আনন্দ নির্দিষ্ট ছিল স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি নিখিলেশ। ভাবতে পারেন নি তাঁর সায়হ্নের কালো আকাশ হঠাৎ এমন আলোয় ভরে যাবে।

দুপুরের পর তাঁকে বিস্ময়ে আরো অভিভূত করে দিয়ে সুদীপ্ত বলল, বাবা, আপনাকে তৈরী হয়ে নিতে হবে, আমরা বেরোব — দু'দিনের মতো আপনার জামাকাপড়, আর আপনার যা যা লাগবে একটা সুটকেসে ভরে নিতে হবে।

সীমা শাড়ি পরে সেজে তৈরী হয়েই বাবার ঘরে এসে ঢুকল। বাবার যা যা লাগবে আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি। — বড়দা তুমি যাও তৈরী হয়ে নাও।

সীমার মেয়ে সোহিনী এসে বলল — তুমি এখনো সাজোনি দাদু! বড় মামু বলল অনেকক্ষণ হল গাড়ি এসেগেছে। জানো দাদু দু'খানা গাড়ি এসেছে!

নিখিলেশ অবাক হয়ে বললেন — কী ব্যাপার বলত সীমা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

সীমা সুটকেসে নিখিলেশের জামা কাপড় গোছাতে গোছাতে বলল, কেন, তুমি তো তখন বললে বড়দার পরিকল্পনা তুমি সবই জানতে!

নিখিলেশ বললেন, সুদীপ্ত তোদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসছে জানতাম, তারপর তো আর কিছু জানতাম না।

সীমা বলল, আমরাও তারপর আর কিছু জানতাম না। তোমাকে বড়দা যেমন বলল তৈরী হয়ে নিতে, একটু আগে আমাদেরও বলল তৈরী হয়ে নিতে।

সুদীপ্ত তোদের বলে নি কোথায় নিয়ে যাবে —।

না কিছুই বলে নি, শুধু বলল, দু'দিনের জন্যে আমরা একটা জায়গায় যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছি, কত দূরে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি — কিছুই বলে নি!

সীমা একটু হাসল শুধু।

বেরোতে বেরোতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ি দুটো একটানা ছুটে কলকাতার ভীড়, কোলাহল, ধুলো, ধোঁয়া, শব্দ সব কিছু ছাড়িয়ে তারপর আরো প্রায় আধঘণ্টা আগের চেয়ে

জোরে ছুটে তারপর হাইওয়ে থেকে নেমে পশ্চিম দিকে একটা লাল সুরকির পথে নেমে মিনিট চার পাঁচ গিয়ে গাড়ি দুটো দাঁড়াল সবুজ লতা পাতায় ঢাকা একটা গেটের সামনে।

গেটের দুদিকের বিস্তীর্ণ প্রাচীরও ঘন সবুজ লতা পাতায় ঢাকা।

গেটের ওপারে ছোট বড় অসংখ্য গাছ। সবুজের অবাধ বিস্তার।

সূর্যাস্তের সময় হয়ে এলো বলে আকাশের নীলে লাল হলুদ, কমলা রঙের প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে। সেই আকাশের একটা দিক আড়াল করে আলো হয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া ফুলের লালে।

গেট খুলে যেতেই দেখা গেল নিবিড় সবুজের মধ্যে মুক্তোর মতো কোমল উজ্জ্বল সাদা রঙের ছবির মতো একটা বাড়ি।

দূর থেকে মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখা এক পান্থশালা।

যেন স্বপ্নের মধ্যেই, স্বপ্নের মধ্যেই এবং এই জন্মের নয়, এই জন্মের আগের জন্মের, হয়তো তারও আগের জন্মের, হয়তো তারোও আগের, অনেক অতীত, ধূসর স্মৃতির স্বপ্নের মধ্যে থেকে এক আশ্চর্য পান্থশালা নিখিলেশকে ডাকছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘন ছায়া আর স্নিগ্ধতা আর অদ্ভুত এক সুগন্ধ দিয়ে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বাড়িটা।

অনেক দিনের চেনা বাড়িটাকে এমন মুগ্ধ হয়ে দেখছেন নিখিলেশ যেন এই প্রথম দেখছেন।

উঁচু বারান্দায় ওঠার চার ধাপ সবুজ রঙের সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশ থেকে লতানে জুঁই-এর সবুজ ঝাড় উঠে গেছে ছাদে। ঘন সবুজ রঙের টানা চওড়া বারান্দার কোলে সবুজ রঙের টবে গাঢ় সবুজ সতেজ এরিকা পামের সারি। সবুজ রঙের দরজা। জানালাগুলোর রঙও সবুজ। বারান্দার এক জায়গায় একটা বেতের টেবিল, টেবিল ঘিরে বৃত্তাকারে সাজানো অনেকগুলো বেতের চেয়ার — সেই টেবিল চেয়ারগুলোও সবুজ রঙের। আর যে দিকেই চোখ যায় গাছপালা লতাপাতা উদ্ভিদের সবুজ, বিচিত্র অদ্ভুত সবুজ।

গাছপালা লতাপাতা উদ্ভিদের মৃদু গন্ধের সঙ্গে বকুল ফুলের গন্ধও ভেসে আসছিল।

কাছেই কয়েকটা অচেনা গাছের মাঝখানে বকুল গাছটাকে দেখা যায়, ঘন ডালপালা পাতার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র ফুলের কুঁড়ি নিয়ে শেষ বিকেলের লাল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

আর অনেক গাছপালার উজ্জ্বল বিস্তৃত সবুজের শেষে আকাশের একটা দিক আলো করে আছে সেই কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছটা।

সব কিছুই খুব চেনা নিখিলেশের। এই সব কিছুর মধ্যে তিনি গভীর ভাবে ছিলেন এক সময়। হয়তো এই জন্মে নয়, আগের জন্মে। হয়তো আগের জন্মে নয়, তার আগে — ঠিক বুঝতে পারেন না।

শুধু ঠিক বুঝতে পারেন তিনি ছিলেন।

এই বাড়ি, এই গাছপালা, সেই কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ, ওই বকুল ফুলের গাছ, এই লতানে জুঁই গাছ, জুঁই-এর কুঁড়িগুলো, জুঁই-এর পাতাগুলো, এই সবুজ, চারদিকের বিচিত্র সবুজ, সব কিছু বেলাশেষের আকাশটাও নিখিলেশকে চেনে — চিনতে পেরেছে।

## তিন

কতদিন পরে যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছেন নিখিলেশ। মন ভরে গেছে খুশিতে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে গভীর প্রসন্নতা। অদ্ভুত আবিষ্ট গলায় বললেন — হারিয়ে যাওয়া এমন একটা সবুজ দ্বীপ কীভাবে খুঁজে পেলি রে সুদীপ্ত।

সুদীপ্ত একটু হেসে বলল, চলুন ছাদে চলুন। ছাদে বসে চা খাওয়া যাবে। আপনার ভালো লাগবে — আসুন।

বারান্দায় উঠে সুদীপ্ত সবাইকে ডেকে বলল — এসো সবাই — ছাদে যাচ্ছি আমরা — সীমা — প্রতিমা — সোহিনী — এসো সবাই তাড়াতাড়ি — যদি সূর্যাস্ত দেখতে চাও —।

সামনে বিরাট, বিস্তৃত মাঠ। ধানের ক্ষেত।

এই গ্রীষ্মে নতুন এক ধরনের ধানের গাছ সারা ক্ষেত জুড়ে।

যত দূর চোখ যায় সেই বিস্তীর্ণ সবুজ, তার শেষ নেই যেন, সীমাহীন। অনেক, অনেক দূরে আরো ঘন সবুজের সঙ্গে মিশে গিয়ে আকাশের সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। যেখানে লাল, সিঁদুরে লাল, কমলা, হলুদ, বেগুনি, ফিকে বাদামী ও আরো নানা রঙের অদ্ভুত উচ্ছ্বাস।

সারা আকাশ জুড়েই সেই সব রঙের আশ্চর্য সঞ্চালন চলেছে।

তারপর হঠাৎ সারা আকাশ সারা চরাচর স্নিগ্ধ কমলা রঙে ভরে গেল।

লাল রঙের সূর্যটা বড় হতে হতে বিরাট একটা সিঁদুরের টিপের মতো

দ্রুত নেমে যেতে যেতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল যেন শেষ বারের মতো মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখার সুযোগ দিতে। তারপরই আগের চেয়ে আরো দ্রুত নেমে যেতে যেতে নিমেষের মধ্যে ডুবে গেল কোন অতলে।

আকাশ এবং চরাচরের সেই কমলা রঙ ফিকে হয়ে ক্রমে ফ্যাকাসে হয়ে তারপর অদ্ভুত ধূসর একটা রঙ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে রইল।

ছাদের ওপর এক জায়গায় সবুজ রঙের বেতের টেবিল চেয়ার সাজানো ছিল। দু'জন লোক চায়ের কাপ, চায়ের পট, দুধ চিনি, দুটো ট্রেতে করে এনে সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে সুদীপ্ত, প্রদীপ্ত, সীমা, প্রতিমা — তারা সবাই পাহাড়ে, সমুদ্রে, মরুভূমিতে সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলছিল।

নিখিলেশ সকলের কথা শুনছিলেন, নিজে কোন কথা বলছিলেন না।

তারপর কথা সব থেমে গেল।

পাখিদের অদ্ভুত কলরব শুরু হয়ে গেছে।

পাখিগুলো প্রথমে একটা দুটো করে ফিরে এসে বসছিল আশেপাশের এক একটা গাছে ; তারপর দলে দলে এসে যায় তারা।

তাদের কলধ্বনি অদ্ভুত এক সঙ্গীতের মতো শোনায়।

অনেক দূরে আকাশের কোলে ধূসর কুয়াশার মতো এক অন্ধকার জমতে শুরু করেছিল, এখন সেই অদ্ভুত অন্ধকার মাঠ ভেঙে এগিয়ে আসছে।

তারপর মাঝপথেই সেই অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে, মিলিয়ে গিয়ে নয়, স্নিগ্ধ নীল হয়ে সারা মাঠ সারা আকাশ সারা চরাচর ভরিয়ে দিল।

আকাশে একটা তারা ফুটল।

গাঢ় নীল বিশাল আকাশটার বুকে যেন কেউ সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর আরো কয়েকটা তারা ফুটল।

আরো তারা ফোটার আগেই পূর্ণিমার চাঁদের মতোই প্রায়, পরিপূর্ণ, রক্তিম লাবণ্যভরা চাঁদ উঠে এলো আকাশে।

আগামীকালই পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে যাবে কাল চরাচর।

আজ তার মহড়া হবে।

জ্যোৎস্নার জোয়ার দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল।

বকুল ফুলের যত কুঁড়ি উচ্ছ্বাসে ফুটতে শুরু করেছে।

জুঁই ফুলের যত কুঁড়িও।

জুঁই বকুলের গন্ধে উদ্বেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

সুদীপ্ত বলল — এবার নিচে যাওয়া যাক। বাবা, চলুন আপনি একটু বিশ্রাম নেবেন। সীমা, এরা রাতের খাওয়ার কী রকম ব্যবস্থা করেছে প্রতিমাকে নিয়ে একবার রান্না ঘরে গিয়ে দেখে আয়।

সীমা বলল, ব্যবস্থা তুমি সবই এত ভালো করেছ আমাদের কারো কিছুই দেখতে হবে না।

সুদীপ্ত বলল, তবু সব দেখবি তোরা — বাবার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় দেখবি। আর দেখনা এখন যদি কিছু খাবার দাবার ওরা দিতে পারে। সোহিনীর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে — কি মামনি ?

প্রতিমা বলল, বুঝতে পেরেছি আপনার খুব খিদে পেয়েছে, কী খাবেন বলুন, মিষ্টি তো অনেক রকম এনেছেন — মিষ্টি খাবেন ?

সুদীপ্ত বলল, আমি মিষ্টি খাব না, আমি একটা ওমলেট খাব — ডবল ডিমের কিন্তু।

সোহিনী বলল, আমিও ডবল ডিমের ওমলেট খাবো।

প্রতিমা বলল, বাবা আপনি কিছু খাবেন তো।

নিখিলেশ বললেন — না না আমি এখন কিছুই খাব না। তোমরা যদি আবার চা খাও আমাকে দিও এক কাপ।

কত বছর পরে এমন আপনজনদের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসেছেন নিখিলেশ।

সুখ, আনন্দ সবটুকু সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারছেন না তিনি।

বার বার যে শুধু মনে হচ্ছে এই সুখ এই আনন্দ সবই তো ক্ষণিকের, শুধু দু'দিনের জন্যে! তারপর আবার সেই নিঃসঙ্গতার, সেই একাকিত্বের, সেই অসহায়তার, সেই চরম হতাশার যন্ত্রণা।

এই এত সুখ এত আনন্দ এত আলো যে আবার তাঁর জীবনে এসেছিল সে সব স্বপ্নের মতোই মনে হবে। মনে হবে সে সব কিছুই সত্যি আসেই নি !

সুদীপ্ত ব্যস্ত হয়ে বলল — আপনি কিছু খাচ্ছেন না বাবা — রান্না কি ভালো হয় নি ?

নিখিলেশ বললেন — খুবই ভালো হয়েছে, সবগুলো রান্নাই বেশ উৎকৃষ্ট হয়েছে। — খাচ্ছি না কি বলিস, রাতে আমার যতটুকু খাওয়া উচিত তার অনেক বেশিই তো খেয়ে ফেললাম।

প্রতিমা বলল — রান্নাগুলো সত্যিই দারুণ হয়েছে ! এত ভালো পটলের ডালনা অনেক দিন খাইনি। ইলিশ মাছটাও দারুণ ! — কতদিন পরে ইলিশ মাছ খাচ্ছি !

সীমা বলে উঠল — কতদিন চিংড়ি মাছ খাইনি বড়দা।

প্রদীপ্ত একটু হেসে বলল — গলদা চিংড়ি চোখেই দেখিনি অনেকদিন।

সুদীপ্ত হেসে বলল — ঠিক আছে, গলদা চিংড়ি আসবে কাল।

সীমা বলল — কাল কিন্তু আমি রান্না করব।

সুদীপ্ত বলল — তুই পারবি অত লোকের রান্না করতে ?

নিখিলেশ সুদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে একটু বিস্ময়ের স্বরে বললেন — অত লোক !

সুদীপ্ত একটু হেসে বলল — আমরাই তো ছজন — দুজন ঠাকুর আছে, কাজের লোক আছে একজন — ।

সীমা বলে উঠল — তোমার ঠাকুররা ভাত ডাল ভাজাটাজাগুলো করবে — অন্য পদগুলো আমিই রাঁধবো — বাবা যা যা খেতে ভালোবাসে — ।

নিখিলেশ হেসে বললেন — তোর মনে আছে আমি কী কী খেতে ভালোবাসি ?

সীমার গলায় আবেগের প্লাবন — তুমি কি ভেবেছ ভুলে গেছি — ভুলিনি কিছুই। — তুমি ভালোবাসতে মাছের মাথা দেয়া সোনা মুগের ডাল — তার সঙ্গে সরু সরু করে কাটা কড়কড়ে আলু ভাজা, বেসন দিয়ে কুমড়ো ফুল ভাজা, পোস্তর বড়া — । ছানার ডালনা তুমি ভালোবাসতে। মাছের মধ্যে তুমি খুব ভালোবাসতে কৈ মাছের ঝাল, আর ভাপা ইলিশ, আর — আর সবচেয়ে ভালোবাসতে গলদা চিংড়ির মালাইকারি। আর একটা মাছ তুমি খুব ভালোবাসতে — পাবদা মাছ। — পাবদা মাছ এখন পাওয়া যায় বড়দা ? আরো একটা মাছ বাবা ভালো বাসত খুব — সরপুঁটি। সরপুঁটি কি পাওয়া যায় এখনও ?

সুদীপ্ত বলে উঠল — নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

প্রদীপ্ত বলল — নিউ মার্কেটে গেলে পাওয়া যাবেই।

সুদীপ্ত বলল — অত দূরে যেতে হবে না, কাছেই একটা বড় বাজার আছে, আমি খোঁজ নিয়েছি, রোজ সকালে টাটকা ভেজিটেবল ছাড়াও নানারকম টাটকা মাছ আসে প্রচুর। তোর চিন্তা নেই সীমা, যা যা চাইবি সব ঠিক ঠিক এনে দোব। কোন অসুবিধা হবে না।

নিখিলেশ একটু হাসলেন। — আমার অসুবিধার কথাটা তোরা একটু ভাবিস। আমি যে হার্টের রুগী কথাটা যেন ভুলে যাস না। এক মাসের ওপর আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

প্রদীপ্ত বলে উঠল — সে তো আট ন বছর আগের ঘটনা বাবা। তারপর থেকে তো আপনার কোন অসুবিধার কথা শুনিনি।

সুদীপ্ত বলল — এর মধ্যে কোন রকম অসুবিধা হয়েছে নাকি!

নিখিলেশ একটু হেসে বললেন — না তেমন অসুবিধা আর কিছু হয় নি। কিন্তু নিয়ম করে রোজ ওষুধগুলো তো খেয়ে যেতে হয়। ওষুধগুলোই এখন আমার আসল খাদ্য। অসুখ তো শুধু হার্টেরই নয়, আরো অনেক আছে — থাকবেই, অনেক বয়েস হয়ে গেল।

প্রদীপ্ত ব্যস্ত হয়ে বলল — আপনার কি ঘুমের কোন অসুবিধা হয়, বাবা?

নিখিলেশ আবার একটু হেসে বললেন, না, ঘুমের তেমন অসুবিধা হয় না। একটা করে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিই শোবার আগে। তাতেও যদি কোন কোন দিন ঘুম না আসে তাহলে আরো একটা।

সীমার চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। অধীর হয়ে বলে উঠল — তোমাকে রোজ ঘুমের ওষুধ খেতে হয়!

নিখিলেশ সীমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। ঘুমের ওষুধ কত লোকেই তো খায় রোজ! খেয়ে কত জনে কত বছর বেঁচে থাকে! — আমাকেই দেখ না! তবে আমি যে রোজই খাই তা নয়, এক একদিন খাই না, ভাবি ওষুধ না খেলে ঘুম আসে কি না দেখি।

সীমার চোখে মুখে উদ্বেগের সঙ্গে যন্ত্রণা, কষ্ট ফুটে উঠেছে। — ঘুম আসে না বাবা?

আসে —। এই তো আজই, রাত এখন কটা বাজে, দশটাও বাজে নি, এখনই তো আমার বেশ ঘুম পেয়ে গেছে!

সুদীপ্ত বলে উঠল — তাহলে আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন বাবা।

তোরা?

আমরা — আমরা একটু বসি। জুঁই ফুলের গন্ধটা খুব ভালো লাগছে — এত সুন্দর জ্যোৎস্না।

নিখিলেশ তাঁর ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন — আলোগুলো সব নিভিয়ে দিয়ে বোস তাহলে।

নিখিলেশ তাঁর ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই বাগানের দিকের দুটো জানালার কাঁচের শার্সিগুলো আলো হয়ে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে নিখিলেশ একটা জানালার পাল্লা দুটো খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতায় আর প্রসন্নতায় তাঁর মন প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে ভরে গেল।

আকাশ জেগে আছে আশ্চর্য স্নিগ্ধ নীলিমা নিয়ে। ফুলের মতো কয়েকটা তারাও আছে।

নিচে যত গাছপালা, গোটা বনানী অদ্ভুত জ্যোৎস্নার প্লাবনে নীলিমাময় হয়ে গেছে।

গাছপালার নিচে বনভূমিতে কোথাও একটু আলো কোথাও কোমল অন্ধকার। আবার কোথাও ঘন ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, ঘাস জ্যোৎস্নার লাবণ্যে আপ্লুত হয়ে আছে।

ফড়িঙার, ঝিল্লির, আরো কোন পতঙ্গের ডাক অদ্ভুত একটা সঙ্গীতের মতো ভেসে আসে — ভেসে আসতেই থাকে বিরামহীনভাবে।

মাঝে মাঝে কোন পাখির ডাক।

আর একটা গন্ধ আসে ভেসে।

মাটির গন্ধ নয়। মাটির গন্ধ স্মৃতিতে আছে।

ঘাসের, লতাগুল্মের, উদ্ভিদের গন্ধও নয়। সে গন্ধও স্মৃতিতে আছে।

কোন ফুলের — অজানা কোন ফুলের গন্ধ কি! নাকি জ্যোৎস্নার গন্ধ।

এত সূক্ষ্ম এত কোমল, প্রায় অনৈসর্গিক, মায়াময় এই গন্ধ এমন জ্যোৎস্নারই হওয়া স্বাভাবিক।

খুব ইচ্ছা হয় একবার ছুঁয়ে দেখে এই জ্যোৎস্নাকে।

জ্যোৎস্নার স্পর্শ পেতে অদ্ভুত বাসনা হয়।

অনেক পাখি একসঙ্গে ডেকে ওঠে সেই সময়।

তারপর আবার ঝিল্লির তান। সেই কোমল মায়াময় সৌরভ। সেই জ্যোৎস্নার প্লাবন।

তারপর আবার সেই পাখিদের কলতান।

ঘুমিয়ে ছিলেন না জেগেই ছিলেন ঠিক বুঝতে পারেন না নিখিলেশ।

কতবার যে পাখিদের ডাক শোনেন, কতবার যে মনে হয় ঘুমিয়ে ছিলেন না জেগেই ছিলেন!

তারপর একসময় সত্যি ঘুমিয়েই পড়েছিলেন নিখিলেশ।

পাখিগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নিখিলেশের ঘুম ভাঙে একটা পাখির ডাকে।

বিছানায় উঠে বসে নিখিলেশ জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন বাগানে ভোরের স্নিগ্ধ নীল আলো ফুটেছে। জানালার কাছেই ছোট একটা গাছের ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল সাদা রঙের অনেক ফুল ফুটে আছে। সেই ফুলের মধ্যে ফুলের মতো একটা পাখি। তার সোনালী হলুদ রঙ. লাল ঠোঁট। দু'চোখে অদ্ভুত মায়া তার। নিখিলেশের দিকে তাকিয়েই আছে।

পাখিটা সুরেলা গলায় আর একবার ডেকে যেন নিখিলেশকে জন্ম দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেল। ভোরের নীল আলোর মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল।

সুপ্রভার কথা মনে পড়ে গেল নিখিলেশের।

সেই রাতের পাখিগুলোর কলতান শুরু হয়ে গেল। কলরব। সেই সঙ্গে ডানার ঝটপটানি। আবার ঘাসপোকা ফড়িঙা ঝিল্লির তীক্ষ্ণ রব।

তার মধ্যে সানাই-এর সুর।

সানাই-এ বাজছে রাগ ললিত।

সূর্য ওঠার আগে আকাশে লাল রঙের আবির ছড়িয়ে পড়েছে।

## চার

নিখিলেশ ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সকালের কোমল আলো আর গাছপালার যত ঘন সবুজ পাতার প্রগাঢ় স্নিগ্ধতা আর বকুলের গন্ধ তাঁকে মুগ্ধ অভিভূত করে প্রসন্নতায়. এক পরম প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ করে ভরিয়ে দিল তাঁর মন প্রাণ, হৃদয়।

অদূরে বারান্দায় সুদীপ্ত. প্রদীপ্ত. সীমা. প্রতিমা. সোহিনী — সবাই বসে নিখিলেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

সবাই উঠে এগিয়ে এসে একে একে নিখিলেশকে প্রণাম করল।

তারপর সোহিনী নিখিলেশের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বসালো গদি-আঁটা একটা আরাম চেয়ারে।

তখন সানাই-এ বাজছে নট ভৈরব।

সেই সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে — বকুল গাছের ডালপালা পাতা ফুলের সমারোহের ওপর দিয়ে তারপর যত গাছপালা আছে তাদের অজস্র ডাল-

পালা পাতা ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছটার আকাশ জোড়া ফুলের সমাবেশের ওপর দিয়ে আরো দূরে চলে যাচ্ছে সেই সুর।

কাল রাতের আকাশটা কত সুন্দর ছিল, জ্যোৎস্নায় কেমন ভেসে যাচ্ছিল চারদিক, আজকের ভোর হওয়াটাও কত সুন্দর, কত পাখির ডাক, ঘাস পোকা ফড়িঙের ডাক, বকুল ফুলের আশ্চর্য সুবাস, আর এই আলোয় ভরা সকাল — স্বপ্নের মতো এই জায়গাটা কার কেমন লাগছে আবেগে উচ্ছ্বাসে সেই সব কথাই সবাই বলছে চা খেতে খেতে। তার মধ্যেই কখন সূর্য উঠে গেল। কোমল লাল রঙের আলোয় ভরে উঠল চারদিক।

সুদীপ্ত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল — প্রদীপ্ত, ওঠ, চল — আমরা বেরিয়ে পড়ি এবার!

সীমা বলে উঠল — যা যা লিখে দিয়েছি সব কিন্তু আনা চাই — কিছু যেন বাদ না যায়!

গাড়িতে উঠতে উঠতে প্রদীপ্ত বলল — কিছুই বাদ যাবে না — সবই আনব।

সীমা বলল — তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু — তোমরা ফিরলে সবাই একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবো।

সাড়ে আটটার মধ্যেই ঠিক ফিরে এলো সুদীপ্তরা।

তার অনেক আগেই, সকাল সাতটার মধ্যেই স্নান করে নিতে হয়েছে নিখিলেশকে। স্নান করে সীমার আনা দামী ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী পরতে হয়েছে তাঁকে। প্রতিমা ভারি সুন্দর হলুদ রঙের পোখরাজ পাথর বসানো সোনার আংটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে, আংটিটা আঙুলে পরতে হয়েছে তাঁকে।

সোহিনী অনেক বকুল ফুল কুড়িয়ে এনেছিল, সেই ফুল সব দুহাত ভরে নিতে হয়েছে নিখিলেশকে।

শাঁখও এনেছিল সীমারা। সীমা শাঁখ বাজাল। প্রতিমা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। সোহিনী নিখিলেশের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিল।

টেপ রেকর্ডারে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছিল।

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে / মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ। / তব ভুবনে তব ভবনে / মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান। / আরো আলো আরো আলো.....

আলোয় ভরা বারান্দায় বসে নিখিলেশ মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছেন। উপরে আকাশ ভরা উজ্জ্বল নীলিমা। নিচে নিবিড় সবুজের প্লাবন। পাতার

ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে মাটিতে এখানে ওখানে আলপনা এঁকেছে। কোথাও কোমল ছায়া। বকুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস আসছে ভেসে। আর থেকে থেকে পাখির ডাক।

ভোরবেলার সেই হলুদ পাখিটার কথা মনে পড়ে গেল।

সুপ্রভার কথা আবার মনে এলো।

কতদিন পরে সেই ভোর থেকে, তারপর সারা সকাল ধরে কতবার যে এলো সুপ্রভা।

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছেন নিখিলেশ, বকুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রভা। সেই প্রথম দিনের প্রথম দেখা সুপ্রভা।

কত দিন — ক—ত দিন এমন দেখা হয় নি।

বকুলের গন্ধ নিয়ে সেই সঙ্গে সুপ্রভার স্পর্শ নিয়ে বাতাস এসে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে নিখিলেশকে।

সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেই এক সময় একটু অবাক হয়ে নিখিলেশ দেখলেন একটা গাড়ি, নীল রঙের একটা মোটর খোলা গেট দিয়ে ঢুকে লাল সুরকির পথ ধরে এগিয়ে আসছে।

গাড়িটা দেখে সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রদীপ্ত, সীমা, প্রতিমা, সবাই এগিয়ে এলো।

এক ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। পরনে ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী। নিখিলেশেরই বয়েসী হবেন বৃদ্ধ। মাথার চুল সব সাদা। চোখে চশমা। এক হাতে লাঠি। আর এক হাতে একটা ফুলের তোড়া।

হাসি মুখে তিনি নিখিলেশের দিকে এগিয়ে আসছেন।

নিখিলেশ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছেন সুবিনয়কে দেখে।

পঁচিশ তিরিশ বছর পরে দেখা। তবু চিনতে ভুল হয় নি।

শৈশব কৈশোরের প্রিয় বন্ধুর মুখ কি কোনদিন ভোলা যায়।

বিস্মিত নিখিলেশ কিছুতেই বুঝতে পারছেন না আজ এই সকালে সুবিনয় কিভাবে এলো।

সুবিনয় হাসি মুখে ফুলের তোড়া নিখিলেশের হাতে তুলে দিয়ে বললেন — খুব অবাক হয়ে গেছিস তো।

সুদীপ্ত একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল — বসুন কাকাবাবু।

সুদীপ্তর মুখের হাসি দেখে সবই বুঝতে পারলেন নিখিলেশ। সুদীপ্ত কদিন রোজ সকালে বেরিয়ে যেত, দুপুরে ফিরে আবার বিকেলের আগে বেরিয়ে যেত, কেন সবই বুঝতে পারলেন নিখিলেশ।

সুবিনয় বললেন, মুখের দিকে তখন থেকে অমন করে চেয়ে আছিস, কী দেখছিস ?

কী বলবেন নিখিলেশ — কি করে বলবেন — বলা যায় না, শব্দ দিয়ে বোঝানোও যায় না এমনই এই অনুভূতি, শৈশব কৈশোরের প্রাণের বন্ধুকে ফিরে পেয়ে কত কাল আগে হারিয়ে যাওয়া, স্মৃতি থেকেও হারিয়ে যাওয়া তাঁর শৈশব কৈশোরকে আবার ফিরে পাওয়া !

সুবিনয় বললেন, কেমন আছিস বল — শরীর কেমন। দেখে মনে হচ্ছে শরীর একটু ভেঙেছে — আমারও ভেঙেছে ভালোই, দেখতেই পাচ্ছিস।

নিখিলেশ একটু হাসলেন। তারপর বললেন, কোথায় আছিস এখন, বাড়ি করেছিস কোথায় ?

সুবিনয় বললেন, ভুলে গেছিস — বেহালায় আমি যে বাড়ি করেছি তোকে তো বলেছিলাম — গৃহ প্রবেশে তোদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তোরা আসিস নি।

নিখিলেশ বললেন, হ্যাঁ এবার মনে পড়ছে। মনে করতে পারছি না কেন, কী কারণে তোর বাড়িতে সেদিন আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তারপর থেকে তুই আর আমার বাড়িতে আসিস নি, আমি ঠিক বলেছি কি না, রাগ করে বা অভিমান করে তুই — ।

সুবিনয়ের গলায় অভিমান, বললেন, তুইও তো আমার কোনরকম খোঁজ খবর নিস নি, কোনরকম যোগাযোগই আর রাখিস নি !

অভিযোগ, অনুযোগ, অভিমানের কিছু মুহূর্ত পেরিয়ে দু বন্ধু তারপর হৃদয় উন্মুক্ত করে অদ্ভুত আবেগে তাঁদের সেই শৈশব কৈশোরের দিনগুলোর মতোই তাঁদের হারানো শৈশব কৈশোরের দিনগুলোয় ফিরে গেলেন।

তাঁদের গ্রামের সেই ছায়া ঢাকা পথ। সেই মাটির গন্ধ এক পশলা বৃষ্টির পর। সারা দুপুর ধরে থেকে থেকে হু হু বাতাস। বাতাসে ভেসে আসা বকুল ফুলের গন্ধ। আর থেকে থেকে পাখির ডাক, পাখির শিস। দূরে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছ, ফুলে ফুলে আকাশ ভরিয়ে দিয়েছে।

অতীত বর্তমান স্মৃতি সত্তা একাকার হয়ে গেছে।

মুগ্ধ দুই কিশোর বসে আছে মুখোমুখি।

এক সময় নিখিলেশ দেখতে পেলেন দূরের সবুজ রঙের গেটটা খুলে গেল, গাঢ় সবুজ রঙের একটা গাড়ি গেট পেরিয়ে লাল সুরকির পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

সুদীপ্ত আবার আগের মতোই তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নিচে নেমে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রদীপ্ত সীমা প্রতিমারাও ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে।

সুদীপ্ত গাড়ির দরজা খুলে বলল, আসুন — আসুন কাকাবাবু।

হাসি মুখে গাড়ি থেকে নামলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বিকাশ সেনগুপ্ত নিখিলেশের কলেজ জীবনের, যৌবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কলেজ জীবনের শুরুতেই যে বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছিল দু'জনের মধ্যে, খুব দ্রুত সেটা এমন একটা প্রীতির, গভীর ভালোবাসার সম্পর্কের রূপ নিয়েছিল, এক সময় দু'জনের মধ্যে এমন প্রাণের টান তৈরী হয়েছিল, দু'জনেরই মনে হয়েছিল তাঁদের এই সম্পর্ক কোনদিনই ছিন্ন হবে না। কলেজ জীবনের পরেও সম্পর্কটা সত্যিই ছিন্ন হয় নি। প্রায় দশ বছর ধরে তাঁরা সুখ দুঃখে আনন্দে আবেগে আশা নিরাশায় একজন আর একজনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়েই ছিলেন। তারপর যৌবন যেমন এক সময় শেষ হয়ে যায়, সময়ের নিয়মেই, তাঁদের সেই প্রাণের সম্পর্ক এক সময় শেষ হয়ে যায়। গত তিরিশ বছর তাঁদের মধ্যে কোনরকম যোগাযোগ নেই। তিরিশ বছর কি, তারো দশ বছর আগে থেকেই বিকাশ নিখিলেশের কাছ থেকে, নিখিলেশ বিকাশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন।

নিখিলেশরই তো বয়েসী বিকাশ, নিখিলেশরই মতো রোগাটে গড়ন ছিল যৌবনে, নিখিলেশরই মতো উজ্জ্বল রঙ, চোখদুটো গভীর, মায়াময় — এখন আর কিছুই নেই। বার্দ্ধক্য সবই কেড়ে নিয়েছে। ভাঙা চোয়াল, শুকনো ত্বক, চামড়ায় ভাঁজ, পিঠটা অনেকটা বেঁকে গেছে বিকাশের। চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে ম্লান দুটো চোখ।

হাসি মুখে একগুচ্ছ লাল গোলাপ নিখিলেশের হাতে তুলে দিতে দিতে বিকাশ বললেন — কত দিন পরে — কত দিন পরে — আবার যে দেখা হবে কোনদিন, ভাবিনি —।

নিখিলেশ শুনলেন বিকাশের সেই যৌবনের সতেজ সুন্দর গলার স্বর।

বিকাশ বললেন, খুব অবাক হয়ে দেখছিস, চিনতে পেরেছিস — মনে আছে কি সেই সব দিনের কথা। আমার কিন্তু সব মনে আছে। এটাও মনে

আছে আমার বাড়িতে. গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠানে তুই বউ ছেলে নিয়ে — তোর বড় ছেলে সুদীপ্ত. পাঁচ ছ বছর বয়েস হবে তখন সুদীপ্তর, সকালে তোরা এলি, সেদিন রাতেই চলে গেলি ; তারপরেও একবার বোধ হয় এসেছিলিস. আমার বাড়িতে, কী অনুষ্ঠানে মনে নেই, কিন্তু মনে আছে তুই একা এসেছিলি. মনে আছে, এই জন্যে তারপর থেকে তুই আর কোনরকম যোগাযোগ রাখিস নি আমার সঙ্গে ।

নিখিলেশ অভিমানের সুরে বললেন — তুইই কি যোগাযোগ রাখার কথা ভেবেছিস কোনদিন, ধর্মতলায় তোর অফিস. দু মিনিট হেঁটে গেলে আমার অফিস, কোনদিন তো এলি না আমার অফিসে. একটা টেলিফোনও তো করিস নি কোনদিন ।

বিকাশ বললেন, তুইও কি কোনদিন টেলিফোন করেছিস আমার অফিসে — যদি আমার খোঁজ করতিস তাহলে জানতে পারতিস হঠাৎ আমাকে বদলি হয়ে দিল্লী চলে যেতে হয়েছিল । পনের বছর দিল্লীতে কাটিয়ে তারপর আবার কলকাতায় ফিরে আসি । কলকাতায় বছর পাঁচেক থাকার পর আবার বদলি হয়ে যাই ।

নিখিলেশের হঠাৎ খেয়াল হয়. বলেন — তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই — ।

বিকাশ বললেন — আলাপ আছে ওঁর সঙ্গে । — তোর বিয়ের বউ-ভাতের দিন আলাপ হয়েছিল । তার অনেক আগে থেকেই ওঁকে আমি চিনি । তোর মুখে ওঁর কথা এত শুনেছি — ।

সুবিনয় একটু হেসে বললেন, আমিও দূর থেকে দেখেই আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি । একবারই মাত্র বোধ হয় আমাদের চাক্ষুষ দেখা হয়েছিল — আপনার সেই যৌবনের মুখ চোখ, চেহারার ছবি, আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি, কি করে এত নিখুঁত ভাবে এত বছর ধরে মনের মধ্যে, মনের কোন্ গভীরে, কোথায় রাখা ছিল ।

বিকাশ একটু হাসলেন । বললেন, আবার কোনদিন যে আমাদের এইভাবে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি । অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া আমাদের যৌবনের দিনগুলোর কথা আজ দু দিন ধরে এত মনে পড়ছে । আজ ভোরের অনেক আগে ঘুম ভেঙে গেছে, আর তখন থেকেই মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে — ।

সুবিনয় বলে উঠলেন — আজ কদিন ধরে আমারও মনের মধ্যে অদ্ভুত

একটা আকুলতা — । সেই শৈশব কৈশোরের দিনগুলোয় দেখা, বর্ষায় — আষাঢ় শ্রাবণে, গ্রামের শেষে যে দিগন্ত জোড়া ধানক্ষেত তার দূর থেকে বৃষ্টি ছুটে আসত তুমুল বেগে, তেমনি করে মনে আসছে সেই কত দিন আগের শৈশব কৈশোরের দিনগুলোর কথা — কত স্মৃতি, কত ছবি — ভোরের কোমল নীল আলো, ভোরের আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমা, গাছপালার লাবণ্যময় সবুজ, বকুল ফুলের গন্ধ ভরা বাতাস, পাখির ডাক — শালিক, ছাতারে, ফিঙে, দোয়েল, টুনটুনি, হলদে পাখি, নীলকণ্ঠ পাখি — শৈশব কৈশোর হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে পাখিগুলো সব হারিয়ে গিয়েছিল । কত — কত দিন পরে মার গলার স্বর শুনতে পেলাম — চৈত্র বৈশাখে সারা বিকেল ধরে হাওয়ার উজানে মাঠ ভেঙে ছুটে চলতাম আমরা, কিসের উদ্দেশে — হয়ত দিগন্তে, যেখানে আকাশের নীল মাটির সবুজে মিশেছে সেইখানে পৌঁছতে ; সূর্য ডোবার পরে মনে পড়ত ঘরে ফেরার কথা — ফিরতে ফিরতে আকাশে দুটো একটা করে তারা ফোটে, মাঠ জুড়ে নীল সন্ধার মায়া দূরে গ্রামের গাঢ় নীল রেখা — শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছে, আর মার গলার স্বর ভেসে আসছে — সু-বি-ন-য় — নি-খি-লে-শ — ।

নিখিলেশ দেখলেন একটু দূরে সুদীপ্ত, প্রদীপ্ত, প্রতিমা দাঁড়িয়ে কথা বলছে — কথা বলতে বলতে থেকে থেকে তিনজনে হাসি মুখে নিখিলেশদের দিকে তাকিয়ে দেখছে ।

প্রতিমার চোখে চোখ পড়তে নিখিলেশ বলে উঠলেন — বউমা, তোমরা আমাদের একটু চা খাওয়াবে না !

সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে এসে বলল — সীমা আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা করছে, বেশি দেরি হবে না — ।

সুদীপ্ত হাতের ঘড়িটা একবার দেখে তারপর দূরের গেটটার দিকে তাকাল ।

সেই সময়ই ঠিক গেটটা খুলে গেল আবার ।

সুদীপ্তরা ব্যস্ত হয়ে বারান্দা থেকে নেমে নিচে গিয়ে দাঁড়াল ।

সাদা রঙের একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সিঁড়ির কাছে ।

ধূসর রঙের প্যান্ট, সাদা হাওয়াই সার্ট ; একহাতে একগুচ্ছ লাল গোলাপ আর এক হাতে লাঠি, মুখে সকৌতুক মৃদুহাসি নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন সুবিমল রায়, নিখিলেশের পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি জীবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ।

নিখিলেশের সহকর্মী ছিলেন সুবিমল। তাঁর জীবনের একটা দীর্ঘ অধ্যায়ে, আপদে-বিপদে, দুঃখে সুখে, সাফল্যে ব্যর্থতায়, জীবনের সব ঘাত-প্রতিঘাতে পরম আত্মীয়ের মতো পাশে ছিলেন সুবিমল।

রিটায়ার হওয়ার পর তিন চার বছর সম্পর্কটা অটুট ছিল। তারপরেও ছিল সম্পর্কটা — চিঠি লিখে দু'জন দু'জনের খবরাখবর নিতেন। তারপর চিঠি লেখাও বন্ধ হয়ে যায়।

সুবিমল নিখিলেশের দু'হাতে গোলাপ ফুলগুলো তুলে দিতে দিতে হেসে বললেন, তোমাকে তো বেশ দেখতে লাগছে — মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে বয়েস হঠাৎ অনেক কমে গেছে!

নিখিলেশ হেসে উত্তর দিলেন — বয়েস সত্যিই অনেক কমে গিয়েছিল, তোমাকে দেখে বয়েসটা আবার অনেক বেড়ে গেল।

সুবিমল বলে উঠলেন — তাহলে তো আসা উচিত হয়নি আমার — বলো যদি ফিরে যেতে পারি।

নিখিলেশ হেসে বললেন, এত ঘটা করে অত দূর থেকে এসেছ ফিরে যেতে বলি কি করে — বরং জিজ্ঞাসা করি পথ চিনে আসতে কোন অসুবিধা হয় নি তো তোমার?

সুবিমল বললেন, পথ তো আমার চেনার কথা ছিল না; তোমার পুত্রের এত নিখুঁত ব্যবস্থা, ঠিক সকাল সাড়ে ছটায় গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে আমার বাড়ির দরজার সামনে। আমি অবশ্য ছটার আগেই, ভোর থেকেই তৈরী হয়ে বসেছিলাম। সারা রাতই তো জেগে —।

নিখিলেশ বললেন — তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

সুবিমল বলে উঠলেন — আলাপ অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে ওঁদের সঙ্গে — সুবিনয়বাবু আর বিকাশবাবুকে আমি ভালো করেই চিনি। ওঁদের সঙ্গে অনেক বছর আগে একবারই দেখা হয়েছিল, তারপর আর দেখা হয়নি ঠিকই কিন্তু ওঁদের ভুলে যাই নি, দূর থেকে দেখে ঠিকই চিনতে পেরেছি।

সুবিনয় একটু হেসে বললেন, আমিও আপনাকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছি।

বিকাশ একটু হেসে বললেন, আমিও দূর থেকে দেখেই ঠিক চিনতে পেরেছি।

নিখিলেশের চোখে মুখে খুশির উচ্ছ্বাস। — এমন একটা দিন আমার জীবনে আসবে আবার ভাবিনি — স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। — তোমরা সত্যিই এসেছ তো — সুবিনয় — বিকাশ — সুবিমল ?

সেই সময় একজন কাজের লোক এসে দুধ সাদা চারটে প্লেট টেবিলটার চারদিকে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর সেই লোকটিই আবার এসে চারটে খুব সুন্দর কাঁচের গ্লাস সাজিয়ে দিয়ে গ্লাসগুলোয় জল ভরে দিয়ে গেল।

তারপরেই সীমা আর প্রতিমা দুটো বড় ট্রে হাতে এগিয়ে এলো।

দুজনে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ট্রে থেকে একটার পর একটা ছোট মাঝারি সুদৃশ্য গড়নের প্লেট নামিয়ে টেবিলের ওপর আলপনা দেওয়ার মতো করে সাজিয়ে দিল। লুচি, বেগুন ভাজা, নারকেলকুরো দেওয়া ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, সন্দেশ তিন রকমের, ক্ষীর কদম্ব, ছানার জিলিপি, পায়েস, তারপর আম, গোলাপ জাম, লিচু।

নিখিলেশ হেসে বললেন — জল খাবারের যদি এই মেনু হয় তাহলে তো দুপুরের খাবারের জন্যে এই রকম চারটে টেবিল লাগবে সীমা !

সীমা বলল, দুপুরে টেবিলে নয়, মেঝেয় আসন পেতে বসে খাওয়া হবে।

সুবিনয় বলে উঠলেন — গ্রাম ছেড়ে আসার পর আর মেঝেয় বসে খাওয়ার সুযোগই হয় না।

বিকাশ বললেন — অনেকদিন হল গ্রামের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই নেই, তবে শুনি আজকাল গ্রামে অনেক বাড়িতে টেবিল চেয়ারে বসে খাওয়া-দাওয়া হয়।

নিখিলেশ বলে উঠলেন — এখন আর কথা নয়, খেয়ে নও যে যেমন পারো তারপর চলো বেরিয়ে পড়ি। বাতাসে বকুল ফুলের গন্ধ পাচ্ছ তো — আরো অনেক ফুল আছে ভোর থেকে ফুটে আছে আমাদেরই জন্যে, দেখবে কত গাছ, কত রকমের গাছ, কত বিচিত্র রকমের পাতা আর পাতার কত রকম রঙ, সবুজ রঙই কত রকম — চলো ছায়ায় ছায়ায় হাঁটি ; ঘুঘুর ডাক শুনতে পাচ্ছ তো, দেখবে আরো কত পাখি — হয়ত দেখা পেয়ে যেতে পারি অনেক কাল আগে হারিয়ে যাওয়া পাখিগুলোকে — ফিঙে, দোয়েল, টুনটুনি, হলদে পাখি — চলো চলো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি, দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে যাবে।

## পাঁচ

কত তাড়াতাড়ি, কত দ্রুত দুপুর হয়ে গেল।

সকালটাকে ভালো করে অনুভবই করা গেল না। যেন কত তাড়াতাড়ি দুপুরে পৌঁছবে সেই তাগিদের ব্যস্ততায় অদ্ভুত দ্রুততায় সকালটা শেষ হয়ে গেল।

দুপুরটাকেও তেমন করে অনুভব করা গেল না। বোঝা গেল না, অনুভব করা হল না প্রাণ ভরে. তৃষ্ণা মিটল না। দেখতে দেখতে কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল।

রোদ ম্লান হয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেছে। গাছপালার ছায়া বড় হয়ে হয়ে একটা বেদনার. শোকের ছায়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

গাছের ডালপালা কাঁপিয়ে শুকনো পাতা ঝরিয়ে হু হু করে বহে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

দিনের এই করুণ শেষ সময়টুকু শেষ হতে আর কতক্ষণ।

সুবিনয় সকলের আগে এসেছিলেন, তিনি চলেও গেলেন সকলের আগে। যাওয়ার আগে একটা কথাই শুধু বলতে পেরেছিলেন। — যাই!

তারপর বিকাশ। তিনিও চলে গেলেন সেই একই কথা বলে। — যাই!

শেষে সুবিমল, আমাকেও যেতে হবে এবার — যাই, বলে চলে গেলেন।

নিখিলেশ বসেছিলেন সকালের সেই জায়গায়, বারান্দার এক প্রান্তে সেই চেয়ারে।

সুবিনয়, বিকাশ, সুবিমল একে একে সকলেই চলে গেছেন। আশ্চর্য, নিখিলেশের একবারও মনে হচ্ছে না সত্যিই তারা চলে গেছে। নিখিলেশের মনে হচ্ছে কেউই যায় নি তাঁকে ছেড়ে, সকলেই আছে, সকলেই আছে তাঁর খুব কাছাকাছি। তিনি খুব স্পষ্টই, খুব নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারছেন। তাঁর অস্তিত্বে যে মিশে আছে সুবিনয়রা।

তাঁর মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে ভারি মধুর এক সুখের অনুভূতি। গভীর এক আনন্দ।

সুপ্রভা, কতদিন আগে সুপ্রভা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, আজ ভোরে ঘুম ভাঙার পরই তারপর সারাদিনই তাঁর মনে হয়েছে সুপ্রভা তাঁর খুব কাছাকাছিই

আছে। সেই উজ্জ্বল রঙ সুন্দর লাবণ্যভরা মুখ, গভীর চোখ দুটো, ঠোঁটের সেই হাসি, নিখিলেশ যখনই দেখতে চেয়েছেন ঠিকই দেখতে পেয়েছেন। সেই গলার স্বরও শুনতে পেয়েছেন অনেকবার।

মার মুখখানা তাঁর তেমন মনে পড়ার কথা নয়, আশ্চর্য, খুব নিখুঁতভাবে মার মুখখানা আজ অনেকবার নিখিলেশ দেখতে পেয়েছেন। মার গলার স্বরও শুনতে পেয়েছেন — নিখিলেশ শৈশবে কৈশোরে মার গলার যে স্বর শুনেছেন।

সূর্য ডুবে গেছে। আকাশের এখানে ওখানে মেঘের কোলে রক্তিম একটু আলো আছে। আকাশের গাঢ় নীলেও এখনো একটু আলোর রেশ।

সামনের বিস্তৃত গাছপালার গাঢ় সবুজের ওপর নীল আলোর মায়া।

বকুল ফুলের গন্ধভরা বাতাস। ভোরের বাতাসের মতো। ভোরের মতোই দূর থেকে ভেসে আসছে অনেক পাখির ডাক।

ভোরই হচ্ছে বলে মনে হয়। আবার সকাল শুরু হবে।

সীমা কখন এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে, হঠাৎ মুখ ফেরাতে সীমাকে দেখে নিখিলেশ হাসি মুখে বলেন — কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস তুই, আমাকে ডাকিস নি কেন, কিছু বলবি ?

সীমা বলল — আপনি তৈরী হয়ে নিন বাবা। এবার যেতে হবে।

চমকে উঠলেন নিখিলেশ। — যেতে হবে ! — আজই যেতে হবে !

সীমা ধীরে ধীরে বলল — সেই রকম ব্যবস্থাই যে করা হয়েছে। আপনার জিনিসপত্র সব আমি গুছিয়ে নিয়েছি। আপনি শুধু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন বাবা। সময় আর বেশী নেই।

নিখিলেশ তবু বসেই রইলেন।

বাইরে কিছু দূর পর্যন্ত স্বচ্ছ নীল আলো, তারপর গাঢ় নীল — তারপর যত দূর চোখ যায় গাঢ় নীল যেন ঘন অন্ধকার।

একবার আকাশের দিকে তাকালেন নিখিলেশ। দেখতে পেলেন একটা, তার পাশে আরো একটা তারা ফুটে আছে, ভোরের আকাশে যেমন ফুটে থাকে।

সীমা বলল — বাবা উঠুন এবার — আর যে সময় নেই।

সুদীপ্ত কখন এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

সুদীপ্তকে দেখে সীমা বলে ওঠে — দাদা, তুমি বাবাকে বলো।

সুদীপ্ত ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিখিলেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর মৃদু গলায় ডাকল — বাবা !

নিখিলেশ একটা গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে, অন্তর্গত প্রবল একটা আবেগের আলোড়নে অভিভূত হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তর দুটো হাত নিজের দু'হাতের শীর্ণ আঙুলগুলোর মধ্যে নিয়ে গভীর আকুতি ভরা গলায় বলে উঠলেন — সুদীপ্তরে, আমার যে যেতে কিছুতেই প্রাণ চাইছে না রে। — আর দুটো দিন, দুটো দিন আরো থেকে যেতে চাই !

নিখিলেশ ছেলের হাত দুটো ছাড়েন না।

পূর্ণ চাঁদের আলোর মায়ায় ভুবন ভোলাতে পূর্ব আকাশের কোল থেকে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠে আসে হাসতে হাসতে। □

# আমার জীবন ঃ সুব্রত রুদ্র

## রথীন ভৌমিক

যতদিন ঘাসের কাছে ছিলুম
ঘাস ছাড়া আমার কেউ ছিল না
আমার জীবন ছিল
ঘাসের গায়ে কান্না ফুরোবার বাতাস

তারা চোখ চেয়ে থাকলে মনে হয়
পরিচয়হীন আমি, ক্ষীণ হ'য়ে আসে কাঁপা।

আরো একদিন, এভাবে চলতে চলতে এক সময়
দেখবে নদীর গর্ভে থাকা আমি।

'জীবন' এই শব্দটি হয়ে উঠতে পারে এই জগতের সারাৎসার। তখনই এ-প্রশ্ন আসতে পারে, শব্দটি কতটা শুনবার, কতটা অনুভবের। অর্থাৎ কতটা পরিবহন যোগ্যতা নিয়ে উঠে এসেছে এখানে। এই কবিতায়। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এই 'জীবন' শব্দটি ব্যবহার করে নিজের মধ্য থেকে নিজেকে খুলে দিতে চেয়েছে। বেরিয়ে আসতে চেয়েছে সমস্ত ছিন্নতার থেকে গাঢ় এক বিন্যাসের দিকে। বিস্তারিত এক না-আমির উপলব্ধির কেন্দ্রের দিকে। এ-সব আমরা জানি বটে যে কতিপয় মানুষের জগতে এই রোমাঞ্চকর উপলব্ধি পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেবলই এ-কথা নয়। এরও বাইরে আরও কিছু আছে, যেখানে 'জীবন' এই শব্দটি এক আশ্চর্য, গভীর আর গহন এক কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে দূর কোনও আত্মতার আহ্বান তৈরি হতে থাকে সমগ্র ইন্দ্রিয় জুড়ে, যেমন এই কবিতায়। বহুদূর স্মৃতির মধ্য দিয়ে মিলনের ছবিটি তৈরি হতে থাকে এক সন্ধ্যালীন কোনও গূঢ় ভাষায়। যেখানে জেগে থাকে তার প্রবল অস্তিত্ব নিয়ে তৃণগুল্মময় মৃত্তিকাজগৎ, থাকে প্রাণেরও প্রাণ মহাপ্রাণ, যার আয়তনের মধ্যে মানুষ ধরতে চায় তার সমগ্র জীবনধারার ইতিহাস আর উন্মোচন।

এই বহির্জাগতিক যাপনের মধ্যে সে আজ অতীতহীন এক বিচ্ছিন্ন

দ্বীপের মতো। তার আত্মপরিচয় ক্রমে ভেঙে যেতে থাকে। সংসার নয়, সমাজ নয় এক অসীমবিভার অভাবের আঘাতে। এ-যে এক মস্ত ক্ষতি। জন্মকে ভুলে যাওয়ার মতো প্রবল দুঃখ আর কি থাকতে পারে ?

তখনই আসে বড়ো রকমের জিজ্ঞাসা। আর এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে ধ্যান থেকে এসে পৌঁছয় মানুষ তার মৌল উত্তরে। তার পরিচয়টিকে বলে যায় এই বিশ্বমণ্ডলের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য। বলে যায় প্রাণেরও আগে যে মহাপ্রাণ তার কথা।

সুব্রত রুদ্রের এ-কবিতা ওই বলে যাওয়া। এ-শুধু ভাবের কথা নয়, এ-হলো অনুধ্যান আর আত্মসাক্ষাৎকারের কথা। এই প্রবল বিশ্বের সমস্ত সংঘর্ষ এবং সংঘাতকে অতিক্রম করে কবি নিজের বাইরের আবরণটাকে ভেঙে যে আত্ম-আমির মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছেন, সে তো এই বিশ্বের মহাপ্রাণের সংযোগে যাওয়া।

বলেছি মহাপ্রাণ। তাহলে কী সেই মহাপ্রাণ ? আজ যে প্রাণ ছড়ানো আছে এই বিশ্বলোকের বিশাল আয়তনে, কত জটিল বিচিত্র স্তর অতিক্রম করে যা আজ পৌঁছেছে এক পূর্ণ নির্মাণের প্রান্তে, তার প্রথম স্ফুরণ ঘটেছিল যে নৈসর্গিক লীলা কেন্দ্রে, যার বার্তা আজও রহস্যে আবৃত, সেইটিই মহাপ্রাণ।

তাহলে এ-কবিতা শুধু নিজেকে যাচাই করারই নয়, মহাপ্রাণেরও প্রার্থনা।

কবিতাটি অবশ্যই সহজপাঠ নিয়ে আসেনি আমাদের কাছে। কিন্তু কিছু অনাড়ম্বর শব্দ অভিমানের বৃত্ত তৈরি হয়েছে বটে। যা আবার আমাদের চারিদিকে ঘিরে নিচ্ছে। অবসান আর সূচনা পরস্পরকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

২

কবিতাটি কীসের সূচনা নিয়ে এসেছে ? বন্ধনের ? মুক্তির ? কবিতাটি লেখা হয়েছিল কবির কোনও গূঢ়তর বেদনার বিস্তার থেকে। যে অনুভব জেগে উঠেছে কবিতাটিতে, যেন দর্শনেরই অভিঘাত তৈরি হয়ে উঠেছে তার প্রকাশে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সহজভাবে শব্দ সাজানোর একটা ব্যাপার আছে বটে। কিন্তু তার আবডালে, একটু ভিতর দিকে চোখ নিলে দেখা যাবে, এক প্রগাঢ় অবচেতনের ভাষা কবিতাটির গোপনে কেঁপে যায়।

আর এই রণন কবির চেতনায় ঘটে যাচ্ছে, পূর্বেই বলেছি, বন্ধনের নয়,

আলোর অভিপ্রায়ে। মুক্তি যাকে বলে। আমাদের স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, এ-মুক্তি বা কীসে, আলোয় বা কোথায় ? কেন না এই প্রবহমান জীবনাচরণের মধ্যে কীসের হানি ঘটে গেল কবির মধ্যে ? আসলে গোপনে গোপনে এক ক্লিষ্টতা সমস্ত স্বপ্নকে ছিঁড়ে এক সমগ্র ছন্দহীনতার মধ্যে ভাসিয়ে দেয় কবিকে। কবির মধ্যে তখনই উঠে আসে ঘরহীনতার শূন্যতা। তাঁর কাছে, এও তো এক প্রবাস, এরকম অভিমান জেগে ওঠে। আর এ অভিমান থেকে তিনি ফিরে যেতে চান তাঁর ঘরে, একদিন, কোন্ সুদূর অতীত পেরিয়ে যেখানে তার জন্ম হয়েছিল বহু শতাব্দীর জড়তা মোচন করে, সেই ঘরে। মানুষ শুধু নয়, যে কোনও জীবের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, এর চেয়ে বড়ো সম্পর্ক আর কি হতে পারে।

মৃত্তিকার অবতলে সেই ঘর। প্রাণ একদিন জেগে উঠেছিল এই মৃত্তিকারই কোণে কোণে। যেমন ঘাস, লতাগুল্ম। এই লতাগুল্ম ঘাসই ছিল তার বন্ধু। সখা। সেখানে ঘটেছিল তার আত্মার বোধন। চেতনার বিস্তার।

সেই ফেলে আসা জীবনের কাছে ফিরে যাওয়ার অথবা এমনও বলা যায় সেই জীবনের মর্মরিত সুখেরই কথা এই কবিতাটির স্বরে। কবি বলতে চেয়েছেন সেই অন্তরঙ্গ সত্তার কথা, না কি মিলতে চেয়েছেন সেই সত্তার অন্তঃপটে। যেমন ঘরে ফেরা।

কী ছিল সেই জীবনে ? আশ্রয় ছিল। জীবন ছিল। বাতাস ছিল। কান্নাকে মুছে দেওয়ার ছিল ভালোবাসা। আর আজ যখন বিচ্ছিন্নতায় সময় কাটে, তখন কোনও পরিচয় থাকে না ; তবু তাদেরই ভালোবাসার স্পর্শ কবিকে দাহ থেকে সরিয়ে নেয় 'ক্ষীণ হ'য়ে আসে কাঁপা'।

আমাদের ভালোবাসাহীন সময়ের মধ্যে, বিচ্ছিন্নতা আর জটিল আবর্তের মধ্যে এ-কবিতা আকাঙ্ক্ষাময় এবং প্রেমপ্রত্যাশী এক আত্মোদ্বোধনের কবিতা, যেখানে দাঁড়ালে সমস্ত যন্ত্রণা হাল্কা হয়ে যায়। এ-কবিতা নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নয়। ঘরের মধ্যে থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে যাওয়া, যেমন 'মন চল নিজ নিকেতনে'। এ-কোনও প্রত্যহ দিয়ে গড়া নয় কেন না শেষ উচ্চারণে পৌঁছে আমরা শুনবো : '…এভাবে চলতে চলতে এক সময় দেখবে নদীর গর্ভে থাকা আমি।' কবির এ সময়ের ভাবনা। এরই নাম আনন্দ।

একে কী বলবো ? পুরাতনী ? তাই কি ? এই তো বড়ো আধুনিকতার লক্ষণ। ইতিহাস আর বিবর্তন জ্ঞান কবিকে এভাবেই পৌঁছে দেয় বৃহৎ পাঠক

সমাজের কাছে। এটাই হোক স্বপ্ন। সৃষ্টির, শিল্পের।

৩

এক গভীরতর সংকটের উপর, অস্তিত্ব আর সমকালের, কবি দাঁড়িয়ে আছেন, এক প্রগাঢ় প্রজ্ঞা ধারণ করে। শূন্যবিহারী কোনও দর্শন নয়, জীবনের আবরণ নিয়ে যে শূন্যতা, তাকে ছিঁড়ে ফেলে এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তাই এটা কোনও চলতি হাওয়ার পন্থী নয় কবিতা, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে সমসময়ের হনন আর হরণ ; এ-কবিতা মৌলসত্তার সংঘাতে আর সংকটের, স্থিতি আর স্থাপনের। এ-কবিতা দর্শনের। সনাতন সৌরভের। এ-কবিতা মর্মের, এ-কবিতা বিবর্তনের।

---

কবিতাটির প্রকাশকাল ১৯৮৮।

অর্কিড/২১৬

CENTRAL LIBRARY

With Best Compliments from

Dataman
INFOTECH PVT. LTD.

# Responsibility begins in the dream

*With Computer*

# DATAMAN
INFOTECH PVT. LTD.

## Where Futuristics Are . . .

16 GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA - 13

TELEFAX 2219559/61, 2378265

EMAIL : dataman@cal2.vsnl.net.in

CENTRAL LIBRARY

*With Best Compliments From :*

# Galaxy Trading Co.

***H.M., L.D., P.E., L.L.D.P.E. Treated Shipping Bags***
***Tea-Chests, Foil, Paper, Flexo & Gravure Printing***

**Sk. Zahurul Islam**

**44A, Ripon Street ( Muzaffar Ahmed Street )**
**Calcutta - 700 016**

**Phones : 229-1747**
**229-6237**

---

*With Best Compliments From :*

# Luquemanian & Co.

**63, A. J. C. Bose Road,**
**Calcutta - 700 016**

# অর্কিড-এর গ্রাহক হতে গেলে

## গ্রাহক চাঁদা ঃ

এক বছরের জন্য সডাক ৭৫-০০ টাকা [ পঁচাত্তর টাকা ] মাত্র।
দু' বছরের জন্য সডাক ১৪০-০০ টাকা [ একশ চল্লিশ টাকা ] মাত্র।
আজীবন সদস্য চাঁদা ১০০০-০০ টাকা [ এক হাজার টাকা ] মাত্র।

- ☐ পত্রিকা প্রতি সংখ্যা সার্টিফিকেট অফ্ পোস্টিং-এ পাঠান হবে।
- ☐ গ্রাহকরা অর্কিড প্রকাশনীর যে কোন বই ( সংকলন বাদে ) কেনার সময় শতকরা তিরিশ টাকা হারে ছাড় পাবেন।
- ☐ বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যাবে।
- ☐ মনি অর্ডারেও টাকা পাঠিয়ে যে কেউ গ্রাহক হতে পারবেন।

টাকা পাঠানো বা সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক,

২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে, সাহাপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩৮, পশ্চিমবঙ্গ।
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

---

## অর্কিড-এর পরবর্তী প্রকাশনা

**এই শতাব্দীর শেষ প্রতিনিধিত্বমূলক বাংলা কবিতার সংকলন**

প্রখ্যাত সমালোচকের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত

# স্বাধীনতা-উত্তর শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতা

সম্ভাব্য মূল্য : একশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : নব্বই টাকা [ এককালীন ]

যোগাযোগ :

২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে সাহাপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩৮
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

Registration No. 32758/77 ARKID 24th Year 1st Issue 2000

## অর্কিড প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কিছু বই

প্রবন্ধ

### শান্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায় এবং অন্যান্য

উপেক্ষিত লেখক অপেক্ষিত অবলোকন

উপন্যাস

### চণ্ডী মণ্ডল

অলীক অবন্তব

কাব্য সংগ্রহ

### পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কাব্য সংগ্রহ : ১

কাব্য সংগ্রহ : ২

কবিতা

### সুব্রত রুদ্র ( সম্পাদিত )

স্বর্ণকুমারী দেবীর

প্রেমের গান আর কবিতা

কবিতা

### দীপক মুখোপাধ্যায়

ওষ্টাভিয়ো পাজ ( অনুবাদ )

### প্রদোষ দত্ত

কাঁগল ভালোবাসা ডিনটেজকার

### শান্তনু প্রামাণিক

শিকড় বাকড়

### রাণা চট্টোপাধ্যায়

নীল সাময়ানার নিচে

আধভাঙা চাঁদের আলোয়

### প্রসেনজিৎ বক্সী

এখন কোরাস

জটায়ুর প্রতীক্ষা

সমুদ্র ও সারস

### অলোককুমার ঘোষ

নিম ফুলের মধু

সময় ধরা শূন্য মুঠোয়

Published From : 29, H. B. Pathway Sahapur Calcutta-700 038
Printed at : G. D. Enterprise, 29, Sitalatala Road, Sahapur
Calcutta-38 ✆ : 468-8214
Rs. 35/- only

CENTRAL LIBRARY

চতুর্বিংশতি বর্ষ ২য় সংখ্যা
বইমেলা ২০০১

# চাঁদের

অলোককুমার ঘোষ

CENTRAL LIBRARY

## একবিংশ শতকের প্রথম বই মেলায় অঁকিড প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে আকর্ষণীয় ১২টি বই

কাব্যগ্রন্থ

### রাণা চট্টোপাধ্যায়
**বিকেলের আলোর ভিতরে**

### অলোককুমার ঘোষ
**স্বজনে বিজনে**

### সুভদ্রা ভট্টাচার্য
**তাপকলের মেয়ে**

### প্রসেনজিৎ কুমার বক্সী
**জটায়ুর প্রতীক্ষা**

### প্রদোষ দত্ত
**কাঁগিল ভালোবাসা ভিনটেজকার**

### শান্তনু প্রামাণিক
**শিকড় বাকড়**

### দীপক মুখোপাধ্যায়
**ওক্টাভিয়ো পাজ ( অনুবাদ )**

কাব্যগ্রন্থ

### শ্যামল কুমার নাইয়া
**নদী ঝরিয়েছে ঘাম**

### সুব্রত রুদ্র ( সম্পাদিত )
**স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রেমের গান আর কবিতা**

### অলোককুমার ঘোষ ( সম্পাদিত )
**এ সময়ের নির্বাচিত দীর্ঘ কবিতা**

উপন্যাস

### মিহির ভট্টাচার্য
**ঘূর্ণিকাল**

প্রবন্ধ

### মুরারি ঘোষ
**কবি মধুসূদন ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ**

---

২০০১ বই মেলায় সুভদ্রা ভট্টাচার্য-এর
পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পথে

শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক
চতুর্বিংশতি বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
[ বইমেলা ] ১৪০৭

সম্পাদক
অলোককুমার ঘোষ

প্রচ্ছদ
দেবকমল মণ্ডল

প্রকাশিকা
ছবি ঘোষ

প্রকাশস্থল
২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে, সাহাপুর
কলকাতা-সাত লক্ষ আটত্রিশ
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

মুদ্রক
ছবি ঘোষ

মুদ্রণস্থল
জি. ডি. এণ্টারপ্রাইজ
২৯, শীতলাতলা রোড, সাহাপুর
কলকাতা-সাত লক্ষ আটত্রিশ

কুড়ি টাকা

# সূচীপত্র

## প্রবন্ধ

পরশুরামের গল্পে 'আমি'
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৫

বিশ্বে ছ'শো কোটি—ভারতে
একশো কোটি/মুরারি ঘোষ ১৪

কেন জন্ম কেন নির্যাতন
রাণা চট্টোপাধ্যায় ১৯

শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ
ইতিহাসের ছায়াপথিক/রবি রায় ২৫

(আমাদের) জলের জেঠা
ইতালো কালভিনো
অনুবাদক ঃ অভিজিৎ ঘোষ ৩৩

## পুস্তক আলোচনা

দেবাংশু ঘোষ ৬৩
অমূল্য কুমার চক্রবর্তী ৬৬
বৃন্দাবন দাস ৭০
অনন্ত দাশ ৭২

## গল্প

শুকুলের রোচনামচা অথবা
বিপ্লব এবং লিবিডো
শুকুল উপাধ্যায় ৮১

## কবিতা

বাসুদেব দেব ৫১
রাজকুমার শেখ ৫১
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৫২
রামপ্রসাদ দাস ৫২

CENTRAL LIBRARY

## কবিতা


| | | | |
|---|---|---|---|
| আবদুস শুকুর খান | ৫৩ | অশোক কুমার রায় | ৬২ |
| মতি মুখোপাধ্যায় | ৫৪ | নরেশ দাস | ৭৭ |
| সুভদ্রা ভট্টাচার্য | ৫৫ | দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় | ৭৭ |
| শান্তনু প্রামাণিক | ৫৫ | অনন্ত দাশ | ৭৮ |
| নারায়ণ ঘোষ | ৫৬ | মিহির সরকার | ৭৯ |
| চন্দন চট্টোপাধ্যায় | ৫৬ | তারক চট্টোপাধ্যায় | ৭৯ |
| সংবর্ত রায় | ৫৭ | শিউলি গুহ | ৮০ |
| মুরারী মান্না | ৫৮ | গণেশ ভট্টাচার্য | ৮০ |
| শুভব্রত চক্রবর্তী | ৫৯ | সুভাষরঞ্জন দাস | ১৫০ |
| অমরেন্দ্র গণাই | ৫৯ | বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী | ১৫০ |
| শ্রীধর মুখোপাধ্যায় | ৬০ | অমরনাথ বসু | ১৫১ |
| বৃন্দাবন দাস | ৬১ | সুদেব সাহা | ১৫১ |
| | | অলোককুমার ঘোষ | ১৫২ |

CENTRAL LIBRARY

গুজরাতের অভূতপূর্ব ভূমিকম্পে আমরা মর্মাহত
মৃতদের আত্মার প্রতি জানাই
আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম
এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি
রইলো আমাদের সমবেদনা।

CENTRAL LIBRARY

আগামী বছর **অর্কিড** ২৫ বছরে পা রাখবে।
এই ২৫ বছরটি স্মরণীয় করে রখতে আমরা সচেষ্ট।
এই উপলক্ষ্যে অর্কিড-এ প্রকাশিত বাছাই কবিতা,
প্রবন্ধ, গল্প এবং সম্পাদকীয় নিয়ে ৪টি 'নির্বাচিত
অর্কিড' সংকলন প্রকাশ করার ঐকান্তি ইচ্ছা আছে।
অর্কিড-এর পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়িদের উদার
সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়।

আশা করি আমাদের আহ্বানে সবাই সাড়া দেবেন।

# পরশুরামের গল্পে 'আমি'

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পরশুরাম গল্প লিখেছিলেন মোট নিরানব্বইটি ("আনন্দ মিস্তি"-কে ধরে আর "জামাইষষ্ঠী"-কে বাদ দিয়ে)। তার মধ্যে চোদ্দোটি উত্তমপুরুষে, অর্থাৎ 'আমি'-র বয়ানে লেখা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সব ছোটোগল্পকারই যে সমারসেট মম্-এর মতো উত্তমপুরুষে লেখা পছন্দ করেন,[১] এমন তো নয়। বরং লেখক যেখানে গল্পের বাইরে দাঁড়িয়ে সর্বজ্ঞতার সুযোগ নেন, সেখানেই গল্প জমে। যেমন "পরশপাথর" শুরু হয় এইভাবে : 'পরেশবাবু একটি পরশপাথর পেয়েছেন। কবে পেয়েছেন, কোথায় পেয়েছেন, কেমন করে সেখানে এল, আরো পাওয়া যায় কিনা এসব খোঁজে আপনাদের দরকার কি। যা বলছি শুনে যান।'

এর মধ্যে ওস্তাদ গল্প-বলিয়ের মেজাজ আছে। শ্রোতার তুলনায় তিনি যে অধিকারে বড় অর্থাৎ privileged, মানবমনের অনেক বেশি খবর রাখেন — একটি বাক্যেই সে দাবি পাকা হয়ে গেঁথে যায়, কারও অস্বীকৃতির তোয়াক্কা করে না। বিশেষ করে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক গল্প লেখার সময়ে পরশুরাম পছন্দ করতেন 'গল্পের ভেতরে গল্প'-র কায়দাটি।[২] যেমন, "দক্ষিণরায়" ও "মহেশের মহাযাত্রা"য় ফ্রেম-গল্পটি লেখা হয় প্রথমপুরুষে : বকুলাল আর মহেশ মিত্তিরকে নিয়ে। বাঘ আর ভূতের গল্প দুটি বলেন কিন্তু চাটুজ্যেমশায়। "স্বয়ম্বরা"-তেও একই কায়দা কাজে লাগানো হয়েছে। তবে এখানে অলৌকিক কিছু নেই — চাটুজ্যেমশায় তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার থেকে একটি 'সত্য ঘটনা' শুনিয়েছেন। এখানে ফ্রেম-গল্প প্রথমপুরুষে কিন্তু মূল কাহিনী উত্তমপুরুষে।

উত্তমপুরুষে লেখা গল্পে পরশুরাম যে সর্বদা আত্মজীবনীর ছেঁড়া পাতা ছড়িয়ে রাখেন — এমন নয়। তেমন গল্প ( পরশুরামের নিজের কায়দায় 'গল্পিকা'[৩] বলাই ঠিক হবে ) তিনটি . "বনোয়ারিবাবু", "সত্যবতী ভৈরবী" আর "মধুকুঞ্জ সংবাদ" ("প্রাচীন কথা"-র অন্তর্গত)। শুরুতেই অবশ্য তিনি বলে রাখেন : 'এই সব ঘটনার ৭০—৮০% সত্য, ২০—৩০% মিথ্যা, অর্থাৎ স্মৃতিকথায়

যতটা ভেজাল দেওয়া-দস্তুর তার চাইতে বেশী নেই।' স্মৃতিকথার লেখকদের সম্পর্কে কটাক্ষটুকু উপভোগ করার মতো। কিন্তু এও দেখবার : প্রায় কোনো গল্পেই 'আমি'-র মারফত পরশুরাম নিজের কথা লেখেন না। আত্মবিলোপ বা নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর এমনই মজ্জাগত যে উত্তমপুরুষে লেখা গল্পেও তার ছাপ পড়ে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি দর্শক বা শ্রোতা মাত্র। তাঁর জায়গা কেন্দ্রে নয়, এক প্রান্তে। এই সূত্র ধরেই পরশুরামের গল্প বলার রীতিনীতি বোঝার চেষ্টা করা যায়।

প্রথমেই 'আমি'-র আঙ্গিকে লেখা তাঁর গল্পগুলির তালিকা দেওয়া যাক —

কচি সংসদ ( ? )
প্রেমচক্র (১৩৩৯ ব., ১৯৩২ খ্রি.)
শোনা কথা (১৩৫৬ ব.)
অক্রূরসংবাদ (১৩৫৯ ব.)
কৃষ্ণকলি (১৩৫৯ ব.)
নিরামিষাশী বাঘ (১৩৫৯ ব.)
শিবলাল (১৩৬১ ব.)
নীলকণ্ঠ (১৩৬১ ব.)
ধনু মামার হাসি (১৩৬২ ব.)
স্মৃতিকথা (১৩৬২ ব.)
সত্যসন্ধ বিনায়ক (১৮৭৯ শকাব্দ, ১৯৫৭ খ্রি.)
প্রাচীন কথা (১৮৮০ শকাব্দ)
গণৎকার (১৮৮১ শকাব্দ)
গুপীসাহেব (১৮৮১ শকাব্দ)

লক্ষ্য করার বিষয় হলো : পরশুরামের গল্পের যেটি স্বর্ণযুগ (১৩২৯-৩৯ ব.)— 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' আর 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' যে-সময়ে বেরিয়েছিল — সেই পর্বে উত্তমপুরুষে লেখা গল্প মাত্র দুটি। 'আমি'র আঙ্গিকে প্রথম গল্প "কচি সংসদ"। 'আমি' এখানে একজন উকিল। নিজেকে তিনি খুব বুদ্ধিমান বলেই মনে করেন। কিন্তু গল্পে যা ঘটে তার কিছুই তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যা করার তা করেন টুনিদিদি। মঞ্চের কেন্দ্র দখল করে থাকেন নকুড়মামা ও তাঁর ভাগ্নে কেষ্ট, আর অবশ্যই কচি সংসদের-এর আটজন সদস্য — নাম থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক আচার-আচরণ কথাবার্তা সব দিক দিয়েই যাঁরা উদ্ভট। তার মধ্যে যেটুকু বিদ্রূপ আছে তা নেহাতই নিরীহ।

ব্যঙ্গের চেয়ে নিছক মজাই প্রধান। পরের অনেক গল্পে যেমন দেখা যাবে এখানে তারই আভাস রয়েছে : গল্পের কথক এক প্রান্তিক চরিত্র ; মূল কাহিনীতে তাঁর থাকা-না-থাকা প্রায় সমান।

দ্বিতীয় গল্প ; "প্রেমচক্র"-য় 'আমি' আসলে হাজির হয়' 'গল্পের ভেতরে গল্প' বলার জন্যে। ফ্রেম-গল্পটি মূল ব্যাপার নয় — যদিও তার মধ্যে মজা আছে বিস্তর। আসল গল্পটি প্রেমচক্র নিয়ে — চিরন্তন ত্রিভুজের জায়গায় এক হতাশাজনক ষড়ভুজ।[৪]

"শোনা কথা", "অক্রূরসংবাদ", "নিরামিষাশী বাঘ". "শিবলাল", "ধনু মামার হাসি", "স্মৃতিকথা" আর "গুপীসাহেব" — এই সাতটি গল্পেও আসল আকর্ষণ। ।ফ্রেম-গল্পে নয়, মূল কাহিনীতে। 'আমি'-র আঙ্গিকে লেখা হলেও এই সবকটি গল্পেই 'আমি' নেহাতই উপলক্ষ্য। রাজনীতির আলোচনা, বউ বাছাই-এর সমস্যা, প্রাগৈতিহাসিক ষাঁড়ের ইতিবৃত্ত, চোরের ওপর বাটপাড়ি, বা গুপীসাহেবের মতো কাঁকড়াবিছে পোষার শখ — এগুলোই গল্পকটির মূল আকর্ষণ, 'আমি' শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, প্রায় পুরোপুরি অবান্তর। ফ্রেম-গল্প বাদ দিয়েও মূল কাহিনীগুলি দিব্যি লেখা যেত।

এই চোদ্দোটি গল্পের মধ্যে শুধু "প্রেমচক্র" আর "স্মৃতিকথা"-য় পুরাণ-প্রসঙ্গ এসেছে ( যদিও তাকে পুরাণের প্যারডি বলাই ঠিক ) — দ্বিতীয় গল্পটিতে নতুন করে যোগ হয়েছে শূর্পনখার নাক হারানোর পটভূমি। এ যেন বাল্মীকির ওপর কলম চালানো — তিনি যা বলেন নি তা জোগান দিলেন পরশুরাম। "তৃতীয় দ্যূতসভা" গল্পের একইভাবে ব্যাসের ওপর ব্যাসকিরি করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনো ফ্রেম-গল্প ছিল না। "স্মৃতিকথা"-য় ফ্রেম-গল্পর সঙ্গে মূল কাহিনীটি মিলেছে চমৎকার। গল্পটি পড়তে শুরু করার সময়ে ভাবাই যায় না : এর পরে একটি রামায়ণী কথা আসছে। 'আমি' এখানে এক আধুনিক লেখক — নানা বিশেষজ্ঞর কাছে তিনি পরামর্শ নিচ্ছেন : কারও দু কাঁধে হাত দিয়ে কতটা চাপ দিলে তার শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে, বিয়ের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মকদ্দমা কিসে হয়, আনাড়ি লোক প্রথম মদ খেলে কতটা পেটে পড়লে নেশা হবে। এ সবই যে শূর্পনখার স্মৃতিকথার মালমশলা, লেখকের নিজের জানার জন্যে নয় — কে তা বুঝবে !

সাধারণভাবে 'গল্পের ভেতরে গল্প'র একটা অলিখিত নিয়ম আছে : মূল কাহিনীর শেষে ফ্রেম-গল্পটি আবার ফিরে আসে — যেমন হয় গানের ক্ষেত্রে। তবেই গড়নটা দাঁড়ায় 'মিল্টনিক স্যাণ্ডউইচ'-এর মতো।[৫] পরশুরামের 'গল্পের

ভেতরে গল্প'-য় কিন্তু সবক্ষেত্রে তেমন ঘটে না। "প্রেমচক্র"-এ অবশ্য ফ্রেম-গল্পকে ফেরাতেই হয়, কেন-না মূল কাহিনীটি এমন জায়গায় এসে থামে যেখান থেকে তার কোনো সুষ্ঠু পরিণতি সম্ভব নয়। "শোনা কথা"-র মূল বিষয় : দেশের হালচাল নিয়ে নানা লোকের নানা মত, এর মধ্যে আর কোনো কাহিনী নেই। এ গল্পের 'আমি' শুধু নানা বক্তব্যের বিবরণটুকুই রাখেন, তার বেশি কিছুই তাঁর বলার বা করার নেই — মতামত চাইলেও তা দেন না।

অন্য গল্পকটিতে 'আমি' দেখা দেন নানা নামে, নানা মুখোশ পরে — কখনও তিনি দর্শনের অধ্যাপক, কখনও বা নেহাতই ছাপোষা বাঙালি ভদ্রলোক। সব গল্পে 'আমি'-র নামও পাওয়া যায় না। অন্যত্রে কোথাও তিনি ব্রজেন ( "কচি-সংসদ" ), কোথাও সুশীলচন্দ্র চন্দ্র ( "অক্রূরসংবাদ" আর "নীলকণ্ঠ" ), কোথাও রামেশ্বর ( "শিবলাল" আর "ধনু মামার হাসি" )। বাকি সব গল্পেই 'আমি' অনামা। দুটি করে গল্পে একই নাম-ব্যবহারও পরশুরামের বিশেষত্ব।[৬]

একমাত্র "গুপী-সাহেব"-এই 'আমি'-কে দেখা যায় 'গল্পের ভেতরে গল্প'-র কথক হিসেবে। এখানে অবশ্য ফ্রেম-গল্পটি ফিরে আসে, যেমন আসে "ধনু মামার হাসি"-তে। "শিবলাল"-এ ফ্রেম-গল্পটি নেহাতই মূল কাহিনী বলার উপলক্ষ্য। সেটি ফিরে আসায় বা না-আসায় কোনো ইতরবিশেষ হয় না। "নিরামিষাশী বাঘ" ও "স্মৃতিকথা"-য় ফ্রেম-গল্প আর ফেরে না, কারণ তাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে।

'আমি'র আঙ্গিকে লেখা গল্পর একটি সীমাবদ্ধতা হলো : লেখকের আর সর্বজ্ঞ বিবরণদাতা হওয়ার সুযোগ থাকে না। অন্য পাঁচজনের মতো 'আমি' যা নিজে দেখেছেন বা শুনেছেন তার মধ্যেই তাঁকে আটকে থাকতে হয়। কিন্তু এর একটা সুবিধের দিকও আছে : কল্পনাশক্তির রাশ ছেড়ে দেওয়া যায় সহজে। ধরা যাক "শোনা কথা" গল্পটি। পার্কে যাঁরা আড্ডা মারেন তাঁদের সকলেই 'আমি'-র চেনা, কিন্তু কারুরই নামধাম জানা নেই। 'আমি'-কে তাই বলতে হয় : 'অগত্যা কাল্পনিক পরিচয় দিয়ে এঁদের বিচিত্র আলাপ বিবৃত করছি।' "পরশপাথর" গল্পের লেখক ছিলেন একদম বেপরোয়া — 'নিতে হয় তো নাও, নইলে যাও', take it or leave it. এই ভাবটা 'আমি' কিছুতেই নিতে পারে না। প্রায় সামুদ্রিক শাস্ত্রর ধরণে, এক-একজনের চেহারা, পোশাক-আশাক দেখে তিনি প্রত্যেকের পরিচয়, পেশা ইত্যাদি সনাক্ত করার চেষ্টা করেন। তার মধ্যেই চমৎকার ব্যঙ্গের সুযোগ মেলে। যেমন, দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিকে বহুকাল থেকেই আমাদের পাড়ায় দেখে আসছি।

এ'র বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি, ফরসা রং, স্থূলকায়, একটু বেশি বেঁটে। পনর বৎসর আগে এ'র কালো গোঁফ দেখেছি, তারপর পাকতে আরম্ভ করতে বার্ধক্যের লক্ষণ ঢাকবার জন্য কামিয়ে ফেলেন। সম্প্রতি এ'র চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু চামড়া খুব উর্বর, টাক পড়ে নি। এই সুযোগে ইনি এখন আবক্ষ দাড়ি-গোঁফ এবং আকণ্ঠ বাবরি চুল উৎপাদন করেছেন, তাতে চেহারাটি বেশ ঋষি ঋষি দেখাচ্ছে। বোধহয় ইনি যোগশাস্ত্র, থিয়সফি, ফলিত জ্যোতিষ, ইলেকট্রোহোমিওপ্যাথি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্বের চর্চা করেন। এঁকে ভরদ্বাজবাবু বলব।'

স্রেফ আন্দাজে ভর করে এত কথা বলা! বক্তার পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আর অনুমান-শক্তির তারিফ করতে হয়। সর্বজ্ঞ বিবরণদাতা এই কথাগুলোই আরও নিশ্চিতভাবে বলতে পারতেন, কিন্তু তাতে চমক লাগানোর কিছু থাকত না। এই যে 'আমি', পার্ক-এর আড্ডার সকলকেই তিনি চেনেন কিন্তু মুখ চেনার বেশি তাঁদের সম্পর্কে আর কিছু জানেন না — এই সীমাবদ্ধতাই "শোনা কথা"-য় চরিত্রদের পরিচয় আরোও মজাদার করে তোলে। প্রত্যেকের চালচলন পোশাক আশাক কথাবার্তা থেকেই ধরে নিতে হয় তাদের পেশাগত পরিচয় — কিন্তু তার হদিশ জোগান গল্পের 'আমি'। আর সেই সঙ্গে পরশুরামের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বও ধরা পড়ে। 'গূঢ়তত্ত্ব'র তালিকাটি যে তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য তা বুঝতে ভুল হয় না।

তাঁর অন্যান্য গল্পে যেমন তিন কিসিমের ঠক ও জোচ্চোর দেখা যায় — ধর্মীয় ঠক, পেশাদার ঠক আর পাতি ঠক — 'আমি'-র আঙ্গিকে লেখা গল্পেও তাঁরা যথারীতি হাজির হন : সত্যবতী ভৈরবী ( "প্রাচীন কথা" ), মীনেন্দ্র মাইতি ( "গণৎকার" ) আর ভজুমামা ( "নীলকণ্ঠ" )। তবে এঁরা কেউই শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বিরিঞ্চিবাবা, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া বা এমনকি জটাধারী বকশীরও ধারেকাছে আসেন না।

পরশুরামের গল্পের জগৎ সাধারণভাবে প্রাপ্তবয়স্কের। শিশু ও কিশোর কিশোরীদের সেখানে খুব কমই দেখা যায়। দেখা গেলেও ( যেমন, "লম্বকর্ণ" -তে বংশলোচনবাবুর ছেলে ও মেয়ে ) তাদের ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য। একমাত্র "রটন্তীকুমার" আর "কৃষ্ণকলি"-তেই বাচ্চাদের প্রসঙ্গ গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে আসে ; "আতার পায়েস"-এ তারা এসেছে দল বেঁধে। ছোটোদের কথা শেষের দিকে আরও কিছু গল্পে দেখা যায় — কিন্তু সেগুলি সবই প্রথমপুরুষের বয়ানে লেখা। একমাত্র ব্যতিক্রম "প্রাচীন কথা"-র তিনটি 'গল্পিকা'। এখানে

ছোটোদের চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে বড়দের জগৎকে। আর মজা ছাড়াও ব্যঙ্গ আছে "সত্যবতী ভৈরবী"-তে। এই তিনটি গল্পিকাতেও 'আমি' নেহাতেই ভালোমানুষ, আর খানিক অবোধও বটে। সব গল্পিকাতেই স্কুলের ছাত্রদের মুখপাত্র হয়ে দেখা দেয় কেষ্ট। বয়সের তুলনায় ছেলেটি যথেষ্ট লায়েক। ভৈরবী আর প্রাণকান্তবাবুর কথা কিছুই বুঝতে না পেরে, 'আমি' কেষ্টকে জিগেস করে, "কি হয়েছে ভাই, প্রাণকান্তবাবু পালিয়ে গেল কেন ?" 'সপ্রতিভ' কেষ্ট জবাব দেয়, "বুঝতে পারলি না বোকা, এই ভৈরবীর সঙ্গে প্রাণকান্তবাবুর লভ হয়েছিল।" তিনটি কাহিনীতেই কেষ্ট থাকে প্রধান ভূমিকায়।

অন্যদিকে, "কৃষ্ণকলি"-তে দুটি কিশোরীর সঙ্গে গল্পের 'আমি'-র অনেক কথা হয়। এখানেও পরশুরাম খানিক স্মিত হাসির জোগান দেন—অসমবয়সীদের কথায় ও আচরণে পাঠকও মজা পান বেশ। এর 'আমি' কিন্তু একজন বৃদ্ধ — বলার চেয়ে শোনাতেই যাঁর উৎসাহ বেশি।

এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি কথা বলতেই হয় : 'আমি'-র আঙ্গিক পরশুরামের হাতে কোনোদিনই তেমন খোলে নি। কয়েকটি গল্প সত্যিই দারুণ ("কচি-সংসদ" তো সেরা)। কিন্তু তা আঙ্গিকের গুণে উতরোয় না, উতরোয় কাহিনীর ও বর্ণনাভঙ্গির গুণে।

কেন একথা বলছি ? একটু গোড়া থেকে ব্যাখ্যা করা যাক। গল্প বলার (লেখার কথা এখুনি আনছি না) দুটি ধরণ একেবারে আদ্যিকাল থেকেই চলে আসছে : অন্যের অভিজ্ঞতা বলার সময়ে প্রথমপুরুষ (সে / তিনি ও তারা / তাঁরা) ব্যবহার করে, আর নিজের অভিজ্ঞতা বলার সময়ে উত্তমপুরুষ (আমি / আমরা)-এর বয়ানে। শিকারকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, রোমাঞ্চকর কীর্তিকলাপ, 'অলৌকিক' উপলব্ধি (অন্যেরা যা-ই বলুক, যাঁর সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর কাছে সেটি 'অলৌকিক') — সে রূপকথাই হোক আর সত্যি ঘটনাই হোক, গল্প বলার এই দুটি মাত্র ধরণই থাকতে পারে।

পরে, গল্প লেখার বেলায়, উত্তমপুরুষটি আর লেখক নিজে থাকেন না। গল্পের 'আমি' হয়ে ওঠেন লেখক থেকে আলাদা কোনো ব্যক্তি। সত্যজিৎ রায় আর তোপসে যে এক নয়—পাঠক সেটা বোঝেন, কিন্তু তোপসেই যেন লিখছে (সত্যজিৎ রায় নন) — সাময়িকভাবে সেটি মেনে নিয়েই তিনি ফেলুদা গল্পগুচ্ছ পড়তে থাকেন। এ হলো গল্প বলার চলতি রীতিকে

লেখার এক বিশেষ আঙ্গিকে পরিণত করা।[৭]

আসলে উত্তমপুরুষে গল্প লেখার পেছনে একটি বড় কারণ থাকে। সেটি হলো ; বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা। মূল কাহিনীটি কমবেশি উদ্ভট বা অলৌকিক হলেও যেহেতু তা গল্প-কথকের নিজের অভিজ্ঞতা, সেই সুবাদে সেটি খানিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।[৮]

আশ্চর্য ব্যাপার হলো : 'আমি'-র আঙ্গিকে পরশুরাম একটিও আজগুবি বা অতিপ্রাকৃত গল্প লেখেন নি ! বংশলোচনবাবুর বাড়ির আড্ডায় বা ট্রেনের কামরায় যে সব অদ্ভুত গল্প শোনা যায়, সেগুলো 'আমি'-র আঙ্গিকে লেখা নয়। খুব বেশি হলে, একটু খাপছাড়া গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে অন্য কাউকে হাজির করা হয় ( যেমন, "নিরামিষাশী বাঘ"-এ 'আলিপুর জন্তুরবাগানের কর্তা' ডাক্তার যোগীন মুখুয্যে বা "শিবলাল"-এ হরদয়ালবাবু )। দরকারমতো 'আমি' -কে তিনি খাটোও করতে পারেন ( যেমন, "সত্যসন্ধ বিনায়ক"-এ )। আবার কোনো কোনো গল্পে 'আমি' কিছুটা উদ্যোগী ( যেমন, "নীলকণ্ঠ", "গণৎকার" আর "গুপীসাহেব"-এ )। "সত্যসন্ধ বিনায়ক"-এ 'আমি' একটি মেরুদণ্ডহীন চরিত্র, যার উল্টোমাপে নীতিনিষ্ঠ চরিত্র, বিনায়কের মহিমা আরও স্পষ্ট হয়।

কিন্তু পরশুরামের 'আমি' সাধারণভাবেই নিষ্ক্রিয়, 'প্যাসিভ'। অক্রূর নন্দী যখন 'আমি'-কে পরিণয়তত্ত্ব বোঝান, তাতে তাঁর বিশেষ কিছু যোগ করার থাকে না। মাঝে মাঝে তিনি শুধু কথা উস্‌কে দেন মাত্র। "শিবলাল"-এও 'আমি'-ও প্রায় নীরব শ্রোতা।

সব মিলিয়ে তাহলে ব্যাপার দাঁড়ায় এই : 'আমি'-র আঙ্গিকে পরশুরাম যে চোদ্দোটি গল্প লিখলেন তার আটটিই আসলে 'গল্পের ভেতরে গল্প' বলার জন্যে। তার মধ্যে একটি আবার নেহাতই রাজনীতিক আলোচনার বিবরণ ( "শোনা কথা" )। অবশ্যই চরিত্রসৃষ্টির মজা আছে বেশ কটি গল্পে—অক্রূর নন্দী আর গুপীসাহেবকে সহজে ভোলা যায় না। তবু এও ঘটনা যে, 'আমি'-র বয়ান পরশুরামের গল্পে তেমন খাপ খায় নি — প্রথমপুরুষে লেখা গল্পেই তাঁকে আরও স্বচ্ছন্দ লাগে।

**টীকা**

১. W. Somerset Maugham, Preface, 'Complete Short Stories' (1951), Vol. 2, p. vii. Valerie Shaw, 'The Short Story. A Critrical Introduction', London and New York :

Longman, 1986, p-114-এ উদ্ধৃত। 'উত্তমপুরুষ একবচন' ব্যবহার নিয়ে আলোচনা আছে বইটির পঞ্চম অধ্যায়ে, বিশেষত পৃ. ১১৪ থেকে ১২১-এ। এ ছাড়া টীকা ৭-ও দ্র.।

২. এই নামটি কার দেওয়া তা জানা নেই, তবে সাহিত্য-সমালোচনায় এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। "গল্পের ভেতরে গল্প : কোলরিজ ও রবীন্দ্রনাথ", শারদীয় 'অনুষ্টুপ', ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ( বর্ষ ৩২, সংখ্যা ১, ১৯৯৭ ), পৃ. ৭৯-৯৩ দ্র.।

৩. 'প্রবাসী' ( বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৬, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ. ৮৮৫-৯০ )-তে "গল্পিকা" নামে চারটি ছোটো ছোটো গল্প বেরিয়েছিল — "পুনর্ম্মিলন", "উপেক্ষিতা", "উপেক্ষিত" আর "রাতারাতি"। এর মধ্যে প্রথম তিনটি 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প'-এ ঠাঁই পেয়েছে, আর "রাতারাতি" গল্পিকাটি "ছেলেধরা" ( 'প্রবাসী', বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৬, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ. ৭৮৬-৯ )-র সঙ্গে মিলে "রাতারাতি" নামে ঐ বইতেই ছাপা হয়েছে।

৪. ফার্স্ট ইয়ারের ( এখনকার হিসেবে একাদশ শ্রেণীর ) পড়ুয়া, 'গল্প আর ছবির একজন মস্ত সমঝদার', চিংড়ী বলে একটি মেয়ে তার মামার গল্পের মুখপাত শুনেই বলে উঠেছিল, 'এ যে ইটার্নাল ট্র্যাংগলের বাবা, হোপলেস হেক্সাগন !'

৫. কোনো বিশেষ্যর আগে ও পরে দুটি বিশেষণ দিয়ে যে শব্দগুচ্ছ তৈরি হয় তারই নাম Miltonic Sandwich ( নামকরণ কার তা জানা নেই )। যেমন : forced fingers rude, sad occasions dear ('Lycidas', lines 4-5), heavenly spirits bright, jealous love malign ('Paradise Lost', IV. 361, 503) ; এরই অনুকরণে জন কীট্‌স্-এর fairy lands forlorn ("Ode to a Nightingale", line 70), ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড্-এর tremulous cadence slow ("Dover Beach", line 13), ইত্যাদি।

৬. পরশুরাম যে একাই এমন করেছেন, তা নয়। যেমন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর রাণু গল্পগুচ্ছে রাণুর মেজকা, শৈলেন। রাণু নেই অথচ শৈলেন আছেন এমন গল্পও কম নয়। 'রাণুর কথামালা'র কয়েকটি গল্পে আর "ছোড়দি রহস্য" ( 'লঘুপাপ' ) ও "যাত্রা" ( 'হৈমন্তী' )-য় একা শৈলেনকে পাওয়া যায়। আর ছোটোদের গল্প ধরলে, নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়-এর যাবতীয় 'চারমূর্তি' গল্প ও উপন্যাসের লেখক তো একমাত্র প্যালারামই। এসব ক্ষেত্রে চরিত্রের সঙ্গতি রাখার যে-দায় লেখকের থাকে, মাত্র দুটি করে গল্পে এক নামের চরিত্র ব্যবহার করার দরুন পরশুরামের অবশ্য তা ছিল না। রামেশ্বর বা সুশীলচন্দ্র চন্দ্র মূলত শ্রোতা / দর্শক — ঐ চারটি গল্পে 'আমি'-র চারটি আলাদা নাম দিলেও, লাভ বা ক্ষতি কোনোটাই হতো না।

৭. গল্প লেখার ধরণ-ধারণ, প্রথমপুরুষ ও উত্তমপুরুষের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে, বিশেষ করে উপন্যাস প্রসঙ্গে, বিস্তর আলোচনা হয়েছে। Marjorie Boulton, 'The Anatomy of the Novel', London [etc.] : Routledge and Kegan Paul, 1975, Ch. 3, "The Point of View", pp. 20-44, আর Roger Fowler, 'Linguistics and the Novel', London : Methuen 1977, Ch. 4, "Discourse", বিশেষত পৃ. ৮১-৮৯ দ্র.। মাত্র দু বছরের ব্যবধানে বইদুটি বেরিয়েছিল। অথচ প্রথমটি অনেক সুখপাঠ্য ও পরিষ্কার, দ্বিতীয়টি 'জার্গন' বা অস্পষ্ট কথার ভারে নুয়ে পড়েছে। পড়তেও কষ্ট, বোঝা আর বোঝানোও ঝামেলা।

৮. মম্ ( সূত্র ১ ), পৃ. আট দ্র. ; শ ( ঐ ), পৃ. ১১৪-য় উদ্ধৃত।

---

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : রিঙ্কু চৌধুরী, প্রত্যূষ দত্ত, সরোজ দত্ত, সঞ্জীবন সরকার, প্রভাষকুমার সিংহ

# বিশ্বে ছ'শো কোটি —
# ভারতে একশো কোটি

## মুরারি ঘোষ

ভারতে একশো কোটিতম শিশু সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছে একবিংশ শতাব্দীর আগমনের আগেই — গত ১৫ই আগস্টে। বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের ইকোনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তর এই ঘোষণাটি যখন প্রচার করে ভারতের সংশ্লিষ্ট জন-গণনা দপ্তর ( সেন্সাস ডিপার্টমেণ্ট ) বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল। ভারতের সরকারি হিসাব হলো একবিংশ শতাব্দীর মে মাসেই ভারতীয় জনসংখ্যা একশো কোটিতে পৌঁছাবে। বিতর্ক যাই হোক — আট বা নয় মাসের আগে পরে যাই হোক দু হাজার সনের মে মাসের পর এখন স্বীকার করতে আপত্তি নেই — ভারতের জনসংখ্যা একশো কোটি ছাপিয়ে গেছে

চীনের জনসংখ্যা বর্তমানে একশো কোটি তিরিশ লক্ষ। জনসংখ্যা হিসাবে সর্ববৃহৎ দেশ — ভারত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। তবে যে হিসাবে এদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে জনসংখ্যায় প্রথম স্থানাধিকার অর্জনে ভারতের আর মোটে বিশ বছর লাগবে যদি বর্তমান হারেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এই দেশে। চীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়েছে ভারতের চেয়েও বেশি ছিল।

বিশ্বের জনসংখ্যা ৬০০ কোটি পেরিয়ে গেছে গত অক্টোবরের ১২ তারিখে রাষ্ট্র সংঘের হিসাবেই। সারা বিশ্বের গড়ে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন কমে গিয়ে এক দশমিক তিন শতাংশে এসে নেমেছে গত পাঁচ বছরের হিসাবে ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত। তার আগে ষাটের দশকে জনবৃদ্ধির হার ছিল দুই দশমিক এক শতাংশের কিছু কম। গত তিন দশকে শিশু জন্মের হার সব দেশেই কম বেশি কমেছে।

বিশ্বের জনসংখ্যায় এখন প্রতি ছ'জন মানুষের একজন ভারতীয়। সারা বিশ্বে প্রতিদিনে যত শিশুর আবির্ভাব ঘটছে সেই হিসাবে প্রতি একশো জনে একুশ জনের জন্ম ভারতে। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশের মতো মানুষ ভারতে বাস করলেও বিশ্বের মাত্র আড়াই শতাংশ জমি ভারত নামক রাষ্ট্রের এক্তিয়ারে। ক্রমাগত জনবিস্ফোরণের দরুণ আর্থ সামাজিক জীবনে নানা দুর্গতির আবির্ভাব

অস্বীকার করা যাবে না — অন্তত ভারতের মতো রাষ্ট্রে — খাদ্য, জনস্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবহারের সঙ্কট যে রাষ্ট্রে রয়েছে।

ভারতে জনবিস্ফোরণের সরকারি উদ্বিগ্নতা প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনায় প্রকাশ পায় — ১৯৫১ সনের জনগণনার রিপোর্ট থেকে। তখন ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি। ঐ সময় থেকেই বছরে গড়ে দু দশমিক চার শতাংশ হারে জন সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে চলে আশি দশক পর্যন্ত। শেষোক্ত দশক থেকেই কমতে শুরু করে। নব্বই দশকে বৃদ্ধির হার দু দশমিক দুই শতাংশের কোটায়। দশকওয়ারি ফের জনগণনার শুরু হয়েছে ভারতে — তবু অনুমান করা হচ্ছে বর্তমানে ভারতে জনবৃদ্ধি হার দুই দশমিক এক শতাংশ।

ভারতের জনসংখ্যায় বৃহত্তম রাষ্ট্র হলো উত্তর প্রদেশ। ১৯৯১ সনের জনগণনায় এই রাজ্যে সংখ্যাটি হলো ১৩ কোটি ৯১ লক্ষ ভারতের প্রায় এক ষষ্ঠাংশের কিছু বেশি মানুষ এই রাজ্যে বাস করে। উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা সত্তর ও আশি দশকে বছরে আড়াই শতাংশের বেশি হারে বেড়েছে। সবচেয়ে কম হারে জনবৃদ্ধি ঘটেছে কেরলে — বছরে এক দশমিক চার শতাংশ হারে।

তবু ভারতে বর্তমানে জন্ম হার কমের দিকে। দু দশক আগে ১৯৮১ সনে ভারতে জন্ম হার ছিল একশো মানুষ পিছু ৩৩ জন। ১৯৯৬ সনের সরকারি হিসাবে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাতাশ জনের কিছু বেশি। মৃত্যু হারও কমেছে আট থেকে ছ'য়ে। জন্ম হার সবচেয়ে বেশি উত্তর প্রদেশে। এখনো ঐ রাজ্যে একশোয় ৩৪ জন শিশু জন্মায় প্রতি বছরে। জন্ম হার সবচেয়ে কম কেরলে একশোয় ১৮ জন।

জন্ম হার ভারতে কমলেও অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনায় বেশি। আর্থিক উন্নয়নের স্বল্পতায় দেশের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য সরকারি চেষ্টায় গাফিলতি যেমন রয়েছে তেমনি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে ক্রমাগত জাতীয় উন্নয়ন কর্মে নিয়োগ করার ব্যবস্থাও হয়নি। আমাদের চেয়েও চীনে জনসংখ্যা বেশি তা সত্ত্বেও চীনে জাতীয় অর্থকরী কর্মে বর্ধিত জনসংখ্যার নিয়োগ বেশি। চীনে মাথাপিছু আয় ভারতের চেয়ে বেশি।

দেশ ও জাতি আর্থিক উন্নয়নে ব্যর্থতার দায়িত্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর চাপিয়ে দেবার অজুহাত সরকারি তরফে বারে বারেই নেওয়া হয়। অথচ জনসংখ্যার প্রাচুর্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার হতে পারে সেই লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাধীনতার শুরু থেকেই নেওয়া হয়নি। বিপরীত ক্রমে

জনসংখ্যা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এই সূত্রেই জেনে রাখার কথা হলো সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হলে জনসংখ্যা কিন্তু বর্তমান হারে বাড়তে পারতো না।

বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের শাখা সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলাপমেণ্ট প্রোগ্রাম থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ মানবোন্নয়ন প্রতিবেদনে ( হিউমান ডেভেলাপমেণ্ট রিপোর্ট ১৯৯৯ ) বলা আছে মানব উন্নয়নে প্রথম স্থানাধিকারী পাঁচটি দেশের জনবৃদ্ধির হার ( ১৯৯৯ ) এক শতাংশের নিচে যাদের মাথাপিছু আয় বিশ হাজার ডলার থেকে ৩৮ হাজার ডলার। পাঁচটি দেশ হল, কানাডা, নরওয়ে ইউনাইটেড স্টেটস, জাপান ও বেলজিয়াম। অথচ ৭০/৮০ দশকে বেলজিয়াম ছাড়া প্রত্যেকের জনবৃদ্ধি হার এক শতাংশের ওপরে ছিল। শুধু এই রাষ্ট্রগুলির নয় বিশ্বে জনবৃদ্ধির ইতিহাসে দেখা যায় উন্নত আয়ের রাষ্ট্রগুলির জনবৃদ্ধির হার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কমেছে। শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধি অবশ্য নয় — শিক্ষা প্রসার, স্বাক্ষরতা বৃদ্ধিও সমপরিমাণে দায়ী।

আন্তর্জাতিক মানবোন্নয়ন বিচারে ভারত যে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্গত ( মধ্য আয় গোষ্ঠী ) সামগ্রিকভাবে বর্তমানে তাদের গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক দশমিক এক শতাংশ। অর্থাৎ হাজার জনসংখ্যায় এগারো জন শিশু বছরে জন্ম গ্রহণ করছে। ভারতে কিন্তু এই হার হাজারে একুশ — প্রায় দ্বিগুণ। ভারতের চেয়ে মাথাপিছু আয় কম কেনিয়া বা কম্বোডিয়া বা আলজিরিয়া। এদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে এক দশমিক ছয়, এক দশমিক আট ও এক দশমিক তিন। ভারতের চেয়ে কম। আয় কম হলেও এই রাষ্ট্রগুলি দেশের জনসংখ্যার চাপ কমাতে পেরেছে ভারতের তুলনায়।

১৯৫১ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা চালু হবার পর ভারতে জন বিস্ফোরণ কমাতে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনার শুরু।" বিশ্বে ভারত প্রথম রাষ্ট্র সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা—অর্থাৎ শিশু জন্ম হার কমানোর চেষ্টা শুরু করে। ভারতের নবম পরিকল্পনার নথীতে দেখা যায় জন্মহার নিয়ন্ত্রণ খাতে নির্ধারিত ব্যয় কোন বছরেই লক্ষ্যপূরণ করেনি। তবে ব্যয়ের লক্ষ্য পূর্ণ হলেই যে কার্য-সিদ্ধি হয় ভারতের কোনো পরিকল্পনায় তা দেখা যায় নি। এ পর্যন্ত আটটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনার পরেও প্রথম যোজনার লক্ষ্যপথ হিসেবে বর্ণিত এক স্থির নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় পৌঁছানো যায় নি।

১৯৫১ সনে ভারতের ৩৬ কোটি জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় তিন দশকের পর ১৯৮৩ সনে। তার সতেরো বছর পরেই প্রায় তিনগুণ অর্থাৎ একশো কোটিতে পরিণত হয় ১৯৯৯ সনেই। পরিকল্পনার পঞ্চাশ বছর কেটে যাওয়ার পরেও দেখা গেল জনবিস্ফোরণ কমছে না। সরকার এবার এক বাড়তি উদ্যোগের কথা ঘোষণা করে — 'জাতীয় জনসংখ্যা নীতি' ( ন্যাশা-নাল পপুলেশন পলিসি )।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী এন টি সন্মুখম ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০০ সনে এই নীতি সম্পর্কে যে বক্তব্য পেশ করেন জানা যায় — সরকারের লক্ষ্য হলো ২০৪৫ সনে ভারতকে এক স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে। তা হলেও দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যবস্থা-মত সাফল্য আসতে প্রায় একশো বছর লাগবে — পঞ্চাশ বছর ইতিমধ্যেই কেটে গেছে।

জনবৃদ্ধির হার দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ থেকে পঞ্চাশ বছরে মাত্র দুই দশমিক এক শতাংশে নেমে এসেছে। হাজার মানুষ পিছু চারজন শিশুর সংখ্যাবৃদ্ধি কমেছে। অবশ্যই এই পঞ্চাশ বছরে যৎকিঞ্চিৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হার কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে আর্থিক উন্নয়ন ও সীমিত শিক্ষাবিস্তার কিছুটা দায়ী। তবে জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে যে স্তরের আর্থিক উন্নয়ন ও শিক্ষা-বিস্তার প্রয়োজন তা পেতে এখনো ৪৫ বছর লাগবে এমন তথ্য সরকার দিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে স্থিতিশীল জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহারে দুর্ভিক্ষ, আর্থিক দুর্বিপাক ইত্যাদি বাধা অতিক্রম করে জনসংখ্যা স্থিতিশীলতায় এনে কয়েকটি মাত্র উন্নতদেশ, জার্মানি, জাপান, বেলজিয়াম, সুইডেন, ইতালি, ডেনমার্ক, ব্রিটেন ইত্যাদি আরো কয়েকটি রাষ্ট্র যাদের শিশুজন্মহার এবং জাতীয় মৃত্যুহারের হিসাবে জনবৃদ্ধি মাত্র এক শতাংশেরও কম। ভারতে বর্তমানে হাজারে একুশজন। পঞ্চাশ বছর লেগেছে হাজারে পঁচিশ থেকে একুশে নামিয়ে আনতে। এখন ভারতের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষিত হলে আগামী ৪৫ বছরে একুশ সংখ্যাটিকে এক-য়ে নামিয়ে আনতে হবে।

প্রথম যোজনায় পরিবার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পাঁচ বছরের জন্য খরচ রাখা হয়েছিল ৬৫ লাখ টাকা। দু'হাজার সনের বাজেটে এই খরচ রাখা হয়েছে তিন হাজার পাঁচশত বিশকোটি টাকা। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তার চেয়েও বেশি হারে জল নিয়ন্ত্রণে খরচ বাড়ছে। সামনের বছরেই নতুন শতাব্দীর গুণ

CENTRAL LIBRARY

গণনার তথ্য পাওয়া যাবে তখন-ই জানা যাবে এই ব্যয় কতটা সুফল প্রসব করেছে।

আগামী বিশ বছর লাগবে চিনের তৎকালীন জনসংখ্যাকে ভারত অতিক্রম করবে। চিনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হাজারে তেরো — ভারতের একুশ কিন্তু চিনকে অতিক্রম করার পর কোন জনসংখ্যার অঙ্কে ভারতের জনজীবন স্থিতিশীল সংখ্যায় আসবে সরকারি তথ্যে সেই হিসাবটি নেই।

# কেন জন্ম কেন নির্যাতন

## রাণা চট্টোপাধ্যায়

রচনাটির শিরোনামটি আমার কলম থেকে বেরোয়নি। আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যাঁরা লেখালিখি শুরু করেছিলেন, তাঁরা জানেন চব্বিশ বছর আগে এরকম জুন মাসে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে যিনি গুয়াহাটি শহরে হৃদযন্ত্রটির আকস্মিক বিকল হওয়ায় মারা গিয়েছিলেন সেই সদা চঞ্চল হাস্যোজ্জ্বল কবি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম থেকে ধার করেছি আমি। এখনকার সদা ব্যস্ত তরুণতম কবি তাঁর নামও সম্ভবত শোনেন নি। তাঁরা মোটামুটি ভাবে পত্র-পত্রিকায় সক্রিয় থাকা কবিদের নাম হয়তো জানেন। হয়তো জানেন বললুম এই কারণে যে তাঁরা না জানলেও আমি এখন আর অবাক হই না। এ'রা এসেই 'লবি' খুঁজে ফেরেন। কারও কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া গেলে কেনই বা অন্যদের সম্পর্কে জানতে হবে ?

তখন আমি পেছন ফিরে তাকাই। কি দেখি ? তিরিশ বছর আগের লিখতে আসা বেশিরভাগ তরুণ কবি ছিলেন ভীরু, সদালজ্জ, অপরিপক্ক। তাঁদের পাঁচ বছরের বড় কোনো অগ্রজ কবি যদি বলতেন — 'তুমি, কি অশোকবিজয় রাহার কবিতা পড়েছো ? তুমি কি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছো ?' সে মাথা নিচু করে স্বীকার করে নিতো না সে এ'দের নাম শোনেনি। তারপরই খোঁজা শুরু হ'য়ে যেতো। এ'দের কবিতা কোথায় পাওয়া যায় ?

এখন কোন তরুণ কবিকে যদি বলি — তুমি বিশশতকের তিরিশের কবিদের কবিতা পড়েছো ? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে — হ্যাঁ। পড়েছি, জীবনানন্দ দাশের ! আমি তরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখের ভাষাটুকু বুঝতে চেষ্টা করি। কোনো জড়তা নেই, ভয় নেই, লজ্জা নেই। বলি — জীবনানন্দের কোন বইটা তোমার ভাল লাগে ?

সে অকপটে তার জ্ঞান জাহির করে — বনলতা সেন। ওমুক দা'র গলায় শুনে দারুণ রোমাঞ্চ হলো। সে সাম্প্রতিককালের একজন আবৃত্তিকারের নাম করে। আমি কিছু বলি না। চুপ করে থাকি। সে একটু পর তার ঝোলা থেকে কবিতা বার করে। বলে — "আপনার কাগজের জন্য"

আমি আবারো তার মুখের দিকে তাকাই। এ কোন ভাষায় সে কথা

বলছে ? মনে পড়ে যায় ষাটের দশকে লেখালিখি শুরুর বেশ কিছুদিন পর, সে-সময়ের এক বিখ্যাত কবিতা পত্রিকা'র সম্পাদক, নানান ছোট পত্রিকায় আমার দু'চারটি নাবালক কবিতা পড়ে একদিন বলেছিলেন — 'আপনি আমায় বেশকিছু কবিতা দেবেন তো, আমি দেখব।' শুনে আমার আনন্দ থেকে ভয় করতে লাগলো বেশি। যদি বানান ভুল থাকে, যদি ছন্দটা ঠিক মতো না বাজে। আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে, তিনি বললেন — কোনো সমস্যা আছে ? বললাম — না, না। এমনি···

ক'দিন ধরে দিনরাত কাটাছেঁড়া করে কয়েকটি কবিতা তৈরি করে পরের রবিবার তাঁর দোতলার ঘরে দিয়ে এলাম। উনি কবিতাগুলি নিয়ে বইয়ের আলমারির মাথায় রেখে দিয়ে বললেন — পরে দেখব। ব্যস! আর ও-বিষয়ে কোনো কথা উচ্চবাচ্য করিনি। আরও দু'টো রবিবার কেটে গেল। উনি দুটি ছোট কবিতা রেখে বললেন — এগুলি খুব কাঁচা। কোথাও দেবেন না। রি-রাইট করবেন।

আমি কবিতাগুলি ফেরত নিয়ে চুপ করে বসে আছি। উনি বললেন — প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দের বইটা পড়বেন। আর তিরিশের কবিদের কবিতা। ধারাবাহিকভাবে না পড়লে লেখা যায় না। ভাল কবিতা-খারাপ কবিতা তা'হলেই চিনতে পারবেন।

আমি বাধ্য ছাত্রের মতোন তাঁর কাছে কবিদের নাম জিগ্যেস করলাম। উনি অনেক নাম বলে গেলেন, এমন কি তাঁর সম-সাময়িক দু'চারজন কবিরও। আমি এ'দিক সে'দিক খুঁজে পেতে দু'চারজনের বই জোগাড় করে ফেল্লাম। কখনই নিজেকে জাহির করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, বারো চোদ্দ বছরের বড় সেই কবিই কি সে-সময় খ্যাতনামা ছিলেন ? তাঁরও কি সব জানা ? তাঁকেও দেখেছি বিষ্ণু দে'র সামনে, বুদ্ধদেব বসু বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সামনে বাধ্য ছাত্রের মতোন বসে থাকতে। তিনিও কিছু পেতে চাইছেন। আসলে, এটাই খুব স্বাভাবিক। এখন দেখি বেশিরভাগই উল্টো রাস্তায় হাঁটছেন। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য 'মেডইজি' পড়ার মতোন কবিতা লেখার 'শর্টকাট মেথড' রপ্ত করা হয়ে গেছে অনেকের। না পড়লেও চলে! মনে আছে সত্তরের গোড়ায় কিংবা ষাট দশকের শেষে 'আলোক সরণি' নামের একটি পত্রিকার উদ্বোধনে কবি-গল্পকার — সাধক পুরুষ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ'র জীবনী লেখক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত'র ভাষণ। লেখক হ'তে গেলে চাই নিষ্ঠা, সততা ও নিরন্তর লেগে থাকার পরিশ্রম। শুধু, লিখতে পারাটাই যথেষ্ট নয়। পড়তে হয়,

জানতে হয়, কোনো শর্টকাট বা মেডইজি সাহিত্যে নেই। 'কল্লোল যুগে'র প্রণেতার প্রতিটি বাক্য কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে গিয়েছিল। দুরুদুরু হৃদয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিলাম আপনার 'বেদে' উপন্যাস আমি পড়েছি। উনি প্রায় চমকে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বোধ হয় নামটাই শোনা। বলেছিলেন — কোন জায়গায় ভাল লেগেছে ? বলার পর উনি বলেছিলেন — আজকাল 'বেদে' কেউ পড়েন ? শুনিনি তো। সে-সময়, নামীদামী এঁদের সামনা-সামনি হলেই গলদ ঘর্ম হতাম। আড়ষ্ট হতাম। এখন আমাদের মতোন তরুণতম কাউকেই দেখি না। তরুণ প্রজন্মের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সব জানা হয়ে গেছে তাদের। এদিকে আমি ভাবি আরেকটা জীবন যদি পেতাম ! কতো পড়া বাকি !

সে-সময় যে যা বলেছেন পড়েছি। এমন কি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'র 'বিচিত্র' প্রসঙ্গ প্রমথ চৌধুরী'র 'সবুজপত্রে'র কিছু সংখ্যা দেখে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে লিখেছিলাম 'প্রমথ চৌধুরী'র সবুজ পত্র'। অবন ঠাকুরের শকুন্তলা, নালক, রাজকাহিনী পড়ে মনে হয়েছিল কোন যাদুময় লেখনীর স্পর্শে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি সত্য বলে প্রতীয়মান হয় ? এঁদের লেখা তরুণরা পড়েন ? কারো মুখে শুনিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝাঁপি' বা 'কল্পকথা' গল্পের নাম। রবীন্দ্র বংশলতিকার সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প গ্রন্থ 'করঙ্ক'র কথা নিয়ে কবি-লেখক কেউ আড্ডায় কথা বলেছেন বলে আমি শুনিনি। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের কৌতুক গল্পগুলির সন্ধান এই সময়ে কেউ করেছেন ? তাঁর 'কোষ্ঠীর ফলাফল' কিংবা "আই হ্যাজ"-এর মতোন সহানুভূতিময় হাস্যোজ্জ্বল উপন্যাস দু'টি সদ্য লিখতে এসেছেন বা আট দশ বছর লিখছেন তাঁদের জানা আছে কি ? জানলে হাতি ঘোড়া হয় না কিন্তু না জানাটা যে লজ্জার সে কথা জানেন ? ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর অন্তিম ও শুরুর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদনাথ লাহিড়ী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কায়কোবাদ, শাহদাৎ হোসেন, ফর্‌রুখ আহমদ, কিরণধন মুখোপাধ্যায়, যাঁরা কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছিলেন তাঁদের কিছু কবিতাও কি কেউ পড়েছেন ? পাঠ্যবই বহির্ভূত অন্য কবিতার কথা শুনেছেন ?

মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মৃত, যিনি রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন, যাঁর উপন্যাস "ফুলজানি"র সমালোচনা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায়,

যিনি, 'সাধনা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "কৃতজ্ঞতা" লিখে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে, সেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কি করে অজ্ঞাত নাম হয়ে যায় বুঝতে পারি না। আমি যখন একা একা এইসব ভাবি, মনে হয় মিথ্যা এই লেখালিখি, মিথ্যা এই ব্রত পালন। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই ফিরে দেখতে চাইছেন না বাঙালীর সাহিত্যের ঘরে কি কি সম্পদ মজুত আছে। এর প্রধান কারণ হলো পাঠাগার-বিমুখতা। গ্রন্থাগারগুলিতে লোক নেই জন নেই, আলমারিগুলিতে অব্যবহৃত পুস্তকরাজী উঁই পোকার বা 'সিলভার ফিস' পোকার দখলে। অথচ কোটি-কোটি টাকা ব্যয় ক'রে সরকার বহু গ্রামীণ পাঠাগার পরিপালন ক'রে যাচ্ছেন বছরের পর বছর ধরে। শহরের "প্রাইভেট" বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি গ্রন্থাগারগুলি এ সময়ে উঠে যেতে বসেছে। লেখক-কবিরাও কেউ সেই সব গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়ে বই দেখেছেন বলে শুনিনি। অথচ পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে বহু কবি-লেখকরা এইসব গ্রন্থাগারের নিয়মিত সদস্য ছিলাম। শ্লাঘার কথা নয়, শুধু তথ্যের জন্য জানাই আমি এক সময় চারটি পাঠাগারের সদস্য ছিলাম। ১৯৬৪ থেকে ১৯৮২ এই সুদীর্ঘকাল ব্রিটিশ কাউন্সিল, আমেরিকান লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও দক্ষিণ কলকাতা সংসদ পাঠাগারের নিয়মিত সদস্য ছিলাম। এখন অবশ্য কোথাও যাই না। গ্রন্থাগারগুলিতে নতুন বই বলতে সবই বাজারী জনপ্রিয় লেখকদের উপন্যাস গ্রন্থের প্রদর্শনী। এইসব গ্রন্থ হয়তো ভাল, কিন্তু মন ভরে না। আর জাতীয় গ্রন্থাগারে বই-এর স্লিপ দিয়ে একঘণ্টা বসে থাকার পর "Regret" লেখা স্লিপ ফিরে আসে। আগে দু'চার ঘণ্টা বসে অনেক দুস্প্রাপ্য বই পড়তে পেরেছি। সাহিত্যিক বিমল মিত্র আমৃত্যু এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। এখনও পঞ্চাশ দশকের দু'একজন এসব জায়গায় যান, কিন্তু আশি-নব্বুই এর একজন কবি লেখকের কাছেও শুনিনি তাঁরা এসব জায়গায় যান। খুবই আশ্চর্য লাগে! হায়! পড়াশুনা। ইদানীং প্রতিবাদ করতে করতে বুঝতে পারি আমি ক্রমশ একা ও নির্বান্ধব হ'য়ে পড়ছি। কোন অগ্রজকে যদি বলি আপনার লেখালিখি ও আদর্শর সঙ্গে আপনার কথাবার্তার মিল পাইনা, যে ধরনের লেখার আপনি বিরোধী, মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে-সব লেখার সুখ্যাতি করছেন। বুঝতে পারিনা আপনাকে। তিনি শুনে রুষ্ট হন। আমায় avoid করেন। খুব কষ্ট হয়। এভাবেই চলছে সব। হয়তো ইন্টারনেটের যুগে সাহিত্যপাঠ উঠে গিয়ে এখন "হল্লারাজার হাঁকাহাঁকি" শুনে সত্যিই আমাদের "প্রাণপাখি"র উড়ে যাওয়ার অবস্থা শুরু হয়েছে। সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার জন্য তরুণ থেকে বৃদ্ধ

অবধি সকলকেই দেখছি, টি-ভির নানান চ্যানেলে ঘুরপাক খেতে। ছেচল্লিশ বছরে লিখতে এসে আটচল্লিশ বছর বয়সে ২৫ হাজার টাকার পুরস্কার পেয়ে রীতিমত কবি হয়ে যাচ্ছেন। অথচ যিনি বা যাঁরা এসব পুরস্কার দিচ্ছেন পরলোকগত মা-বাবার নামে, তিনিও জানেন পুরস্কৃত কবি, কবি হবার দৌড়ে অনেক দূরে। দু'একটি চমৎকৃত লাইনই যদি কবিতা হতো, তা'হলে সংবাদপত্রের অনেক শিরোনামই কবিতা বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। এসব বলে লাভ নেই। দেখছি, হুজুগ-এর যুগ। কবিতা কি, এটা নতুন করে বুঝি সংজ্ঞা লিখে প্রমাণ করতে হবে। অদ্ভুত-অদ্ভুত 'সারমন' দেয়া হ'চ্ছে। অর্থহীনতাই কবিতা বলে অনেকে গলা ফাটাচ্ছেন। আমরাতো সবই দেখেছি ষাটের দশকে, অক্ষরের ছবি, অশ্লীল শব্দের মুহুর্মুহু প্রয়োগ, শ্লোগান, অ-কবিতা, না-কবিতা, দুর্বোধ্যতা, আধ্যাত্মিক বাক্যর সুরধ্বনি, এমন কি অর্থহীন শব্দ বন্ধ। কিন্তু একুশ শতাব্দীর চৌকাঠ পেরিয়ে দেখছি আজও সেই কবিতাই পড়তে ভাললাগে যে কবিতা 'রসোত্তীর্ণ' ও "অস্পষ্টতা দোষে" দুষ্ট নয়। আজ থেকে সত্তর বছর আগে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন — "রসোত্তীর্ণ কাব্যের আর একটি লক্ষণ এই যে, কবি চিত্তে ভাবের বাসনা দৃঢ় ও স্পষ্ট হওয়ায় কাব্যে সত্যকার অস্পষ্টতা দোষ আসে না। অনেক সময় বাসনা গভীর বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে কাব্য অস্বচ্ছ দেখাইতে পারে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এ কাব্য কোনদিন পঙ্কিল — সলিলের ন্যায় মলিন নহে।"

ভাষাবদল জোর করে করা যায় না। ভাষা ধীরে ধীরে বদল হয় সমাজ বদলের সঙ্গে। "আজি এ প্রভাতে রবির কর / কেমনে পশিল প্রাণের পর" এর ভাষার সঙ্গে "হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা"র ভাষার কোনো মিল নেই আবার ওই দু'টি কবিতার লাইনের সঙ্গে "সৃষ্টির সমুদ্রে এক সূর্য ডুবে যাচ্ছে" ( রাম বসু ১৪০০ সাল ) 'র ভাষাও আলাদা। আবার আমি যে ভাষায় লিখি যেমন" অন্ধকারের মধ্যে কি খুঁজছি নিজেও জানি না / খোঁজা তবু শেষ হয় না" তাও ভিন্ন। কিন্তু এসব ভাষা তো সমাজের ভাষা, দৈনন্দিন মানুষের মুখের ভাষা'কেই কাব্যভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু "তোদের নাকি ধমনীতে ছিল ছাই মাখা পায়রাদের একভাষী উড়াল" বা "এইখানে নীল মোমবাতি বিনিয়োগ করলে আকাশ পাওয়া যায়" কিংবা "এই ফাঁকা কাচতে আর / সবু নাইলনের রোদে মেলতে / মেঘ করে দেওয়া" — পড়লে মনে হয় জোর করে একটা কৃত্রিম ভাষায় এঁরা লিখতে চাইছেন যার সঙ্গে আবহমানকালের বাংলা ভাষার কোনো যোগ নেই। সান্ধ্যভাষা'র ও

CENTRAL LIBRARY

তো মানে ছিল। সাংকেতিক ভাষারও একটা অর্থ খুঁজে পাই। কিন্তু এ তো "পঙ্কিল-সলিল" এর মতোন মলিন। "মূর্খরা যে সামাজিক হয় না, শঙ্খ ঘোষের এই ভাবনার সঙ্গে এখন আমি ঐক্য খুঁজে পাই। তারা যে কোনো যুক্তিকে মূর্খতা দিয়েই খর্ব করবে। তাই, কষ্ট পাই না। তাই প্রয়াত শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের মতন এখন কেউ বইয়ের নাম দেয় না "কেন জন্ম কেন নির্যাতন"। এখন কাব্যগ্রন্থের নাম হবে "যেপাতে খাই সেপাতে মুতি" কিংবা "থামস্ আপ — ঘুটঘুটি অন্ধকারে 'লবি' খুঁজছি ॥

# শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

# ইতিহাসের ছায়াপথিক

রবি রায়

রবীন্দ্রোত্তর কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে মহৎ প্রতিভাধর তিন বন্দ্যোপাধ্যায় — বিভূতি-তারাশঙ্কর-মানিকের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত না হলেও আর এক বন্দ্যোপাধ্যায় — শরদিন্দু কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এঁদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে আছেন। পথের পাঁচালি ও আরণ্যক, গণদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা ও আরোগ্য নিকেতন কিংবা পদ্মানদীর মাঝি ও দিবারাত্রির কাব্য-এর মত অতখানি উচ্চতার একটি উপন্যাসেরও লেখক না হয়েও বিভিন্ন বয়েসের ও রস-রুচির পাঠকের কাছে শরদিন্দু যে অকল্পনীয় সমাদর পেয়েছেন, তা সম্ভবত আর কোন বাঙালি লেখকের ভাগ্যেই জোটেনি। আর শুধু তো সাধারণ পাঠকই নয়, বাঙালি লেখকেরা নিজের ছাড়া আর কারও লেখা পড়েন না — এই অপবাদকে মিথ্যে প্রমাণ করে শরদিন্দু যে লেখকদেরও একজন প্রিয় লেখক ছিলেন, তাঁর অগ্রজ-অনুজ এবং সমবয়সী অনেক লেখকেরই কথায় এবং লেখায় তার সাক্ষ্য আছে।

নানা শ্রেণীর গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা লিখে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব বয়েসের পাঠকের মনের খোরাক জুগিয়ে শরদিন্দু যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তার সিংহভাগই অবশ্য প্রাপ্য সত্যান্বেষী ব্যোমকেশকে নিয়ে লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির। কারণ বিশ্ব-বিশ্রুত লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল-এর সৃষ্ট অমর চরিত্র শার্লক হোম্‌স-এর মতই শরদিন্দুর ব্যোমকেশও একজন কিংবদন্তী-খ্যাত পুরুষে পরিণত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্য-সংসারে সম্ভবত আর কোন চরিত্রই হতে পারেনি। তবু আমার মনে হয় যে, শরদিন্দুর শিল্পী ও কবিমনের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কল্পকুহেলিতে আচ্ছন্ন ইতিহাসের ছায়াপথে। বিস্মৃত-প্রায় ইতিহাসের জীবনছন্দটি তাঁর অনুভূতিতে একান্তই সহজ স্বতঃস্ফূর্তায় ধরা দিত বলেই হয়তো তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্প-উপন্যাস-গুলিতেই সাহিত্যিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাই শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি সম্পর্কেই সংক্ষেপে দু-চার কথা বলব।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই

জানেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস-কল্প দুটি একটি রচনার সন্ধান মিললেও যথার্থ শিল্পসুষমামণ্ডিত সার্থক উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ পরিচয়টিও নিরঙ্কুশ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিতেই। কারণ বঙ্কিম-প্রতিভার প্রধান লক্ষণ হল কল্পনার বিশালতা, যার বিচিত্র বর্ণবৈভব ও চিত্র-রূপময়তা প্রকাশের যথোপযুক্ত আধার হল ইতিহাসের ক্যানভাস। ইতিহাস যদি হয় অতীতের কবর, ঐতিহাসিক উপন্যাস তাহলে সেই কবরের উপর রচিত শিল্পসৌধ — যার কোনটি হল পিরামিড, কোনটি তাজমহল, আর কোনটি বা তার স্বল্পায়তনিক অনুকৃতি।

কিন্তু ইতিহাস ও উপন্যাস সম্পূর্ণই বিপরীত দুটি বস্তু। কারণ ইতিহাস হল সত্য, আর উপন্যাস হল কল্পনা। সুতরাং সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা হল সত্য ও কল্পনা — এই দুই বিপরীত মেরুতে বিস্তৃত এক বিশাল হরধনুতে জ্যারোপণ করার মতই দুঃসাধ্য একটি কাজ। কারণ ইতিহাসে আমরা যা পাই তা শুধু শুষ্ক নীরস তথ্য এবং অনেকাংশেই অপূর্ণাঙ্গ। ইতিহাসে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ রাজ্য জয়, শাসন পদ্ধতি, বিলাস-ব্যসন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ-অনাগ্রহ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির কিছু বিবরণ পেলেও প্রাত্যহিক জীবনে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি জীবনের সমস্যা-সংকট ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আবর্তিত হৃদয়বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি তো দূরের কথা, স্থূল পরিচয়টুকুও পাই না। অথচ এগুলিই হল উপন্যাসের মূল বিষয়। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে হলে একদিকে যেমন প্রজ্ঞাপরিশীলিত কল্পনার সার্থক প্রয়োগে ইতিহাসের পুনর্গঠন করতে হয়, অন্যদিকে তেমনই ঐতিহাসিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করে গার্হস্থ্য জীবনের রসাবেদনও সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু এ কাজটি এমনই শিল্প সচেতনতার সঙ্গে করতে হবে যাতে ইতিহাসের কোন বিকৃতি বা ব্যত্যয়ও ঘটবে না, আবার ঔপন্যাসিকের কল্পনার সৌন্দর্যও মহিমময় হয়ে উঠবে। ঐতিহাসিক তথ্যের শুকনো হাড়-পাঁজরের উপর ঔপন্যাসিকের সৃজনী কল্পনা যখন রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা যোগ করে তাতে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে, তখনই তা সত্যিকারের ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত অলোকসামান্য প্রতিভার পক্ষেও তা সর্বথা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে শরদিন্দু

যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই প্রকৃত অর্থে যাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে, তা তিনি কখনই লেখার চেষ্টা করেননি। তিনি যা লিখেছেন, তা আসলে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। কিন্তু তার জন্য তাঁর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখাও ঠিক হবে না। কারণ সাহিত্যশিল্পের সার্থকতা তো কোন তত্ত্ব বা আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না, তার পরিমাপ করতে হয় রসসৃষ্টির নিরিখে, আর সেটা সম্পূর্ণই পাঠকের একতিয়ারে পড়ে। রসের ক্ষেত্রে অধিকারী ভেদ থাকলেও, একথা মানতেই হবে যে, রসপিপাসু পাঠকের রসোপভোগ কোন সাহিত্যশাস্ত্রী বা পণ্ডিত সমালোচকের রায়ের উপর যেমন নির্ভর করে না, তেমনই কোন 'ট্রেডমার্ক'-এরও তার প্রয়োজন হয় না। রস-পরিতৃপ্তিই তার একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় বলে সেই কাঙ্ক্ষিত রসের স্বাদ যদি সে পায়, তাহলে আয়োজন ক্ষুদ্র না বৃহৎ এবং উপাদান-উপকরণে কোথাও কোন ঘাটতি আছে কি না, তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। দ্রোণ-পুত্র শিশু অশ্বত্থমা নাকি পিটুলিগোলা খেয়ে ততদিনই পরিতৃপ্ত ছিল, যতদিন সে জানত না যে, সেটা দুধ নয়। আমরা কিন্তু সেই মূর্খের স্বর্গে বাস করি না। দুধ নয় জেনেই আমরা নতুন গুড়, নারকেল আর নতুন চাল বেটে তৈরি পিটুলিগোলাই নবান্নের উৎসবে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদন করি। কেন না তাও একটা শিল্পকর্ম যাতে শিল্পীর পরিমিতি বোধ, পারিপাট্য ও রচনা-কুশলতা আছে। আমরা যারা শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলির পাঠক, এগুলি যে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় এবং শরদিন্দুও যে দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র নন, তা জেনেই লেখাগুলি পড়ি এবং কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে না বসে, যা পেয়েছি, আকণ্ঠ ভরে তা পান করে বুঁদ হয়ে থাকি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত কল্পনার বিশালতা না থাকলেও শরদিন্দুও একজন কল্পনাকুশল লেখক ছিলেন। তবে সে কল্পনা হল ইচ্ছেসুখে ভেসে যাওয়া পাখির মত লঘুপক্ষ ও খেয়ালি। স্বকাল ও স্বসমাজের অতি পরিচিত ভূ-সংস্থানে কল্পনাকে বাস্তব সত্যের কাছে আনুগত্য মেনেই চলতে হয় বলে শিল্পীর স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা তাতে পদে পদে ব্যাহত ও সংকুচিত হয়। শরদিন্দু তাই অতীত ইতিহাসের অন্ধকার অপরিচিত ধূসর জগতে ছায়াপথের পথিক হয়ে নিজের অধিকারের সীমা বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। আসলে তাঁর মানসপ্রকৃতিই ছিল এমন যে, অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন সুদূর অতীতের মায়াবিভ্রমে তা সহজেই আকৃষ্ট ও আবিষ্ট হত। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাই যথার্থই বলেছিলেন, "আপনার সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য এবং কল্পনা-

শক্তি দুই-ই আছে — এই দুয়ের সঙ্গে আপনার মনের যে এক ধরণের রোমান্টিক প্রবৃত্তি আছে, ভারতের অতীতকে, হিন্দু ক্ল্যাসিক্যাল বা বৌদ্ধ monastic ভাবরূপকে পুনরুদ্ধার করিবার যে কবিত্বময় স্পৃহা আছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়।"

বস্তুত, শরদিন্দু যে পাঁচটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লিখেছেন, তার মধ্যে প্রথম চারটিই হিন্দু বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় লেখা। প্রথম উপন্যাস 'কালের মন্দিরা'-র পটভূমিকা হল গুপ্তবংশীয় সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল এবং এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে ভারতে দ্বিতীয় বারের হূণ আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে। তবে উপন্যাসটি আদৌ কোন যুদ্ধ-কাহিনী নয়— নিছকই একটি রোমান্টিক প্রেম কাহিনী, যুদ্ধের আয়োজন ও উদ্যোগ তার অনুষঙ্গ মাত্র। শরদিন্দু নিজেই বলেছেন যে, স্কন্দগুপ্তের চরিত্রটি ঐতিহাসিক হলেও কাহিনী সম্পূর্ণই তাঁর কল্পিত। বলে নেওয়া ভাল যে, স্কন্দগুপ্তেরও নাম-পরিচয় এবং তিনি যে দুর্ধর্ষ এক মহাবীর ছিলেন, তার উল্লেখ ছাড়া ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের কিছুমাত্র যোগ নেই। ইতিহাসের যে ঘটনাগুলির সুষ্ঠু রূপদানের ফলে উপন্যাস রস সমৃদ্ধ হয়ে তার ঐতিহাসিক অভিধাকে প্রতিষ্ঠিত করে, এ উপন্যাসে তার একান্তই অভাব। তবে এমনই মুন্সিয়ানার সঙ্গে কল্পিত কাহিনীটিকে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিহাসের সুরটি যেমন অবিচ্ছিন্ন আছে, তেমনই গল্পেরও কোন ছন্দপতন হয়নি।

প্রথম উপন্যাসে ঐতিহাসিক বাতাবরণটি নিখুঁতভাবে চিত্রিত হলেও তাতে তৎকালীন সমাজমানসের এবং পারিবারিক জীবনের যে পরিচয়টি অনুদ্ঘাটিত ছিল, দ্বিতীয় উপন্যাস 'গৌড়মল্লার'-এ শরদিন্দু সে ঘাটতিটুকু অনেকটাই পূরণ করে নিয়েছেন। উপন্যাসটির পটভূমি হল গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরের কুড়ি বছরের গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস। এই উপন্যাসে শরদিন্দু তৎকালীন যুগের বাঙালির গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের যেমন একটি বিশ্বস্ত পরিচয়দান করেছেন, তেমনই সেকালের বাঙালির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতিরও নিখুঁত একটি চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। তবে শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা ও সময়কে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়েই তো ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, ইতিহাসকে নতুন করে আবিষ্কার ও তার পুনরুজ্জীবনও ঘটাতে হয়। কল্পিত কাহিনী ও চরিত্রগুলির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের যথার্থ প্রাণ সঞ্চার হয় না। 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। তবে ইতিহাসের তথ্য সমাবেশে লেখকের কোন ঘাটতি নেই। রাখালদাস বন্দ্যো-

CENTRAL LIBRARY

পাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাস', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' থেকে শরদিন্দু যেমন নানা তথ্য আহরণ করেছেন, তেমনই ব্যক্তিগত উদ্যোগে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কাছ থেকেও তিনি বহু খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জেনে নিয়েছেন।

তৃতীয় উপন্যাস 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' অপেক্ষাকৃত সুলিখিত হলেও এতে শরদিন্দুর রোমান্টিক কল্পনা অনেকটাই স্বেচ্ছাবিহারী। এই উপন্যাসের পটভূমি হল তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বের ভারতবর্ষ। মগধ রাজকুমার বিগ্রহ পালের সঙ্গে চেদি রাজকুমারী যৌবনশ্রীর বিবাহ দেবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ কর্তৃক কন্যার স্বয়ংবর সভা আহ্বান এবং বিগ্রহপালকে অপমান করার জন্য তাঁর বানর-মূর্তি নির্মাণ করে সভায় স্থাপন ইত্যাদি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দুটি রাজ্যের দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং পরিশেষে নাটকীয় চমকের মধ্য দিয়ে মিলনান্তক পরিণতিটি অনেকটাই ইচ্ছাপূরণের শর্তে ঘটেছে। প্রথম উপন্যাসটির চেয়ে এই উপন্যাসে নাম পরিচয়ে অন্তত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনেক বেশি। ঐতিহাসিক না হলেও ইতিহাস সম্ভাব্য চরিত্ররূপে তাঁদের গ্রহণ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক বাতাবরণ সৃষ্টি এবং বাংলা ও মগধের অধিবাসীদের রীতি-নীতি, আহার-বিহার, আচার-আচরণের বর্ণনা অবশ্যই ইতিহাসের অনুগত।

চতুর্থ উপন্যাস 'কুমারসম্ভবের কবি' যথার্থ উপন্যাস পদবাচ্য নয়। এর ঘটনা ও চরিত্র সম্পূর্ণই কাল্পনিক, শুধু কিংবদন্তী খ্যাত মহারাজ বিক্রমাদিত্য, রানি ভানুমতি এবং কবি কালিদাস সহ নবরত্ন সভার কয়েকটি রত্নের নাম ছাড়া। মূর্খ কালিদাস যে গাছের ডালে বসেছিলেন, তাঁর সেই গাছেরই ডাল কাটা থেকে কাহিনীর শুরু এবং মহাকবি রূপে বিক্রমাদিত্যের রাজসভার অন্যতম রত্নরূপে তাঁর মনোনয়নের পর তাঁর যে বিদুষীপত্নীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন তাঁর সঙ্গে মিলনের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনীটি শেষ হয়েছে। সমস্ত আখ্যানটিই কিংবদন্তী থেকে গ্রথিত। সুন্দর একটি কাব্যিক মেজাজে শরদিন্দু এতে যে অপূর্ব প্রেমের আখ্যানটি রচনা করেছেন তা পাঠকের মনে দারুণ একটা রসাবেশ সৃষ্টি করে। স্বল্পরেখায় অঙ্কিত চরিত্রগুলির হৃদয়ের উত্তাপ সহজেই পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে।

শেষ উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'-র কয়েকটি চরিত্র ইতিহাস থেকে নেওয়া হলেও কাহিনীটি যে তাঁর মৌলিক কল্পনাপ্রসূত, শরদিন্দু নিজেই সে-কথা বলেছেন। এর ঘটনাস্থল দাক্ষিণাত্যের বিজয় নগর রাজ্য এবং ঘটনাকাল

পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথমার্ধ। বহু দূরকালের সামান্য কয়েকটি ঘটনার কঙ্কালের মধ্যে শরদিন্দু তাঁর অপূর্ব নির্মাণক্ষম-প্রতিভার দ্বারা প্রাণের সঞ্চার করেছেন। সুসমঞ্জস কল্পনা ও অভ্রান্ত ইতিহাস চেতনার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটায় উপন্যাসটি এমন চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে যে, ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের রূপ-রস-স্বাদ-গন্ধ এতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "আপনি বিজয় নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন — এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ — কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না — কিন্তু আপনার বই পড়িবে।" ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনায় শরদিন্দুর কৃতিত্বের এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হতে পারে ?

প্রসঙ্গত শরদিন্দুর জনপ্রিয় উপন্যাস 'ঝিন্দের বন্দী'র কথা একটু বলি। 'ঝিন্দের বন্দী' শরদিন্দুর মৌলিক উপন্যাস নয়, ইংরেজি 'প্রিজনার অব জেন্দা'র অনুসরণে এটি রচিত। কাহিনী পরিকল্পনা ও চরিত্রচিত্রণে মৌলিক কল্পনার পরিচয় যথেষ্টই থাকলেও বিদেশি ঋণের কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়।

এইবার ঔপন্যাসিক হিসাবে শরদিন্দুর শিল্প কৃতিত্বের একটু পরিমাপ করা যেতে পারে। একথা অবশ্যই ঠিক যে, গল্প শোনার আগ্রহ নিয়েই পাঠক উপন্যাস পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটাও স্বীকার করতে হবে যে, নিছক গল্প শোনানোই ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, তাঁর একটা শৈল্পিক দায়বদ্ধতা আছে এবং শিল্প হিসাবে উপন্যাসেরও কিছু কলাবিধি ও আঙ্গিক প্রকরণ আছে। উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশন রীতি — এই তিনটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার মধ্যেও কেউ বা কাহিনী গ্রন্থন এবং কেউ বা চরিত্র সৃষ্টিকেই উপন্যাসের প্রধান উপাদান বলে মনে করেন। খাঁটি উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টিই প্রধান উপাদান হলেও, রোমান্স সচরাচর গল্প প্রধানই হয়। শরদিন্দুও মূলত রোমান্স রচয়িতা বলেই তাঁর ইতিহাসাশ্রিত এই রচনাগুলিতে তিনি কাহিনীগ্রন্থনার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তুলনায় চরিত্র সৃষ্টি কিছুটা যেন গৌণ হয়েই গেছে। অন্যদিকে আবার কাহিনীগ্রন্থনের উপর গুরুত্ব দিলেও তাঁর এই রচনাগুলিতে তিনি যে বিচিত্র ঘটনাজাল বুনেছেন তাতে বর্ণনার চমৎকারিত্ব এবং চিত্তাকর্ষক নানা উপাদান থাকলেও গভীর ও অন্তর্ভেদী জীবন-পরিচয় বিশেষ কিছু নেই। ইতিহাসের যে অমোঘ বিধানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে তাকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং

পাত্র-পাত্রীদের জীবনাবর্তের নিয়ন্ত্রনী শক্তি হয়ে ওঠে, তার পরিচয় তাঁর উপন্যাস-গুলিতে বিশেষ কিছু নেই। জীবনের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বিচিত্র অভিব্যক্তি উপন্যাসগুলিতে থাকলেও যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীরা উপন্যাসের চরিত্র হয়ে ওঠে, তার পরিচয় দুটি একটি ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যত্র নিতান্তই দুর্লভ।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতায় শরদিন্দু সমকালীন অনেক লেখকের সঙ্গে তুলনায় কিছুটা ন্যূন হলেও কাহিনীগ্রন্থনের কুশলতা এবং জীবনচিত্রণের মুন্সিয়ানাই তাঁকে পাঠক-সমাজের কাছে জনপ্রিয় করেছে। বস্তুত, এত মনোরম ভঙ্গীতে ও সুললিত ভাষায় শরদিন্দু গল্পগুলি পরিবেশন করেন যে, একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠকের রেহাই নেই। গল্প বলার এই অসাধারণ আর্ট, ভাষার সৌকর্য, গল্পের যাদু এবং রোমান্স সৃষ্টির দুর্লভ ক্ষমতা দিয়ে শরদিন্দু এক দুর্মর আকর্ষণে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে টেনে রাখেন। এই কারণেই প্রমথনাথ বিশীর মত একজন সৃষ্টিশীল লেখক ও রসজ্ঞ সমালোচককে বলতে হয়, "আপনার গল্প পড়তে পড়তে বঙ্কিমবাবুকে মনে এনে দেয় — তিনি ছাড়া আপনার জুড়ি নেই।" আর পণ্ডিতপ্রবর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্নকে প্রীতিপ্রসন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করতে হয়, "তোমার লেখার একটা যাদু আছে, তুমি অনায়াসে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি কর যে, পলকে মনকে সুদূর অতীতে টানিয়া লও।"

শরদিন্দু সাধুভাষাতেই তাঁর এই উপন্যাসগুলি লিখেছেন এবং তাতে প্রচুর অপরিচিত সংস্কৃত শব্দেরও সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু সে ভাষা কলস্বরা নদীর মত তরতর করে বয়ে গেছে। আর এই প্রসাদ গুণমণ্ডিত সরস ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শরদিন্দুর স্নিগ্ধ-প্রসন্ন ও প্রশান্ত কৌতুকদীপ্ত মন্তব্য, যা রাজশেখর বসুর মতে, "পাঠককে থেমে থেমে উপভোগ করতে হয়, যেমন পোলাও খেতে খেতে পেস্তাবাদাম পেলে।"

CENTRAL LIBRARY

২৬তম বইমেলায় অর্কিড প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হল ঃ

সংবর্ত রায় অনুবাদিত

# মুসোলিনির বিচার

এবং

কবি সুভদ্রা ভট্টাচার্য-এর

# ঘুমের রং

# ( আমাদের ) জলের জেঠা

## ইতালো কালভিনো

**অনুবাদক : অভিজিৎ ঘোষ**

যে সব মেরুদণ্ডী প্রাণী কার্বনিফেরাস যুগের প্রথম জল ছেড়ে মাটিতে উঠে এলো, তাদের জন্ম হয়েছিল মাছের বংশে, যে মাছ-এর হাড় আছে, আছে ফুসফুস, যাদের শরীরের তলার পাখনা এমনভাবে নাড়ানো সম্ভব যে তা দিয়ে শক্ত জমিতে পায়ের কাজ চালানো চলে।

ততদিনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে জলের যুগের শেষ হয়ে এল — বুড়ো কফয়ফ্‌ক্‌ বললেন প্রাচীন স্মৃতি ঘেঁটে — যারা দেশান্তরে যাওয়াই মনস্থীর করেছিল, তাদের সংখ্যা দিনে দিনে ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল, এমন কোনও পরিবার ছিল না যাদের কোনও না কোনও প্রিয়জন শুকনো ডাঙায় উঠে যায়নি, আর সেইসব প্রবাসীরা প্রত্যেকে সেদেশের অসম্ভব সব গল্পকথায় সেখানে কত কিছু যে করা সম্ভব সে কথা বলে পাঠাত আর আত্মীয়স্বজনকে ডাক দিত তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। তরুণ মাছেদের আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না ; কাদার পাড়ে তারা তাদের পাখনা আছড়ে পরীক্ষা করে দেখত তা দিয়ে সত্যিসত্যি পায়ের কাজ চালানো সম্ভব কি না, যেমনটা অবশ্য চালাক চতুর যারা, তারা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছিল।

আবার সেই সময়েই আমাদের মধ্যের ফারাকগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো : কোনো কোনো পরিবার হয়ত ততদিনে জমির ওপরে বহু প্রজন্ম কাটিয়ে ফেলেছে, তাদের ছেলে ছোকরাদের চলাফেরা জীবনযাপন ততদিনে আর এমনকি উভচর জাতীয়-ও নয়, প্রায় সরীসৃপের কাছাকাছি বলা যায় ; আবার অপর দিকে অন্যরা কেউ কেউ তখনও পিছিয়ে থাকছে, তখনও মাছের মতোই দিন কাটাচ্ছে যারা, বলা যেতে পারে, আগের চেয়েও সন্দেহজনকরকম মেছো হয়ে উঠছে।

আমাদের পরিবারের কথা ধরলে অবশ্য বলতে হবে যে দাদু-দিদিমা ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সমেত আমরা সবাই অনেক আগেই পাড়ের ওপর উঠে পড়েছি আর এমন দাপটে পাখনা আছড়ে বেড়াচ্ছি যেন এছাড়া আর কোন কিছু কোনোদিনই করিনি : আমাদের নবআ-নগআ জেঠা-দাদু যদি গোঁয়ার্তুমি না করতেন, তবে জলের জগতের সঙ্গে সেই কবেই আমাদের সব যোগাযোগ ছিন্ন

হয়ে যেত।

হ্যাঁ, আমাদের গুষ্টির এক কর্তাব্যক্তি তখনও মাছ থেকে গিয়েছিলেন। সঠিক বলতে গেলে তিনি আমার বাবার মামার বাড়ির মাছ, জন্ম ডেঙানির যুগের সেলকাম্বাস বংশে ( আরও খুলে বলতে গেলে ও বাড়ির মিঠে জল ঘরের দিকে, যারা কিনা বড় ঘরের কুটুম — তবে এই আত্মীয় কুটুম্বিতার জটিল প্রশ্নে ঢুকতে চাইছিল, সেসব কথা কেউই ভালো করে বোঝে না ছাই। ) তা যা বলছিলাম, এই জেঠাদাদু থাকতেন অগভীর একটুখানি কাদাগোলা জলে, কিছু প্রাক-কনিফার গাছের শেকড়ের ফাঁকে ফাঁকে, লেগুনের সেই খাঁড়ির ধারে যেখানে আমাদের সব কর্তাবাবারা জন্মেছিলেন। ওখান থেকে কখনো নড়তেন না : সমবৎসর যে কোনো সময়ে যে কোনো ঋতুতে আমরা যখনই গাছগাছালির নরম পচা পাতার ওপর দিয়ে শরীর ঠেলে, সোঁদা কাদায় নেমে, ডুবে যাওয়াটুকু টের পাচ্ছি ওমনি ঐ নিচে, পাড় থেকে মাত্র কয়েক বিঘৎ দূরে দেখতে পেতাম ওনার দমছাড়া একরাশ বুদবুদ, সব বুড়ো মাছেদের মতোই উনিও ভারী নিঃশ্বাস ফেলতেন, অথবা হয়তো ওনার চোখ নাকের খোঁচায় গুলিয়ে ওঠা কাদাজলের মেঘটুকু দেখা যেত, বুঝতে পারতাম উনি শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছেন, খাবারের দরকারে ততটা নয় যতটা স্রেফ অভ্যেস বলে।

"নবআ জ্যাঠা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম ! আপনি কি আমাদের কথা ভাবছিলেন ?" একথা চেঁচিয়ে বলে পা আর লেজ জলে আছড়ে আমরা ওনার নজর কাড়ার চেষ্টা করতাম। "আমাদের ওখানকার কিছু পোকামোকা এনেছিলাম আপনার জন্যে ! নবআ জ্যেঠা ! এমন মোটামোটা আরশোলা কি দেখেছেন কোনোদিন ? একটা মুখে দিয়েই দেখুন না, ভালো লাগে কি না…"

"তোদের ওসব দুর্গন্ধ আরশোলা দিয়ে নিজেদের গায়ের বিচ্ছিরী খোস-প্যাঁচড়াগুলো সারা গে যা।" উত্তরে জেঠাদাদু সব সময়ে এমন কথাই বলতেন, অথবা এর চেয়েও বিচ্ছিরী করে : এভাবেই আমাদের আসতে-বসতে বলতেন যেন তিনি, তবে আমরা এসব একদম গায়ে মাখতাম না, জানতাম তো যে একটু পরেই বেশ ঠাণ্ডা হবেন, আমাদের আনা জিনিসপত্তর সব খুশী মনেই নিয়েও নেবেন, এমনকি কথাবার্তাও নরম-সরম হয়ে যাবে।

"কি যে বলেন জেঠু ! খোস-প্যাঁচড়া ! কবে কোনদিন আমাদের গায়ে খোস-প্যাঁচড়া দেখেছেন বলুন ?"

এই খোস-প্যাঁচড়ার ব্যাপারটা বুড়ো মাছেদের মধ্যে একটা চালু ধারণা ছিল : এরকম একটা বিশ্বাস ছিল যে শুকনো ডাঙায় থাকার ফলে আমাদের

সারা গায়ে নাকি ক্ষত-ঘায়ে ভরে যাবে, আর সেসব থেকে নাকি জলের মত কিসব গড়াবে : কোলা ব্যাঙেদের ক্ষেত্রে কথাটা সত্যিসত্যি ঠিকই, কিন্তু তাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো মিল ছিল না ; বরঞ্চ আমাদের যা চামড়া, মসৃণ, চকচক করছে, তেমনটা তো কোনও মাছেরও কোনোদিন হয় নি ; আমাদের জেঠাদাদু সে কথা ভালো করেই জানতেন তবে যেমন কুৎসা আর অসহিষ্ণুতার আবহাওয়ায় তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, তাতে তেমনই অ-কথা কু-কথা দিয়ে মুখের কথার ঝাল বাড়ানোটা কিছুতেই তিনি সামলাতে পারতেন না ।

আমরা বছরে একবার করে গুষ্টিসুদ্ধু সবাই মিলে জেঠা-দাদুকে দেখতে যেতাম । এতে অবশ্য নিজেদের সবার সঙ্গে এই একবার দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ হত. কারণ এমনিতে ততদিনে তো আমরা গোটা মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতাম টুকিটাকি খবরাখবর আর খাদ্য-সুখাদ্য পোকামাকড়ের আদান-প্রদান করা যেত, আর যেসব পুরনো সমস্যার তখনও কোনও সুরাহা হয়নি সেসব নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হতো ।

আমাদের জেঠাদাদু সব বিষয়েই নিজের মত জাহির করতেন. এমনকি যেসব ব্যাপার ওনার জগৎ থেকে যোজন-যোজন দূরের কথা. সেসব নিয়েও বলতেন । যেমন ধরা যাক ফড়িং শিকারের এলাকা ভাগাভাগি ; একটা না একটা পক্ষের দিক নিয়ে উনি নিজের মতো যুক্তি খাড়া করতেন ঠিক ; সে সমস্ত যুক্তিই অবশ্য. বলাই বাহুল্য, জলের ভাষার যুক্তি । "আরে. ওপর দিকের থেকে গভীর জলেই যে শিকার জমে বেশী এটাও জানো না নাকি ? তাহলে আবার কি নিয়ে এত ঝামেলায় পড়ছ ?"

"না জেঠামশাই দেখুন, এটা তো ওপরে কিংবা তলায় শিকারের প্রশ্ন নয় । এই আমি থাকি টিলার পাদদেশে. আর ও থাকে টিলার ঢালের আদ্ধেক পথ উঠে···টিলা বলতে আমি কি বলছি তা ধরতে পারছেন তো···"

অমনি উনি বলবেন "খাদের ঠিক তলাটাতেই সবচেয়ে সরেশ কুচো চিংড়ি মেলে ।" ওনার নিজের দুনিয়ার থেকে অন্য. একেবারে ভিন্ন কোনও জগতের কথা ওনার মেনে নেওয়া যেন একেবারেই অসম্ভব ছিল ।

তবুও আমাদের সবার কাছে ওনার মতামতের একটা বিশেষ গুরুত্ব থেকেই গিয়েছিল । ফলে, যেসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও উনি বুঝতেন না, সেসব ব্যাপারেও আমরা ওনার পরামর্শ চাইতাম, সে পরামর্শ একেবারে রামভুল হতে পারে. একথা জেনেও চাইতাম । উনিই যে পুরনো দিনের রয়ে যাওয়া শেষটুকু.

তার জন্যেই হয়তো ওনার কথার এত গুরুত্ব ছিল, বা হয়তো ওনার মুখের সেই পুরনো ধাঁচের ভাষা, যেমন ধারা "হোথায় পাখনা নামাও সামলে, ছোকরা," যেসব কথার মানে আমরা খুব স্পষ্ট করে বুঝতেই পারতাম না, তারই জোরে হয়তো।

ওনাকে ডাঙায় নিয়ে আসার বিস্তর চেষ্টা আমরা আগেও করেছিলাম, তখনও করে চলেছিলাম ; বলতে গেলে, এ ব্যাপারে গুষ্টির এ তরফে ও তরফে রেষারেষি থামতেই চাইতনা, কারণ শেষ পর্যন্ত জেঠাদাদুকে যদি কেউ তুলে আনতে পারত, তাহলে সমস্ত আত্মীয়জনের মধ্যে তারই তো সবচেয়ে প্রতিপত্তি গড়ে উঠত। কিন্তু এই রেষারেষি একেবারেই অর্থহীন ছিল, লেগুন ছাড়ার কথা জেঠা-দাদু স্বপ্নেও ভেবে দেখতেন না।

"জেঠামশাই, আপনি যদি শুধু একবার বুঝতেন — আমাদের কি খারাপ যে' লাগে আপনাকে এভাবে এখানে একলা ফেলে রাখতে, আপনার এই বয়সে, অই অ্যাতো জোলো হওয়া···আমাদের না, একটা খুব দারুণ কথা মাথায় এসেছে···" এইভাবে হয়তো কেউ শুরু করল ;

"আমিও এদ্দিন এই আশাটাই করছিলাম যে শেষমেষ তোরা ব্যাপারটা একদিন ঠিক ধরতে পারবি।" মাছ বুড়ো থামিয়ে দিয়ে বলে উঠতেন, "তা এবার যখন তোদের মাথা থেকে ঐ শুকনো ড্যাঙার' মাটি আঁচড়ে বেড়াবার খেয়ালটা নেমেছে তখন ফিরে এসে সুস্থ স্বাভাবিক প্রাণীর মতো বাঁচতে শেখ। এখানে সবার জন্যে যথেষ্ট জল পড়ে আছে, আর খাবারদাবারের কথায় যদি আসিস, তো পোকামাকড় ধরার এর চেয়ে ভালো মরসুম এর আগে আর হয়নি কখনো। তা, ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড় সব, এ নিয়ে আর এত কথাবার্তার কি আছে।"

"না, নবআজেঠা, না, তুমি একদম ভুল বুঝছ। আমরা চাইছিলাম তুমিই আমাদের সঙ্গে চলে আসবে, একটা ছোট্ট সুন্দর ঘাস জমিতে থাকবে··· কি আরামে থাকবে তুমি ; ছোট একটা জলের গর্ত খুঁড়ে দেব তোমার জন্যে, তার ভেতরে তুমি এপাশ-ওপাশ নড়েচড়ে আছড়ে বেড়াবে, ঠিক এখানকার মতো। এমনকি চারধারে কয়েক পা হাঁটার চেষ্টাও করে দেখতে পারো ; পারবে তুমি, খুব পারবে, দেখোই না ক'দিন। তাছাড়া দেখো, তোমার বয়সে ভাঙা জমির জল-হাওয়াটা বেশী উপকারীও বটে। চলো তাহলে জেঠু, আর ধরা-কওয়া করিও না। কী, যাবেনা আমাদের সঙ্গে ?"

"না। যাবো না।" এই চোখা জবাব জেঠাদাদুর. তারপরই জলের ভেতর ডুব দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

"কিন্তু জেঠামশাই, কেন? এতে আপনার আপত্তিটা কিসে? আমরা স্রেফ কিছু বুঝতে পারলাম না। আপনার মতো উদার মনের যে কোনো কারুর তো এইসব সংস্কার-টংস্কার কাটিয়ে ফেলা উচিত..."

জলের ওপর রাগী ফেনা ফুটিয়ে, লেজের পাখনায় তখনও জোয়ান ঝট্‌কা মেরে শেষ বার গভীরে ডুবে যাবার আগে শেষ কথাটা বললেন জেঠা ঃ "আঁশের তলায় উকুন গজায়, পেটি খসটাও কাদার পাড়ে." এটা হয়তো হেঁয়ালি কিংবা লোকপ্রবাদের মতো কিছু হবে [ ভাবে খানিকটা আমাদের সেই আঁট-সাঁট প্রবাদের মতো ঃ "গা চুলকোলে, আঁচড়ে নিও" ] ঐ "কাদা" শব্দটা উনি ব্যবহার করতেন "জমি" অর্থে।

মোটামুটি এই সময়েই আমি প্রেমে পড়লাম। আমি তার লল সারাদিন দু'জনে একসাথে. এ ওকে তাড়া করে কাটাতাম ; ওর মতন চটপটে প্রাণী এর আগে কখনও দেখা যায়নি ; ফার্ণের জঙ্গলে, — তখনকার দিনে যে ফার্ণ বড় বড় গাছের মতো লম্বা ছিল, ও সেখানে এক দমে একেবারে মগডালে উঠে যেত, আর ফার্ণের সেই ডগা যেই নুয়ে পড়ে প্রায় মাটি ছুঁত, অমনি ও লাফিয়ে নেমে দৌড়ে চলে যেত আবারও ; আমি যেতাম পেছন পেছন, ওর চেয়ে আস্তে আস্তে, ওর তুলনায় থলথলে পায়ে। আমরা চলে যেতাম ডাঙা জমির ভেতর দিকে, যেখানে শুকিয়ে যাওয়া সর-পড়া মাটিতে কোনোদিন কারো গায়ের আঁচড় পড়েনি ; কখনো কখনো আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তাম, লেগুনের জলের বিস্তার থেকে এতদূর চলে এসে ভয় পেয়ে যেতাম। কিন্তু জলের জীবনের যাবতীয় কিছুর সঙ্গে লল-এর যতটা ফারাক, ততটা অন্যরকম আর কি-ই-বা হতে পারত ঃ বালি আর পাথরের মরু অঞ্চল, ঘাসজমি প্রেয়ারী প্রান্তর, ঘন অরণ্য, পাথুরে টীলা, কোয়ার্টজ্‌ পাহাড় ঃ এই ছিল ওর দুনিয়া, এমন একটা জগৎ যা যেন ওর দীঘল চোখের দৃষ্টিপাতে ধরা পড়ার জন্যেই, ওর ডিঙি মেরে লাফিয়ে চলা পদক্ষেপকে বুকে ধরার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। ওর মসৃণ ত্বকের দিকে চেয়ে থাকলে মনে হতো যেন আঁশ-টাঁশ কোনওদিন ছিলই না কোথাও।

ওর আত্মীয়-পরিবার আমাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলতেন ; যারা প্রথম যুগেই শুকনো জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ওদের পরিবার ছিল তাদের মধ্যে একটি, ততদিনে যাদের স্থির ধারণা হয়ে পড়েছে যে তারা এই এখানেরই প্রাণী,

কোনদিনই অন্য কোথাও বসবাস তাদের ছিল না ; সেইসব পরিবারের একটি যারা তখন এমনকি ডিমটাও ডাঙার ওপরেই পাড়ত, শক্ত মোটা খেলায় ঢাকা ডিম, এবার লল, তার লাফ মেরে চলা ঝিলিক দেওয়া নড়াচড়া লক্ষ করলে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যেত যে ভর জন্মই হয়েছিল ঠিক এই আকারে, বলি আর রোদে সেঁকা কোনও ডিম থেকে, কিলবিলিয়ে জল সাঁতরালে ব্যাঙাচির পর্যায়টা জীবন থেকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে, পাশ কাটিয়ে — আমাদের মতো কম বিবর্তিত পরিবারে যে পর্যায় কাটানোর বাধ্যবাধকতা তখনও ছিল।

আমাদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে লল-এর দেখা করানোর সময় হয়ে এসেছিল ঃ আর যেহেতু জেঠাদাদুই ছিলেন সবার বড় গুরুবাক্তি, ওনার সঙ্গেও দেখা করানোটা এড়ানোর উপায় ছিল না। তবু যতবারই সুযোগ আসুক, আমি পিছিয়ে দিতাম ব্যাপারটা, লজ্জা আর অস্বস্তিতে ; লল যে সব বিশ্বাস আর ধারণার মধ্যে বড় হয়েছে সে সব জেনে আমি তো তখনও ওকে একথা বলে ওঠারই সাহস পাইনি যে আমার দাদু কিনা একটা মাছ !

আমরা একদিন ঘুরতে ঘুরতে, লেগুনের ধার ধরে যেসব স্যাঁতসেঁতে উঁচু পাড়ের জমিতে বালির চেয়ে জড়িয়ে থাকা শেকড়বাকড় আর পচে যাওয়া গাছ-গাছালিই বেশী জমে, সেখানে পৌঁছে গেলাম। লল, অভ্যেসমতো, আমাকে ওস্কাতে চেষ্টা করল ঃ "আচ্ছা, কফয়ফ্‌ক্‌ তুমি পাড়ের কতটা কাছ পর্যন্ত যেতে পারবে ? দেখিনা, কে কতক্ষণ টাল সামলাতে পারে !" বলেই ও তো জমি জন্তুর স্বভাব-লাফ মারল একটা, তবে এখানে যেন একটু ইতস্তত করে !

এবারে কিন্তু আমার মনে হলো যে ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে তো পারবই, এমনকি জিতে যেতেও পারি, জলে ভেজা জমিতে আমার পাখনা পায়ের সুবিধেই বেশি কিনা। "যত কাছে যেতে বলবে, ততদুর তো যাবোই" আমি বললাম, "এমনকি তার ওপরেও যেতে পারি !"

"আজেবাজে বকো না" ও বলল, "পাড়ের ওপরে আবার দৌড়বে কি করে ? ওদিকে তো সব জল !"

আমার জেঠাদাদুর কথাটা তোলার এই বোধহয় সুবর্ণ সুযোগ। "তাতে কি হল ?" আমি বললাম ওকে, "কেউ কেউ পাড়ের এপাশে দৌড়য়, কেউ সাঁতরায় ওপাশে।"

"তুমি যা সব বলছ তার কোনো মানেই হয়না।"

"আমি বলছি — আমাদের নবআ নগআ জেঠাদাদু ঐ জলেই থাকেন,

আমরা যেমন ডাঙায় থাকি তেমনভাবেই থাকেন, কোনোদিন জল ছেড়ে আসেন নি।"

"তাই নাকি ! তা তোমার এই নবআ-নগআকে দেখতেপেলে হোত !"

ওর মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে লেগুনের ধারের কাদাগোলা জল বুদবুদে গুজরে উঠল, জলে পাক দিল ছোট্ট একটা ঘূর্ণি, আর থোঁচা থোঁচা আঁশে ঢাকা একটা নাক ভেসে ওঠার জায়গাটুকু ছেড়ে দিল সেই জল।

"এই যে আমি, এখানে। ঝামেলাটা কি নিয়ে ?" নুড়ি পাথরের মতো গোলগোল ভাবলেশহীন চোখে লল-এর দিকে তাকিয়ে থেকে, চওড়া ঘাড়ের দুপাশে কানকোর ঝাপট দিতে দিতে বললেন জেঠাদাদু। এর আগে কখনো আমাদের জেঠাদাদুকে আমাদের থেকে এতটা অন্যরকম দেখতে লাগেনি : সত্যিকারের রাক্ষুসে মাছ।

"জেঠামশাই, কিছু যদি না মনে করেন···মানে···এ হলো, ইয়ে···মানে বলছিলাম কি, আমার ভাবী স্ত্রীকে আপনার সম্মুখে আনার এই সৌভাগ্য···" আমি লল-এর দিকে ইঙ্গিত করে দেখি যে ও, কি এক অজানা কারণে ওর সবচেয়ে অচীন ঢঙে, পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে, যে ধরণের ভঙ্গিমা ঐ গোঁয়ার বুড়োর না-পসন্দ হবার সম্ভাবনাই বেশী।

"তা ছুঁড়ি, লেজ ভেজাতে এসেছ একটু, আঁ ?" জেঠাদাদু বলে ফেললেন : ওনাদের সময়ে হয়তো এরকম মন্তব্য লোকে ভালোভাবেই নিত, কিন্তু আমাদের কানে এসব একেবারে ইতর অশ্লীল শোনালো।

লল-এর দিকে চোখ ফেরালাম, আমি তো ভেবেছি ও নির্ঘাত এই অপমানে কিচ্‌কিচ্‌ করে ডেকে উঠে এক্ষুনি ঘুরে পালাবে। কিন্তু ওর সহবত তালিম যে কতটা পাকাপোক্ত, চারপাশের জীবনের ইতরামি গায়ে না মাখার ক্ষমতা যে ওর কতটা গভীর, তার কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

"আচ্ছা আপনি বলতে পারবেন কি : ঐ যে ওখানে সরু সরু গাছের মতো···" অবিচলিত স্বরে লেগুনের জলে মাথা তুলে আকা কিছু জলখাগড়ার দিকে দেখিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, "ওরা ওদের শেকড় নামায় কোথায় ?"

একদম কথার কথা, আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে যেমন সব প্রশ্ন করতে হয় আর কি : ওর যেন জলখাগড়া নিয়ে খুব চিন্তা ! কিন্তু এমন হলো যেন দাদু এতদিন ধরে ঠিক এই মুহূর্তের জন্যেই বসেছিলেন — ভাসমান উদ্ভীদের কী কেন এবং কিভাবে সমস্ত সবিস্তারে বোঝানোর

অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন — তাদের ফাঁকে ফাঁকে কি কায়দায় সাঁতরাতে হয়, এমনকি কেন ঐ শেকড়ের মধ্যেই সবচেয়ে ভালো শিকারের খোঁজ পাওয়া যায়, সেই সমস্ত কথা বলেই চললেন।

মনে হলো যেন দাদু আর থাকবেন না। অধৈর্য হয়ে আমি হুফ্ হাফ্ করলাম, মাঝপথে কথা থামাবার চেষ্টাও করলাম। কিন্তু লল যা করল! উল্টে ওনাকেই উস্কোতে লাগল। "ও, আপনি সত্যি জলের তলার শেকড়-গুলোর মধ্যে শিকার করেন? ওঃ কি দারুণ!"

আমি লজ্জার মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম।

উনি বললেন, "মস্করা করছি না। ওখানে যা পোকামাকড় গেঁড়ি গুগলি মেলে না! পেট ভরে বটে!" তারপর, আর অন্য কোনও কথা না ভেবে, দাদু ঘাই মারলেন। এত তেজীয়াল ঘাই মারতে ওনাকে আমি আগে কোনও দিন দেখিনি। বলা উচিৎ, জলে নয়, উনি লাফ মেরে উঠে এলেন বাতাসে — অজস্র আঁশ বসানো গোটা শরীরটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন — প্রতিটা পাখনার কাঁটা শিরা সব ছড়িয়ে মেলে দিয়ে উঠলেন; তারপর বাতাসে দারুণ একটা অর্ধবৃত্ত পূরণ করে আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, মুড়ো-আগে লেজ পরে, আর সবশেষে চাঁদপনা লেজের ঘূর্ণিচালে হঠাৎ জলে অদৃশ্য হলেন।

এই দৃশ্য দেখে, আমার মনে হলো যে ছোটখাটো যে ভাষণটুকু আমি ছকে রেখেছিলাম, ললকে সব বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্যে, সেসব কথা হয়তো জেঠাদাদুর ডুব দেবার ফাঁকে বলে ফেলা যায় ( "...আসলে ওনাকে বুঝতে হবে, বুঝলে, মাছেদের মতো দিন কাটাবার এই পাগলামির ফলে আজকাল ওনাকে দেখতেও কেমন মাছের মতো হয়ে উঠছে বটে..." ) কিন্তু কথাগুলো আমার গলাতেই শুকিয়ে গেলো। আমার ঠাকুরমার নিজের ভাই-এর মেছোমিটা যে কতদূর, তা এর আগে কোনোদিন পুরোপুরি উপলব্ধি হয়নি। শুধু বলে উঠতে পারলাম: "দেরী হয়ে যাচ্ছে লল. চলো ফেরা যাক..." কিন্তু এরই মধ্যে জেঠা-দাদুর পুনরাবির্ভাব, তাঁর হাঙর-ঠোঁটে গুগলি শামুক আর কাদামাখা শাপলা-ঝাঁঝির মালা।

ফিরে যাওয়া সম্ভব হলো যতক্ষণে, তখন যেন আর বিশ্বাস হতে চাইছে না যে নিজেদের দুনিয়ায় আবার ফিরে যাওয়া যাবে। তবু, লল-এর পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে মনে হলো এই বুঝি শুরু হবে ওর সব টিপ্পনি, মনে হলো যা ঘটে গেছে তার চেয়েও দুঃসময় আসছে। লল কিন্তু, একটুও না থেমে,

আমার দিকে একটু পাশ ফিরে বলল "তোমার জেঠামশাইটি খুব ভালো।" ব্যস। আর কিচ্ছুটি না। এর আগেও আমাকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে নিরস্ত্র করেছিল, কিন্তু ওর এই মন্তব্য শুনে আমার গা হীম করা যে অনুভূতি হল, তা এতই ভয়ানক, যেন মনে হলো এ বিষয়ে ওর আর কোনো কথা শোনার চেয়ে ওর সঙ্গে আর কোনোদিন না দেখা হওয়াও ভালো।

আমাদের দেখা সাক্ষাত কিন্তু বজায় থাকল, লেগুন-পাড়ের সেদিনের ঘটনার কোনো উল্লেখও হতো না। তাতেও আমার অস্বস্তি কাটেনি ঃ সব ভুলে গেছে ও, এমন কথা নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করাটাও বৃথা, থেকে থেকেই মনে হতো যে ইচ্ছে করেই ও এখন চুপচাপ থাকছে, পরে কোনোদিন পিলে চমকানো কোনো কায়দায় অপদস্ত করার অপেক্ষাতে আছে, হয়তো ওর বাসার লোকেদের সামনেই কখনও···অথবা, হয়তো — আমার পক্ষে এই দ্বিতীয় কথাটা আরও মর্মান্তিক মনে হতো — ও হয়তো আমার প্রতি করুণার বশেই অন্য অন্য বিষয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে।

তারপর একদিন, কোথাও কিছু নেই, এক সকালবেলায় আমাকে হঠাৎ রুক্ষভাবে বললো ও ঃ "কি হলো, আমাকে আর তোমার জেঠার কাছে নিয়ে যাবেন নাকি ?"

আমি মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "তুমি কি ঠাট্টা করছ ?" না। তা মোটেই নয় সত্যি সত্যি নবঅ নগঅ বুড়োর সঙ্গে আরো একবার আড্ডা জমানোর আশায় ওর যেন আর তর সইছিলো না ! আমার সবকিছু গুলিয়ে গেল।

সেবারে আমাদের লেগুন সফর আরও বেশীক্ষণ চললো। একটা ঢালু পাড়ে আমরা এলিয়ে বসলাম, তিনজনেই। জেঠাদাদু জলের সবচেয়ে কাছে বটে, তবে আমরা দু'জনেও তো আদ্দেক জলে আদ্দেক ডাঙায়, তাই দূর থেকে কেউ আমাদের অমন পাশাপাশি শুয়ে থাকতে দেখলে বুঝতে পারত না কোন জন জলের প্রাণী আর কোনজন ডাঙার।

বুড়ো তো ওনার শঙ্খের ঝগড়া দিয়েই শুরু করলেন ঃ জলের ভেতরে শ্বাস-প্রশ্বাস কিভাবে খোলা হাওয়া শ্বাস টানার অপেক্ষায় উত্তম প্রক্রিয়া, এই ধরণের যত বাঁধা গত, সব চলল। "এইবার লল দেবে, লাফিয়ে উঠে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবে সব" — আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু লল সেদিন একেবারে অন্য পথে চলল ঃ খুব মনোযোগ দিয়ে তর্ক চালিয়ে আমাদের ডাঙা জমির দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরছিলো বটে, তবে নবঅ বুড়োর ধ্যান-ধারণাও যেন যথেষ্ট

বিবেচনা করছে ও. এমন একটা ভাব বজায় রাখল ।

জেঠাদাদুর মতে. এই যে সব ডাঙা জমির জেগে ওঠা. এ সব নিতান্ত সাময়িক ঘটনা ঃ যেমন ভাবে হঠাৎ মাথা তুলেছে. তেমনভাবেই ওসব একদিন তলিয়ে যাবে. অথবা. তা যদি নাও হয়. ও দুনিয়া সব সময়েই অনবরত বদলে যেতে থাকবে ঃ অগ্ন্যুৎপাত হবে. হীমশৈলে চাপা পড়বে. ভূকম্পন হবে. ভূউত্থানে মাটি ঠেলে উঠবে আরোও. আবহাওয়া আর উদ্ভিদ. সব কিছুরই বদল হয়ে চলবে । আর এইসব রূপান্তরের মুখোমুখি হয়ে আমাদের জীবনযাত্রাও ক্রমশ ঃ রূপান্তরিত হতে থাকবে । গোটা গোটা প্রজাতি হারিয়ে যাবে. টিকে থাকতে পারবে শুধু তারাই যারা তাদের অস্তিত্বের মূলটুকুও এত আমুলভাবে বদলে ফেলতে রাজি থাকবে যে এই বেঁচে থাকাটা কেন যে সুন্দর সেই কথাটাই চাপা পড়ে যাবে. হারিয়ে যাবে বিস্মৃতিতে ।

আমরা. সমুদ্র পাড়ের সন্ততিরা. যে আশার হাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলাম সেই আশাবাদের সম্যক বিপরীতে ছিল এই পরিণতির কল্পনা । আমি খুব জোরদার প্রতিবাদ করলাম ওনার সব ধারণার । তবে আমার কাছে এসব তর্কের ( সবচেয়ে ) জীবন্ত আর সত্যি নজির প্রমাণ তো লল নিজে । ওর মধ্যে আমি দেখতে পেতাম প্রাণী শরীর ক্রমবিবর্তনের শেষ ও নিখুঁত আদর্শ রূপ. জেগে ওঠা জমির অধিকরণের লড়াই থেকেই যার জন্ম হয়েছে ; যে সব অপার সম্ভাবনার দরোজা খুলে গেছে. সে সবের মূর্ত প্রতীক ছিল লল । কি করে জেঠাদাদু ওর এই উপস্থিতির বাস্তবটুকু অস্বীকার করবেন ? আমি তর্কের মেজাজে জ্বলে উঠেছি. আর মনে হচ্ছিল বারবার যে আমার বান্ধবী বড্ড বেশী ধৈর্য্য ধরছে. আমার প্রতিপেক্ষের প্রতি বড্ড বেশী বুঝদার হতে চাইছে ।

এ কথা অবশ্য আমার পক্ষেও সত্যি — জেঠাদাদুর মুখে এতদিন গোঁয়াতুর্মি আর গালিমন্দ শুনতে এত অভ্যস্ত ছিলাম — যে এই যুক্তি পরম্পরায় সাজানো তর্ক একেবারে এক নতুন অভিজ্ঞতা । যদিও তাতেও অবশ্য আবার আদ্যিকালের পুরনো সব ভাষাভঙ্গির এমন মিশেল ছিল. আর ওনার কথা বলার টানেও এমন অদ্ভুত উচ্চারণের ঢঙ্ যে সেসব কথায় মাঝে মাঝে আমার হাসিও পেয়ে যাচ্ছিল ।

তবুও. মহাদেশের কোথায় কি আছে তার যে এত অনুপুঙ্খ জানা ছিল ওনার. যতই বহিরাঙ্গিক জ্ঞান হোক সেটা — তবুও তা দেখে হতবাক হবারই মতো ।

লল নানা প্রশ্ন করে করে জেঠাদাদুকে জলের তলার জীবন সম্পর্কে

যতটা সম্ভব কথা বলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল ঃ আর কোন সন্দেহ নেই যে এই বিষয়টিতেই জেঠাদাদুর বক্তব্যের সবচেয়ে ঠাসবুনোই আবেগময় কথাগুলো শোনা গেল।

জমির অথবা আকাশের অস্থিরতার তুলনায়, লেগুন সাগর সমুদ্রে ছিল নিরাপত্তার আশ্বাস। ঐ গভীরে, তেমনভাবে বদলাবে না কিছু, থাকার জায়গা পেটের খাবার সব থেকে যাবে অপরিমিত, মাপা থাকবে তাপমাত্রাও ; এক কথায় জীবন যেমনভাবে চলে এসেছিল তখন পর্যন্ত, তেমনি বজায় থাকবে, তার বিকশিত নিখুঁত আকৃতিতে, ঘটবে না এমন কোনো বিবর্তন বা সংযোজন যার পরিণাম নিয়ে সংশয় করা চলে, আর প্রত্যেকে তার নিজের প্রকৃতির বিকাশ ঘটাতে পারবে, নিজের এবং সবার, সবকিছুর মূলবস্তুকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। জল-জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার সময় জেঠাদাদু কোথাও রঙ্ চড়ালেন না, মায়াস্বপ্নের আশা দেখালেন না, সমস্যা যা হতে পারে, তাও ঢাকলেন না এমনকি গুরুতর যে সব সংকট ঘনিয়ে আসছে সেসব কথাও [ সবচেয়ে চিন্তার কারণ ছিল জলে লবণ-পরিমাণের অনুপাত বৃদ্ধি ] ; তবে সেই সব সমস্যা ওনার মূল বিশ্বাস বা পরিমিতিবোধে ঘা দেবার মতো কিছু নয়।

"কিন্তু দাদু আমরা যে এখন পাহাড়ে উপত্যকায় টগবগ করে ছুটতে পারছি !" আমিই বললাম, নিজের হয়েও বটে তবে বিশেষ করে লল-এর হয়ে, ও তো তখন চুপ করেছিল।

"যা তো বেটা ব্যাঙাচি, আবার যখন গা ভিজবে, তখন আবার বাড়ি ফিরবি !" আমাকে ধমকে বললেন উনি, যেভাবে চিরকাল আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি ওনাকে, আবারও সেই গলায়।

"আচ্ছা জেঠামশাই, আপনার কি মনে হয় আমরা এখনও জলের ভেতরে নিঃশ্বাস নেওয়া শিখে নিতে পারি, নাকি বহু দেরী হয়ে গেছে ?" সহজ সরল আগ্রহে জানতে চাইল লল। আমি ভেবে পেলাম না, আমি কি খুশী হব, আমার জেঠাকে ও-ও জেঠা বলে ডাকল বলে, নাকি চিন্তিত হব, সে সব কথা মুখেও আনা উচিৎ নয় ( অন্তত আমি তো তেমনটাই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম ) সে কথা বেবাক বলে ফেলল বলে ?

"তোমার যদি শখ হয়, মিষ্টিমনি" মাছবুড়ো উত্তর দিল, "তবে এক ঝটকায় শিখিয়ে দেব !"

লল অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, আর তারপর, অবশেষে দৌড়তে শুরু করল,

দৌড়েই চলল. ক্রমশঃ. সব ধরা ছোওয়ার বাইরে চলে যাবে যেন।

আমি তাকে খুঁজে বেড়ালাম মালভূমি আর পাহাড়ে ; জলে ঘেরা ঐ ভূখণ্ডের মরুভূমি আর ঘন জঙ্গল — সব কিছুর ওপরে মাথা তুলেছিল যে ব্যাসল্ট পাহাড়ের উঁচু চাঙড়, তার চুঁড়োতেও পৌঁছে গেলাম আমি. লল-এর খোঁজে। সেখানেই ছিল সে। আমার মনে হলো ওকে বুঝে ফেলেছি আমি — আমাকে যা বলতে চাইছে ও — বুড়ো নবআ-নগআর এত কথা শুনে আবার পালিয়ে এসে এই ওপরে লুকিয়ে থেকে ও যা বোঝাতে চেয়েছিল তা তো নিশ্চয়ই এই যে — নিজেদের দুনিয়ায় আমাদের দস্তুর মতো বেঁচে উঠতে হবে, ঠিক যেমনভাবে বুড়োমাছ তার দুনিয়ায় ভীষণরকম বেঁচে ছিল।

"আমি এখানে সেইভাবে বেঁচে থাকব. যেভাবে জেঠাদাদু আছেন ওখানে." আমি. চেঁচিয়ে বলতে গিয়ে একটু তুংলে গেলাম ; তারপর শুধরে নিয়ে বললাম : "এখানে আমরা দু'জনে থাকব. একসাথে!" কারণ ওকে ছাড়া যে ও অঞ্চলে আমি একা নির্ভয়ে টিঁকতে পারব না. সেটাও সত্যি।

লল আমাকে উত্তরে যা বলল! আজও. এত ভূতাত্ত্বিক যুগ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেকথা মনে পড়লে আমার গাল লাল হয়ে যায়! ও বলল : "যাও তো বেটা ব্যাঙাচি ; ওর চেয়ে আরও দম লাগে তাতে!" আমি বুঝতে পারলাম না — জেঠাদাদুকে নকল করে ও কি আমাকে. আমার জেঠাদাদুকে. দু'জনকেই ব্যঙ্গ করতে চাইছে. নাকি জেঠাদাদু আমাকে যে তাচ্ছিল্যের নজরে দেখেন. ও-ও সেই চোখেই দেখছে আমাকে। দু'ই আমার পক্ষে রীতিমতো হতাশ হবার কথা. কারণ দুটো কথারই একটাই শেষ মানে — ও আমাকে দো-আঁশলা জন্তু একটা — যে প্রাণী এই দুই দুনিয়ার কোনোটাতেই স্বচ্ছন্দ নয় — তেমন ভাবেই দেখছে।

ও কি আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে? একথা মনে হওয়াতে. তারপর থেকে আমি ওকে আবার ফিরে পাবার ভীষণ চেষ্টায় মেতেছি। নানা ভাবে নজরকাড়া কত কাণ্ড শুরু করেছি : হাওয়ায় ওড়া পোকা শিকার করেছি. বাতাসে লাফিয়ে ডিগবাজি খেয়ে উঠেছি. মাটির তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেখেছি. দলে যাদের গায়ের জোর সবার চাইতে বেশী, বেছে বেছে তাদের সঙ্গে কুস্তি লড়াই লড়েছি। নিজেকে নিয়ে গর্ব হতো আমার, তবু. এইসব বাহাদুরীর সময়ে একবারও লল ছিল না সেসব দেখতে : ও থেকে থেকে উধাও হয়ে যেত, আর কোথায় যে সে লুকিয়ে আছে. সে কথা জানতো না কেউ।

শেষ পর্যন্ত আমিই ধরতে পারলাম : ও লেগুনের জলে যায় যেখানে

জ্যেঠাদাদু ওকে জলের তলায় সাঁতার কাটা শেখান। ওদের দু'জনকে একসঙ্গে ভেসে উঠতে দেখলাম ঃ পাশাপাশি সমান বেগে সাঁতরে চলেছে দু'জনে, যেন দুই ভাই-বোন।

"জানো তুমি ?" আমাকে ফুর্তিসে ডেকে বললো, "আমার পা দুটো দারুণ পাখনার কাজও করে !"

"বা ঃ দারুণ খবর ! অনেকখানি এগোনো গেল তাহলে," ব্যঙ্গটা আমি সামলাতে পারলাম না।

আমি বুঝতে পারছিলাম, এটা ওর কাছে একটা খেলা। কিন্তু খেলাটা আমার ভালো লাগছিলো না। ললকে আবার আসল জগতে ফিরিয়ে আনতে হবে, অপেক্ষমান ভবিষ্যতের দিকে ওর মুখ ঘুরিয়ে দিতে হবে।

একদিন, জলের দিকে ঢলে পড়া ফার্ণের জঙ্গলে আমি ওর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

"লল, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার আছে," ওকে দেখামাত্র বললাম আমি, "যথেষ্ট মজা লোটা হয়েছে। অনেক জরুরী কাজ জমে আছে আমাদের। আমি পাহাড়ের ফাঁকে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি ঃ ওপাশে পাথরের বিশাল সমতল পড়ে আছে, সবে সেখান থেকে জল নেমে গেছে। আমরাই প্রথম ওখানে বাসা বাঁধবো, তুমি, আমি আর আমাদের সন্তান সন্ততি।"

"ঐ সমুদ্র বিশাল," বলল লল।

"ঐ বোকা বুড়োর আবোল তাবোল আওড়ানো তুমি থামাও। পৃথিবী এখন পায়ের দুনিয়া, পাখনার নয়, তুমিও সেটা ভালো করেই জানো।"

"আমি জানি ও এমন একজন যে তেমন একজন। "লল বলল।

"আর আমি ?"

"পা আছে যাদের, তাদের মধ্যে ওর মতো কেউ নেই।"

"আর তোমার পরিবার ?"

"ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ওরা কিচ্ছুটি বোঝেনা।"

"কী বলছ, তুমি কি পাগল ! কেউ ফিরে যেতে পারেনা !"

"আমি পারি।"

"তুমি কি করবেটা কি ভেবেছো বলতো, একা একেবারে, বুড়ো মাছটার সঙ্গে ?

"বিয়ে করব ওকে। ওর সঙ্গে আবার মাছ হয়ে উঠব। আর পৃথিবীতে এনে দেবে আরও অনেক মাছ। বিদায়।"

সেই শেষবার, আগের মতো তরতর করে ফার্ণডগার মাথায় ও উঠে গেল, লেগুনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল তাকে, তারপর লাফ দিয়ে ছেড়ে দিল। জলের ওপরে ভেসে উঠল আবার, তবে এবার একা নয় ; নবআ নগআ জেঠার বাঁকানো লেজ ওর লেজের পাশেই ভাসলো। আর তারপর, দুজনে একসঙ্গে জল ভাগ করে তলিয়ে গেল।

আঘাতটা আমার খুব জোর লেগেছিল। তবে, যাই হোক, আমার কিই বা করার ছিলো ? আমি নিজের পথে চললাম, পৃথিবীর সব রূপান্তরের মধ্যে নিজেও রূপান্তরিত হয়ে হয়ে। কখনো কখনো জীবিত প্রাণীর এত অজস্র রূপের ভীড়ে, দেখা হয়ে গেছে এমন কারো সাথে যে আমার চেয়ে অনেক বেশী "কেউ একজন" : ভবিষ্যতের ঘোষণা করল যে, হাঁস-ঠুটো প্লাটিপাস, ডিম ফুটে বেরনো বাচ্চার যত্ন নিতে যে শেখালো ; অথবা দেখা হয়ে গেলো অন্য একজনের সাথে, যে অতীত সময় ফিরে আসার কোনো আশা নেই সেই অতীত দিনের সাক্ষী এক ডাইনোসর, সেনোজয়ীক যুগের প্রারম্ভেও টিঁকে গিয়েছিল যে ; অথবা — কুমীর একজন — সেই অতীত সময়ের অংশ যে অতীতি নিজেকে অনড় রাখার পথ খুঁজে পেয়েছিল। এদের সবার ছিলো এমন কিছু না কিছু, যা আমার চেয়ে শ্রেয়তর করে তুলেছে ওদের, উত্তম কোন গুণ, এমন কিছু যে ওদের পাশে, প্রতিতুলনায়, আমাকে মাঝারীমানের দেখায়।

তবুও, ওদের কারোর সাথেই আমি নিজের স্থান বদলাতে রাজী নই :

---

কসমিকমিক্স্ ( ১৯৬৫ ) গ্রন্থের উইলিয়াম উইডার কৃত ইংরাজী অনুবাদ সংস্করণ থেকে এই গল্পটি গৃহীত, ইংরাজীতে নাম 'আকোরেটিক আঙ্কল' ( Aquatic Uncle ).

## প্রসঙ্গকথা

পঁয়ষট্টি সালে প্রকাশিত 'কসমিকমিক্স্', আর সাতষট্টির 'সময় ও শিকারী' ( টি-জিরো অংশ বাদে ), এই দুটি বইয়ের মোট উনিশটি গল্প লেখা হয়েছিল একটি মূল পরিকল্পনায় : প্রতি গল্পের শুরুতে থাকে একটি এপিগ্রাফ, তাতে থাকে অ্যাস্ট্রোনমি অথবা কসমোলজি-বর্ণিত কোনো তথ্যসূত্র। তারপর গল্প আসে এক কথকের মুখের কথায়। কফয়ফ্ক্ ( Qfwfq ) নামক এই কথক-অস্তিত্ব অতি-প্রাচীন, সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকেই সে হাজির, গল্প-গল্পান্তরে সে কখনো জড়বস্তু কখনো প্রাণী কখনো অণু কখনো মাছ, কখনো শুদ্ধ চেতনা অথবা ডায়নোসর। তবে প্রতি অবতারেই সে বিশ

শতকীয় মানুষী মানসে সমৃদ্ধ। আত্ম-সচেতন ও প্রসন্নচিত্ত এই কথকের ভাষ্যের মুলসুরে থাকে কমিক আয়রনি, যার স্পর্শ আছে চরিত্রের নামকরণেও—স্বরবর্ণের উদ্ভবের আগে জন্ম, তাই ঐ বিচিত্র নাম।

এ গল্পের প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রদের বোধশক্তি অবশ্যই অবাস্তব, কিন্তু বর্ণিত ঘটনাক্রম সবসময়েই বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞান-নির্ভর। পরিভাষা পরিচয়-এ চোখ বোলালে দেখা যাবে যে প্রাকৃতিক ইতিহাসের যে সম্ভাব্য বর্ণনা আমরা এনসায়ক্লোপিডিয়ায় পেয়ে থাকি, গল্পের আখ্যান যেন তারই নাট্যরূপ। তবে গল্প কিন্তু বিজ্ঞানসূত্রের ব্যাখ্যা অথবা ইলাসট্রেশন মাত্র থেকে যায় না। গল্প-কথনের ভাষা ও ভাষ্য দুই-ই নিয়ে যায় অন্য পথে। কালভিনোর মতে 'বৈজ্ঞানিক রচনার প্রবণতা থাকে এক বিমূর্ত লজিকের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শুদ্ধ আঙ্গিক ধর্মী ভাষার দিকে, যে ভাষা তার দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের প্রতি উদাসীন। অপরদিকে সাহিত্যের প্রবণতা থাকে একটি মূল্যব্যবস্থা নির্মাণের দিকে, যেখানে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি চিহ্ন একটি বিশেষ মূল্য ধারণ করে — অসংখ্য শব্দ ও চিহ্নের ভীড়ের মধ্যে থেকে ঐ বিশেষ কয়েকটি বেছে পাঠ-পৃষ্ঠায় বসিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াতেই ঐ মূল্য নির্দিষ্ট হয়।' বস্তুত এইসব গল্পে বিজ্ঞান পটরচনা করে শুধু, গল্পের চরিত্র ও তাদের সম্পর্কগুলি গড়ে দেয় মানবসভ্যতার ইতিহাস ও দর্শন। ফলে, আখ্যান প্রাগৈতিহাসের প্রকোষ্ঠে বন্দী থাকেনা, হয়ে ওঠে নিতান্ত সাম্প্রতিক।

মূল্য-সৃষ্টির কথাটি কিন্তু 'মরালিটি' অর্থে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা বোঝায় না। কালভিনোর মতে 'মরাল মূল্যবোধের স্থান সাহিত্যে নয়, বাস্তবে প্রায়োগিক আচরণের মধ্যে তাকে খুঁজে নিতে হবে।' এর মানে এই নয় যে সাহিত্যিক রচনা বা চরিত্র মরালিটি বিচারের বাইরে। 'সাহিত্য কিছু স্বশাসিত মানস-প্রতীমা ( ইমেজ ) সৃষ্টি করে, যাকে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা অথবা মনের অপর কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনামূলক বিচার-আলোচনায় ব্যবহার করা চলে।' যে মূল্যবোধের সন্ধানে পাঠক প্রবৃত্ত আছে, আর একটি সাহিত্যকর্ম যে মূল্য-ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে — এ দুয়ের সচেতন তুলনামূলক বিচারই ( সাহিত্যপাঠে ) এথিকাল ক্রীয়ার স্থান নেয়। পাঠক সাহিত্যকর্মটিকে অথবা তার মেটাফর-কে গ্রহণও করতে পারে, বর্জনও করতে পারে, তবে সে ঠিক কি বর্জন করতে চায়, এর স্পষ্টতর ধারণা গড়ে ওঠে। ...বড় কথাটা হলো পাঠককে তার নিজের কল্পজগতের ভাষায় এমন এক সৃষ্টির মুখোমুখি করা যা তার মনে প্রতিক্রিয়া জাগায়, আপত্তি-প্রতিবাদের জন্ম দেয়।'

কালভিনোকে 'মহাকাশযুগের ক্রবাদ্যুর' অভিহিত করা হয়, তুলনা টানা হয় এডওয়র্ড লিয়র, বোরহেস বা এশার-এর সঙ্গে। তাঁর রচনায় কল্পনা ডানা মেলে বিজ্ঞান অথবা দর্শন অথবা ইতিহাস কিম্বা সাহিত্যতত্ত্বের সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ় কোনো বিতর্কের আবহাওয়ায়। জন্ম ক্যুবায়, ১৯২৩ সালে। বড় হয়ে ওঠেন সমুদ্রকুলবর্তি শৈলশহর সান রেমো-তে। কলেজশিক্ষায় মন ছিল না, তবু নাম লেখাতে হয়েছিল কৃষিবিদ্যার ক্লাসে। যুদ্ধ এসে পড়ায় সেসব মুলতুবি থাকে। যুদ্ধের পরে কাজ খুঁজে নেন 'ঈনডি'-র বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থায়। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসেন, নিজেও লিখতে শুরু করেন, যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। পার্টির সদস্যপদ '৫৭ সালে ছেড়ে দিলেও, ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকে আজীবন। মারা যান ১৯৮৫ সালে।

**প্রাসঙ্গিক পুরা প্রাণতাত্ত্বিক পরিভাষা**

পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান বটে, তবে তার বিবরণ অনেকাংশেই আনুমানিক, বিতর্কের কিছু স্থান থেকেই যাবে। সেসব এড়িয়ে, গল্পে উল্লিখিত কয়েকটি শব্দের সরল পরিচয় দেওয়া হল।

**১ ) ডেভনিয়ান যুগ ( Devonian Period ) :**

আনুমানিক ৪০ কোটি বছর পূর্ব থেকে শুরু করে ৩৫ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে ভুতাত্ত্বিক পরিভাষায় এই নামে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়কে 'মাছের যুগ' বলা হয়, বিবর্তনের ধারায় মাছের প্রজাতিসমূহের সংখ্যা ও বৈচিত্র এই সময়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে, দীর্ঘস্থায়ী খরার প্রকোপে বহু হ্রদ নদী শুকিয়ে যেতে থাকে। মাছেদের সেই সঙ্কটে এক ধরনের উন্নত ফুসফুস-যুক্ত মাছ একটি শুকিয়ে যাওয়া জলাশয় থেকে অপর একটি জলাশয় অবধি শরীর টেনে নিয়ে যেতে এবং সেটুকু সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রাখতে শেখে। জল থেকে ডাঙায় ওঠার সেই শুরু। এ যুগের শেষভাগেই মাথা তোলে অতিকায় ফার্ণ-এর জঙ্গল।

**২) সেলাকন্থ ( Coelakanth ) :**

এই প্রাচীন মাছেরা আজও টিঁকে আছে, যদিও তার আত্মীয়-সম্পর্কের অন্য সব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে বহুকাল। ডেভনিয়ান যুগের শুরুতে তাদের

আবির্ভাব, সমসাময়িক ফুসফুস-মাছের আত্মীয় গোষ্ঠী তারা, কিন্তু ঐ যুগের মাঝামাঝি সময়ের ফসিলেই ঐ দুই গোষ্ঠীর শরীরী বৈশিষ্ট্যে ফারাক লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনের ধারায় দুই গোষ্ঠী দুই ভিন্ন পথে চলে যায়। প্রথম দিকের সেলাকান্থ-এর নিবাস ছিল অগভীর মিষ্টি জলে, কিন্তু পরে, ট্রায়াসিক ( Triassic ) যুগে, অর্থাৎ ২২.৫ কোটি বছর — ১৮ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যায় তারা। ১৯৩৮ সালে দঃ আফ্রিকার উপকূলে আকস্মিক আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এদের অবলুপ্ত বলেই মনে করা হত। আজ, ভারত মহাসাগরে মাদাগাস্কার-এর উত্তরের কোমারো আর্কিপেলাজোর-র উপকূলে, গবেষকের কৌতূহলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পাথর আর কোরালেই খাড়াই খাদের খাঁজে প্রায় ৫০০ থেকে ১৫০০ ফুট গভীর জলের গুহায় ঐ জলের জ্যাঠারা দিব্যি দিন কাটাচ্ছে।

৩ ) কার্বনিফেরাস যুগ ( Carboniferous Period ) :

আনুমানিক ৩৫ কোটি বছর — ২৭ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল। যুগের গোড়ায় সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত ছিল প্রচুর পরিমাণ চুন ক্রমশঃ তা প্রস্তরীভূত হয়ে লাইমস্টোন তৈরী হয়। এ যুগেরই পরিবর্তি পর্যায়ে, ভূতলের এক আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতল নানা জায়গায় উঁচু হয়ে ওঠে, জলের ওপর মাথা তুলে সৃষ্টি করে নিচু জমি, জলাভূমি, অগভীর লেগুন। এই সময়েই কিছু উভচর প্রাণী জলের বদলে ডাঙায় ডিম পাড়া শুরু করে। এই ডিমে আগের মতো নরম খোলার বদলে থাকে শক্ত আস্তরণ, আর তার ভেতরে থাকে প্রচুর তরল পদার্থ — অর্থাৎ প্রতিটি ভ্রূণের জন্যে তৈরী রইল একান্ত নিজস্ব একটি জলাশয়! তবু, জন্মের পর ঐ উভচরের শিশুদের ফিরে যেতে হয় জলে, জলের বাইরে খুব বেশীক্ষণ থাকলে উভচরের শরীর শুকিয়ে যায়। যুগের শেষ পর্যায়ে এসে পড়ে সরীসৃপ, যে ডিম পাড়ে ভাঙাজমির যত্রতত্র, তবু ডিম ফাটা শিশুর প্রাণসংশয় হয়না — অতঃপর জলের পাড় থেকে সরে বহুদূর পর্যন্ত প্রাণীজগতের বিস্তারের চাবিকাঠি খুলে যায়।

৪ ) ডায়নোসর, এবং সেনোজয়িক পর্যায় ( Cenozoic বা Cainozoic Era ) :

ফসিলের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রথম ডায়নোসরের আবির্ভাব ট্রায়াসিক যুগে ( ২২.৫ কো.ব.পু — ১৮ কো.ব.পু ) — তখনও তারা অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের। রমরমা জুরাসিক ( Jurassic ) পর্যায়ে ( ১৮ কো.ব.পু — ১৩.৫

CENTRAL LIBRARY

কো.ব.পূ )। ক্রেটেশস ( Cretaceous ) যুগের শেষে, অর্থাৎ মোটামুটি আজ থেকে ৭ কোটি বছর আগে ঐ অতিকায় সরিসৃপ লোপ পায়। এই তিন যুগ মিলিয়ে মেসোজয়িক ( Mesozoic Era ) পর্যায়। এর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর পর, সেনোজয়িক পর্যায়ের প্রাথমিক যুগে যদি কফয়ফ্ক্ কোনো ডায়-নোসরের দেখা পায়. তবে তা সত্যি অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

৫ ) কুমীর :

আজকের কুমিরের পূর্বজদের আবির্ভাব সেই ট্রায়াসিক যুগে, অর্থাৎ তারা ডায়নোসরের সমবয়সী। অবশ্য আরশোলা আরও প্রাচীন।

প্লাটিপাস :

আদিমতম স্তন্যপায়ীদের দুটি মাত্র প্রজাতি আজও বেঁচে আছে — একটি প্লাটিপাস, অপরটি এ্যকিড্না।

## বাসুদেব দেব

### আমাদের পুরোনো বাড়ি

তোমার দেয়াল থেকে শেষ ছবি আর ক্যালেণ্ডার
তুলে নিলাম, পুরোনো বাড়ি, তুমি এখন মুক্ত
তুমি এখন এক স্মৃতির বন্দর আমাদের, কুয়াশা এসে
ক্রমশ ঘিরে ধরবে তোমাকে, তুমি এখন দীর্ঘশ্বাসে অনবয়ব
বিবাহ ও জন্মদিনের উৎসব ক্লান্ত কয়েকজন মানুষের আশ্রয়
আমাদের অসুখ-বিসুখ মনখারাপ, শুকিয়ে যাওয়া টবের তুলসি
এইসব, আমাদের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ডেকে আনবে নতুন মানুষ
অনন্ত সরাইখানার পাশে কখন একটা নির্বোধ শ্যাওড়াগাছ
বড় হয়ে উঠেছিল নিঃশব্দে, তার ডালে বাসা বেঁধেছিল একটি কাক
তাকে বিদায় জানিয়ে আসা হলো না
বিদায় এখন কেবল এক বিমূর্ত ইতিহাস

## রাজকুমার শেখ

### সুখ সুখ স্বপ্ন

আমার স্বপ্নর পাশে শুয়ে থাকে অন্ধকার
অন্ধকার সহবাসে জন্ম নেয় আলোপৃথিবী।
তুমি আলো চেনোনা তাই আলপথ হয় বাঁকা,
এত বাঁকা পথে কখনও সোজামানুষ কী হাঁটে ?
চোরাপথে চোরাবালি,
মানুষরে, অন্ধকারেও যে তুই খাঁটী—
খাঁটী সোনা।
ওই বাঁকা আলপথে আমার স্বপ্ন শুয়ে থাকে।
স্বপ্ন আলপথে আমার যত আলোপৃথিবী
আমার যত বাঁকা পথ আজ সুখ
সুখ সুখ স্বপ্ন।

# মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

## ফুলের উৎসব এলে

বৃক্ষ ভাষা জানি না বলেই পাহাড়তলিতে অরণ্যে নির্বাক আমি
শিকড় ও ডানার ঠিক অর্থও বুঝি না।
সন্ধ্যাশ্রী সুন্দরী মেয়ে সমুদ্রের গভীরতা বুঝে
জানে সে ফুলের ভাষা বৃক্ষের জীবন প্রণালী
পাতার মর্মর বুঝে, বুঝে কোন্ ডালে কোন্ পাখি
কেন ডেকেছিলো ?

সে এখন সব কিছু খোলাখুলি বলে দিতে পারে।

সন্ধ্যাশ্রীকে তাই আমি ভালবাসি বৃক্ষ ও ফুলেরও চেয়ে বেশী।
আমি তো জানি না কোন শিকড়ের গোপন কাহিনী
ভাষা বোধ শূন্যে হারায়
অরণ্যে প্রবেশ করে অপরূপা অগ্নি সুন্দরী
কাঠের কঙ্কাল খুঁজে পাখির পালক
চমকে ওঠে ঝর্ণায় মুখ দেখে বাঁশী ফেলে রাখাল বালক।

সন্ধ্যাশ্রী আমাকে ডাকে দু' চোখের ইশারায়
বৃক্ষের গোপন ভাষা পাতাদের গান
ফুলের উৎসব এলে এবার শোনাবে।

# রামপ্রসাদ দাস

## 'এখন, আমি ভালো নেই

সেই কবেকার খেলার ছবিগুলো ধূসর, মলিন
তবুও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল — ছড়িয়ে থাকা বাবলা বন্
সদ্য পোড়ানো মড়াকাঠ সরিয়ে উদ্দাম
অরুণো সারা মাঠজুড়ে খেলা শুধু খেলা।
কখনও নিঃশব্দে পায়ে ফুটে থাকে কাঁটা
আমৃত্যু সঙ্গী-প্রতীক—সেই কিশোরবেলার ঢেউগুলো,

আজও বুকের মধ্যে তোলপাড় করে,
মনে হয়, 'এখন আমি ভালো নেই'
এখনও খেলে চলেছি জীবনের সঙ্গে
মা. বাবা, স্ত্রী. ছেলেমেয়ে, সবাই-এর সঙ্গে লুকোচুরি
ডালে.বেতালে সারা সংসার জুড়ে
চারিদিকে অদৃশ্য পাঁচিল. আর ঘুমন্ত শিশুর মুখ।
কিশোরবেলার কাঁটা পা থেকে অবাধ্য হৃদয়ে
এখনও সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত
ঋজুতায় পৃথিবীর পরিচিত রোদের মতোন
মনে হয়, 'এখন আমি ভালো নেই'

## আবদুস শুকুর খান

### দহন

জীবনভর এমন কথা বললে না.
যা হৃদয়ে রাখতে পারব
কেন বললে না. এ প্রশ্ন অষ্টপ্রহর যন্ত্রণা দেয়।

শূন্য হওয়ার কারও কথা ছিল না. অথচ
একজনের ছবি দেয়ালের ফ্রেমে ফুলমালায়
অনুপস্থিতি ভারি দিনগুলি থমকে আছে. আনাচে-কানাচে
অন্যজন বালির প্রাসাদ গড়ে বুনছে স্বপ্নজাল,
জীবনকাব্য থেকে ছিঁড়ে যাওয়া একটি পাতা
কখন যে যবনিকা টানলো
কবে যে গুহার আঁধারে ঘুমালো আত্মার পাখি
জানি না. শ্রীহীন বৃত্তান্তে আজও আমি গৃহী
উহ্যকথার তরঙ্গে দিনরাত্রি অক্ষর পাতায় লিখছি
অন্ধকার. আলোর ভিতরে আগুন শরীর, দহন ক্রিয়া!

CENTRAL LIBRARY

# মতি মুখোপাধ্যায়

## উড়ান

এখনো যায়নি তবে যাই যাই করছে
পাখির মতো হাঁঠোঁট চাইছে জল
ফোঁটা ফোঁটা গড়ুষে যতটা তৃষ্ণা মেটে
উড়তে উড়তে পুড়তে পুড়তে সবে নুয়েছে
ভাবতে পারেনি আত্মীয় অনাত্মীয় এত ছায়া
পাতা খসার মতো নরম কথা ঘরময়
যাতে শব্দবাতাস না ঝাপটা দেয় চোখে মুখে
খুলে গেছে কোমলতম স্নায়ুপাপড়ি
স্থির আঁখিতারা কী যেন বলতে গিয়ে চুপ
শব্দ স্পর্শ রাগ অনুরাগ স্মৃতি
জুতোর মতো বাইরে খুলে রেখে ঢুকছে ঘরে
এত শান্তি এত ভালোবাসা এত অশ্রুপাত
পঁয়ত্রিশ বছরে এই প্রথম বউটি
অনুভব করে দোল খাচ্ছে অনুভূতিহীন দোলনায় ।

বন্ধ জানলা দরজা দু'হাট করে খোলা
যাবে, নিশ্চয়ই যাবে
তাকে ডেকেছে অরণ্য তাকে ডেকেছে আকাশ
কতোকাল যে বাতাসে ডানা মেলেনি
এবার তার উড়ান, উড়বে
বাতাসে বাতাস হয়ে আকাশে আকাশ ।

## সুভদ্রা ভট্টাচার্য

### বৃত্ত

লাইন টেনে টেনে বৃত্ত বানাতে চাইছি
বোধের বাইরে থাকা শব্দগুলো ধরছি
বুঝতে পারছি না স্বপ্নে বোনা রাত ছুঁচ্ছি
অবচেতন মনের বাইরে থেকে কাকে খুঁজেই চলেছি
বুঝতে পারছি না বলেই
শামুকের মত গুটিয়ে রেখেছি নিজেকে
যেন
শাশ্বত যা কিছু সেসবের মহড়ায়
নেই জায়গা ওই বৃত্তটার
কিন্তু যে কোন সময়কে ছোঁয় ওই বৃত্তটা অবলীলায়
যেন
জীবনকে ছুঁতে গিয়েও হোঁচট খাচ্ছে
বিষম ভাললাগা আগ্রহে
তাই
লাইন টেনেই চলছি বৃত্তের ভেতরে ঢোকার জন্য

## শান্তনু প্রামাণিক

### সূত্র

একদা ছিলাম আমি ব্যাকুল অনিয়মে শিহরণে
ভুল প্রস্তাব মত প্রণয় ও স্নেহ
উভয় ডানার ভরে আচ্ছন্ন থাকিত হৃদয় ।

সংজ্ঞা নিয়ম ও সংকেত মত জীবন
প্রবহমান রেখে মানব ও মানবীর সমধিক ভুল হয় !
ঋণ ও পরাজয় স্বীকারে কেন তবে অধিক সংকোচ !

পরবর্তী বিশ্লেষণে বুঝে অধিক নিরাপদ মনে হলো
বস্তুতঃ নীরব মৃতের মত সকলে রয়েছি পরীক্ষাগারে ।

## নারায়ণ ঘোষ

### অন্যশতাব্দীর দিকে

গতকাল রাতে যে বাস ব্রিজ ভেঙ্গে পড়ে গেল জলে, তাতে
আমার প্রিয় বন্ধুর থাকার কথা ছিল, সুভদ্রা বৌদির থাকার কথা ছিল
যাদের জন্য এইসব ঘটে যায়. তারা চিরকাল নির্বিকার সিগারেট টানতে ভালবাসে
এখন কত কী ঘটে যায়, যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনা
নইলে স্কুলের টয়লেটে কেন পাওয়া যাবে ব্যবহৃত কনজেম, চুড়িদার··· ?
চারপাশে অর্থহীন উল্লাস উচ্ছ্বাস আর প্রসাধনসামগ্রীর বিজ্ঞাপনশিল্প
আমাদের পায়ের চিহ্নগুলোকে কেমন অস্পষ্ট আর নিঃসঙ্গ করে দিচ্ছে
পুকুরের পাড় কেমন রাস্তা গিলে নিচ্ছে. যেমনভাবে বড় বড় প্রমোটার-বোয়াল
গিলে নেয় পুকুর ; শৈশবকে গিলে নেয় মুরগির খাঁচা আর হরলিক্স···, ···

আমরা প্রতিদিন বাসে উঠি, বাস থেকে নামি···ট্রেনে উঠি···শতাব্দি গড়িয়ে যায়···
মোটুবাবু লুঙ্গি পরে থপথপ করে থলে হাতে একইভাবে
অন্য শতাব্দির খোলাবাজারের দিকে হাঁটেন···
তবে তাঁর পকেটে রঙিন সুন্দর ক্যালকুলেটর···, ···, ···

## চন্দন চট্টোপাধ্যায়

### এই রাত, এই

আর কিছু নয় ; চুলের শিরার ভিতর শ্রীপঞ্চমী।
এই তারস্বর থেকে টেবিল ও রক্তের
একটু দীর্ঘতা।

আমি শুধু গ্রীষ্মকাল চিনি
গুঁড়ো গুঁড়ো ফুটপাত কারকাছে ধুলো, ছায়া—
বোবাগান জানে। এই হাতে
সাদা পায়রার দল খুঁটে খুঁটে তৃপ্তি খেয়েছিল,
আর যাসম্ভব তাও চারিদিকে যন্ত্রস্থ।

লতাগাছে ভীড়, বড় অসহ্য তন্বী রাত
এই রাত
এই অসম্ভব রাত··· ···

# সংবর্ত রায়

## দূর

১.

মানুষ হতে হলে অনেক দূর যেতে হয়
অনেক দূর
যেখান থেকে পৃথিবীটাকে
বিন্দুর মত দেখায়,
সাময়িক বিরতি মনে হয় এই আয়ুষ্কাল

২.

আমি স্পষ্ট করে কাউকে দেখতে পাই নি।
হাত নেড়ে বিদায় জানাব বলে
বন্দরের ঘাটে এসে
শ্যামলী
কোথায় যেন হারিয়ে গেল,
মিশে একাকার হয়ে গেল ভীড়ে

আমি তাকে একদম চিনতেই পারি নি।

আমি স্পষ্ট করে কাউকে দেখতেই পাই নি
দেখেছি শুধু অনেকগুলি হাত
অনেক কে বিদায় জানাচ্ছে।

৩.

একটা কাজ কর মল্লিকা
আর একটু পিছাও
আর একটু.....
দূর থেকে দারুণ দেখাচ্ছে, দারুণ
সুন্দর।
পৃথিবীতে কোনো কুৎসিত রমণী কেউ নেই
যদি দূর থেকে দেখ।

CENTRAL LIBRARY

৪.

ফ্লাশ ব্যাকে তুমি স্নানের পর চুল আঁচড়াচ্ছ
বুকের উপর চুইয়ে নামছে জল,
জলের সাথে তরল উত্তাপ।

তুমি কি এখন চুল আঁচড়াও না আর ?
চোখে পড়লেই ইচ্ছে হ'ত, ইচ্ছে হ'ত আবার।

## মুরারী খান্না

### জল ছুঁতে

আজ বুঝেছি
ছুঁয়ে যেতে পেরেছি
কিছুকে।

ছুঁতে পেরেছি
কিছুটা সময়

এখন
এই শীতে
জল ছুঁতে তাই
হাত কাঁপে
ভয় হয়

হৃদয়ের ওম নিতে
তাপ বেড়ে চলে

ভয়ংকর শব্দের ঢেউ
বেজে ওঠে
অন্তরীক্ষে।

## শুভব্রত চক্রবর্তী

### সর্পতুল্য

দু-একটি ইঁদুরের শোক ব্রাত্যভূমির দিকে সুগভীর নেমে আসে ; যাকে
তোমরা মোমঋতু বলো ঃ বলো, পাঠ্যপুস্তকের পাতায়
'সুষুপ্তির বন্ধনশালা, অনাবৃষ্টিহেতু কিছু মৃত্যু রেখে যায়' আর
ইস্কুলবালিকারা স্তব্ধ আকাশের যুবতী হতে পোড়ায় পরিক্রমাকাল
অন্ধ ঘরের রাত, ভাতের হাঁড়ির ভিতর যাদুবাস্তবের উপবাস ;
এখানেই শেষ নয়, আরো আছে, যদি আরো একটু গভীর ঢুকি
দেখি ঃ স্থির পাণ্ডুলিপি, ছায়াজন্ম ; এমন কি স্বপ্নভ্রমে
কালো যমুনার জল প্রেমহীন অক্ষরে বিকোয় ! তারপর খুঁজি,
অন্ধকার, ভিন্ন এক প্রেতযোনি যাত্রা, মৎসারতিভ্রূণে নিমজ্জিত হই,
গলা পর্যন্ত জল, ক্রমে উঠে আসে, ডুবে যায় ঘোলাটে করোটি
এই ছদ্মবেশ, অতিসম্মোহন, চিতাছন্দ, উপকণ্ঠের শরীর
নাভীচিহ্ন জানে। জন্ম নিভে থাকে
অথচ বুঝি না শ্বাশত নরকের সেই অরন্ধনজাত দীর্ঘ শূন্যতা
মগ্ন চরাচর ; সর্পতুল্য কুলকুণ্ডলিনী সেখানেও জাগ্রত হয়, তীব্র স্নায়ুকষ্টে।

## অমরেন্দ্র গণাই

### সুখ পাতাবাহারের গাছ

সুখ পাতাবাহারের গাছ ; ফুল নেই, ফল নেই তার
দুঃখগুলি পাতার ফলক জুড়ে সবুজ আঁধার।
হলুদ-চন্দন ছিটে, লাল-নীল রঙের বুননে—
দুঃখগুলি পুরোনো দিনের গান কান পেতে শোনে।
লুকোনো ঝর্ণার জল কবে কোন্ স্রোতের সঙ্গমে—
ভালবাসাহীনতায় হিম ও পাথর হয়ে জমে।
তারি কিছু ছিন্ন ব্যথা কেন আজ বুকে টেনে আনো।
দুঃখ তো একার নয় ; দুঃখ সারা আকাশ-ছড়ানো।

CENTRAL LIBRARY

# শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

## সাদা হ'য়ে যাওয়া

এক নিঃসঙ্গ মাতাল রাতের মধ্যে দেখি
পাতাজোড়া অভিচার, ব্যভিচার,
মত্ত প্রকম্পনা আর দুষ্ট আচার।
তখন চোখ খোলেন রাত্রিমাতা—
আমি দেখি সংকল্পিত বাক্, গার্গী, দ্রৌপদী আর বেহুলার স্তব
যখন তন্দ্রা পেরিয়ে ঘুম
যখন পা টিপে টিপে আমাদের, অচেতন পদ্মমূলে যাওয়া
তখন সমস্ত রাত্রি বিদীর্ণ ক'রে এক মেরুজ্যোতি,
এক নিতান্ত মানবীর ফুল হয়ে ওঠা

এই মানবীকে আমি চিনি,
চিনি তার পদশব্দ, অফুরন্ত প্রাণের সুন্দর
আর এক নিঃসঙ্গ মাতাল রাতের নিষ্প্রদীপ,
এক কাপুরুষ সুভদ্রের রাত্রিযাপন

রাত্রিকন্যা তুমি, তুমি সুশ্রী বর্ণনা
রাতের নৈসর্গে এসো—
তোমার সর্বস্ব নিয়ে আগুন উৎসবে যাবো, এই জেনে
আমি আজ প্রহরঘাতক
এক নিষ্প্রদীপ মাতাল রাত
এক নিদ্রাহীন প্রেমিকার সাদা হয়ে যাওয়া—

CENTRAL LIBRARY

# বৃন্দাবন দাস

## অন্যালোক

নিরুদ্দেশে যাবো বললে—
যা
নিরুদ্দেশে যাবো না বললেও—
তা

খুঁজবেটা কে
অনাথ তো নই
নাথও জোটেনি
ঠিক মতো

রাজার ছেলে
বন্ধু হবে—
শুনেছিলুম

এখন সব চুক্তি করে

ভাগাড়ে ঠিক কটা শকুন
জানে না সঠিক
দক্ষ গণৎকারও

রাজার ছেলের পোষা অঢেল
এবেলাতে লক্ষ্মী এলে
ও বেলা তে সরস্বতী
কালীমাকেও বশ করেছে
অঢেল খুশির মদ্য দিয়ে

শম্ভু এবং নিশম্ভু কিংবা
নন্দী এবং ভৃঙ্গী—
সবাই এখন মোক্ষচালে
মারছে বাজী রাজধানীতে
বলবেটা কে—

CENTRAL LIBRARY

আমার হয়ে বলার মতো
ছিলো যারা স্বর্গ এবং মর্ত্য জুড়ে
কোন সুযোগে লুকিয়েছে মুখ
অমৃত কোন্ ধুলো পেয়ে

আক্ষেপ আর ক্ষোভের ভিতর
কাটছে দিন পাপক্ষয়
ছেঁড়া ত্যানায় লুকিয়ে লজ্জা
বলছি—আমি অন্যস্রোত

বোঝার যারা ঠিকই বোঝে—
শিল্পীনীতি কবি নীতি
আসলে সব কথার কথা

এবার এলে মহোৎসব
তালিকাতে ঝুলবে ঠিকই
কবির নামে
অন্যালোক

## অশোক কুমার রায়

### পরিণত শস্যের ভ্রূণ

তুমি ছিলে তৃণ সম, যেন ঘাস সবুজ
এখন তোমার শরীরে ফুল ।
তুমি এখন উলঙ্গ হতে ব্যস্ত শিল্পির মত ।
শিল্পি যেমন অরণ্যের অন্তরে
স্বচ্ছতা খুঁজে
তুমিও কি এখন পরিণত শিল্পির চোখ মন নিয়ে
ব্যবচ্ছেদ কর সোনালী লাবনী শরীর,
আর ধরতে চাও খেলতে চাও
জাগতিক নেশায় ভালবাসা ?
অথবা আশার অনেক চোখ
আশার অনেক হাত
যেন তুমিই সকলের ঘর সংসার ।

# দীর্ঘ কবিতা ও ছোট কবিতার সঙ্গ-অনুসঙ্গ

## দেবাংশু ঘোষ

দীর্ঘ কবিতার চল এখন প্রায় নেই বললেই চলে। কখনও সখনও সময় পেলে দীর্ঘ কবিতার জন্য কবিরা যেন অনেকটা ইচ্ছাকৃত নড়ে চড়ে বসেন। তবে অলোককুমার ঘোষ সম্পাদিত 'এ সময়ের নির্বাচিত দীর্ঘ কবিতা'য় বেশ কিছু ভালো কবিতা চোখে পড়ে। সত্তর এবং আটের দশকে যাঁরা কবিতা চর্চা শুরু করেছিলেন তাঁদের কবিতা এখানে স্থান পেলেও বেশিরভাগ কবিই ষাটের। অবশ্য এটাও ঠিক ষাটের দশকে যারা কবিতা চর্চা শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকেই দীর্ঘ কবিতায় মুন্সীয়ানার ছাপ রেখেছেন। ইতিহাস চেতনা সম্পন্ন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কলমে বাংলা দীর্ঘ কবিতা অবশ্যই নতুন মাত্রা পেয়েছে। তিনি ইতিহাস সচেতন কবি বলেই হয়ত তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে ভালোবাসা বা মঙ্গলবোধ। তাই তিনি লেখেন, 'মানুষ বোজেনি চোখ মানুষেরই ভয়ে।...মানুষের চোখে আজো হায়নার লুব্ধ চোখ জ্বলে। মৃত্যু ভয় নয়. আমি গ্রস্ত যে বিষাদে / চাইনি তো পৃথিবী এমন" / ( আমি কেন একা )। কবি অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী গল্প বলার ভঙ্গিতে কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেও তা ব্যাপ্তি পেয়ে যায় জীবন মুখর উত্তরণের জন্য। এছাড়া এ কবি ছোট ছোট কোলাজে সাবলীল চিত্রকল্প গড়ে তোলায় পারঙ্গম। কখনও কখনও এই কবি রাজনৈতিক টানাপোড়নে ধ্বস্ত হলেও মানুষের প্রতি তিনি কখনও আস্থাহীন নন। সেই আস্থা কী পড়ন্ত বেলায় ফিকে হয়ে আসছে নাকি হতাশার নাগপাশে বন্দী ? নয়তো কবি কেন এমন করে বলেন. "অনেক বছর এই শহরে / নিজেই এখন নিজের ঠগ / কলম ঘুরছে ভেড়ার পালে, কষ্ট হয় / সামনে দিঘি স্কুলে যেতে / চোরা কাঁটা যে কত / এ সময়ের আর এক প্রতিষ্ঠিত কবি রাণা চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর কবিতায় টের পাওয়া যায় জীবনের উত্তাপ। মানুষ আর প্রকৃতির ভিতর তাঁর যে প্রতিকৃতি শুব্ধ হয়ে আছে তাকেই খনন করে চলেছেন এ কবি হাজার বছর ধরে, সহজ, সরল সাবলীল ভাষার ওপর তাঁর আস্থা। তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ বিদ্রুপও লক্ষ্য করা যায়—'সত্যানুভূতির মশাল নিভিয়ে দাও। হেঁটে যাও জড়োবুদ্ধি নরকের দিকে। / নিজেকে পণ্য করো, নিজেকে বন্য

করো / রাক্ষুসে মাছের মতো থাকো একা / আকোরিয়ামে / তবে এই সময়ের আর এক কবি সাগর চক্রবর্তী শুধু বিষয়বস্তুতে নয় বলার ঢঙে ও কিছুটা সংক্ত এবং সাহসী। তিনি সরাসরি বলতেই ভালোবাসেন, প্রতিবাদ যেন তাঁর কাব্যধার চিরঅঙ্গ। কবি অনন্ত দাশ 'ভীষ্মের শরশয্যায় আমি' কবিতাটিতে যেখানে বলতে চেয়েছেন শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের কথা সাগর চক্রবর্তী সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যুদ্ধের প্রত্যাশী কিন্তু সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল অস্ত্রবাজদের কোনও স্থান নেই। "রক্তমাখা রুটির উত্থানে'ই তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। তাই এই বিধ্বস্ত সভ্যতার দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন. "ইতর প্রাণীও অনায়াসে মহামান্য হয়ে পুজো পায় / বিশুদ্ধ ইতরামি আজ প্রকাশ্যেই মানবতা খায়।" / এছাড়া এই বইটি ষাটের প্রতিষ্ঠিত কবি বাসুদেব দেব. মৃণাল বসু চৌধুরীর কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে—যা পাঠকের দৃষ্টি কাড়বেই।

সত্তরে শুরু করা কবির তালিকাও এখানে কম নয়। এদের মধ্যে রফিক উল ইসলাম. অলোককুমার ঘোষ. সুব্রত রুদ্র. ধূর্জটি চন্দ. তুষার চৌধুরী সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ও গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা এই বইটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সুব্রত রুদ্র চতুষ্পার্শের সব কিছুর মধ্যে থেকেও সবকিছুকে যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন. "আমি শরতে মরি কোন্ গাছে ফুল এসেছে দেখে।" / এর পাশাপাশি সত্তরের কবি সুভদ্রা ভট্টাচার্যের গলা অন্যরকম। তিনি তেজী মানুষের খোঁজে তলোয়ারে শান দিতে দিতে আবিষ্কার করে ফেলেন একটা ইতিহাসের—"যেখানে ভুয়ো পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে জীব বার করে।" কবি অলোককুমার ঘোষের 'স্থির রেখা চিত্র বর্ণনা-মূলক ঢঙে লেখা হলেও ব্যাপ্তি পেয়ে যায় জীবনের নানা তুচ্ছ ঘটনার অনায়াস অতিক্রমণের জন্য। অলোককুমার ঘোষের 'স্থির রেখা চিত্র' পড়লেই যে কোনও পাঠক তার শৈশবের দিনগুলিতে ফিরে যাবে—ফিরে পাবেই হারিয়ে যাওয়া সব আনন্দকে তিনি বলেন. "এখনও ! / খুঁটি বেয়ে ঘরের চালে উঠেছে। লাউ আর চাল কুমড়ো শীতের রোদ পোয়াতে. / উঠোনের কোণে দড়ির জালে / পাক খেয়ে উঠে চিচিঙ্গে ঝুলছে / নিচে বাঁধা সুতোল দড়িতে ইঁটের টুকরো / মায়ের সহযোগী হয়ে সে সব বেঁধেছি / দ্রুত বেড়ে ওঠার আশায়। এছাড়া বৃন্দাবন দাস. অরুণাংশু ভট্টাচার্য শুভব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় এই বইটি যে সমৃদ্ধ হয়েছে তা বলা বাহুল্য। সব মিলিয়ে বইটি অবশ্যই সংগ্রহের।

শান্তনু প্রামাণিকের 'শিকড় বাকড়' কাব্যগ্রন্থটি এক কথায় দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনায় সমৃদ্ধ। টুকরো টুকরো নানা অনুভূতির বর্ষণমাল।

১৯৭৭ থেকে ৯৪ সাল পর্যন্ত কিছু কম প্রায় দশ বছরের নানান অনুভূতি এই বইটির মধ্যে গেঁথেছেন।

তাঁর কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ কবিতাটিতে তিনি বলেন, — স্মৃতির ভিতর — / মন্ত্রনা আর পতনটুকু জমিয়ে রেখে / মিলত যদি জীবনযাপন সরলরেখায়।" কবি নিজেও জানেন এ আশা আশাতীত। রবার্ট ব্রাউনিং এক জায়গায় বলেছিলেন, "হোয়াট হ্যাণ্ড অ্যাণ্ড ব্রেন ওয়েণ্ট এ ভার পেয়ার্ড ? হোয়াট হাট অ্যালাইফ কনসিভ্‌ড অ্যাণ্ড ডেয়ার্ড ?" তবুও কবিরা আশাতেই বুক বাঁধেন। তাঁর কবিতায় পরিণতির স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, 'মাটিতে প্রথিত শিকড়ে ওঠে খনিজ শিহরণ। মেধাহীন প্রেমে সতত যত্ন রাখে অবোধ সাবালিকা ; সর্বস্বপণ করো, তার মতো পদাবলী হাতে / ঘুরে দাঁড়াও লিখতে পারো জীবন সেই মস্ত প্রহেলিকা।" কখনও কখনও তার কবিতার চিত্রকল্প হৃদয়ে স্পর্শ রেখে যায়। যেমন তিনি বলেন. 'উঠোনে রাখা সদ্য শাদা কাপড়ে ঢাকা শব / ধূপের গন্ধ মাখে বিধবাটি নিটোল যুবতী শরীরে।" এমনই সব গভীর অনুভাবনা ও চিত্রকল্পের রঙে তার ছোট ছোট অনুভূতি কবিতা হয়ে যায়। অলোককুমার ঘোষের প্রচ্ছদ স্বাভাবিক।

---

এ সময়ের নির্বাচিত দীর্ঘ কবিতা ॥ সম্পাদনা—অলোককুমার ঘোষ ॥ অকিড প্রকাশনী কলিকাতা-৩৮। মূল্য—পঁয়ত্রিশ টাকা।

শিকড় বাকড় ॥ শান্তনু প্রামাণিক ॥ অকিড প্রকাশনী, কলিকাতা-৩৮। মূল্য—পনের টাকা।

# বিকেলের আলোয় সমুজ্জ্বল

## অমূল্য কুমার চক্রবর্তী

কবিতা লিখে আনন্দ, আবৃত্তি ও পাঠে আনন্দ, শুনে আনন্দ। তবু বলা যায়না কবিতা শুধু আনন্দ থেকেই লেখা হয়। শোক দুঃখ অভিমান বিচ্ছেদ বেদনা থেকে হৃদয়গভীরে জমে ওঠা ভাবনা ভাবাবেগ থেকে যে কবিতার সৃষ্টি তারও তুলনা নেই। অপূর্ণ আশা, প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা উৎস হয় শুদ্ধ কবিতার। যে সূত্রেই হোক না কেন, স্রষ্টা কবির পরম প্রাপ্তি এক আনন্দঘন পরিতৃপ্তি। মুক্তির স্বাদ। ভাবে ও স্বভাবে পরিণত কবি রানা চট্টোপাধ্যায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুবাদে কাছে দূরে বহু পথ অতিক্রম করে যেতে যেতে তুলে রেখেছেন ফসল. আর বিকেলের মিষ্টি আলোয় সেই সঞ্চয় হয়ে উঠেছে সুচারু সুন্দর পুষ্ট রসঘন। কোন সময় অসময় থাকেনা এসব ব্যাপারে। যে কোন সুক্ষণে বা সামান্য অলক্ষুণে কারো ডাকে বা ক্রন্দনে বা ঘটনায় আপনি ধরা দেয় ভাবপাখি, সে ডানা ঝাড়ে. কোন নিরুদ্দেশ ঠিকানায় ইশারা জানায়।

প্রতি মুহূর্তই মূল্যবান
যে পারে ধরে রাখতে তার কাছে সময় অসময় নেই
খুব ভোরে হাওয়া দিলে আলগা হয়ে পাতারা খশে
খুব টান থাকলে অন্য গ্রহের নক্ষত্র
খুলে ফেলে নিজস্ব তাঁবু
গুটিয়ে নেয় আর ছুটতে থাকে দুরন্ত গতিতে
সময় অসময় সামান্য মৃত্যু।

নিজস্ব তাঁবু গুটিয়ে ফেলা দুরন্ত গতিতে ছুটে যেতে থাকা আর সুদূরের গ্রহ নক্ষত্র এসব শব্দরাজী থেকে মায়াজাল সৃষ্টি হতে থাকে পাঠক বা মনোযোগী শ্রোতার অন্তরে, সেখানে বাস্তবকে সীমাকে ছাড়িয়ে স্বপ্ন ও কল্পনাতেই হয়ে ওঠে সত্যনির্ভরতা, — মেধা ও মননের সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনাপেক্ষিকতা, বাক্-চাতুর্যেরও। অসীমের সন্ধানে অনবরত চলিষ্ণু মানুষ যেন ধ্যানে ঋষি, কর্মে সন্ন্যাসী। এইভাবেই পরিচয় ঘটে 'সেই মানুষের'। যেমন রানা চট্টোপাধ্যায় কে নিবিড় ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যাচ্ছে তারই সম্পন্ন আভায় আলোকিত বিভিন্ন কবিতায়। বস্তুতঃ কোন যোগ্য মানুষের বা মানবীর জীবন উপেক্ষা করা সম্ভব

নয়। এই প্রাণ, প্রাকৃত জগৎ স্বজন সন্তান যে বহু মূল্যবান সে কথা অস্বীকার করে 'কূটস্থ' হয়ে থাকা কোন কবির স্বভাব ধর্ম নয়, কবি অর্থে যিনি দার্শনিক।

'জীবন আমার কাছে বহমান নদী
যার দুদিকে শ্যামলিম ভালবাসা,
হয়ত বিতত নির্জনতা, দায়বদ্ধ বোধি
স্নেহ মমতা মূল্যবোধ নিরন্তর আশা
জীবন নানান ফুলেতে গাঁথা মালা চলে যায় সহর্ষ সাগরে
সব কিছু ফেলে—
বলো উল্কামুখী নেচে গেয়ে কিছু পেলে ?

আসলে এই প্রশ্নটাই চিরন্তন, 'কিছু পেলে' ? কী পেলাম ? জিজ্ঞাসার পেছনে আরো প্রশ্ন থাকে 'আমি কী চাই ? যেমন রয়েছে 'নেত্রকোনা'র কবিতায় ঃ আমার কী নাই, আমি কী যে চাই

সারাদিন শুধু এ প্রশ্নটাই।

দেহাবদ্ধ প্রকৃতি শাসিত জীবনে অগ্রাহ্য করা চলেনা স্বপ্নসুখ ও স্বপ্নভঙ্গে ক্ষোভ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বদোলা, প্রেম ও প্রত্যাখ্যান। কবির পক্ষে ব্যতিক্রম খুবই কম। 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' এই ব্যথাতেই আনন্দ, কবির তখন ভাষা ফোটে। সর্বকাল এমনি ঘটেছে। বিভিন্ন কবিতে বিভিন্ন আবহে। কবি চিহ্নিত হয়ে থাকেন তার আরথের স্বকীয়তায়, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। সমকালীন বাংলা কবিতার মধ্যে মেকী মনন ও মায়াকান্না, ভাবসম্পদাবিহীন আসিত্বের 'আস্পর্ধা', শব্দগাঁথার স্বচ্ছতাশূন্য চাতুর্যের ক্লান্তিকর পুনরুক্তি—এর মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্যে রাণা চট্টোপাধ্যায়ের সমৃদ্ধ পরিচয় তার বিকেলের কবিতায় ঃ

প্রকৃত কবির কোন প্রত্যাশা থাকেনা
... ... ...
তার কোন অভিজ্ঞান নেই,
জয়ের পালক গুঁজে সে থাকেনা বিজয়ীর রথে
তার কোন ঈর্ষা নেই অশ্রুও অশ্রুত তার চোখে
প্রকৃত কবির কোন প্রত্যাশা নেই
শিরদাঁড়া সোজা হেঁটে যায় অন্য সৌরলোকে।

মৃত্যুচেতনা থেকে মুক্ত এই পঙক্তি পড়ে স্বস্তি পাওয়া যায়। রাণা চট্টোপাধ্যায়ের সত্তর থেকে নব্বই দশকের কবিতায় (১৯৯৯) শোকাচ্ছন্নতার চাপা বেদনা

পাঠকের মনে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, মৃত্যু উঁকি দিয়ে থাকত কবিতার প্রান্ত থেকে। সেই ধূসর বেদনা জীবনানন্দ দাসের মত একসময় অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চলেছেন, তমিস্রার মধ্যেও নতুন উদিত এক নক্ষত্রের আলোকে পথের আশ্বাস পেয়েছেন। সর্বক্ষণ আছে এক অন্বেষার তাগিদ। মহত্তর যদি কিছু থাকে ত তাকেই চাই। ঐশ্বরীক না হলেও, শুধু যেন হয় তা মানবিক।

মানুষ যেখানে নেই সেখানে আমি যাব না
নক্ষত্র থেকে গ্রহতারা থেকে
মানুষ অনেক বড়ো।
যেখানে মানুষ আছে উজ্জ্বল অনেক স্মৃতি
থেকে যায় মানুষের গন্ধে অনেক মহত্তর।

মনে পড়ে যায়
পাঁচশো বছর আগে এরকমই মানুষের জন্য
চোখে জল ভরে নদীয়ার রায়

বলেছিলেন—কিছুই থাকেনা হাসিটুকু থেকে যায়—
মানবিকতার জন্য এমন আন্তরিক আগ্রহ, তন্ময়তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে রাণা চট্টোপাধ্যায়ের এক স্মরণীয় শায়ের

ঈশ্বরকে খুঁজে বার করতে পারো ?
আমার কাছে মানুষই ঈশ্বর
ঈশ্বরের কাছেও সম্ভবত মানুষই বড়।

মানুষের মধ্যেই শুধু নয়, যেখানেই প্রাণের উন্মেষ, জীবনের স্পন্দন, আনন্দ সেখানেই। কবি সেখানে অবগাহন করতে পারেন ত তার কবিতা সার্থক। প্রায় একশ বছর আগে ফরাসী লেখক জঁ হেনরি ফেরর-এর The sacred Beetle থেকে উল্লেখ করা যায় : 'like good simple folk who find pleasure in all living things, we were off to spend a morning at the most wonderful of festivals, life's spring time awakening.

এই জীবনোৎসবের স্বাদ অন্যভাবে রয়েছে রাণা চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রকৃতি' কবিতায় : নিমরোদ্দুর মেখে গাছগুলি হাসছে / ঘাসফড়িং আর প্রজাপতির ডানায় প্রকৃতি বসে আছে / খানিক জিরিয়ে নিলুম তোমার মাটিতে / ...বলেছিলাম আসব, পাগল হয়ে শুয়ে থাকবো / সজনে ফুলের সংসারে / মায়াময় তাপে দু একটা উচ্ছেফুল দুলছে / খানিকটা জিরিয়ে নেবো পরাণ ডোবার

CENTRAL LIBRARY

নিচে / শাপলার সংসার চিনি।

অকৃত্রিম সহজ ভাষায় প্রাণখোলা ভালোবাসা সদাস্ফুট নূতন নূতন জীবনলক্ষণে, —ঘাসফড়িং আর উচ্ছেফুল! এমনি এক অত্যাশ্চর্য আধুনিক শুদ্ধ কবিতা বৈকালিক রাণার।

---

বিকেলের আলোর ভিতরে। রাণা চট্টোপাধ্যায়। অর্কিড প্রকাশনী। কলকাতা-৩৮

# রোদ্দুর জাতক মানে প্রিয়তম মানুষ

## বৃন্দাবন দাস

একবার কথা প্রসঙ্গে কবিরাণা চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের ১৮ কোটি বাঙালীর মধ্যে দেড় কোটি কবিতা লিখিয়ে।

এখানে এ কথা বলার কারণ. যাঁদের কথা এখানে বলবো — এঁরা কিন্তু ওই দলভুক্ত নন ; কবিতা এঁদের প্রাণবায়ু সঞ্জীবনী সুধা।

আমাদের পাঠকগণ. হয়তো ভাববেন. এমন কথা বলার কী প্রয়োজন। না. তাঁদের বিনীতভাবে জানাই কবি রমেশ পুরকায়স্থ-র 'রোদ্দুর জাতক' এবং কবি ক্ষিতীশ ঘোষালের 'প্রিয়তম মানুষ' কেবলমাত্র কবিতা লেখার জন্য কবিতা নয়. কবিতা অন্ত প্রাণ যেমন সমাজ সচেতন তেমনই সংবেদনশীল মননের গভীর বেদনার্ত আকুতির দুটি—কবি মুখ।

'রোদ্দুর জাতক' কবি রমেশের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এর আগে তিনি তিনটি সিঁড়ি বেয়ে এখানে এসেছেন। তাই কবিতাগুলি যেমন সংহত. সংযত তেমনই প্রস্ফুটিত কুসুম। সঙ্গে বলে রাখা ভালো তিনি একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং গবেষকও।

"তার চেয়ে শুভলক্ষ্মী, রক্তমাখা লাসগুলো' ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। এসো, কিছুক্ষণ গল্প করা যাক পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোতে" ( পুরনো নদীর কাছে ) ; এই কবিতার শেষ পংক্তিটি বলি" আমাদের স্বপ্নগুলো আগুনের ডানা ঝাড়ে বুকের ভিতর।" অথবা "পৃথিবীর ছন্দগুলি মিত্রাক্ষরে কখনো মেলে না' ( ছুটির স্মৃতিতে )। গভীর অনুসন্ধিৎসা ও সমাজের মাটি ফিরে অভিজ্ঞতা না থাকলে কিভাবে এসব উচ্চারণ সম্ভব ?

"আলোর পাখিরা আকাশে আকাশে জয়ের বার্তাবহ" ( নীলাঞ্জনাকে ) এবং "গোপন স্পর্শের যাদু / আহত জিনের ওপর / আলোড়িত করে আমার সমগ্র চেতনা" ( আহত জিনের ওপর ). কিম্বা "কর্কশ খোলসে মোড়া কবিতার কাছে তার পরম নির্বেদ / জল দিও, তবু জল দিও" ( তবু জল দিও—আমাদের নাড়া না দিয়ে পারে কি ? এই কবিকে সোচ্চার সামাজিক হয়ে উঠতেও দেখি. তাঁর 'উদ্দালকের সন্ধানে' কবিতায় "নষ্ট জল ঠেকানোর পাঠ নেবে উত্তরপুরুষ।"

কবি রমেশ পুরকায়স্থের 'রোদ্দুর জাতক' পাঠককে মনোনিবেশ করিয়ে রাখবে — একথা বলতে দ্বিধা নেই।

দ্বিতীয় আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ কবি ক্ষিতীশ ঘোষাল-এর 'প্রিয়তম মানুষ'। বলে রাখা উচিৎ, ক্ষিতীশ বাবু নিজেই এক প্রিয়তম মানুষ তাঁর পরিধির মধ্যে। বড় নিরহংকার, প্রচার বিমুখ ও অপরিচিত থাকার মায়া তাঁকে ক্রমশ স্নেহশীল, মমতাশীল ও শ্রদ্ধাবান করে তুলেছে।

কবি ক্ষিতীশ তাঁর 'প্রিয়তম মানুষের মাধ্যমে প্রিয়তম পাঠকের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যান — সরল উচ্চারণে, অনায়াস কথনে ও স্বভাব কবিত্বে। এই গ্রন্থের চল্লিশটি কবিতার তিরিশটিই শুধু মানুষকে কাছে পাবার বিনম্র প্রার্থনা — যা এসময়ে অতীব বিরল। কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করি—

১। পুড়ে যাচ্ছে শরীর। / যা কিছু ভালোমন্দ / থেকে যাচ্ছে পৃথিবীতে।
[ অস্তিত্ব ]

২। কবি কাঁদলে বজ্রপাত হয়, / কবির হাসিতে / বিশ্ব মৈত্রীর বার্তা।
[ কবি কথা ]

৩। অথচ তোমার কষ্টে / কতটুকু ব্যথিত / মোটেই বলতে পারি না।
বলতে পারি না।

৪। আমার ঘর, দোর, উঠোন আর কবিতায় / মম করে / পৌষলক্ষ্মীর আল্পনাময় পদচিহ্নের মতো / মানুষের আন্তরিক সহাবস্থান।
[ আপনজন ]

৫। ফোটা ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে / ভাবি — আমার ভালোবাসা / আমাকে যথার্থ মূল্য দিয়েছে। [ আমার ভালবাসা ]

এটি ক্ষিতিশবাবুর ১ম কাব্যকৃতি। আশা করবো, পরবর্তীতে আর একটু গঠনশৈলী ও শব্দচয়নে পরিমিত হয়ে উঠবেন ; আমরা এক মানুষের কবিকে পাবো।

---

রোদ্দুর জাতক ॥ রমেশ পুরকায়স্থ ॥ প্রমা প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-১৭। মূল্য – ২৫।
প্রিয়তম মানুষ ॥ ক্ষিতীশ ঘোষাল ॥ এখন খোলা হাওয়া ॥ পূজালী, বজবজ, দঃ ২৪ পরগণা ॥ মূল্য—১৫।

# নদী ঝরিয়েছে ঘাম

## অনন্ত দাশ

শ্যামল কুমার নাইয়ার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নদী ঝরিয়েছে ঘাম' গত বই-মেলায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছুকাল ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার কবিতা পড়ছিলাম ; কিন্তু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তার ছিল গভীর অনীহা। কিছুটা আমার, কিছুটা রাণা চট্টোপাধ্যায়ের তাগিদে এবং অলোককুমার ঘোষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শ্যামল তার প্রাথমিক জড়তা ও দোলাচলচিত্ততা কাটিয়ে উঠে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করে। মোট ৮৬টি কবিতা এখানে সংকলিত হয়েছে ; এই সংখ্যাটি ১০০ কিংবা তার বেশিও হতে পারতো ; কিন্তু শ্যামল একটু বেশি খুঁতখুঁতে স্বভাবের এবং প্রতিটা কবিতার রসোত্তীর্ণতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থস্থ করতে তার দ্বিধা। একজন তরুণ কবির কবিতার রূপ-নির্মিতি নিয়ে এত সতর্কতা সচরাচর চোখে পড়ে না। ফলে, প্রথম কাব্যগ্রন্থেই শ্যামলের পরিণতি লক্ষ্য করার মত।

দশকের হিসেবে বিচার করতে গেলে শ্যামল নব্বইয়ের কবি। নব্বইয়ের কবিদের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিশেষণের বহুল ব্যবহার এবং শব্দচিত্র নির্মাণ। ষাটের কবিদের মধ্যে কালীকৃষ্ণ গুহর কবিতাতে বিশেষণ নির্ভরতা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে দেখা যায়। অনেককে অভিযোগ করতে শুনি, নব্বইয়ের কবিরা ছন্দ জানে না, টানা গদ্যে কবিতা লেখেন ; আর যেহেতু পরাবাস্তব কবিতায় বিশ্বাসী তাই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেন না। শ্যামলও কি তাই ? শ্যামলও কি বিশ্বাস করেন নিছক শব্দচর্চা একজন কবির সাধনা ও লক্ষ্য ? মনে হয় তা নয়, কবিতা হচ্ছে বহমান নদীর মত—তাকে নানা বাঁক ঘুরে চলতে হয়। এই চলার পথে কবিকে পুরনো আঙ্গিক ও শব্দ বর্জন ক'রে নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি করতে হয় ; আর এটা হয়, পরিবর্তিত সময়ের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। মালার্মে বলেছিলেন ; 'A poem constitutes not of thoughts but of words'. সুতরাং আজকের নব্বইয়ের কবিতায় চিন্তাবস্তুর অভাব থেকে যদি কেউ শঙ্কিত হন, সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু বিষয়হীন কবিতা হয় নাকি ? কবির কিছু বলার থাকে বলেই তাকে লিখতে হয়। কবি যেহেতু এই সমাজে বাস করেন সুতরাং তার কবিতা এই সমাজেরই স্বপ্নফসল। আর আমাদের এই সমাজ ও সভ্যতায় বর্তমানে

যে ভয়ানক রকম ভাঙচুর, টানাপোড়েন ও টেনশন চলছে নব্বইয়ের কবিরা তাকে অতিক্রম বরতে পারে না। তাছাড়া তিরিশের কবি বা ষাটের কবিদের পূর্বসুরীকে অতিক্রম করার যে বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল, নব্বইয়ের কবিদের সেইরকম কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়নি। ফলে, উদার অর্থনীতির মতো বিশ্বায়নের মুক্তবাজার তাদের কাব্যবোধের সহায়ক হয়ে উঠেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে কবিতার সমাজ নিরপেক্ষ কোনো ভূমিকা নেই ; শ্যামলের কবিতা পাঠের পর এই বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে শ্যামল একটি কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী। ফলে, প্রতিনিয়ত তাকে যেমন সজাগ থাকতে হয়েছে বামপন্থী রাজনীতির দ্বি-চারিতা, আদর্শহীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে, তেমনি ভারতীয় বাজারে বহুজাতিক সংস্থার প্রবেশকে মেনে নিতে পারছেন না। তাছাড়া, ক্যাডারদের নীতিভ্রষ্ঠতা, প্রমোটার রাজনীতি, সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িকতা, আমলাদের শাসন, সোভিয়েট রাশিয়ার পতন ও নানা আন্তর্জাতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার অন্তরজগৎ বারবার আলোড়ি হয়ে উঠতে দেখি। বস্তুত, উচ্ছ্বাসকে এড়িয়ে চিন্তাবস্তুকেই শ্যামল কাব্যের মাধ্যম করে তুলেছেন।

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি 'নদী ঝরিয়েছে ঘাম'। এই কবিতাটি থেকে শ্যামলের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায়। প্রথমত, এই কবিতাটিতে তিনি আবেগহীন শব্দের ব্যবহারে পদ্যগদ্যের সীমারেখা মুছে দিয়েছেন অন্যদিকে উচ্ছ্বাস বর্জন করে কবিতাকে চিন্তাবস্তুর বাহন করে তুলেছেন ; বলেছেন—

অনেক আদিম বিষণ্ণতা নদী তোমাকে ছুঁয়েছে।
অনেক ভেজা কান্না বুকের গভীরে স্থির হয়ে আছে
যদিও হাজার চাঁদ খিলখিল হেসে চলে গেছে।
অসংখ্য পাখির ডানা তিরতির জল ছুঁয়ে গেছে
যদিও যাবার আগে সূর্য সাত রং ঢেলে দিয়ে গেছে
..... ... ... ... ...
তীরবর্তী ঝাউগাছ অনিচ্ছায় নীরব সাক্ষী থেকেছে
তবুও আপন মনে তুমি হেঁটে গেছ মহাজীবনের পথে

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ ব্যবহারে যেভাবে পংক্তিগুলো সাজানো তাতে এক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং 'তবুও আপন মনে তুমি হেঁটে গেছ মহা-

জীবনের পথে' বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি। এখানে আবেগের বশে টেনে ধরা হয়েছে এবং উচ্ছ্বাস নেই বললেই চলে ; সব মিলিয়ে যা আছে তা এক সংহত পরিমিতিবোধের প্রকাশ। কবিতা তার কাছে কোনো প্রেরণাদ্দিষ্ট অনুপ্রেরণা নয়, এক সচেতন মনের সৃষ্টি। অনেক ভেবেচিন্তে, আবেগকে সংহত করে ঋদু ও অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে তার অনুভূতির প্রকাশ ঘটে, যেমন 'বাহারী মলাট' কবিতায়। আগেকার মত এখন এই কবি নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় আর তৃপ্ত নন, তিনি যে রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বাস করছেন তারও অন্যতম সমালোচক। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচার সর্বস্ব, চতুর্দিকে তার মোহময় হাতছানি তাই এই রাষ্ট্রিক কাঠামোকে বাহারি মলাটের সঙ্গে তুলনা করে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য প্রশ্ন করেছেন —

কে তুমি ?  তুমি কে ?  চিত্রময় বাহারী মলাট
প্রচার সর্বস্ব অহঙ্কারে নির্লজ্জ রূপ।
সস্তা স্ফূর্তির অঞ্জনে মাখামাখি চোখ
ক্রীড়ারত সার্কাসের নিরীহ অসুস্থ বাঘ

এখানে কোনো উপমা নেই, চিত্রকল্প নেই ; 'ক্রীড়ারত সার্কাসের নিরীহ অসুস্থ বাঘ' এই পংক্তিটিতে আছে বাঘের দুটো বিশেষণ—

নিরীহ অসুস্থ এই বাঘ সার্কাসের মত রাষ্ট্রব্যবস্থায় অসহায় রূপটাকে প্রতিভাত করে। কিন্তু 'সস্তা স্ফূর্তির অঞ্জনে মাখামাখি চোখ' কীসের প্রতীক ? কবিতাকে যারা সুললিত শব্দের ভাষণ বলে মনে করেন, তাদের কাছে শ্যামলের এই ধরণের কবিতার রস ও অর্থ উপলব্ধি একটু পরিশ্রম সাপেক্ষ। এই অনাড়ম্বর বাক্যগঠন প্রনালী এবং সাংকেতিক ভাষার জন্য তার কবিতা সহজবোধ্য তো নয় বরং, বলা যেতে পারে, দুরূহ এবং কখনও কখনও দুর্বোধ্য। আমার মনে হয়, শ্যামল মনে মনে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শকে যেন বেছে নিয়েছেন। তাই ভাববস্তুর সঙ্গে রূপনির্মিতি এবং প্রকরণ ও প্রকাশ পদ্ধতি তার কবিতায় একাত্ম হয়ে ওঠে।

'এভাবেই' কবিতাটিতেও দেখি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তার মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে রূপকৌশলের সঙ্গে চিন্তাবস্তুকেও মিলিয়ে দিয়েছেন ; এটাই তার কবিতার বৈশিষ্ট্য। হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি, তার বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, মিলনের ঐতিহ্য, পারস্পরিক ভাববিনিময়, ভাষাধর্ম ঐতিহ্যের শুভ পরিণয়, লোকগাথা, লোকাচার, মৈত্রীবন্ধনের সুদীর্ঘ প্রয়াসের কথা এখানে বলা হয়েছে। দীর্ঘকালের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা

করছে 'অতর্কিতে কিছু হানাদার চুপিসাড়ে'। 'ক্ষিপ্র দস্যুতায়' যারা 'ঘুমন্ত ফুলের কু'ড়ি'কে ভাগাভাগি করে নিতে চায় কবি তাদের চিনিয়ে দেন ; অন্ধ পরিবেশের প্রতিকূলতায় তিনি স্বপ্নকে উজ্জীবিত রাখেন এবং বলেন —

পরিক্রমণরত ঋতুরা, রামধনু আসবেই
আবর্তিত সময়ের সরলরেখায়।

এইভাবে বর্তমান রাজনীতিকে নিয়ে ছড়া ( 'বন্‌বন্ ঘুরছে লাটাই / উড়ছে ঘুড়ি নীল আকাশে / রঙবেরঙের শরীর নিয়ে / মাঞ্জা লড়াই জোর বাতাসে' ) ; পুরুষের নারীকে পোষ মানানোর প্রবৃত্তি ( 'আমরা / আহরণে / পূর্ণকাম / পোষ মানানোর সহজাত প্রবৃত্তি / কল্পনার মায়াজাল বিস্তার / সহজেই উপলব্ধি করি' ) ; বামপন্থীদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ( 'বস্তুতঃ কথার তোড়েই ভেসে গেছে সমস্ত সুখের মোচ্ছব' ) ; অশিক্ষিত ক্যাডার ( 'নিরবচ্ছিন্ন কেউ তাকে কোনদিন শেখায়নি প্রকৃত সাঁতার' ) ; মার্ক্সবাদে দীক্ষাগ্রহণ ( 'কলুষিত মন নিয়ে তীর্থে যাওয়া নিতান্ত বারণ / পবিত্র স্নানের মত শুদ্ধ রাখ সমস্ত শরীর' ) ; স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিচর্চা ( 'সেই তখন পাঁজরের শব্দ শুনে ভেঙে যেত ঘুম / বুকের অলিন্দ জুড়ে দাপাদাপি লেগেই থাকত' ) ; বহুজাতিক সংস্থাকে আহ্বান করার আগে কবির সংশয়ান্বিত প্রশ্ন ( 'বাতাসে কিসের শব্দ দ্বিতীয় ভুবনে ?··· ক্ষুধার্ত মলিন বেশ হাড় জিরজিরে / শীতল পানীয় দিও মাদুর বিছিয়ে / অনুপুঙ্খ জেনে নাও কেন এই দশা ?' ) ; বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকে আমেরিকার ভোগবাদের প্রকাশ ( 'কে তুমি বাজাও বাঁশী কদম্বের ডালে ? / পুষ্প শোভিত আহা মনোহর এই রূপ হেরিলে।' ) ; বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে দূষণ মাত্রার বৃদ্ধি ( 'মন্থনের যেটুকু অমৃত, তার সবটাই অমরতা নয় / জল নয় জীবন বিষ বাসুকির দেহ নিসৃত' ) প্রভৃতি কবিতার চুম্বক থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে শ্যামলের কবিতা বিষয় বৈচিত্রে ভরপুর এবং তার জাগ্রত চেতনা স্বকালের সমস্ত স্বভাব ও সংশয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উচ্ছ্বাস ও কল্পনাকে মূর্ত করেছে।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার উত্থানে দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ একদিন সংঘবদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর সেই সংঘবদ্ধতায় চিড় ধরে। অন্য অনেকের মত কবিও আজ হতাশ গ্রস্ত ; একটা আর্তনাদ যেন তার হৃদয় বিদীর্ণ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে —

আমাকে বসিয়ে রেখে সবকিছু বাজি ফেলে
এ কোন লজ্জায় তুমি শেষ হয়ে গেলে ?

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন চলছে, বহুজাতিক কোম্পানী-গুলির পণ্য প্রচারের ঢক্কানিনাদে দেশীয় পণ্য মার খাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ঘাড়ের উপর এসে শ্বাস ফেলছে — তবু আমরা শত্রু চিনতে পারছি না : তাই কবির সংশয়ান্বিত প্রশ্ন — 'নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকারে কে চেনাবে শত্রুর মুখ ?' যে চেনাতে পারতো সেই লেনিন, সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিভূ, ধর্মতলার মোড়ে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার 'নিশ্চল পাথরের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর শোক।'

আদর্শগত ক্ষেত্রে আজ যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উপর যে আঘাত এসে পড়েছে, রাজনৈতিক দিক থেকে বামপন্থীদের আজ যে কোনঠাসা অবস্থা তার জন্য সত্যিই কারো কি অনুতাপ আছে ? কবির প্রশ্ন — 'অন্তস্তলে নেই, কোথাও নেই অনুতম শুদ্ধ পরিতাপ / কেন ? কেন ? কেন ?'

বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলে চাই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, সঠিক নেতৃত্ব ও নীতিগত কৌশল। তাই কবি হতাশ হন না ; মানুষকে উজ্জীবিত করেন, আশায় প্রাণিত করে এবং বলেন —

হৃদয়কে সেঁকে নাও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে
স্থাণুবৎ প্রাজ্ঞকাল শুধু তোমারই অপেক্ষায়।

( অপেক্ষমান )

ইদানীংকালের কবিতায় শ্যামলের মত যুক্তিশুদ্ধ ভাবনার কবিতা খুব একটা পাই না। তবে তার সব কবিতাই যে আমার বোধগম্য হয়েছে তা নয়। তার কবিতার অস্পষ্টতা চিন্তার অস্বচ্ছতা থেকে নয়, চিন্তাবস্তুকে প্রকাশ করার দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের জন্য।

গদ্যছন্দই শ্যামলের কবিস্বভাবের অনুকূল মেনে নিয়েও বলা যায়, 'বাঘে ছুঁলে' ও 'লাটাই' কবিতায় যে ছন্দবৈচিত্র আনার চেষ্টা করেছেন তাতে তার ছন্দজ্ঞানের পরিচায় পাই ; তবে ছন্দ বৈচিত্রের সঙ্গে চিত্রকল্পের ব্যবহার কবিতায় যে অন্য মাত্রা এনে দেয় শ্যামলকে তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

---

নদী ঝরিয়েছে ঘাম ॥ শ্যামল কুমার নাইয়া ॥ অর্কিড প্রকাশনী ॥ কলকাতা—৩৮
দাম—তিরিশ টাকা।

## নরেশ দাশ

### এইমাত্র বাস এলো

এইমাত্র বাস এলো ; বরযাত্রীর মত নামল সবাই
কেউ হাসছে, কেউ গোমড়া ক'রে আছে মুখ
সবাই সবাইকে চেনে ; অথচ অপরিচিতের মত,
টিকটিকির মত পাশাপাশি হাঁটা
ভোরবেলা ছেলেমেয়ের পড়া সেরে
স্কুলের ব্যাগ নিয়ে অফিসে হাজিরা।

হাঁসের মত সাদা মেঘ,
উড়ছে সাদা মেঘ চারপাশে
ধীরে ধীরে কাছে আসছে কাশবন।
এরই পিছনে ছোট ঘরে থাকি বারমাস
আমি বারমাস চিমনীর আড়ালে
বসে, শুয়ে, ঘুমিয়ে কাটাই
আর কবিতা কবিতা করি।

## দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

### এই দিন

এই এক দিন লোকাল ট্রেনের মত ঢুকে যাচ্ছে
আরেকটি দিনের সুড়ঙ্গে।
এইভাবে ছোঁয়া যায় অনন্তে ভূমি !

এই দিনটি কতো উজ্জ্বল ! অথচ অন্ধকার
পদক্ষেপে এলোমেলো।

এই স্রোতে আলো থেকে ঝরে যায় পাপ ;
ফুল থেকে কীট আর রক্তের উত্তাপ।

অলৌকিক ভাবে নয়, এ দিনের নির্জনে বস্তুত
লেখা হয় ক্ষয়ের সংলাপ.....

# অনন্ত দাশ

## ভালোবাসা কখনো মরেনা

তোমার শরীর যেন শো-কেসের সাজানো বাগান !

এত রোগ, এত জ্বালা
তোমার দেহ ও মনে এত ভাঙচুর
প্রতিদিন ঢেউয়ে ঢেউয়ে
তুমি যেন চলে যাচ্ছো দূর থেকে দূর

তোমার হৃদয় যেন
অসংখ্য জটিল এক বাবুইয়ের বাসা
ঝড়ে দোলে, শান্ত হয়
তবু তুমি খেলে যাচ্ছো শকুনির পাশা
ভাবি এই বিপর্যয়
করে দেবে জীবনের সব কিছু ক্ষয়

কপালে অসংখ্য ভাঁজ, জ্যোতিহীন চোখে
কোথা সেই উচ্ছলতা দ্যুতি
দীর্ঘকাল রোগে ভুগে
হারিয়ে ফেলেছ তুমি পুরাতন প্রেমের বিভূতি

আজ কেউ কাছে নেই
সবাই নিজের বৃক্ষে পাক খাচ্ছে
দেখো দূরে খাড়া এক বরফ পাহাড়

একেকদিন মনে হয়
তুলে নিই ঐ হাত পরম আশ্বাসে
বসি তার পাশে, বলি ঃ
জীবনের সব কিছু হয়নিতো ক্ষয়
স্মৃতির উল্লাসে
ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে যদি উঠে যাও ছাতে
এখনও অনেক তারা দেখা যাবে রাতের আকাশে

ভালোবাসা, কখনো মরে না, থাকে চাপা
তুষের আগুনে
অনুকুল হাওয়া দিলে
জ্বলে উঠতে পারে এই বিষণ্ণ ফাল্গুনে —

## মিহির সরকার

### ভুল ছিল

চোদ্দটা স্টিচ্ গালে ও বুকে
কেন হোল ?
ওকে দেখে পাড়ার কুকুর ডেকেছিল
চা কখন হল ?
বেশ রাত আকাশে চাঁদ ছিল ।
বল, তারপর কি হল ?
যা হয়, পাড়ার মানুষজন চোর ধরল
ও চোর নয় তবু পেটানি খেল ।

কুকুরগুলো তাহলে ভুল ছিল ?
তাই হবে, তবে মজার ব্যাপার
এখন দেখছি না তাদের
কোথায় গেল !

## তারক চট্টোপাধ্যায়

### পোষাক খুলে

খিদের, নিশ্চিন্ততা বিক্রি হচ্ছে
কলকাতাকে গ্রাস করছে

পোষাক খুলে সার সার দাঁড়িয়ে, খিদে

## শিউলি গুহ

### দুটি কবিতা

১

সমুদ্র গভীর থেকে
তুলে ফেলি বর্ণিল ঝিনুক
হৃদয় বিক্ষত করে নিত্যদিন
স্মৃতির চাবুক ।

২

আরশি-জলে ধোওয়া পা
সবুজ গালিচায় মুছতে মুছতে ভাবি
আর কতদিন থাকবে এই গালিচা !
এই নদীও কি থাকবে ?

বুকের গভীরে থেকে যাবে
ভালোবাসার নদী ।

## গণেশ ভট্টাচার্য

### জেনারেশন গ্যাপ

মায়ের মুখের আদল মেয়ের মুখেও
ভাল লাগল দেখে
মায়ের বয়সটাকে মেয়ের বয়সে নিয়ে আসি
মেয়ের বয়সটাকে মায়ের বয়সে পৌঁছে দিলাম

তবু কেন
মায়ের মুখের কথা
মেয়ের কথার সাথে মিলছে না
কোথাও পরিস্কার ফাঁক রয়ে গ্যাছে !

CENTRAL LIBRARY



# শুকুলের রোচনামচা অথবা

# বিপ্লব এবং লিবিডো

## শুকুল উপাধ্যায়

পাশের বাড়ীটা বিক্রি হয়ে গেলো। বাড়ীর মালিক একদিনের জন্যও তার নিজ হাতে গড়া বাড়ীতে থাকেন নি। যারা এলেন/এলো.. স্বামী স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যা, আট ও পাঁচ বছরের, কারমেলের ছাত্রী। মা পৌঁছে দেয়। বেশ একটু আপাত চাকচিক্য সকলের মধ্যেই। আমাকে মহিলা একটু বেশী আপ্লুত করলেন। ব্রাহ্মপরিবারের কন্যা। গায়ের রং অত্যন্ত উজ্জ্বল। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী। মহিলা নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য এবং ব্যক্তিত্যের ব্যাপারে খুবই সচেতন।

দম্পতী এসেছিলেন। কেমন এলাকা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। বসলেন খুব কাছটিতেই। কোন এ্যালার্জী ছিল না। প্রশ্নোত্তরের পর্ব শেষ হতে মহিলার কথা — 'আপনারা তো রয়েছেনই। আপনাদের কথা শুনেছি অনেক।' এত' শিক্ষিত পরিবার' — ইত্যাদি। আমার স্ত্রী যথেষ্ট সৌজন্যর পরিচয় দিলেন। চা-বিস্কুট এলো। শাদা তাঁতের শাড়ীতে মহিলাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র লাগছিল। আমার কল্পনায় নারীর যে একটা প্রতীকী রূপ রয়েছে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ওর মধ্য দিয়ে। আমার বিদুষী স্ত্রী যেন আলো ফেলে ওকে মাপ ছিলেন। বিদায় নেবার সময় — 'আবার আসবেন!' আমার স্ত্রীর অনুরোধে মহিলার জবাব — এসেই তো আছি। কর্পোরেশনের চার চার আট ফুটের ফারাক তো মোটে।

'তবুও এটা বলতে হয় — কাউকে কাউকে অপছন্দ হলেও।'

'আমি কিছু অপছন্দ হলেই মুখের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিই।'

'না ভাই ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকি সবসময়।' ইত্যাদি সংলাপে বিদায় পর্ব।

ধীরে ধীরে চিলে কোঠায় চলে যাই। ওটা আমার স্টাডি রুম। এবং মুক্তির জায়গা। আমার স্ত্রী সংগীতা যতটা ভদ্রতার পরিচয় দিল এবং আমার প্রতি যতটা আন্তরিক অন্যের সামনে, ততটাই বিপরীত আড়ালে।

আজকাল মাঝেমাঝেই নষ্টালজিয়া পেয়ে বসে। সাতষট্টির ঝড় বাহাত্তরে যেন একেবারে থেমে গেছে। যদিও আমি কখনো বিভ্রান্ত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। পার্কসার্কাসের এক সরু গলিতে আমার দোতলার ঘর। ঘর একটাই —তবে খুবই বড়। মানুষ আমরা আড়াইজন। আমার স্ত্রী এবং আমার তিন বছরের কন্যা। স্ত্রী সঙ্গীতজ্ঞা এবং বিদুষী। না, সুন্দরী নয়। গানটা অসাধারণ গায়। কমরেডরা আসতো। দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় রাত্রে। রাত্রির যে কোন প্রহরে। গোপন সভা। এবং অবশ্যই গোপন আশ্রয় — সেন্টার। আমার বাসা মোটামুটি নিরাপদ সেন্টার ছিল। আমার স্ত্রীর আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি ছিল না। দোতলায় উঠছি, শুনছি অসাধারণ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ। 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালে'। কি খোলামেলাই না ওর কণ্ঠস্বর। কি উঁচু পর্দাতেই তা বাঁধা। ঘরে ঢুকে দেখি জনাচারেক শ্রোতা। পরিচয় করতে শুধু কমরেড ছাড়া আর কোন পরিচয় জানার নিয়ম ছিল না। আমার স্ত্রী আমাকে এক পলক দেখে ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা টেনে গেয়েই চলে। গান শেষে সেজদা অনুরোধ করে আবার গাইতে। "আপনাদের খাবার করে আনি"। সংগীতা মৃদু প্রতিবাদে উঠে যায়। নতুন আসা কমরেডদের তখনো ঘোর কাটেনি। শুধুমাত্র একজন গৃহবধূ যে এমন গাইতে পারে ওদের ভাবনায় ছিল না। "প্রতিভার অপচয় আমাদের দেশে এমন করেই হয়" সমীর বলছিল। আমার মনে হলো এটা কমরেডদের একটা 'ক্লিশে' হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে পড়ছিল সংগীতাকে বিয়ে করার আগে ও পরের কথা এবং আমাদের প্রথম দিককার দাম্পত্য জীবনের নানা উত্থান পতনের কথা।

মহারাষ্ট্রের ছোট মাইন টাউন। সংগীতা ওর দাদার সাথে বেড়াতে এসেছে। আমরা ওই মাইন টাউনেই আছি। কোম্পানীর বাংলোয় — ওদের অতিথিশালায়। একটু রোগাটে গালভাঙ্গা টিকালো নাক বুদ্ধিদীপ্ত ইতিহাসের এম এ, সুন্দরী বলা যায় না। কথা বলতে কোন আকর্ষণ বোধ করিনি ওর প্রতি। সময়ের রাজনীতি বা সাহিত্য নিয়ে কোন জ্ঞান-গর্ম্যির পরিচয় পাই নি। ক্রীকরো'র ফাংশনে কোন কোন শিল্পীকে সে দেখেছে বেশ আবেগের সঙ্গেই সে জানায়। খুবই কাছ থেকে যে উত্তমকুমারকে দেখেছে — এটাও তার অহঙ্কার। তখন 'নীল আকাশের নীচে'র কালী ব্যানার্জী আমাদের কাছে অনেক বড় অভিনেতা। এই ছোট শহরে কোন ইলেকট্রিসিটি নেই। প্রায়ই আমরা বাংলোর উঠোনে সন্ধ্যেবেলা স্নান করে বসতাম। আধো অন্ধকার। ভয়ানক রুক্ষতা চারিদিকে। কিন্তু বাংলোগুলো ছোট ছোট

সবুজের 'প্যাচ'। খাদানের শ্রমিকদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ম ম করা ফুলের গন্ধের বাংলো। কিছুটা কথাবার্তার পর প্রায় সবাই চুপচাপ। মাঝে মধ্যে সংগীতাও এসে বসে। বাংলোর ভেতরে আগুনের হল্কা। সংগীতা বেশ গম্ভীর হলেও যথেষ্ট ছেলেমানুষী আছে। রেংগী করে ম্যানেজার, এ্যাকাউন্টটেন্টের মেয়েদের সাথে অতি নড়বড়ে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যায়। রেংগী এক ধরনের অতি ছোট গরুর গাড়ী। রাস্তা অত্যন্ত ভয়াবহ। তবু ওদের মাঝে মধ্যেই যাওয়া চাই। কখনো দেখি দূর থেকে সংগীতা শাড়ী পাছ কোমরে বেঁধে কুহু, রঞ্জাদের সাথে চোর পুলিশ খেলছে। মজা দেখার জন্যই কিছুটা এগিয়ে যাই। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে খেলা দেখতে থাকি।

'খেলবেন ?' সংগীতা জিজ্ঞাসা করে।

'ছুটতে পারি না যে।'

ও কিছু হবে না। আপনাকে ছাড় দেবো। আমাদের আবার বনু আসে নি আজ।

আমি রেফারি, কেউ জোচ্চুরি করতে পারবে না।

দু তিন মানুষ সমান উঁচু পাথরের গা ঘেঁসে ওরা ছোটে। ওঠা যায় তরতরিয়ে ন্যাড়া পাথরের ওপর। খুবই উপভোগ করছিলাম এই লুকোচুরি।

একটু পরেই সন্ধ্যা নামে। রাস্তা প্রায় অন্ধকার। কোম্পানী অফিসের সামনে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। তার সামান্য আভা আসছে। বাচ্চারা যে যার বাংলোয় ঢুকে যায়। ঢুকতে আর হয় না — সবার বাবা মা খাটিয়া পেতে বাইরে। ছোট্ট লনে জল ঢেলে ঠাণ্ডা করার চেষ্ট হয়েছে। সংগীতার দাদার বাংলোটা আগে, আমারটা আরও কিছুটা এগিয়ে। সংগীতার সাথে ওদের বাংলোর দরজা অবধি আসতে সংগীতা বলে 'আসবেন ?' ওর দাদা তখন আরাম চেয়ারে শুয়ে ধূমপান করছেন। একের পর এক রিং ছেড়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন—আসুন মিঃ উপাধ্যায়। কথা আছে। মিঃ প্রসাদ ও সুব্বা রাও বসেই ছিলেন। আমি একটা খালি চেয়ার দেখে বসে পড়ি। একটু পরে দেখি সংগীতাও স্নান করে এসে বসে। এই অতি রুক্ষ পরিবেশে এমন সবুজের স্নিগ্ধ সমারোহ কেমন এক আবেশ ছড়ায়। এর মধ্যেও এই সবুজ নির্মাণের মধ্যেও যে কুলি তথা শ্রমিক শোষণ রয়েছে মূহুর্তে ভুলে যাই। মিঃ রায় দু চারটে অফিসিয়াল নির্দেশ দিলেন। তারপর হঠাৎই সংগীতার দিকে ফিরে বললেন 'সঙ্গু একটা গান কর তো।' প্রায়ান্ধকার লন্। লু-টা একটু কমে এসেছে। গরম তখনও

কমে নি। সংগীতা বসার ভঙ্গীটি পাল্টে নেয়। চেয়ারে পা তুলে বসে। হাতখানা মুখের কাছে নিয়ে মুখ যেন ঢেকে রাখে। কোন আড়ষ্টতা নেই। অতুলপ্রসাদের গান সংগীতার গলায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। বঁধুয়া নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।' মহারাষ্ট্রের রুক্ষ মাটি যেন সিঞ্চিত হয়। বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠি। কি কণ্ঠ! কি উঁচুতে গলা। আমার ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে ওকে প্রণাম করি। সমগ্র বাংলো সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে। এরপর থেকে গভীর শ্রদ্ধায় দেখতে থাকি। ওদের বাংলোর কাছে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াই। লক্ষ্য করতুম ও সারাদিনই গান করে। টেবিলের ওপর রেডিও। বিবিধ ভারতী নয়তো রেডিও সিলোন সারাদিনই চলে। গলা মেলায় গানের সাথে। পরে জানতে পারি সংগীতা অনেকের কাছেই তালিম নিয়েছে। আজও নিচ্ছে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ছাত্রী সংগীতা।

দ্রুত পট পরিবর্তন হয়। আমার প্রতি সংগীতার দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলাম আগেই। সেদিন বিকেলে হাঁটছিলাম। হাঁটতে আমার কখনো ভাল লাগে না। এত রুক্ষ চারদিক। ছোট বড় শুধুই পাহাড়। নিষ্পত্র। বিরাট বিরাট পাথর যেন ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। একেবারেই সরু রাস্তা। পীচ রাস্তা নয়। পাথরের নুড়ি ছড়ানো। অনেক সময়ই পা হড়কে পড়ে যাই। ধরার কোন অবলম্বন নেই। দূর থেকে দেখেছি সংগীতাও পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। ছড়ে গেছে হাতের চেটো। আগ বাড়িয়ে সহানুভূতি দেখাতে যাই নি। বয়স অনুপাতে একটু গম্ভীরই। খুব খিল খিল করে হাসতে দেখিনি ওকে। সন্ধ্যা নামছে। একমাত্র গাছ — বাবলা গাছ — কাঁটায় ভরা। কেমন যেন রাগী রাগী চেহারা। খুবই সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে সংগীতাদের বাংলোর কাছে চলে আসি। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে পাথর থেকে। খেলা শেষ করে সংগীতা নিজেদের বাংলোর পথে পা বাড়িয়েছে। আমি একটু দ্রুত হেঁটে ওকে ধরে ফেলি। সংগীতা তখনো হাঁপাচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর বুক ওঠা নামা করছে। অনেক জল ছিটিয়ে ওদের বাংলোর উঠোনটা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা হয় প্রতিদিন। আমাকে দেখে বলে— 'আপনি এদিকে? কি মনে করে? দাদা তো নেই।'

জানি দাদা নেই। নাগপুর গেছেন। এই হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। আর তোমাকে অভিনন্দন জানাতেও।

'গানের জন্য? ও শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে — আর কোন মধুবর্ষণ করে না।'

আমাকে তুমি মুহূর্তে পাল্টে দিয়েছো। আজ তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

বেশ করেন — ভেতরে আসবেন ?

ততক্ষণে বাংলোর গেটের কাছে আমরা। ও দরজা খুলে ঢুকে পড়ে দাঁড়ায়। একজন চৌকিদার হারিকেন নিয়ে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে রেখে দিয়ে চলে যায়।

বাংলোতে ও একা। ওর দাদা নেই। ভাল করেই জানে আমি যাবো না। তবু খেজুরে অনুরোধ।

আমি হঠাৎ বলে ফেলি "তুমি কেমন করে গান কর হে শুনি…" শোন আমার রবীন্দ্রনাথের পুরো রচনাবলী আছে। পড়ে ফেল যতটা পার — আরও তো একমাস আছ ?

'এখনই যাই আপনার সাথে — ?'

'না রাত হয়েছে — কাল ফিল্ড থেকে ফেরার পর এসো. আমি চলি এখন।

সেদিন শেষ বিকেলে সংগীতা এসেছে। বিছানায় শুয়ে মাও সে তুং-এর Talks on Yeman Forum পড়ছিলাম। ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু ভাবনা মাথায় ঘুরছিল। ওর দাদা, আমার 'বস' ভাবতেই পারেন না তার বোন একজন সাধারণ অধীনস্থ কর্মচারীর সাথে প্রেমে পড়বে। বোনের ওপর তার অগাধ আস্থা। ফ্রী এ্যাকসেস দিয়েই রেখেছে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার কোয়ার্টারে যে আগেও সংগীতা এসেছে ঘরে ঢুকেই তা আমি টের পাই। বিছানাটা টানটান। বইগুলো এলোমেলো নেই — টেবিলে সাজানো। খারাপ লাগে না — আবার রাগও হয় আমার বইতে কেউ হাত দিলে আমি সইতে পারি না। মাঝে মধ্যে আবার দেখি টেবিলের ওপর এক একদিন এক এক রকমের ফুল। বিশেষ করে বেল ফুল আর চাঁপা। একটা প্লেটের মধ্যে রাখা।

এসেই চেয়ারে না বসে খাটের পাশে বসে। বলে — রাতদিন এত কি পড়েন বলুন তো ? সবসময় দেখি বই-এ মুখ গুঁজে পড়ে আছেন ?

'পড়তে ভাল লাগে — তোমাদের মতো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাই নি তো — তাই একটু শিক্ষিত হবার চেষ্টা করছি।'

'বড় জড়িয়ে পেচিয়ে কথা বলেন — আমাদের মতো কথা বলতে পারেন না ?'

'তাই তো বলি।'

'মোটেই নয় — কেমন যেন বই-এর ভাষা।'

'একটা গান শোনাবে ?' একটু থেমে থেকে সংগীতা গায় — 'গোধূলী গগনে মেঘ ঢেকে ছিল তারা।' আমি ওকে দেখতে থাকি। শুধুমাত্র গানেই কি একটি মেয়ের প্রেমে পড়া যায় ? জানি না। তবে ওর গান শুনলেই আমার শরীরের মধ্যে কেমন করে। গান করতে করতেই ও আমার একটা হাত হাতের মধ্যে নিয়ে নেয়। আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করতে থাকে। গান শেষ হলে বলে — কি বেঁটে বেঁটে আঙ্গুল আপনার। রবীন্দ্র রচনাবলীর তিনটে খণ্ড ওর হাতে তুলে দিই। তার মধ্যে. গীতবিতানও রয়েছে। বইগুলো হাতে নিয়ে একটু স্থির হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎই টেবিলের ওপর বই রেখে। কাছে এগিয়ে এসে অতি উষ্ণ চুম্বন করে। দীর্ঘ সময় যেন। অসংকোচেই ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম বটেই। ক্যাম্প গোটানোর সময় কাছেই। বন্দরের কাজ হলো শেষ। সংগীতার ব্যবহারে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। দেখা হয় প্রায় প্রতিদিনই। শুধু ওর দাদার সামনে যেন একটু 'এয়ার' নিয়ে কথা বলে।

এদিকে ওর উষ্ণ স্পর্শের পর থেকেই আমার আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে চাইছিল। স্নিগ্ধ হাতে সংগীতা বেঁধে রাখে আমাকে। কলেজ ইউনি-ভার্সিটির নানা গল্প শোনায়। যার মধ্যে অনেক ছেলেমানুষী আছে। খোলা চুলে কলেজে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজী পড়াতেন জনৈক অধ্যাপিকা। ডাকসাইটে সুন্দরী। অক্সফোর্ডের ডিগ্রী ছিল — কিন্তু পড়াতে পারতেন না। কলকাতার অত্যন্ত বনেদি পরিবার থেকে এসেছিলেন। এত সুন্দরী তবু নাকি ডিভোর্সি। ওর ক্লাশে পেছনের বেঞ্চিতে বসে কাটাকুটি খেলতো ওরা। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন জনৈক প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালির উত্তরপুরুষ। তাঁর ক্লাশ করা ছিল অসাধারণ অভিজ্ঞতা। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছাত্রীরা তার ক্লাশ করতো। দেখবার মতো তাঁর চেহারা — তেমনই কণ্ঠস্বর। ওদেরই এক সহপাঠির প্রেমে পড়লেন তিনি। অতি সাধারণ পারিবারিক পরিচয়ে, লেখাপড়ায়, এমন কি রূপেও। তিনি এক সন্তানের জনক — তার স্ত্রীকেও ভালবেসেই বিবাহ করেছিলেন। ঘটনা জানার পর আত্মহত্যা করেন প্রথম স্ত্রী। কালিমালিপ্ত হয় তাঁর সব অসাধারণত্ব। মুহূর্তে ওরা তাঁকে শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে দেয়। এই কাহিনী বলার সময় সংগীতা কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক কথা বলতে পারে না। "স্যারটা এমন করলো

কেন ? আমরা যে খুবই ভালবাসতাম। করিডোরে দূর থেকে ভঙ্গিতে দূরে সরে দাঁড়াতাম। ভারি সুন্দর করে হাসতেন" বলতে বলতে সংগীতার যেন চোখে জল এসে যায়।

এইসব নানা কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের ক্যাম্প গোটাতে নির্দেশ এসে গেল। পরদিন ওরা কলকাতা, আমি হায়দ্রাবাদ — এমনই ঠিক হয়েছিল। ট্রেনে ওঠার আগের দিন বিকেলবেলা হাঁটছিলাম। সঙ্গে সংগীতা একটু এগোলেই বস্তী শেষ। সরু রাস্তা। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ দুদিকে। অনেকটা এগিয়ে এসেছি। সংগীতার দাদা ভাবতেও পারে নি তার এম. এ পরীক্ষা দেয়া বোন প্রেম করবে তারই অধীনস্থ এক করণিকের সাথে। তাই অনেক সন্ধ্যেতেই হাঁটতে দেন বোনের প্রতি গভীর আস্থায়। সন্ধ্যার শঙ্খ শুনতে শুনতে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। বস্তী ছাড়িয়ে পথের দুপাশ বড়ই নোংরা। রাস্তার দুপাশেই ওরা প্রাকৃতিক কাজকর্ম করে। অনেকটা পথ দম বন্ধ করে পেরোতে হল। তারপর খোলামেলা। দুপাশে 'বেশরম' গাছ। বেশরম একধরনের গাছ — যতই কাট না কেন লজ্জাহীনের মত বেড়ে যায়। বেশরম নামটি বেশ। লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। সংগীতা গুনগুন করে গাইছে — 'তুমি তো সেই যাবেই চলে।' কাঠকুঠো মাথায় নিয়ে মেয়েরা ফিরছে। প্রকৃতির মধ্যেও বিষণ্ণতা। সন্ধ্যা নেমেছে। প্রায় অন্ধকার। গান শেষ হলে বলে, চল ফেরা যাক্। একটা বিশাল পাথরে ঠেস দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

'কাল চলে যাবে ?' আমার প্রশ্ন

'না, — তুমিও কলকাতা চল কদিন থেকে হায়দ্রাবাদ ফিরবে। চল বাংলোয় ফেরা যাক্।'

হঠাৎই আমার হাত ধরে। মুখোমুখি হয়ে চুম্বন করে। একবার, দুবার তিনবার। আমার মুখে জড়িয়ে যাওয়া লালা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে যায়। আমি বাধা দিই। উত্তাপ ছড়ায় আমার শরীরে। ওর কানে গলায় ঘাড়ে ঠোঁটে প্রবলভাবে মুখ ঘসি। শব্দহীন সেই অন্ধকার পথে দুটি মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষার কোলাহল। ওর বুকেও হাত রাখি। আজ আর ও হাত সরিয়ে দেয় না। হাত রাখতে দেয়, খেলা করতে দেয়। এ আমি কি করলাম শুকুল ! তুমি আমায় এমন করলে কেন ? আমি মুখ দেখাবো কেমন করে ? কার সাথে আমার সম্পর্ক হলো ?' কি পরিচয় ? সবাই বলবে পচা শামুকে তোর পা কাটলো ?' খুবই অভিমান হয় আমার। বলি বেশি কেটে গেলে স্টিচ

করিয়ে নাও — কম কেটে গেলে এ্যান্টিসেপটিক লাগালেই হবে।

'আমি কি সে কথা বলেছি ? আমারই তো দোষ। সেই প্রথমদিনই তোমাকে দেখে কি যে হলো না — কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যেন তোমাকেই খুঁজেছি, পাই নি।' বহুদূরে রাস্তাটা যেখানে অনেক উঁচু দুটো হেডলাইট দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম ওর দাদার জীপ। এখনো পৌঁছতে অনেক সময় নেবে। ওকে বলি — চল ফিরি। দ্রুত যে যার বাংলোয় ঢুকে পড়ি।

ছুটি নিয়ে কলকাতায়, সংগীতার সহযাত্রী হয়ে, পার্কসার্কাস ময়দানে দেখা করার appointment করি। কামালদা, আমার বন্ধু, আমার থেকে অনেক বড়, বয়সে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন। আমার সঙ্গে ময়দানে সংগীতার মুখোমুখি। চীনাবাদামের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে অনেক কথাই হচ্ছিল। কামালদা বলছিলেন, আমার এই বন্ধুটি ন্যালা ক্ষ্যাপা গোছের — জানো তুমি ? ওর মা বালবিধবা, মার ওপর চোখ তুলে কথা কইতে পারে না। ওকে তুমি বিয়ে করবে ? কামালদার কথার উত্তর না দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে — ওকে আরও কদিন থাকতে বলুন — ও হায়দ্রাবাদ চলে গেলে কি হবে ?

ছুটি বাড়ানো সম্ভব ছিল না। চলে আসি আমার হেড অফিসে। সংগীতার সাড়া শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। কথা ছিল ও কোন ঠিকানা দিয়ে চিঠি দেবে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অস্থির হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ে বেড়াই। রোজ ডাক দেখতে পোস্ট অফিসে যাই। বৃথাই প্রতীক্ষা। বিকেলবেলা রোজই হোসেন সাগরের পাশে বসে থাকি। বিকেল থেকে প্রায় রাত পর্যন্ত। হোসেন সাগর—আমার মনে হোতো মিলন সেতু। এপারে হায়দ্রাবাদ ওপারে সেকেন্দ্রাবাদ। বিশাল জলাশয়। স্বপ্ন দেখতাম হোসেন সাগরের পাশে বসে কাবাব আর আইসক্রীম খাবো, সংগীতাকে পাশে নিয়ে। গান শুনবো সংগীতার। ছোট ছোট শান্ত ঢেউগুলোকে খুব বন্ধু বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে ডব্‌ল ডেকার বাসগুলো চলে যায়। মনে হয় পৃথিবীটা যেন একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে এখানে। সহকর্মীদের সাহচর্যও সহ্য হয় না। ভাল না লাগা গভীর বেদনায় ছট্‌ফট্ করি। সংগীতা এ তুমি আমার কি করলে ! তুমিই তো আমায় সিডিউস্ করেছো। আজ এ কি ব্যবহার !

কি করে ভুলি ডাকবাংলোতে তুমি আমার টেবিলে বিছানায় সবার আড়ালে এসে কখন বেল ফুল ছড়িয়ে দিতে। নতুন প্রবন্ধের বিষয় ভাবতে

হয়. জানালার পাশে দাঁড়িয়ে—পেছন থেকে এসে হঠাৎ ঘনিষ্টভাবে চোখ চেপে ধরতো। আমাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে গভীর অক্লেষে চুম্বন। ঠোঁট দুটি দিয়ে আমাকে যেন শুষে নিতে। কথা নয় চুপ। বসে পড়তো খাটের পাশে. বসিয়ে দিতে আমাকেও — কি আদরই না তুমি নিতে পারো!

মাঝে মধ্যে শনিবারের সন্ধ্যেয় পার্টি হ'তো। কোল মাইনের ম্যানেজার মিঃ পাঠক ওর দাদার বন্ধু। নিজেই জীপ চালিয়ে ওর বোনকে নিয়ে মাঝে মাঝে যায়। আমি ওদের সাথী হই না। কেমন হীনমন্যতায় ভুগতে থাকি। কিন্তু মিঃ পাঠক গাড়ী পাঠিয়ে ঠিক নিয়ে যাবেন। আমি ঢুকতেই সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। এই মার্কসিস্ট এ্যানালিস্ট এসে গেছে। আজকে কচ্‌কচি নয় — শায়রী আর শুরা। বলেই মিঃ পাঠকের অট্টহাসি। আসলে কিছুদিন আগে Nagpur Times-এ এখানকার Mins গুলোতে টাকা পয়সার যে নয়-ছয় হয় লেবাররেরা যে কি পরিমাণ বঞ্চনার শিকার তার ডিটেল রিপোর্টিং করেছিলাম। তিন কিস্তিতে। কদিন ছুটি নিয়ে survey করেছি। বেশ হৈ চৈ পড়ে যায় লেখাটা নিয়ে। এরাও একটু নড়ে চড়ে বসে। সেই থেকেই মার্কসিস্ট এ্যানালিস্ট বলা শুরু। আমার অবশ্য ভালই লাগে — যতই ওদের ঠাট্টার সুর থাকুক না কেন।

সেদিনও আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। পানাহার চলছে। বিলিতী শেষে মহুয়া। শেষ পাতে মহুয়া না হলে অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। মহিলামহল ভেতরের ঘরে. সংগীতা সেখানে। হঠাৎ সকলেই প্রায় চুপ করে যায়। হিন্দী ফিল্মের গান গাইছে সংগীতা পাশের ঘরে। পুরোনো গান — হরিয়ালী আউর রাস্তা। গঙ্গা যমুনার সোখান জোড়া। নজর লাগে···। কোন গান মন ভারাক্রান্ত করে। কোনটা বা খুবই চটুল। ! অথচ ও একই ভাবে; আমি মনে মনে দেখতে পাচ্ছি, চেয়ারে পা তুলে গুটিশুটি মেরে হাতখানা দিয়ে মুখ ঢেকে গেয়ে চলেছে। রামা রাও অনভ্যাসে হয়ত একটু বেশি পান করেছিল। হঠাৎ উঠে গিয়ে, কেউ বাধা দেবার আগেই, বহিন জী তুমি থেমো না — গেয়ে যাও পাখির ডাকে থামবে। ওকে আবার ধরে এনে বসানো হয়। গ্লাস খালি আর ভর্তি হয়ে চলেছে। খাবারও প্রচুর। মিঃ মিশ্র মাঝে মাঝেই শায়রী শোনাচ্ছেন। আমাকেও দু চারটে বলতে হ'লো। ফেরার পথে কিন্তু সবাই প্রায় চুপ। সেই উত্তেজনা আর নেই। মিঃ রায় স্বয়ং স্টিয়ারিং-এ। পাশে তার বোন। পেছনে আমি আর মিঃ রাও। নিস্তব্ধ রাত্রিতে গাড়ী চলেছে। ঘন অন্ধকার। জীপের হেড লাইট ছাড়া কোন আলো নেই। দু পাশে

বিশাল বিশাল গাছ। গাছের সাথে কোনদিনই আমার মিতালী হয় নি। মনে হয় এই বুঝি বিশাল দৈত্যের চেহারা নিয়ে আক্রমণ করবে। কখনো ছায়ায় বসার উপায় নেই। লাল পিঁপড়ে কামড়ে শেষ করে দেবে। জীপ চলছে পাতার মড়মড় শব্দ। 'শনিবারের এই হুল্লোড়ে কেন আসিস্ বল তো দাদা' হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙ্গে সংগীতার প্রশ্ন। "সবাই এমন গায়ে পড়া — ভাবলেই কেমন বিচ্ছিরী লাগে।" সংগীতা কথাগুলো কেটে কেটে বলে। দাদার সাথে কথা বলাতেও ওর একটা দৃঢ়তা রয়েছে। 'সত্যিই কোন মানে হয় না' — 'প্রতিবারই বলিস্ আবার শনিবার এলেই কেমন ছট্‌ফট্ করতে থাকিস্।' 'তুই উল্টোপাল্টা খাস নি তো?' 'ওই অল্প একটু'। 'শুকুলবাবু — আপনি? ঘাড় ঘুরিয়ে সংগীতা আমাকে প্রশ্ন করে। ভয় নেই একটুও। দাদার সামনে কেমন দূরত্ব রেখে গাম্ভীর্যের সাথে প্রশ্ন করে আমাকে। প্রশ্নের মধ্যে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। মনেই হয় না আমার সঙ্গে গল্প করার সময় — ওযে অমন লতানো গাছের মতো। সেই চেহারা দেখতেই আমি অভ্যস্ত। আর এখন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে একবার দাদাকে একবার আমাকে দেখছে। সংগীতার এই রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। ওর দাদা মানে রায় সাহেবও কেমন কুঁকড়ে যায় বোনের সামনে। পরে জানতে পারি রায় সাহেবের বাড়ীতে সংগীতার ভূমিকা অনেকটা অভিভাবকের মতো। সেখানে সে নিপুণ হাতে প্রায় সবকিছু সামলায়। ...তাই ভাবছিলাম তবে কি সংসারের দায় নিয়ে আমার দায় থেকে মুক্ত হ'লো?

'টপাটপ পরীক্ষাগুলো দিয়ে দাও তো। লোকে কি বলবে — একটা ম্যাট্রিকুলেটের সঙ্গে বিয়ে বসলি তুই?' সংগীতা একদিন বলেছিল।

আদৌ ইচ্ছে ছিল না আবার এ্যাকাডেমিক পড়াশুনো করি। আবার বইগুলো ঝেড়ে পুছে বার করি। কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা তাড়া করে বেড়ায়। সংগীতাকেই আমি প্রথম আদর করি। নারী শরীর সম্পর্কে আমার তীব্র কৌতূহল ছিল না। চাকরী — আড্ডা — বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অল্প সল্প লেখালেখি — এই নিয়ে বেশ ছিলাম। লেখালেখিটাই, ছাইভস্ম লিখলেও, অব্‌সেসন ছিল। তৈরী হয় নি নারী শরীর সম্পর্কে কৌতূহল সংগীতার সাথে পরিচয়ের পরও। হয়ত খুব সুন্দরী নয় বলেই কি? তবে খুবই প্রাণোচ্ছল এবং উজ্জ্বল বুদ্ধির ছাপ ওর আচরণে কথায় — প্রগল্‌ভতাহীন স্বাভাবিক কথার চাল ওর। আর ওর গান? ওর গানই আমাকে আকৃষ্ট করে। গানের মধ্য দিয়ে ও আমার সম্মান আদায় করে নেয়। সম্মানই — তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু

কি তীব্রভাবেই না ও আমাকে জড়িয়ে ফেলে ধীরে ধীরে। থাঁ থাঁ দুপুর প্রবল রোদ্দুরে কখনো চলে আসে আমার বাংলোয়। গভীর আশ্লেষে চুম্বনে সারা মুখে লালা ছড়িয়ে দিয়ে আবার নরম হাতে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েই — দু হাতে মুখটাকে চেপে ধরে বুকে — 'তুমি কি সুন্দর ছেলেমানুষ শুকুল !' যেমন হঠাৎই এসেছিল তেমন হঠাৎ চলে যায়। বাইরে লু বইছে। দুপুরের রোদ্দুরের সাথে ওকে মিলিয়ে দেখতে বেশ লাগছিল।

হোসেন সাগরের পারে বসে ভাবছি এইসব। ধীরে ধীরে উঠে পড়ি। একটা না-ভীড় ডবলডেকার বাসে মোসাব ট্যাঙ্ক। নিজের ডেরায়। এসে দেখি দুখানা চিঠি। একখানা কামাল হায়দ্রাবাদের আর একখানা — হুঁ। — সংগীতার। দু'জনেরই এক প্রশ্ন কবে আসবে ? সংগীতা যে এতদিন চুপ-করে ছিল তার কোন কৈফিয়েত নেই। শুধু অনুরোধ কবে আসবে ? B T. Class-এ ভর্তি হতে গিয়ে দু'জনের সাক্ষাৎ এবং কামালদাকে দেখেই না কি সংগীতা আবার উদ্বেল হয়ে ওঠে। কামালদা'র সাথে ক্লাশের পর বাঁলগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মিণ্টো পার্কে বসে। অনেক গল্প হয়। অবশেষে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সংগীতা। বলে — আপনার বন্ধুকে এনে দিন — আপনার বন্ধুকে এনে দিন।

কামাল দা — ভারী সুন্দর করে সবকিছু লিখে চিঠি শেষ করে 'বন্ধুকে আর কত মূল্য দিতে হবে ?'

কোনদিনই নিজের মেরুদণ্ডে আস্থা নেই। সিদ্ধান্ত নিতে পারি না কোনদিনই। সহকর্মী বন্ধুদের হাতে চিঠি তুলে দিই। আর ফিরে না তাকানোর সিদ্ধান্ত খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। আমি কলকাতার পথে।

ততক্ষণে চটক ভাঙ্গে। সত্তরের শেষ। আমরা যে যার মত মুক্তির যুদ্ধে নেমে পড়েছি। সেজদা বলে শুকুল এবার তোমার লেখাটা দারুণ হয়েছে। ভাবছি Reprint করে প্রচার করবো। মনটা ভ'রে গেলো। সেজদা মুখোমুখি কারও খুব একটা প্রশংসা করেন না। এমন সময় ঘরে আরও দু'জন কমরেড এলেন। একজন আমার কামালদা। আমার প্রাকবিবাহ যুগের. যাদের সঙ্গে সম্পর্ক আজও অটুট কামালদা তাদেরই একজন। তার বিশাল চেহারার মধ্যে ভারী সুন্দর দুটি নরম চোখ বড়ই মমতা মাখানো। সংগীতা খুশি বেশ বুঝতে পারি। অনেকদিন পর কামালদা এলেন। ধীরে ধীরে হাল্কা পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। সংগীতা রান্না ঘরে। গুরুত্বপূর্ণ সভা। খতমের লাইন নিয়ে জোর বিতর্ক। ক্ষয়ক্ষতি বেড়েই চলেছে। জলে মাছের বদলে ডাঙায়

মাছ হয়ে উঠেছি। মানুষই আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের বক্তব্য জেলা কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক হলেও সম্পর্ক কখনো তিক্ত হয় নি আমাদের।

দু'জন কমরেডের আমার বাসাতেই থেকে যাওয়া স্থির হয়। আমার ওপর নির্দেশ হয় সাতদিনের মধ্যে তিনটে লেখা তৈরি করে দিতে হবে, না বলার উপায় নেই। সেজদা দিন তিনেক তো লাইব্রেরী ওয়ার্ক করতে হবে। কি করে পারবো।

'শুকুল কি করে পারবে জানি না—অফিস ডুব মারো। সামনে ভয়ানক বিপদ। সংগীতা, চা হবে না আর এক কাপ ?' তখন রাত সাড়ে ন'টা। সংগীতা কখনো মুখ ব্যাজার করে না। ও আমার ব্যক্তিগত বন্ধুদের থেকে এঁদের অনেক ভালবাসে। প্রায়ই একটা কথা বলে, জানো শুকুল এত সুন্দর চোখ সকলের কখনো দেখি নি। তোমার সাথে বিয়ে না হলে জানতেই পারতাম না এত পুরুষের একই রকম সুন্দর চোখ হতে পারে। উজ্জ্বল ! কি দৃষ্টি ! কেমন করে সকলের দৃষ্টি এত সুন্দর হলো ?

তুমি তো জানো। প্রশ্ন তো তোমার নয় এটা। তবু বলার জন্য বলি সকলেই স্বপ্নের ফেরিয়ালা। তোমার রবীন্দ্রনাথের কথাতেই তো বলা যায়— 'সুদূরের পিয়াসী'

সংগীতা কামালদাকে কিছুতেই যেতে দেয় না। তুমি অনেকদিন পর এসেছো — আজ যাবে না। সংগীতা কামালদার হাত ধরে বলে। দেখ কাল সকালে আমার নবীনদার সাথে appointment। তাছাড়া ও সেজদার দিকে তাকায়।

সেজদা ধীরে ধীরে বলে, — "থাকতে পারো। ঠিক আছে — সংগীতা কামাল থাকবে। কিন্তু শোবে কোথায় ? তোমার তো এই একখানা ঘর। ওদের দু'জনের আজ তোমার এখানে আশ্রয়।"

সংগীতা খুব সহজে সমস্যা সমাধান করে। দোতলার ঘর। খুবই বড়। বারান্দাটা ঘেরা। অনেকটা ঘরেরই মতো। ওর পাশেই পার্টিশন দিয়ে রান্না ঘর। প্রায় আসবাবহীন আমার ফ্ল্যাট। বই-এর কোন আলমারী নেই। শুধু রবীন্দ্ররচনাবলী বুক ক্যাবিনেট ছাড়া। ডাঁই করা বই ঘরের কোণায়। বই নিয়ে সংগীতার সাথে প্রায়ই লাগে। ওর গোছানো আমার পছন্দ নয় — ও অগোছালো একদম দেখতে পারে না। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে সাজাবে —

আবার যে কে সেই। একখানা বড় তক্তপোষ। খালি যায়গা অনেকটা। আমার ল্যাণ্ডলেডীর একখানা পুরোনো মেহগনি কাঠের আলমারি। আমার অনুমতি নিয়েই তিনি আমার ঘরে রেখেছেন। তিনি বাঙালি খ্রীষ্টান। সম্পূর্ণ নিরুপদ্রপ আমার এই বস্তির মধ্যে দোতলা বাড়ীটা।

সংগীতা সেজদাকে আবার বলে — "সেজদা, কামালদা কাল বিকেল অবধি আমার এখানে থাকবে।

সেজদা ঠাট্টা করে, তবে আমিও থাকবো। ওকে একা তুমি আদর করবে — তা হবে না।

থাকুন না। কাল আমি বড় গোস্ত রান্না করবো কামালদার জন্য খাবেন তো ?

কামালটার জন্য বড় হিংসে হয় — সংগীতা তোমার বিয়েতে আমাকে সাক্ষী রাখলে না কেন ? তবে হয়ত আমিও তোমার নজরে পড়তাম।

"আপনি কি আমার নজরের বাইরে ? সত্যিই সেজদা অতীতটা এসে বড় ভীড় করে কামালদা এলে। অনেক দুঃখ পেরিয়ে নষ্টালজিয়ায় মনটা অবশ হয়ে যায়। আপনাদের মিটিং আলোচনা বুঝি না সবটা। বুঝি না কী করছেন কী চাইছেন। শুকুলও সবসময় উদভ্রান্ত। তেমন করে ও আর আমার গান শুনতে চায় না। সত্যি সেজদা, কামালদা এলে মনটা ফর্সা হয়ে যায়।

তুমি বড় ভাল সংগীতা, সব কমরেডের বউ যদি সংগীতা হতো। আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। এবার বলি সেজদা — একটা বাঙালি মেয়েকে গড়ে পিটে গড়লুম — আমায় কোন ক্রেডিট দিচ্ছেন না। সংগীতা উল্টোদিক থেকে বলে — মা কি ছিলেন — কি হইয়াছেন বাই শুকুল।"

কামালদা এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিল। এবার কথা বলে। এটা তুমি ঠিকই বলেছো শুকুল। আমারও পরিচয়ের পর মনে হয়েছিল শুকুল কার গলায় মালা ঝোলালো। রাজনীতিটাই নেই। গানও তো রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কিছু নয়। আর ফিল্মী গান — যার মানেই বুঝি না।

সেই গান শুনেই তো তুমিও পাগল ছিলে কামালদা। মনে পড়ে ইডেনগার্ডেনে বাদাম খাচ্ছিলাম — তুমি কোয়া ভেঙ্গে আধখানা দিচ্ছিলে। আধখানা তোমার মুখে। প্যাগোডার কাছে- বসে তোমার অনুরোধে গান গাইছিলাম একটু চড়ায় উঠতেই প্রায় ভীড় জমে যাবার জোগাড়। তাড়াতাড়ি

উঠে পড়তে হলো — সবাই ভাবলো প্রেমিক-প্রেমিকা বুঝি।

'হ্যাঁ, আমি তখন শুকুলের প্রক্সি দিচ্ছি। আর তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছি। শুকুল ধনুক ভাঙ্গা পণ করেছে আসবে না কলকাতায় আর। চিঠির পর চিঠি দিচ্ছি আমি। সবশেষে মোক্ষম চাল নিলুম। সংগীতাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছি — সাতদিনের মধ্যে না এলে।

বেচারা। সুড়সুড় করে এসে হাজির।

নানা গল্পে রাত হচ্ছিল। সেজদা আর দুজন কমরেড চলে যায়। আমাকে আরও একটা দায়িত্ব দিয়ে সেজদা বিদায় নেয়। কামালদার হাত দিয়ে ছোট্ট একটা অনুবাদের কাজ কালই যেন পাঠিয়ে দিই।

রাত বাড়ে। বেশ গরম। ছাদে মাদুর পেতে আমি অনুবাদের কাজটায় হাত দিই। সংগীতা কামালদাকে নিয়ে কার্নিস ঘেঁসে দুটো বেতের চেয়ার নিয়ে বসে। খুবই স্বচ্ছন্দে কামালদা মোটা চওড়া হাতটা সংগীতা হাতের মধ্যে নেয়। গুন গুন করে নিজেই গান করে আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশী।' মাঝখানে গান থামিয়ে হঠাৎ সংগীতা বলে, তুমি কেমন যেন হয়ে গেছ কামালদা। কি হ্যাংলাপনাই তোমার ছিল এক সময়? শুকুলের কাছে ঠিক থাকবো বলে তোমাকে শান্ত করেছি শান্ত রেখেছি সব সময়। মনে পড়ে?

কামালদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে সবই মনে পড়ে। মনেও আছে। আচ্ছা কামালদা আজ না একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করবো তোমাকে — আমাকে কিছুটা ভুতে পেয়েছে আজ — তোমরা তো বড় গোস্ত খাও, তারপর ছোটবেলায় তোমাদের শরীরে কি সব করে — অথচ তোমাকে কেমন যেন একেবারে ঠাণ্ডা লাগছে — এমনটি তো ছিলে না তুমি? কোথায় গেল সেই জলুনী — তোমার দিকে তাকাতে পারতুম না?

আজ আমার সব তাপ ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে ছড়ানো সংগীতা। ওরা প্রবল শীতে অকালে মরে যায়। আমাদের তাপে ওরা যদি একটু উষ্ণ হয়!

তুমি এমন বলো আর শুকুল বলে কি জানো যখন ওর কোন বড় লেখা থাকে — আমাকে পাগল করে দেয়। পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে। কখন কোন সময় যে শরীর দাবী করে বসবে ঠিক নেই। বলে লিবিডো ফোর্স, লিবিডো ফোর্সই সব সৃষ্টির পেছনে। আমার যে খুব খারাপ লাগে তা নয়, তবে খুব ক্লান্ত তো লাগে — কাজ থাকে সংসারের।

কামালদা একটু অবাক হয়! লিবিডো? উঠে পড়ে পায়চারী করে আবার বসে পড়ে! মার্ক্সবাদের কি পাঠ শুকুল নিয়েছে! মুখে কিছু বলে না যদিও।

তুমি কিছু বলছো না যে?

কি বলবো! ওর সঙ্গে একদিন বসতে হবে! তা ছাড়া তোমার তো ভালই লাগে বললে। অসুবিধে তো নেই কিছু। আমরা একটা ভাল লেখা পেলাম।

তুমি কি গো. তোমার হিংসাও হয় না!

"সংগীতা তুমি আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছো না। রাজনীতি টালমাটাল। আমরা অস্থির। প্রবল আঘাত এসেছে আমাদের ওপর। তোমার সাথে পরিচয়ের প্রথম পর্বে তুমি তো জানো আমি কেমন ছিলাম। ভিখিরীর মতো দাবী করেছি। আর আজ আমার সব আবেগ, সব ভালবাসা উত্তেজনা — কিছুই আর ব্যক্তিগত নয় — গ্রাম চিনছি প্রতি মুহূর্তে — অনুভব করি গ্রামের মানুষের কষ্ট কি! বইয়ে পড়া বিদ্যা ছিল এতদিন। কত কমরেড যে আমাদের শেষ হয়ে গেল!

আবেগে গলা বুজে আসে কামালদার। সংগীতা হাত দিয়ে কামালদার মুখ চেপে ধরে। থাক আর বলতে হবে না। নীচে চলো শোবে। তোমাকে কাল সকালে যেতে হবে। কামালদা তখনো থামে নি। 'তবে মনে রেখো আমরা ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পেরেছি। ওরা আমাদের ভয়ে আতংকে কাঁটা হয়ে থাকে। গাছের পাতাটা পড়লেও ওরা ভয় পায়। আমাদের সাতজনের সাথে ওরা ষাটজনও লড়তে পারে না।"

ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসি। পরদিন সকালেই চা খেয়ে কামালদা চলে যায়। আমি আর সংগীতা সদর অবধি এগিয়ে দিই। অন্য কমরেডরা তখনো ঘুমোচ্ছে। অতি দ্রুত কয়েকটা ঘটনা ঘটে যায়। কামালদা একটু আঁচ করতে পারে। এবং খুব হিসেব করে ফেরার হয়ে যায়। আমি বিশেষ কিছু বুঝতে পারার আগেই গ্রেপ্তার হই বাড়ীর কাছেই।

অফিস থেকে সাসপেণ্ড। সংগীতার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। প্রস্তুত ছিল না একেবারেই। একান্নবর্তী পরিবারের জটিলতা থেকে অনেক কষ্টে ওকে মুক্ত করেছিলাম। আবার ও সেই আবর্তে। সহানুভূতিহীন ভালবাসাহীন প্রিয়জনদের খপ্পরে। অথচ সংগীতা নতুন বাসায় এসে অনেক

জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

থানায় বসে এই সব সাত পাঁচ ভাবছিলাম। দাম্পত্য জীবনে সূচনার দিনগুলোর কথা। দিন তিনেক লকআপেই। সেখান থেকে আবার Prison van তুললো। বিশেষ কোন প্রশ্ন আমাকে করে নি। গাড়ী চলেছে। সঙ্গে আমার স্মৃতির ঝাঁপিও খুলে ফেলি। লড়াই তো শেষ পর্য্যায়ে। প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এই সময় আমাকে গ্রেপ্তারের মানে বুঝলাম না। তীব্র কোন প্রতিরোধ বা প্রতিবাদও নিজের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

কামালদা কলকাতায় নেই। খবর পেয়েছি কামালদা পাকিস্তানে। কামালদা আমার বিয়ের ঘটক। পুরোহিত। সংগীতা আর আমার অভিভাবক। হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতা চলে এসেছিলাম কামালদার চিঠি পেয়ে। খবর দিয়ে এসেছিলাম। স্টেশনে দুটি মানুষ অপেক্ষা করছে। হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া ব্রিজের মাঝখানে। কারোও মুখে কথা নেই। আমি একটু বেশী গম্ভীর। গঙ্গায় লঞ্চ চলেছে। বেশ কয়েকটি জাহাজ নোঙর করা। দুই তীরে আলোর মালা। সন্ধ্যা নামছে। জল কালো হয়ে আসে। ট্রাম যাবার সময় ব্রীজের ওপর শব্দ খুব বেড়ে যায়। ডব্‌লডেকার বাস যেতেই ব্রীজ যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

কামালদা একটু সরে গিয়ে আমাদের কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন হয়ত। আমি চাপা স্বরে বলে উঠি কিছু দরকার নেই কামালদা। কাল তো আমরা মীট করছিই — তখনই কথা হবে। সংগীতার থমথমে মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। তবু কথা বলতে ইচ্ছে হয় নি। দীর্ঘ ছমাস নীরব থেকেও প্রবল মানসিক অত্যাচার করেছে।

অনেকদিনের ছুটিতে কলকাতা। আমরা আলোচনা করে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলি। সংগীতা শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে পারে নি ঠিকমতো। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল বারবার। ওকে শিয়ালদা থেকে ট্রেনে তুলে দিই। ওর এক দিদি সঙ্গে ছিল। কি ঘটে গেল তার গভীরতা বা মাত্রা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না যেন। আমি শুধু ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করে যাচ্ছিলুম।

পার্কসার্কাস ময়দানে একদিন সন্ধ্যেবেলা। ও আবার পুরোনো কথা-গুলো বলে। 'তুমি পরীক্ষা দেবে না?' তখন সন্ধ্যেবেলা। বিশাল পার্ক। আমরা একেবারে খেলার মাঠের মাঝখানটায় বসে আছি। সেই বাদাম

ভাঙছি। ওকে দিচ্ছি। ও বেশ দূরত্ব রেখেই বসে আছে। নিস্তব্ধ ময়দান। মাঝে মধ্যে লেডী ব্রেবোর্ন এর দারগা রোডের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে গাড়ী চলে যাচ্ছে। কলকাতা তখনো খুব সুন্দর — রোমান্টিক। আমি হেসে বলি, বিয়ে তো হয়েই গেছে — আর পাশ দিয়ে কি হবে। 'না, পড়তে তোমাকে হবেই — যদি বলো আমার পারিবারিক সম্মানের জন্য — তবে তাই। হঠাৎ একটু থেমে বলে, 'লম্বু এলো না যে?' কামালদা না এলে ওর খারাপ লাগে। আমার ঈর্ষা হয় না। কামালদা মানে এক পরম নির্ভরতা। ভাঙ্গা সম্পর্ক এত মসৃণভাবে জুড়ে দেয়।

সেলিনা — ওর ছোট বোনকে আজ দেখতে আসবে।

'কামালদার কথা এত জিজ্ঞেস করি বলে তুমি রাগ করো না তো? আমি সংগীতার দিকে তাকাই। ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনা করেছে ঠিকই। বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো, তার তাৎপর্য্য মাত্রা গভীরতা ওর বুঝবার কথা নয়। ওদের পৃথিবীটা খুবই ছোট।

'ওই মোটা ঢ্যাঙা লোকটা আমার দ্বিতীয় অস্তিত্ব। ওকে সন্দেহ করলে নিজেকেই সন্দেহ করতে হয়।

'অত বিশ্বাস ভাল নয় শুকুল।'

পরে জেনেছি কামালদা ক্লাশ পালিয়ে সংগীতাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ছোটখাটো দাবী অনেকবার করেছে। সংগীতা পরম স্নেহে পেছিয়ে দিয়েছে। 'পরে দেখা যাবে — বন্ধুকে এনে দিন তো আগে' — এই কথা বলে। হয়ত আরও কিছু কথা আছে যা সংগীতা আমাকে বলে নি। এবং বলা বাহুল্য আমার কোন মানসিক যন্ত্রণা হয় নি — এক ঈর্ষাজনিত তৃপ্তি অনুভব করেছি।

হায়দ্রাবাদ ফিরে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে কিছুদিনের মধ্যেই আবার কলকাতা। সংগীতাকে নিয়ে ফিরে যাই। পালিয়ে যাই আমার বিবাহিত বউকে নিয়ে। জানতে পারে না কেউ।

পুরী হয়ে হায়দ্রাবাদ। আমার মধুযামিনী। পুরীর উত্তাল সমুদ্র আমাদের উত্তাল করতে পারে না। দু'জনেই বিষণ্ন, ঠাণ্ডা, উত্তাপহীন। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার শিকার। সংগীতার মধ্যে ঘর ছাড়ার বেদনা। আমার অর্থ চিন্তা। কোন সঞ্চয় নেই। সামর্থ্য নেই নতুন সংসার সুরু করার।

বন্ধু সহকর্মীরা স্টেশনে আসে। হৈ হৈ করে আমাকে নিয়ে যায়

আমাদের মেস বাড়ীতে, একটা বড় বাড়ী নিয়ে আমরা পাঁচজন থাকি। এ্যাটাচ্‌ড বাথ সহ একটা ঘর ওরা আমাকে ছেড়ে দেয়। খাওয়া-দাওয়া একই সাথে। সংগীতার স্বাভাবিকতা ফিরতে সময় নেয়। এদিকে পৌঁছতে না পৌঁছতে ওর দাদার Telegram। 'আমার বোনকে 'ইলোপ' করে নিয়ে গেছে। 'সোসাল' কিছু একটা করতে হবে। পারিবারিক সম্মান বাঁচাতে।' — আমাদের অফিসের বড় সাহেবকে এই ভাষাতেই তার করলেন একদা আমার 'বস্'।

বড় বড় বাঙ্গালী সাহেবরা আমাদের 'মেস' বাড়ীতে হাজির। বোঝাবার চেষ্টা করে আমাকে। আমার সেই দ্বিধা — কি জবাব দেবো ভাবছি। সকলেরই অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠান। সংগীতা একটু পরে বেরিয়ে এসে ড্রয়িংরুমে বসে। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে, দেখুন আমি adult যা করেছি ভেবে চিন্তেই করেছি। আপনারা কিছু অনুরোধ করতে না এলেই ভাল। ওদের আর কথা এগোতে দেয় না। ধীরে ধীরে ওরা বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে দেয় সংগীতা। আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে। আর পারছি না শুকুল, ঘরে বাইরে আর যুদ্ধ করতে পারছি না শুকুল।'

ধীরে ধীরে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমার বন্ধুরা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করে। যাকে বলে Reception, সংগীতার মন বা মত কিছুই ছিল না। তবু সকলের অনুরোধে গাইতেও হয় ওকে। অফিসের ভি আই পি-রা প্রায় কেউই আসে নি। কিন্তু স্থানীয় বিশিষ্ট বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই এসেছেন। ডাইনিং হলটার চেয়ার টেবিল সরিয়ে সাজানো হয়েছিল। সামান্যই আয়োজন। কিন্তু বন্ধুদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সংগীতা গানের মধ্যে যেন নিজেকে ঢেলে দেয়। 'এখনো গেল না আঁধার / এখনো বাধা' অথবা 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' — পরিবেশকে বিষন্ন সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেয়। যদিও শেষ করে 'হৃদয় আমার প্রকাশে / অনন্ত আকাশে' — এই গানটি দিয়ে। পরপর কয়েকখানি গান গেয়ে থামে সংগীতা। মুগ্ধ সবাই। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করি গান শেষে ও 'কটাশ' শব্দটা উচ্চারণ করে কি না। ওর স্নিগ্ধ মুদ্রাদোষ। একটি গান শেষেই যেন কেটে দেয় গানটা 'কটাশ'। বিদায় নেবার সময় কেউ কেউ বলেন মিঃ উপাধ্যায় এই গলা — এখানে নষ্ট হতে দেবেন না। চলে যান কলকাতা।

বন্ধুরা তখনো সকলেই অবিবাহিত। সংগীতা একটু বেশী মাত্রায় অন্তর্মুখী যদিও, ও হয়ে ওঠে কারও কাছে বৌঠান, কারও কাছে বৌদি — কেউ বা ডাকে 'শ্রীমতি' বলে। একদিন রান্নার লোককে সরিয়ে অন্য স্বাদের

রান্না খাইয়ে সকলের নজর কাড়ে। রান্নায় দৌপদী হবার আকাঙ্ক্ষা ওর আদৌ নেই। বলেই ফেলে, 'রমেনদা একদিন করেছি বলে হয়ে গেছে, রোজ চাইলে কিন্তু বেশী নুন দিয়ে কেটে দেবো। রান্না আমার কখনো Passion নয়।'

সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতে যাই। মোসাব ট্যাঙ্কের ওপারে আমাদের বাসা। এ পারে লকড়ী কা পুল — পুরোনো নাম। মোসাব ট্যাঙ্ক এক দীর্ঘ বাঁধের মত। যথেষ্ঠ উঁচু এবং দীর্ঘ। রাস্তার ধারে সবাই কখনো বসে পড়ি। ফাঁকা রাস্তা। লোক চলাচল বা গাড়ী প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের বন্ধু মিঃ পুরোহিত। মারাঠী। হঠাৎ বলে, 'ভাবী বহুত্ আচ্ছি জানা হ্যায় শুনাইয়ে না এক গানা। হিন্দী ফিল্ম কি গানা। সংগীতা কোন জবাব দেয় না। একটু থেমে বলে, 'রাস্তার ওপর ? সবাই যে পাগল ভাববে ভাই। যো শোচেংগে শোচনে দিজিয়ে।' দুটো করতে বলবে না কিন্তু। দিলীপ বৈজয়ন্তীর গঙ্গা-যমুনা তখন প্রবল হিট্। ও গাইল 'দো হংস জোড়া বিছড় গয়া রে — বিনা অনুরোধেই আবার 'নজর লাগে··· যো ম্যায় হোতি রাজা।' পুরোহিত আর বিশ্বাস দা গানের তালে উঠে নাচতে শুরু করে। তিনটি যুবক সাইকেলে দ্রুত শিস্ দিতে দিতে চলে যায়। অনাবিল আনন্দিত সময়।

সব দুঃখ ভুলে সংগীতাকে নিয়ে আমার নেশা ধরে যায়। আবিদ — সুলতান বাজার শহরের মার্কেট সেন্টার। আমাদের নতুন সংসারের প্রস্তুতি। সংগীতা ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করে। খুব বেশী খরচ না হয় — আবার সুন্দর দর্শনীয় হয় যেন। ভারী সুন্দর একটা টী সেট্ কেনে। দু কাপের। খুন্তী — চাকি বেলনী। ভারী সুন্দর নক্সা কাটা কাচের গ্লাস। সংগীতা ঘুরে ঘুরে বাজার করে। রিক্সায় — আবিদ থেকে মোসাব ট্যাঙ্ক। ফিরে আসা। দীর্ঘ পথ। চড়াই উৎরাই। পথে অসাধারণ স্থাপত্যে তৈরী রবীন্দ্রভবন। জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী হয়ত বা। লোকালয় ছেড়ে রিক্সা ফাঁকায় চলে আসে। হঠাৎ সংগীতা বলে, তুমি রাগ করো নি তো অনেক কেনাকাটা করে ফেললাম বলে ? আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখি। শুধু আমারই জন্য সব ছেড়ে এতদূর পথ ও চলে এসেছে পারিবারিক সম্মান মর্যাদা কোন কিছুকেই তোয়াক্কা না করে। রিক্সার মধ্যেই ওর হাতটা হাতের মধ্যে নিই — 'সংগীতা তুমি ভাল — খুব ভাল।' আর কিছু বলতে পারি না — আমার চোখে জল এসে যায়।

আমার আর বন্ধুদের ঘরের মাঝখানে ডাইনিং হল। সেদিন খাওয়া

CENTRAL LIBRARY

দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়েছে। ওখান থেকেই বিশ্বাসদা চেঁচিয়ে বলে 'বৌঠান ঘুমিয়েছো? একটা গান করো না? গুনগুন করছিলে — শুনছিলাম। ওটাই একটু উঁচুতে তোলো।' সংগীতা জোরেই বলে 'গলা খুলে গাইলে অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। জানেন তো আমার গলা অনেক উঁচুতে।'

'কিছু হবে না — গাও।'

সংগীতা আমাকে একটু সরিয়ে দেয়। আমি ওকে একটু আগোছালো করে দিয়েছিলাম। কানের ফুটোয় আঙুল দিয়ে শুড়শুড়ি দিচ্ছিলাম। নাকে নাক ঘষছি। আমার ভাষায় 'নাকে নাকে যুদ্ধ'। ওর স্তনের অঞ্জলী ততক্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে খেলছিলাম। দু হাতে আমাকে আটকাবার চেষ্টা করে সংগীতা গাইতে থাকে। ওর লোমহীন অতি মসৃণ উরুতে আমার হাত। ওর জঙ্ঘার কাছে আমার হাত চলে যায়। স্পর্শ করে ধূসর ছড়ানো যোনিকেশ। হঠাৎই অতি কৌশলে প্রবেশ করি ওর শরীরে। এবং স্থির হয়ে থাকি। ঘটনার আকস্মিকতায় সংগীতার গান থেমে যায়। কানের কাছে মুখ নিয়ে আমি বলি গাও — থামলে যে — বিশ্বাসদা কি ভাববে। আমি চুপচাপ থাকছি।' সংগীতা নিরুপায়ভাবে গেয়ে চলে। বুকডন দেওয়া ফ্রিজ শটের মতো আমি স্থির। দ্বিতীয় গানও যখন শেষ করে ও, ততক্ষণে সবাই সম্ভবত ঘুমিয়েই পড়েছে। গান শেষ হলে ধীরে ধীরে আমার সশব্দ আঘাত। প্রবল ঢেউ তীব্র বেগে আছড়ে পড়তে থাকে সংগীতার শরীরে। সংগীতার শীৎকার। গভীর তৃপ্তির গোঙানী। নিস্তব্ধ পৃথিবীতে শুধুমাত্র ছন্দোময় শারীরিক শব্দ। আমার নির্দয় আন্তরিক তীব্র আঘাত অবশেষে ওকে প্লাবিত করে। অভ্যন্তর পূর্ণ করে দুকূল ভাসিয়ে দেয়। দুপায়ে আমায় আঁকড়ে ধরে সংগীতা। বলে দাঁড়াও — আমায় ব্যথা দিয়েছো — আমিও দেখাচ্ছি মজা। এই ওর এক অদ্ভুত স্বভাব। দুম্ দুম্ করে কিল মারে বুকে। বুকের লোমগুলো ধরে বেশ জোরে জোরেই টানে। কান মলে লাল করে দেয়। সবশেষে আমার কুঁড়ি হয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গে প্রবলভাবে চিমটি কাটে। হাত ধরে ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু আমার শক্তি তখন নিঃশেষিত। আর আমার প্রবল হাসিও পায় বটে। যতই বাধা দিতে চেষ্টা করি হাসিও তত বেড়ে যায়। আমার একটা ছোট্ট অহংকারও হয় — অর্থাৎ ওকে তৃপ্তি দিতে পেরেছি — এ সব তো তারই স্মারক।

সংগীতার শরীরে প্রবেশ করে স্থির হয়ে থেকে গান শোনা এবং গান শেষে রতিক্রিয়া আমার এক অদ্ভুত আহ্লাদ। সংগীতাও এই আহ্লাদে

আমোদিত হতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

হায়দ্রাবাদ প্রবাসে আমি এক দ্রষ্টব্য ব্যক্তি বা বস্তু হয়ে উঠেছিলাম। জানেন তো মিঃ উপাধ্যায়ের স্ত্রী রায় সাহেবের বোন ? দ্বিতীয় পরিচয় আমার খারাপ লাগে না। শিল্পী মিসেস উপাধ্যায়ের স্বামী। তবু নাগপুর বদলীর আদেশ আমার মানসিক ভার লাঘব করলো। নাগপুরের ভাবী সংসারের স্বপ্নে আমরা টুকিটাকি জিনিষপত্র কিনতে থাকি। সংগীতা কেনে আমি থলে ভর্তি করি। বলা বাহুল্য তার মধ্যে ঝিনুক-বাটিও থাকে। চোখে চোখে তাকিয়ে দু'জনের বিষন্ন হাসি। সংগীতা লজ্জা পেয়ে যায়। ও সন্তানসম্ভবা।

হায়দ্রাবাদের নামপল্লী স্টেশন জনসমুদ্র। ছোট্ট কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে নাগপুরের পথে মিসেস উপাধ্যায় ও তার স্বামী। ভাবতে পারা যায় নি — এত মানুষ আসবে আমাদের বিদায় জানাতে। জনে জনে সংগীতাকে অনুরোধ গানটা ছাড়বেন না মিসেস উপাধ্যায় / অথবা বৌঠান / বৌদি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এই প্রবাসী বাঙ্গালীরাই বাংলা সংস্কৃতিকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর ? যে কোন পুজোতে সংগীতা প্রতি রাতে কয়েক জায়গায় গান করেছে। বড়ই আদর করেছে সকলে। অনেককে তো চিনিও না, যারা স্টেশনে এসেছেন। ট্রেন ছাড়ার মুখে সবাই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। চোখের জল চাপতে সংগীতা আড়াল খোঁজে। ট্রেন ছেড়ে দেয়। আমাদের কন্যা সংঘমিত্রা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমি কামালদার সদা আসা চিঠিখানা পড়তে থাকি। বেশ দীর্ঘ চিঠি। কামালদা জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আবহ উত্তপ্ত। নকশালবাড়ীর ঘটনা বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ বলে অভিনন্দিত। বন্ধুরা সকলেই ঘর ছাড়া। লড়াই আর Repression এ সমগ্র কলকাতা শহরটাই যেন যুদ্ধক্ষেত্র। সেজদার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। আরও অনেক কথাই জানিয়েছে ঠারে ঠোরে। অবশেষে ব্যক্তিগত কথা। আমার মা নাকি দু' দিন গিয়েছিল কামালদা'র বাড়ী। যা তা বলে এসেছে কামালদা সম্পর্কে। তার 'ভাল' ছেলেকে কামালদাই নষ্ট করেছে। একটা কায়স্থ মেয়েকে চাপিয়ে দিয়েছে তার ছেলের গলায় এবং আরও অনেক কিছু। অবশেষে কামালদাই জানতে চেয়েছেন মাকে নিয়মিত টাকা পাঠাই কি না ? এবং উপসংহারে সংগীতার কথা "সংগীতার অন্তর্বেদনা বুঝে সহানুভূতির সঙ্গে ওকে দেখো। আমাদের রাজনীতি হয়ত ও অতটা বোঝে না — ওর নিষ্ঠা — সর্বঅর্থে — অনুকরণীয়। Intrinsic Beauty শব্দ দুটো আমরা খুবই ব্যবহার করি — বোধ করি সংগীতা এই সৌন্দর্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে। ঠিকানা দেওয়া গেলো

না — নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই ব'লে। তুমি 'বাবা' হলে কি না জানিও।" সংগীতা ঠোঁট কামড়ে উদ্বেল কান্না সামলায়।

**নাগপুরের রোজনামচা**

নাগপুরে নিজস্ব কোয়ার্টার পেতে অসুবিধে হয় না। আমাদের কন্যা সন্তান নিয়ে অভাব ও আনন্দে দিন কাটে। নাটকীয় ঘটনা বিশেষ নেই। দৈনন্দিনতায় আমরা ক্লান্ত হই না। শুধু মা'র তীব্র শ্লেষ ভর্ৎসনা ভরা চিঠি এলে আমরা এক দুদিন মনমরা থাকি। তবে তাঁকে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে সংগীতার কোন ত্রুটি নেই। Insured Parcel করে ও নিজেই নিয়মিত টাকা পাঠায়। চিঠিও লেখে সঙ্গে — মা যদিও ওকে কোন জবাবী চিঠি দেয় না। — আমাকে লেখা চিঠিতেও ওর কুশল প্রশ্ন করে না। নাগপুর টাইমসের সাংবাদিক বন্ধু মাঝে মধ্যেই আসেন। আমাকে লিখতে অনুরোধও করেন। দু একটা ফীচার লিখে পাঠাই। ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছাপায়। আমার লেখার কখনো wit এবং গোছানো ভাবটা ওদের না কি খুবই পছন্দ। একটু খারাপ লাগে কখনো অবশ্যই — সংগীতার গান নিয়ে আমার যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস — আমার লেখা সম্পর্কে ওর প্রায় নির্লিপ্ত — বেদনার সৃষ্টি তো করেই। কিছুদিন আগেই স্বতন্ত্র বিদর্ভ আন্দোলন হয়ে গেছে। হিংসাত্মক রূপ নিয়েছিল আন্দোলন। এই নিয়ে একটি বিতর্কমূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি নাগপুর টাইমসে। আলোচনার ঢেউ ওঠে আমার রচনাকে কেন্দ্র করে। কন্যা সংঘমিত্রা বড় হতে থাকে। ও এখানে St. Joseph Convent-এর ছাত্রী। এদিকে বিশেষ উদ্যোগ না নিয়েই সংগীতা পরিচিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবে। অত্যন্ত নিপুণভাবে ও সংসার করে। যেখানে নিমন্ত্রিত হয়, গাইতে যায় — যদিও উদ্যোগ আমারই। ও প্রতিবাদ করে প্রায় সব সময়ই। 'তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করে ব'লে আস কেন যে ও গাইবে। মেয়েকে তোমার কাছে রেখে ট্যাং ট্যাং করে গেয়ে বেড়ানো — ভাল লাগে না। ওর বিশেষ পড়া না থাকলেও আছে।"

'আমার বউ-এর 'হ্যালো' কতটা বাড়ে, দেখছি।

স্বামী বড় চাকুরে না হলে আর নিজে খুব রূপসী না হলে হ্যালো বা glamour কিছুই বাড়ে না — শুকুল। — তুমি যত বড়ই শিল্পী হও না কেন। প্রবাস জীবনে এটা আমি বুঝে গেছি।

কথাগুলো আমাকে বিঁধতে থাকে। বলি, 'সব মেনে নিলে তো

চলাটাই বন্ধ হয়ে যায়। সংগীতা — না মেনেই আমরা জীবন শুরু করেছি — না মেনেই চলবো। হেরে হয়তো যাবো — তবু সান্ত্বনা থাকবে আমরা হাওয়ার বিরুদ্ধে হেঁটেছি।'

কেয়ার অফ শুকুল সংগীতার কাছে কামালদা'র চিঠি। আমার দিকে চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে গেয়ে ওঠে 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি গানের পারে।' কোন বিরতি না দিয়েই হৃদয় আমার প্রকাশে / অনন্ত আকাশে' কামালদা লিখেছে উপসংহারে ঃ তোমার নামটি দিলাম 'রবীন্দ্র সংগীত উপাধ্যায়।' 'লম্বু বেশ লেখে — তাই না শুকুল ?' 'হ্যাঁ ওর অনেক লেখাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পড়া হয়েছে — অত লম্বা চওড়া চেহারা কিন্তু কি মিষ্টি করে ও যে পড়ে! আবৃত্তিও খুব ভাল করে শোন নি কখনো ?'

শুনেছি আবার শুনিনিও — তোমার চিন্তায় এমন আচ্ছন্ন, কি যে ও বলে গেল মন দিতেই পারি নি।

এদিকে নাগপুরে বিরাট করে রবীন্দ্র জন্মতিথি। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য। সংগীতা "সুরূপা।" রিহার্সাল প্রতিদিন। কামালদার চিঠি যেন টনিকের কাজ করে। উদ্দিপ্ত হয়ে ওঠে সংগীতা। আমার এক অদ্ভুত প্রবণতা। সংগীতার খ্যাতি, সম্মান আমার যেন আড়াল খুঁজে বেড়ানো। সংগীতাকে প্রতি সন্ধ্যাতেই রিহার্সালে যেতে হয়। সারাদিন যখনই সুযোগ পায় গান মক্‌শো করে। সংসারের দায় থেকে এতটুকু সরে গিয়ে নয়। নিপুণ ভাবে সংসার করা, আমাকে শারীরিক সাহচার্য দেয়া, গানে গানে ঘরকে ভরিয়ে রাখা কন্যাকে টান টান যত্ন করা — ওর অসাধারণ রূপের অভাব ভরিয়ে রেখেছিল। সেদিন রিহার্সাল থেকে ফিরতে বেশ দেরী। মেয়েকে পড়িয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। ব্যালকনিতে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে। অবশেষে গাড়ি এসে ওকে নামিয়ে দেয়। শালপ্রাংশু দেহ সুমন্ত্র চ্যাটার্জী দরজা খুলে সরে দাঁড়ান। সংগীতা উঠতে উঠতে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। দরজা বন্ধ করে আমি ঘরে চলে আসি। রাগ করেছো ? কারণ শুনলে তুমি বুঝতে। শান্তি-নিকেতন থেকে নিলীমা সেন এসেছিলেন। সুমন্ত্রদা তাঁকে নিয়ে এসে-ছিলেন রিহার্সালে। তিনি তোমার বউয়ের গানের একটু প্রশংসা করলেন। আমি ওকে আর কথা বলতে দিই না। পোষাক পাল্টাতেও নয়। পাশের ঘরে নিয়ে যাই। আদর করতে শুরু করি। সংগীতা বাধা দেয় না। একটু আলগা হয়ে ব্রার হুকটা খুলে দেয়। আদর করতে হবে না — দেখ আমি তৈরি। ও সত্যিই প্রায় জলাশয়। গলা জড়িয়ে ধরে গেয়ে ওঠে আমি

তোমার সাথে বেঁধেছি আমার প্রাণ।' অতি দ্রুত মুক্ত হয়ে গেলুম। সংগীতা ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ওর অপূর্ণতা আমাকে বুঝতে দেয় না। একটা যন্ত্রণা আমাকে বিঁধতে থাকে। খেতে খেতে গল্প হয়। জিজ্ঞেস করি কোন কোন গানের রিহার্সাল হ'ল আজ?' "বসন্ত না কে সত্যিই কাঁদে যখন আমি রোদন ভরা এ বসন্ত গাই। — সুমন্ত্রদা বলছিলেন, "রাত প্রায় বারোটা শুয়ে পড়ি। ক্লান্ত সংগীতা। কিন্তু আমি ছটফট করতে থাকি। আবার তৈরি হয়ে ওকে জাগিয়ে দিই। কি হ'লো আবার? 'কিছু না' বলে — প্রবলভাবে ওকে বিধ্বস্ত করি। অবশেষে গভীর তৃপ্তিতে ওকে ছেড়ে দিই। "একেবারে পাগল — এত পারি আমি বলো?" বলেই গভীর আশ্লেষে চুম্বন করে উঠে পড়ে।

অনুষ্ঠানের দিন কে কত দামী লালপেড়ে গাদোয়াল শাড়ী পরে আসতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা। সখীদের শাড়ীর সাজ সবার ওপরে, পোষাকে অতি ম্রিয়মান সংগীতা। সব ছাপিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি ভাল হয়। গ্রীনরুমে আমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে। উত্তেজনা, প্রবল উত্তেজনা। কি নির্ভীক উদাত্ত ওর কণ্ঠ। যেন উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে চড়ে সংগীতা শেষ করে অনুষ্ঠান। আশ্চার্য সংযম, কোন ভাবান্তর নেই। সামান্য হেসে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করে।

আমন্ত্রণ। নানা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ। মিসেস উপাধ্যায়কে আমরা আপনার বাড়ী থেকে নিয়ে যাবো বিকেলে — কর্ণেল সেনের বাড়ী। ছোট অনুষ্ঠান আছে। গিয়ে দেখি বিশাল হল ঘরে ছোট মঞ্চ। শিল্পীরা বসে। চোখা-চোখি হতে ও যেন বলে — 'যা পেয়েছে প্রথম দিনে তাই…' এখানে শুধুই রবীন্দ্রনাথ। 'দুঃখ জাগানিয়া ওগো তোমায় গান শোনাব। বড় ভাল লাগছিল। বেদনা ছাড়িয়ে পড়ে সমস্ত দর্শকদের মধ্যে ও যখন গাইল — বাজে করুণ সুরে। চিত্রাঙ্গদার সেই দ্বৈত সঙ্গীতে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সুমন্ত্রদা আর সংগীতা।

আনন্দ আবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কলকাতা বদলির আদেশ। দীর্ঘ-কাল পরে আবার কলকাতা। চিত্রাঙ্গদা করতে গিয়ে পরিচিত দু একটি ছেলে আসে মাঝে মধ্যে — তার মধ্যে সুভাষ একজন। নিজস্ব গন্ডীর বাইরে হয়ত সংগীতা এমনই দু' একজনের সাথে খুব সহজ। সেদিন রবিবার। বাড়ীতে এসেই বৌদি বলে চিৎকার করে গেয়ে ওঠে — মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।' সংগীতা রান্নাঘরে ছিল। গানেই জবাব দেয়। এখনো

গেলো না আঁধার এখনো বাঁধা। দুজনেই হেসে ওঠে। বড় অনাবিল হাসি।

বলো — সুভাষ, পথ ভুলে। না কলকাতা যাচ্ছি শুনে দেখা করতে এলে ?

'পথ ভুলে বলাটাই ঠিক। চিত্রাঙ্গদার পর আর তোমাদের পাত্তা নেই। তুমি তো সেই খাওয়া-দাওয়া পার্টিতেও গেলে না। সকলেই বারবার তোমার কথা বলছিল।

সুভাষ তুমি তো জানো আমি হৈ-হৈ করতে পারি না। তা ছাড়া সব যেন একটু কৃত্রিম লাগে। রিহার্সালের দিনগুলো একটা excitement ছিল। এই সুভাষ মাছ-ভাজা খাবে ? কাল শুকুল মঙ্গলবাড়ি থেকে অনেক মাছ এনেছে। সংগীতা দ্রুত রান্নাঘরে নিষ্ক্রান্ত হয়। একটা প্লেটে দুখানা মাছভাজা নিয়ে আসতে আসতে গেয়ে ওঠে, একেবারে খোলা গলায় — "কেতনা বদল গয়া ইনসান / সুরজ না বদলা চাঁদ না / বদলা / সুভাষ না বদলা / কেতনা বদল গয়া ইনসান।' দু' লাইন গেয়েই বলে ওঠে "কি কমপ্লিমেন্ট দিলাম বলো ? মিথ্যে কিন্তু। তুমিও শ্রীমান খুব পাল্টেছো।" 'পুরোটা গাও না বৌদি। তোমার গানের প্রশংসায় তুমি হয়তো বিব্রত হও — কিন্তু আমার কি বিস্ময় জানো — কি স্বচ্ছন্দেই না তুমি হিন্দী চটুল গান থেকে রবীন্দ্রনাথে ফিরে যাও ?

সে গাইবখন তুমি আজ থাকবে সুভাষ ? শুকুল এক্ষুনি ফিরবে — সংঘমিত্রাকে নিয়ে বেরিয়েছে।"

থাকবো শর্ত আছে। খান সাতেক হিন্দী গান গাইতে হবে। তার মধ্যে অন্তত তিনটে আমার গলায় তুলে দিতে হবে। একই লাইন বারবার গেয়ে সুর ছুট হলে ঠিক করে দিতে হবে। তবেই শ্রীমান সুভাষ সেন গরীবের পর্ণকুঠিরে আহার গ্রহণ করতে পারে।

'যাও তো থাকতে হবে না খেতে হবে না।' সংগীতা ওকে যেন ঠেলে বার করে দেয়।

'দুঃখ জাগানিয়া, ওগো তোমায় গান শোনাবো।' হঠাৎ গেয়ে ওঠে। সংগীতাও গলা মেলায়। ভারি একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে।

গান শেষে সুভাষ বলে, বাইরে, রিহার্সালে তুমি এত গম্ভীর কেন, অথচ ঘরে তুমি কত সুন্দর।

'অনেক আদিখ্যেতা হয়েছে, এবার খেতে ব'সো।'

বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও সেই সকলের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারে হাজির হলাম। লোকে কি বলবে — এই ভয় আমার ছিলই। তাছাড়া কলকাতায় একা সংসার শুরু করার সাহসও আমার ছিল না। কদিনেই বুঝতে পারি সংগীতাকে নানাভাবে অপদস্থ করার, অপমানিত করার চেষ্টা চলতে থাকে। এবং আমার মা, কাকা কাকীমার কাছে প্রিয় থাকার নিয়ত চেষ্টায়, ছেলের বউর প্রতি দুর্ব্যবহারের যেন প্রতীক হয়ে ওঠেন। এবং আমিও দুদিক সামলাতে গিয়ে কোনদিকই সামলাতে পারি না। মা'র দোষ ত্রুটি বুঝেও আমি সংগীতাকে দুষি। 'একটু মানিয়ে চলো — বালবিধবা তো — সারা জীবনের বঞ্চনা থেকেই অমনটি করে থাকে' — সংগীতাকে উপদেশ দিই। আমরা যে অনাহুত, ভাবে ভংগীতে সকলেই সেটা বুঝিয়ে দেয়। বাড়ীতে জায়গা কম। তিনতলার দুটো ঘর। আর একতলার একটা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা। সেই ঘরেই আবার আমার দাদা, এই বাড়ীতে যার ছড়ি ঘোরানোর একমাত্র চল্ — স্নান করেন। তার স্নানের সময় সংগীতা সংঘমিত্রাকে নিয়ে সিঁড়িতে বসে থাকে। স্নান শেষে সংগীতা ডেটল দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে ঘরে ঢুকতে পায়। সংগীতা গান প্রায় গায় না। এক মেয়ে বললে কখনো কখনো গায়। ওপরে যখন তখন নির্দেশ আসে — কোন আত্মীয় এসেছে গান শোনাতে হবে — সংগীতা হয়ত তখন এক পাঁজা বাসন নিয়ে মাজতে বসেছে। বাইরে থাকার সময় আমার তবু রাজনৈতিক উত্তাপের জগৎ আছে — সংগীতা হাঁপিয়ে ওঠে। রাজনৈতিক আবহ বেশ জটিল। এই ভীষণ অবস্থার মধ্যেও আমার লেখা-জোখা চলছে। বিভিন্ন পত্রিকার দায় মেটাচ্ছি এর মধ্যে। বন্ধুরা কেউ কেউ নীচের ঘরেই এসেই গুটি সুটি মেরে গল্প করে। দোকান থেকে ভাঁড়ে চা এনে খাই। আমার ঘরে ফিরতে রাত হয়। সংগীতা আরও গম্ভীর ও অন্তর্মুখী। সংঘমিত্রাকে আদর করারও সুযোগ পাই না। ও ঘুমিয়ে কাদা।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংকট বিপদসীমা অতিক্রমের মুখে। সংঘমিত্রার জন্য আনা দুধেও জল মেশায়, কাকীমা। মা'র আচরণে বণ্ডেড্ লেবারও সহ্য করতো না হয়তো। আবার ত্রাতার ভূমিকায় বন্ধুরা। প্রায় নীরবেই আলাদা হয়ে যাই। এবং নতুন সংসারে, আমার নিজস্ব সংসারে ধীরে ধীরে ফিরে আসে নিজস্ব ছন্দ। একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকার বিভীষিকা — একটি চমৎকার Picturesque হতে পারে। কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি পাবে আশঙ্কায় — বাদ রাখছি। আবার আন্ডা গান। সংঘমিত্রাকে ধরে ধরে সংগীতার গান, "আজ শুভদিনে, পিতার ভুবনে অমৃত সদনে। চল চল চল যাই।" সংঘমিত্রার

গলায় মা'র মতো সুর খেলে না তবু গায় আনন্দেরই সাগর হতে।

এই নতুন বাসাতেই রাজনৈতিক বন্ধুদের নিয়ে যখন সবে প্রাণের প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে — এবং আন্দোলন যখন প্রায় শেষের দিকে রাস্তা থেকে আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাই। কামালদা উধাও। সেজদা ঠিক সময়টিতে এসকেপ্ করতে পেরেছেন। বিপ্লব সম্ভবত শহীদ হয়ে গেছে।

দীর্ঘকালের জেলবাস। অফিস থেকে সাসপেণ্ডেড। সংগীতার আবার ফিরে যাওয়া সেই Joint family-তে। জেলে প্রায় কোন খবরই পাই না। মাঝে মধ্যে সংগীতা দেখা করতে আসে। কাঁদে না। কামালদা ফিরে এসেছে — সংগীতার কাছে খবর পাই। দেখা করার Risk আছে বলে দেখা করে না। বলে পাঠিয়েছে জেল থেকে বেরিয়ে আর যেন ও বাড়ী মুখো না হই। অত্যাচারের বন্যায়, শ্বেত সন্ত্রাসে — বিভিন্ন মুখি চিন্তায় — আন্দোলন কোনঠাসা। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত। অবশেষে মুক্তি, আচমকাই।

মুক্তির আদেশপত্র নিয়ে চাকরি বাঁচাতে ছোটাছুটি শুরু করি। নতুন একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে নিই দক্ষিণ শহরতলীতে। খুবই ছোট। মাথা গুঁজে কিছুকাল পড়ে থাকি সেখানে। সংগীতা প্রবলভাবে বদলে যাওয়া মানুষ। দু দুবার ওই Joint family-র নরককুণ্ডে রেখে — ওর স্বাভাবিক স্ফূর্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। আর আমার ভূমিকা ওকে খুবই অবাক করেছে। এক কাপড়ে চলে এসেছিল সংগীতা। মা'র কাছে এসে তার আঁচলের তলায় লুকোতে দেখে ( ওর ভাষা ) ও যার পর নাই অবাক হয়েছে। প্রতিবাদ তো দূরের কথা — মা এবং ওর দ্বন্দ্বে আমি সাধারণভাবে মার পক্ষে থেকেছি। এবং বলাবাহুল্য সংগীতা আরও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সংগীতা একেবারেই বদলে যাওয়া মানুষ। সংঘমিত্রা ছাড়া ওর যেন আর কোন দায় দায়িত্ব নেই। নেই ওর অন্য কোন অস্তিত্বও। আমার প্রতিটি আচরণই ওর কাছে দোষের। আমার লেখা-জোখা ও কোনদিনই পছন্দ করে না — কিন্তু বাধা দিত না। আজ লিখতে গেলেই চেঁচামেচি করে।

অফিসের টাকায় যে ছোট্ট বাড়ীটি করি সেখানে এসেও ওর ব্যবহারের কোন তারতম্য ঘটে না।

তুমি আমার গান নিয়েছো, স্বাস্থ্য নিয়েছো — এখন নিজে লেখক হতে বসেছো! কে পড়ে তোমার লেখা শুনি? ঐ সব ছাই-পাঁস?

কোন দিনই খুব ঝগড়া করতে পারি না। শুধু চিঁ চিঁ করে বলি,

'আমি এক লাইনও লিখবো না যদি তুমি আবার গান শুরু করো। সংগীতা ভুলে যেওনা তোমার গানই ছিল আমার সব।' 'ন্যাকামী অনেক হয়েছে — এই ভাবেই ভুলিয়েছো আমাকে। অনেক ছলাকলা ছিল তোমার।'

কথা বাড়াই না। কখনো কখনো বাইরে থেকে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি। রান্না ঘরে কাজ করতে করতে সংগীতা গাইছে সেই খোলা-মেলা। "দূরে কোথায় দূরে দূরে / মন বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।" আমাকে দেখতে পেয়েই একেবারে চুপ। হয়ত অনুরোধ করি অনেক অনুরোধেও আর গায় না। কখনো সখনো সংঘমিত্রাকে নিয়ে মজা হয়, ব্যাস ওই পর্যন্ত। সবচেয়ে বিচ্ছিরী অবস্থা সংগীতার সাথে শোওয়া নিয়ে। আমি কখনো কাছে গেলে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দেয় — অথবা এমন চেঁচায় যে সংঘমিত্রার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ওর প্রশ্ন — 'কি হয়েছে তোমাদের ?' চুপ হয়ে মাথা নীচু করে নিজের বিছানায় চলে আসি।

এই পারিবারিক আবহাওয়েই মিঃ সুরেশ বাগ, স্ত্রী শকুন্তলা বাগ একদা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশের বাড়ীটি ক্রয় করে আমার প্রতিবেশী হয়ে এলেন। আমি শকুন্তলা বাগকে দেখে — প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ। কতগুলো উপমা অস্বাভাবিক হলেও, মাথায় এসে গেলো। দেবদারুর মতো সতেজ, ইউক্যালিপটাসের মতো মাথা উঁচু, শাল-সেগুনের মতো দৃঢ়, আর বসন্তের পলাশ ও গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়ায় মেলানো গায়ের রং — আমার আপাত উদাসীনতার আড়ালে তীব্র এক আকর্ষণ বোধ করি। আধুনিক ঢং-এ সাজিয়েছে ড্রয়িং রুম। কিন্তু বাড়ীতে বই নেই। বই শূন্য কোন বাড়ী সেই বাড়ীর প্রতি আমাকে বিতৃষ্ণা করে তোলে। বাগবাবু কখনো চা খেতে ডাকে। যাই-গল্প করি। কোন বিষয়েই স্বামী স্ত্রীর কোন গভীরতা নেই। আড্ডা ছাড়াছাড়া। জমে না। তবু সুযোগ পেলে, সুযোগ তৈরী করে হাজির হই প্রতিবেশীর বাড়ীতে।

সেদিন সন্ধ্যায় শকুন্তলাদের বাড়ী নিছক আড্ডা দিতেই গিয়েছিলাম। কেন জানি না বাগবাবু তাদের বেড রুমেই নিয়ে গেলেন। দুটো বেতের মোড়াতে দুজনে বসি। একটু পরেই শকুন্তলার প্রবেশ ধূমায়িত চায়ের কাপ সহ। ওর মাথার চুল খোলা। একেবারেই তরঙ্গায়িত জলপ্রপাত। নিজে না বসে একটু আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় ট্রেটা রেখে ছোট ছোট চুমুক দিতে থাকে। ভঙ্গিটির মধ্যে সকলকে যেন অস্বীকারের চেষ্টা। বিছানা খাট সব কিছুর মধ্যে দেখানোপনা রয়েছে। টান টান করে পাতা চাদর। ছোট কাশ্মিরী টেবিলে মাথার কাছে বাগ দম্পতীর ছবি। পাশেই ল্যাম্পের সৌখিন স্ট্যাণ্ড, দুটো চারটে বালিশ পাশাপাশি। পাশ বালিশটা একদিকে। ছোট্ট কন্যা

CENTRAL LIBRARY

এখনো এদের সঙ্গেই শোয় সম্ভবত। একটা ছোট ক্যাম্প খাট, খাটের পাশে। সব মিলিয়ে এটা যে দম্পতীর শয্যাবিলাসের ঘর যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমি কোথায় যেন আদি রসের গন্ধ পেলাম। মনে পড়ে গেলো সকালে সংগীতার বিছানা তোলার অভ্যাসের কথা। রাতের চাদর রোজ সকালে তুলে কাচা চাই-ই। এবং আগের দিনের কাচা চাদর পেতে দেওয়া ওর নিত্যদিনের দায়। বিছানা আলোর কোন অস্তিত্ব ঘরে নেই। পাশ-বালিশও ওর কাছে অশ্লীল। শুধু একটা ছোট সৌখিনতা ছিল। রাতে শোবার আগে একটা ধূপকাঠি নিয়ত জ্বালাতো। খুবই দামী বাজার ঘুরে এক একবার এক এক রকমের গন্ধ। কিছুক্ষণ পর খাট থেকে নেবে সেটাকে সরিয়ে দিত। যদি আমি বলতুম থাক না জ্বলুক, ও বলতো মধুর তোমার শেষ যে না পাই ···। শেষটা প্রত্যক্ষ করতে নেই, অনুভব করতে হয় বুঝলে শুকুল — বেশ থাক — তীব্রতা ভাল নয়।' বলেই ঠোঁটের সব রস নিংড়ে নেওয়া সুদীর্ঘ চুম্বন। তারপর হঠাৎ করে শুকুল শুকুল শুকুল — তোমায় শুকুল বলে বলে ডাকতে কি ভালই না লাগে!' কখনো কোন কিছু ঘোষণা না করে — অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেই অভ্যাস ওর আজও আছে. আমিই শুধু বৃত্তের বাইরে ছিটকে গেছি।

'আপনারা চুপচাপ যে' মিসেস বাগের প্রশ্ন।

'আপনার সারাদিনের রুটিন কি মিসেস বাগ?' যেন সাক্ষাৎকার নেবার ভঙ্গিতে প্রশ্ন রাখি।

'কি আবার! একজন House wife-এর পক্ষে যা সম্ভব! রান্নার কাজের তদারকি করা। মেয়েদের পড়া দেখা। পরচর্চা ঠিক পোষায় না — তা নাহলে বাকি সময়টা কেটে যেতো বেশ। কখনো কখনো গান করা। এখন আবার আর এক মুস্কিল হয়েছে — সংগীতাদির গান শুনে নিজে গাইতে লজ্জা করে।'

'জানেন তো সংগীতাদি আর আমায় গান শোনায় না। হয়ত ও গাইছে — রান্না করতে করতেই গলা ছেড়ে গায় — পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকি আমার উপস্থিতি টের পেলেই ওর গান বন্ধ হয়ে যায়। ওর ধারণা আমিই ওর গান নষ্টের কারণ। মিঃ বাগ এই সময় কথা বলেন: 'সত্যিই অসাধারণ গান করেন কিন্তু সংগীতাদি।' আপনি যদি ঠিক মতো ব্যাক না করে থাকেন কোন jelousy থেকেই নিশ্চয়ই করেছেন।'

'হবে হয়ত।' এটুকু বলেই চুপ করে যাই। মনে মনে ভাবি এই

ধারণার পেছনে কি প্রবল মিথ্যে। ও গাইবে — আরও গাইবে। আমি পেছনেই থাকবো। আর যে সামান্য লেখালেখি করি — যদি পারি তাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাবো। শ্রী মতি সংগীতা উপাধ্যায়ের স্বামী হিসেবেই আমার পরিচয় থাকবে — ওর পেছন পেছন চলার মধ্যেই আমার এক আত্মশ্লাঘা ছিল — কোন রকম আত্মগ্লানি নয়। নিজেকে অনেক বিশ্লেষণ করেও অন্য কিছু খুঁজে পাই নি।

'কেন প্রায়ই তো শুনি যে আপনি সংগীতাদিকে এ গান সে গান করতে হাতে পায়ে ধরছেন।' 'শকুন্তলা অভ্যাস মতো বুকের কাপড় ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও কাপড়টা আবার ঠিক করে আমাকে কটাক্ষ করে বললেন।

হাঁা তা করি। অনুরোধ রাখবে না জেনেও করি। পুরোনো অভ্যেস। তা ছাড়া একটা কথা — আমার লেখালেখি ওর পছন্দ নয়। আমি লিখি ও একেবারেই চায় না। ও গানে ফিরলে হয়তো আমি লিখবার একটু স্বাধীনতা পাবো।

মহিলা একটু অবাক। 'দুটোর মধ্যে শত্রুতা কোথায় ? 'ইগোর শত্রুতা হয়ত।' উঠবার আগে আমার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধের বইটা নিজে হাতে লিখে দিয়ে আসি। উপহারের ভাষায় একটু কৌশল থাকবেই। 'প্রতিবেশীদের — প্রতিবেশের প্রত্যাশায়।

অফিসের কাজে আমাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়। যে শিবিরে গিয়েছিলাম — মানুষের তৈরি করা সবুজের সমারোহ অথচ চারপাশটা অসম্ভব রুক্ষ। মাইল তিনেকের একটি কাঁটাতারে ঘেরা আয়তক্ষেত্র। প্রকৃত অর্থেই ওয়েসিস। ··· এই কাঁটাতারের বাইরে এক রুক্ষ প্রকৃতি। অথচ চোখ জুড়ানো সবুজ — অসাধারণ যত্নে লালিত গাছপালা। অনেক ফল গাছের নামই জানা নেই। ছোট ছোট কটেজ। সামনে ফুল পেছনে ফল সব্জি। আপাতদৃষ্টিতে বেহিসেবিভাবে বেড়ে ওঠা, কিন্তু সর্বত্র রয়েছে শৃঙ্খলা অযথা বেড়ে ওঠা গাছ, একটিও নেই। এমনকি ঘাসগুলিকেও সংযত নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনা হয়েছে। এমন কোন গাছ নেই যাকে বন্ধ্যা বলা যায়। কলকাতা অফিস থেকে বহু কর্তাব্যক্তির সমাগম ঘটে এর গেস্ট হাউসে রাত্রিবাসের আকাঙ্ক্ষায় — এই বাগান সন্দর্শনে সাহেবী কায়দায় হেঁটে বেড়াতে, এবং অবশ্যই কর্তৃত্ব করতে — যেটা কলকাতায় এদের পক্ষে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

দুটি সম্মানজনক দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। অবশ্য এ ব্যাপারে Camp-in-carge-এর সহায়তা এবং কিছুটা পক্ষপাতও হয়ত ছিল আমার

প্রতি। চীনা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলাম এক সময়। সেই সুবাদে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনা প্রতিনিধিদের সাথে শান্তিনিকেতন যাই। কিছুটা দোভাষীর দায়িত্ব নিয়েই। বিভাগীয় বিজ্ঞানী গুরুত্বপূর্ণ একটি পুরস্কার পেয়েছেন — তাকেও প্রাপ্যর চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় আমাদের Camp-এ — উদ্যোগ, দায়িত্ব ছিল আমারই ওপর। উতরে গিয়েছিল অনুষ্ঠানটি। সাহেবরা পিঠ চাপড়েছিল, দায়গুলো শেষ হলে যে প্রবন্ধের সূচনা করেছিলাম কলকাতায়, শেষ করি। এবং মিঃ বাগকে একখানা চিঠি লিখতে বসি। ইচ্ছে হলো গুছিয়ে চিঠিখানি লিখি। বলা বাহুল্য চিঠিখানা মিঃ বাগকে লেখা হলেও চিঠিখানার উদ্দেশ্য যে শকুন্তলা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থেকেই চিঠিখানা লিখি। লোভ হচ্ছে চিঠির পুরোটাই তুলে দিতে।

সুচরিতেষু.

হাতের লেখা অপরিচিত। ওপরে তাই নাম ঠিকানা কষ্ট করে লিখলাম। ধাঁধাঁ যেন না থাকে। একখানা ইংরাজী কবিতার Anthology পড়ছিলাম। শুধুই প্রেমের কবিতা। কবিতার কিছু পংক্তি শোনাতেও ইচ্ছে হচ্ছে। বয়সে আমি পরিণত, বয়স্ক। পঞ্চাশ ছুঁতে বেশী দেরি নেই। অথচ মনে হয় বয়ঃসন্ধিতে যেন এখনও আছি। কখনো কখনো আমার আচরণ এমনই হয়ে দাঁড়ায়। নয়ত আপনাকেই বা — বাংলার এই প্রান্তসীমায় ছোট্ট কটেজে বসে হারিকেনের স্তিমিত আলোয়, চিঠি লিখতে যাবো কেন ?

I turn to thee as some green afternoon turns to the sun set and is loathed to die.

sun set শব্দটাকে পাল্টে sun rise করা যায় কি ? অথবা midday sun ? green afternoon অবশ্য ঠিকই আছে, কি বলেন ? যেখানটায় আছি তার কাঁটায় ঘেরা প্রায় স্বেচ্ছাবন্দী। এই ঘেরাটোপের বাইরে গরু চরানো সেই রাখাল। হাতে কনচি — বেসুরো গলায় গান। তার বোন বা দিদি চলে আসে আমাদের শিবিরে গাই নিয়ে খাঁটি দুধ দিতে। সে কি সত্যি কখনো স্বপ্ন দেখে milk within her body's field / and hears far off, her muted children cry ?

এই রুগ্ন্য সুখ্য কিশোরী / হয়ত বা নারী কোন প্রভাবই ফেলে না আমার নাগরিক চেতনায়। যতই পল্লীশ্রী আমাকে এত মুগ্ধ করুক না কেন — আজও আমার প্রগাঢ় প্রতীক্ষা সেই নারীর জন্য যে

soft in speech, stately in walking / modest in gathering

and in everything declares her excellence

জানা আছে সে তো এক উটোপিয়া। তবু তারই তরে আমার নিয়ত সন্ধান. কাঁধে চড়ার / অথবা ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলার প্রাক মুহূর্তেও।

আপনাদের সাথে আলাপ-পরিচয়ের যে পর্যায়ে camp এ চলে এসেছি —তাতে কতটা কথা বলা যায় বা যায় না — সে মাত্রাজ্ঞান আমার নেই। তবু চিঠিও তো এক ধরনের আড্ডা — অথবা কথোপকথন ? আর বিষয় রাজনীতি সমাজ ছাড়িয়েও অনেক সময়ই প্রেমই প্রহর কাটানোর পরিণত প্রশ্রয় প্রত্যাশা করে। কেননা উভয়েই সন্তানের জনক — দীর্ঘ সময়ের উপান্তে কিছুটা কি ক্লান্তও নই — বেঁচে থাকার উত্তাপ — উত্তেজনা সৃষ্টিতে কৃত্রিমতাও কি নেই ? নিজেরই অজ্ঞাতে ? তবু কবিরা যখন বলেন।

...trust me, I no further meant / Than to be pleased and innocent, তারপরই কথা পাল্টে Blame menot, if at last I meant / More to be pleased than innocent — সমাজবদ্ধ মানুষের সেই দুঃসাহস কোথায় ? তার সাথী শুধু দীর্ঘশ্বাস আর ফিরে ফিরে ভাবা। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে ? বেঁচে থাকাটাই শুধু চলমান বেদনা। এই দেখুন না চীনা কবি লি পো'র সেই বিখ্যাত বন্দর-ব্যাপারীর স্ত্রীর দুঃখ কবিতাটাই ধরুন না কেন ? স্বামী চলে গেছে — বন্দরে বন্দরে বা ঘাটে ঘাটে রসদ ফেরি করতে। স্ত্রী দোরের কাছে ঠায় বসে। হাঁটুতে চিবুক। চোখে জল মুক্তোর মত টল্ টল্ করছে। silent tears. চৌদ্দয় আমার বিয়ে ষোলয় তুমি চলে গেছো। কিশোরী লজ্জা কাটিয়ে তোমাকে কাছে টেনেছি। 'I desire my dust to be mingled with yours' গাছের ওপর বাঁদর গুলো কিচির মিচির করে কান্নার সুরে। উঠোনে দরজায় শ্যাওলা জমেছে — এত বেশী যে তুমি না এলে সাফসুতরো করা যাবে না। যাবার সময় পা দু খানি কেমন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে গভীর অনিচ্ছায়। হেমন্তের পাতা ঝরে চলেছে। যুগল প্রজাপতি তাদের রং পাল্টে হলুদ বরণ ধরেছে। They hurt me — I grow older, 'কুখ্যাং নদীর কিনারে যদি তুমি এসে পৌঁছও — আমাকে জানিও আমি ছুটে চলে যাবো তোমার সাথে মিলতে।' এমনই কবিতা। এরই পাশাপাশি একটি বাস্তব ছবি — একটু ধৈর্য্য ধরুন। কলকাতার পথে অর্থাৎ ঘরে ফেরার পথে এক চাকুরিজীবি — হঠাৎ চুরি করে ছুটি ম্যানেজ করেছে দু তিনদিনের। ট্রেন ফেল করে। অবশেষে অনেক কসরৎ করে রাত সাড়ে এগারোটায় ঘরের কড়া নাড়া। ঘর থেকে — দরজা

খোলার আগেই ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া স্ত্রীর প্রবল বিরক্ত কণ্ঠস্বর, সেদিন গেলে — আবার আজই এসেছো ? চাকুরিজীবীর সেই আর্ত বেদনার্ত অব্যক্ত কণ্ঠস্বর Et tu Brute — Thou too Brutus ! সকাল থেকে খাওয়া নেই — বাড়ীতেও নেই । চিড়ে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে ডিনার । অতঃপর A wishing, unmoving lump he lies শরীরি কবিতায় যিনি সিদ্ধহস্ত সেই E. E. Cummings ও লেখেন I turn my face and hear one bird / sings terribly afar in the lost land.

যদিও ঘরে ফেরার পথে সে স্বপ্ন দেখেছে She would clips me to her breast and sucks me to her face / Her nimble tongue Love's lesser lightning. would play with my mouth / My fluttering soul, sprung with the pointed kiss / Hangs hovering over her balmy brinks of bliss / Whilst her busy hand would guide that part / In liquid raptures I dissolve all over / Melt into sperm, and spend at every pore."

তার নিজের হাতে গড়া ইঁটের গাথনি, সিমেন্টের ছাদ দুরন্ত ঘুরতে থাকা পাখার তলায় ঘুম না আসা চোখে সে অনুভব করে — নিজভূমে সে পরবাসী — তার বাড়ী lost land.

কিন্তু দেখুন বাগাবাবু আমরা কতই না আরাধনা করি — কতই না নিয়ত পূজা আমাদের — ওদের শরীরকে ঘিরে ? কী না অসহায় আত্মসমর্পণ । এমন মিনতি মাখা আরতির বিনিময়ে হয়ত কখনো শুধুই মোনালিসা হাসি — আর সেই সঞ্চয়টুকু বুকে ধরে রেখে একা বিছানায় স্বপ্নচারিণীকে নিয়ে কি নিবিড় সুখস্বপ্ন ! কবি প্রশ্ন তোলেন Scores of lovely gifted girls / Married impossible men / impossible men : idle. illiterate / Self-pitying, dirty sly. এই eulogy-র পর স্বয়ং কবির জিজ্ঞাসা ।

Or do I always overvalue woman / At the expense of man ? Do I ? / It might be.

অথবা কোন অনুষ্ঠানে হঠাৎ দেখা হওয়া একদা বান্ধবী আজ 'সুখী' পরস্ত্রীকে একটু কাছে পেতে কেন পুরুষের এই হ্যাংলাপনা ? একটু আড়াল খুঁজে বেড়ানো — যদি শুধু সেই হাসিটুকু পাওয়া যায় ! 'What length of labour I em.ploy / just to secure a short and transient joy. আঙ্গুলের স্পর্শটুকু যদি সে দেয় সবার আড়ালে — সে কি তার অসাধারণ মহানুভবতা ! যাবার বেলা — বড়ই সোহাগে স্বামী পদে বৃত

পুরুষটিকে সঙ্গে করে হাসির সীমিত রেখাটি মুখে রেখে ঈর্ষার আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে সে যখন Company ছেড়ে চলে যায় মনে হয় চীৎকার করে বলি ঃ

add not to his joy. by your consent. And let it not be given. but only lent, Return no kiss. nor move in any sort, Make it a dull and malignant sport.

কি ভয়ানক বায়নাক্কা বলুন তো ? একদা বান্ধবী / প্রেমিকা / সদ্যগড়ে ওঠা বন্ধুত্বের বিনিময়ে কি ভীষণ দাবি ! পুরুষের এমনই অলীক মোহচ্ছিন্নতা।

আমি দু-চার কলম লিখে থাকি। সময় চুরি করে আবডাল খুঁজে আমাকে লিখতে হয়। এ এক আমার অবৈধ প্রণয়! যে বইখানা আপনাদের দিয়েছি, পাঠকরা গ্রহণও করেছে — Review খারাপ করে নি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। ছেড়ে দিতে যে মন চায় না — শুধু হৃদয় উদ্দীপ্ত হতে চায় — আরও লিখতে, আরও লিখতে — পারি কই ? কেউ নেই, কিছু নেই সূর্য নিভে গেছে···সেই তো নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রির মায়ার মতো।

নিঃসৃত অন্ধকারের আর্তি আমার সমগ্র অস্তিত্বে। কাক ডাকছে। রাত শেষ। চিঠি — থুড়ি, চিঠি নয়। ভার লাঘবের বৃথা চেষ্টায় আত্মকথন শেষ করছি। চিঠি পাবার প্রত্যাশা তো থাকবেই।

—বিনীত

এর ক'দিন পরেই ফিরে আসি ক্যাম্প থেকে। হাতে দু'খানা অসাধারণ ফুলের গুচ্ছ। ক্যাম্প থেকে আমাকে দেওয়া উপহার, অন্যান্য উপহারের সঙ্গে। ট্রেনে অনেক সহযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলোই — অনেকের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। অনেক ফুলের নামই জানা নেই। রিক্সা থেকেই দেখতে পাই শকুন্তলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। সেই অসরল উদ্ধত ভঙ্গি। রিক্সা দাঁড় করিয়ে একটা ফুলের গুচ্ছ হাতে তুলে দিই। কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে ফেলি — 'সোমবার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সুরুচির সামনে সকাল ন'টায় অবশ্যই দেখা করবেন। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছতে গিয়ে।' দ্রুত নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাই।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। ঠিক ন'টায় শকুন্তলা চলে আসে। দোতলার কেবিনে বসতেই শকুন্তলা পর্দা টেনে দিতে বলে। কারণ অন্য কিছু নয় — এটা ওর এক সময়ের এলাকা। কারও চোখে পড়তে পারে। মুখোমুখি বসি দু'জনে। সামান্য খাবার অর্ডার দিয়ে চুপচাপ ওকে দেখতে থাকি।

'কি বলছেন — ডেকেছেন কেন ?

বুঝতে পারছো না — অসম্ভব. অন্যায় জেনেও তোমাকে ভাল লেগেছে। যেদিন বাড়ী দেখতে প্রথম এলে সেদিন থেকেই। হাতটা হাতে রাখি। সরিয়ে নেয় না। সংগীতার তুলনায় অনেক শক্তপোক্ত।

'একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিৎ। সংগীতাদি আপনাকে ভালোবাসে। আপনার সুখের সংসার। অন্তত তাই মনে হয় বাইরে থেকে। ভাল থাকুন। ভাল থাকার চেষ্টা করুন।'

'শকুন্তলা শোন আমি কিছুই চাই না। সংগীতা সম্পর্কে তুমি যা বললে — সে সম্পর্কে আমি কোন প্রতিবাদ করবো না। হয়ত সবই সত্যি। তবু তোমার কাছে একটা প্রার্থনা. তুমি আমায় লিখতে একটু সাহায্য কর। সংগীতা চায় না আমি আদৌ লিখি।'

'বাইরে থেকে উৎসাহের কি খুব দরকার আছে ? নিজেই নিজের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন না ! বাইরের উৎসাহটা নিছক অজুহাত নয় কি ?

ওর চেহারার মতোই কথায়ও শকুন্তলা যেন একটু তেড়া —

তবু বলি 'হতে পারে আমার ভুল. তবু মনে হয় উৎসাহ পেলে আমার লেখাটা অনেক স্বাভাবিক হতো। একটা কথা তোমার স্বামীকে লেখা আমার চিঠিটা পড়েছো ?

শকুন্তলা হেসে ফেলে। বলে 'ওকে লেখা না — আমাকে ?

'ছিঃ, কি সব লিখেছেন — ভাগ্যিস ও অত মনোযোগ দিয়ে ইংরাজী কবিতাগুলি পড়ে নি। ওর সেই ধৈর্যও নেই অবশ্য। তবে ভারি ভাল লেগেছে চিঠিটা। ধন্যবাদ।'

এই সময় আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'হাতে ওর মুখখানা ধরে অস্ফুটে উচ্চারণ করি — শকুন্তলা। তুমি ভারি সুন্দর।'

ও ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে দেয় —'হয়ত — আর এটাই আমার স্বাভাবিক চলাফেরার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'একটা অনুরোধ করবো সকাল পাঁচটায় তোমার ছাদের দরজার ছিট্‌কিনি খোলার শব্দ পাই। আমি তখন ছাদের ঘরেই পড়াশুনো করি। তুমি কয়েক সেকেণ্ড আমার জন্য দাঁড়াবে ?

'কেন এতে কি হবে ?'

'কথা না বলেও মানে না বলতে পারলেও চোখে চোখে কথা বলা হবে।'

'এই বয়সে এমন ছেলেমানুষি মানায় ?'

বেরোবার পথে হাতের ওপর একটু চাপ দিয়ে একটু আগে পরে বেরিয়ে আসি। শকুন্তলা অতি দ্রুত ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি খানিকক্ষণ আরও বসে আর এককাপ কফির অর্ডার দিয়ে ঘোরের মধ্যে বসে থাকি।

কি করছি আমি ? কেনই বা ? আমার সংগীতা সংঘমিত্রা। এত-দিনের এত নিবিড় দাম্পত্যজীবন। আজকে ওর রূঢ়তা ওর nagging স্বভাব সবকিছুর দায় তো আমাকেই নিতে হয়। দুবার করে ওকে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে রেখে যে ধরনের ওর ওপর মানসিক পীড়ন হয়েছে — আমার ভাগ্য ভাল যে ও উন্মাদ হয়ে যায় নি। সংগীতা গান ছেড়েছে বেশ করেছে। ঠিক ঠিক বিচার করলে আমিই বা কতটুকু করেছি ওর গানের জন্য ? শুধু ওকে ব্যবহার করা ছাড়া ? তার চেয়ে বোধহয় বড় কথা — আমার রাজনৈতিক বন্ধুরা কি বলবে আমাকে ? আজ বিপ্লবী জোয়ার নেই বলেই···যা মন চাইছে তাই করার অধিকার আমার আছে ? সংগীতাকে ওরা সকলে ভালবাসে। আমার বাসায় ওরা রাতের পর রাত কাটিয়েছে। সংগীতা অনেক কষ্ট স্বীকার করে ওদের আতিথেয়তা করেছে। আজ ওরা কেউ কাছেপিঠে নেই বটে — কিন্তু আমাকে যদি হঠাৎ করে কাছে পায় এবং শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয় — কি করেই বা ওদের দোষ দেবো ? সংগীতা কমরেডও নয় — কিন্তু ওদের সকলের বন্ধু। নানা সম্বোধনে ওরা ডাকতো সংগীতাকে। কমরেড কেউ ডাকতেন শ্রীমতি বলে। রাতে কয়েকবার কালো চা করে খাওয়াতো সংগীতা। শুতেন না। ইজি চেয়ারটায় বসে ঝিমোতেন। বরিশালের কমরেড তারক গুহঠাকুতা — বলা নেই কওয়া নেই — রাতের যে কোন প্রহরে তার হাজিরা। দরজায় আলতো টোকা বুইনডি আছো ? ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালিয়ে সংগীতা ব্যস্ত হয়ে পড়তো। 'বুইনডি ব্যস্ত হইও না রাত্তিরের খাওনডা লগে লইয়া আইছি। তুমি আমারে একটু গরম জল করিয়া দেবা ? অসুবিধা হইলেও দিতে হইবে — ওষুধ খামু।' সংগীতার ঘোর কাটলে বলতো, 'তারকদা একটু চা করি ?' দেবা, দেও। রাত তখন প্রায় শেষ। রমজানের মাস। বাস্তুতে ধীরে ধীরে কোলাহল বাড়ছে। দিনের আলো ফুটবার আগেই খেয়ে নেবার প্রস্তুতি ঘরে ঘরে। সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে চলেছে মিষ্টি সুরে একটি দুটি মানুষ। সারামাস সে ঘুম ভাঙ্গাবে। রমজান মাসের শেষে সে ঘর ঘর থেকে দান পাবে — একটি করে লুঙ্গি ও একটি করে টাকা।

প্রতিদিন আমারও ঘুম ভাঙ্গতো। জেগে উঠে দেখি — সংগীতা আর

তারকদা গল্প করছে। ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। আমি নিজে উঠে পড়ে চা চাপিয়ে দিই। পার্কসার্কাসের সেই এলাকা পাল্টে নতুন অঞ্চলে এসেও সেই স্মৃতি বয়ে বেড়াই। নিজের স্বভাবের দ্বিচারিতায় অপরাধ বোধে আক্রান্ত হয়েও ভেসে যাই শকুন্তলার মাদকতায়।

ভোর পাঁচটায় দেওয়াল ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। শকুন্তলাও সশব্দে ছিটকানি খোলে। পরনে নাইটি। আমি চিলে কোঠার কোণায় দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকা। ব্যাস। এটা প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়ালো। এবং উভয়ের এই নিঃশব্দ সাক্ষাৎকার বেড়ে যেতে থাকে। হয়ত ধরনটা স্বাভাবিক হতো বয়ঃসন্ধিতে। পঞ্চাশ চল্লিশে আমরা মিলতে থাকি। আমি রাস্তায়, বাজার থেকে ফিরি। স্নান সেরে ওপরে ওঠার জাফরিতে দাঁড়ায় সংগীতা। আমি বাথরুমে স্নান করতে করতে কবিতা আবৃত্তি করি উল্টোদিকের ডাইনিং হলের পর্দার ওপার থেকে এক টুকরো দেখা। 'আমার নতুন লেখা বেরিয়েছে' জানাই শকুন্তলাকে। ওদের বাড়ীর সামনে। শুনবে না ? অনেক চিঠিও আসতে আরম্ভ করেছে। সম্পাদকের দপ্তরে।

'বাড়ীতে নিয়ে আসুন দুজনে মিলে শুনবো।'

'না, তোমার বরকে শোনানোর আমার একটুও ইচ্ছে নেই।' কোথায় শুনবে বলো।

একটু ভেবে তারিখ ও সময় বলে দেয়।

রেষ্টুরেণ্টের ঘেরাটোপের মধ্যে ওকে আমার লেখা পড়াই। নিজের লেখা নিজেরই খারাপ লাগে না। সম্পাদকের কাছ থেকে চিঠিগুলিও নিয়ে এসেছিলাম। পড়ি সেই চিঠিগুলিও। শকুন্তলাকে মনে হল আমার লেখা থেকে সম্পাদককে আমার সম্পর্কে লেখাগুলো বেশি উদ্ভাসিত করলো। কেবিনে মুখোমুখি বসেছিল। ঘুরে পাশে এসে বসে। আমার মাথার চুলগুলি নিয়ে একটু খেলা করে। ধীরে ধীরে আমার মাথাটা নিয়ে বুকের কাছে রাখে। 'কি করলে তুমি আমার শুকুলবাবু। আমার রাতের ঘুম গেছে। স্বামীর দিকে স্পষ্ট তাকাতে পারি না। আমার সন্তানদের যত্ন কমে গেছে।'

একটু থেমে আবার বলে, তুমি জানো না কতবার ছুটে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। ঝোলা কাঁধে একমাথা এলোমেলো কোঁকড়ান চুলওয়ালা ছোটখাটো লোকটা কখন ফিরবে! একপলক দেখলে ছটফটানিটা কমে যায়। বেশ ছিলাম আমি — কেন এমন করে ঘুম ভাঙ্গালে তুমি আমার ?'

কোন জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে ওর আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করতে

থাকি ।

তাই তো বলি বি-এডটা দিয়ে দাও । শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে কি করবে ? মেয়েরাও বড় হয়ে গেছে ।

'দেখি. তিনি আবার চান না — আমি ট্যাং-ট্যাং করে তেতে পুড়ে বাইরে যাই রোজ । তবু আমি চেষ্টা করবো কিছু একটা করতে ।

'বি টি ভর্তি হলে দেখা করার অনেক সুবিধে হয়ে যাবে — কি বলো ?

'এমনি যেন কম হচ্ছে ?'

'তোমাকে তো আজ অবধি সম্পূর্ণ দেখতেই পেলাম না ?

'এই তো দেখছো — ছাদে দেখছো — জানালায় দেখছো, আশ মেটে না — না ?

এ ভাবে নয় বাগবাবু তোমায় যে ভাবে দেখে যেমন খুশি দেখে ।

'অসভ্য ! তা হয় না — তা হয় না শুকুলবাবু ।'

কিন্তু শকুন্তলার প্রতিবাদ প্রতিরোধ বেশিদিন স্থায়ী হয় না । হোটেলে যেতে রাজি হয়ে যায় । শর্ত আরোপ করে কিছু করা হবে না ।

হোটেলের দরজা বন্ধ করে রবীন্দ্রনাথের গানকে কবিতা করে আবৃত্তি করি — 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা. তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে । ভারী সুন্দর করে শাড়ি পরে শকুন্তলা । শরীরকে না দেখিয়ে সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে । ও ঢুকেই ঢকঢক্ করে এক গ্লাস জল খায় । 'দেখ তোমার তেষ্টা আমি মেটালাম ।' সেই আধশোয়া উদ্ধত ভঙ্গিতে খাটে শোয় । মাথার নীচে হাত ।

এটা কি হচ্ছে বলো তো, আমরা কোথায় চলেছি ?

—জাহান্নামে ।

—আমি তো সেটা চাই না । আমার দুটি সন্তান আছে । তোমারও আদরের সংঘমিত্রা রয়েছে । সংঘমিত্রা নামটা শুনেই বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে ।

আমি ওর পাশে শুয়ে পড়ি । বুকের শাড়ী সরিয়ে মাথাটা অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে ধরে রাখে শকুন্তলা । বলে, কথা বলো না । ব্লাউজের হুক ধরে টানটানি করি । উত্তেজনায় খুলতে পারি না । ছিঁড়বে তুমি । আলতো করে খুলে দেয় — খুলে দেয় ব্রার হুকও । একটু আলগা হয়ে শাড়ীটা খুলে ছড়িয়ে রাখে শরীরের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে থাকে । ব্লাউজটা ধীরে ধীরে খুলে ফেলি । ব্রাটা তখনো বুকের ওপর — যদিও খোলা আলগা । ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যাওয়া স্তনাঞ্জলিতে ঠোঁট রাখি । ভারি নরম আর কোমল হয়ে যায়

শকুন্তলা। আমার মাথার চুল নিয়ে ধীরে ধীরে খেলা করে। আমি ঠোঁট সরাই না। অনেকক্ষণ পরে মাথাটা একটু তুলে অন্য বুকে আমার ঠোঁট এগিয়ে দেয়। 'ভারি সুন্দর বুক খাও তুমি।' মুখ তুলে বলি — জানি না তো — এত দীর্ঘ সময় বুক খাবার সুযোগ তো হয় নি। শকুন্তলা — সংগীতা প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায়। শর্ত আছে সবকিছু হবে না। আমি পেটিকোটের দড়ি খুলে সরিয়ে দিই। দীর্ঘ উরু — এত ফর্সা! কিন্তু সারা উরুতেই ছিট্‌ছিট্‌ এবং সংগীতার মত লোমহীন মসৃণ নয়। হঠাৎ আমি চুল এনে সামনে দিয়ে দিই অতি কৃষ্ণবর্ণের কুঞ্চিত ঘন জঙ্গলে পূর্ণ উরু সন্ধিস্থল ছু'য়েছে ওর দীর্ঘ কেশ। অনেকটা 'ভেনাসের জন্ম' ছবিটির মতো। আমি সারা শরীরে হাত রাখি। হঠাৎ ও আমাকে টেনে শুইয়ে দেয় — পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে। আমি যেন ছোট্ট হয়ে ওর মধ্যে লুকিয়ে পড়ি। তখন ও আবার আমার ঠোঁট নিয়ে ওর বুকে রাখে। প্রবলভাবে পাখা চলা সত্ত্বেও দু'জনে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। আমার প্রবল শক্তিকে সংযত রেখে, চুম্বনে ভরিয়ে দিই ওর সমস্ত শরীর।

'মেয়েকে নাচের স্কুলে নিয়ে যেতে হবে — এবার ওঠো তৈরি হই।'

'কথা রেখেছি কিন্তু শকুন্তলা!'

'কথা না রাখলে তুমি তো খুব ছোট হয়ে যেতে আমার কাছে।' একটু থেমে বলে — শরীরি ব্যবহারে একজন পুরুষের সাথে অপর একজনের কত তফাৎ। তুমি কি শান্ত অথচ তীব্র।

সে পার্থক্য তো দুই নারীতেও শকুন্তলা।

দরজা খুলবার আগে পূর্ণ দৃষ্টিতে শকুন্তলা তাকায়। বলে অত সকালে ঠাণ্ডা জলে চান করবে না। জল নিজে গরম করে নিতে পারো না?

আর একবার আমার চুলটা ঠিক করে দিয়ে বলে, 'ভাল থেকো'।

'কবে দেখা হচ্ছে?' আমার প্রশ্ন?

'বলে দেবো — জানালা দিয়ে।' তোমার নতুন লেখার খবর কি? বলছিলে নজরুলের ওপর একটা কাজ করছো?'

ভাবছি, সময় পাই না। লুকিয়ে লুকিয়ে আর কত লেখা যায়।

'তুমি লেখ লেখ — শুকুলবাবু। আমি আছি। তুমি না লিখলে আমি কিন্তু নেই।'

বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কটা একটু আলগাই হয়েছে। আমার কন্যা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সেটা টের পায়। মাঝে মধ্যেই বিশেষ দৃষ্টিতে তাকায় — মাকে

জিজ্ঞেস করে 'বাবার কি হয়েছে বলো তো ? কেমন কথা কম বলে — আনমনা।'

'রোগে ধরেছে — আবার কোন বিপ্লব করবে দ্যাখ্।'

হ্যাঁ। বিপ্লবই বটে। ব্যক্তিজীবনে অঘটন। শকুন্তলা মাঝে মধ্যেই প্রশ্ন করে 'এভাবে কতদিন চলবে — দু নৌকোর পা দিয়ে ? একটা কিছু সিদ্ধান্তে তো আসতে হয়।' এই ধরণের চূড়ান্ত কথাবার্তায় ঘাবড়ে যাই বই কি। সেদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে কথা হচ্ছিল। নিয়ে গিয়েছিলাম শকুন্তলাকে। প্রায় জোর করেই। মুসলিম রক্ষণশীল পরিবারের মতন শুধুই পর্দানশীন হয়ে কথা কইতে ভাল লাগে না। রাস্তায় এক পা ওর সঙ্গে এক সঙ্গে হাঁটি নি কখনো। নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ানো দ্রুত পর্দা ঢাকা কেবিনে ঢুকে যাওয়া এটাই বাধ্যতামূলক গোপনীয়তা রক্ষা করার উপায়। বিশাল রিডিংরুমটা দেখে শকুন্তলা তাই মুগ্ধ। 'তুমি কোথায় বসো ? শকুন্তলা প্রশ্ন করে। কোন ঠিক আছে নাকি ? যখন যেটা খালি পাই, বসে পড়ি — তবে ঐ দিকের কোণের চেয়ারটাই আমার পছন্দ। শকুন্তলা খালি দেখে নিজেই বসে পড়ে। টেবিলটা শাড়ির আঁচলে মুছে দেয়। অনেক পাঠকই চোখ তুলে ওকে দেখতে বাধ্য হয়। পড়াশুনোর জন্য যে আসে নি সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না কারও। খানিক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকি। Reserve করা আমার কখানা বই ছিল। নাবিয়ে দেখাই ওকে। সাধারণের নাম না জানা কয়েকখানা উপন্যাস। এই অবহেলিত লেখকদের নিয়ে একটা কাজ করছিলাম। অফিস থেকে ছুটি নিয়েই লাইব্রেরীর কাজ করেছি। সংগীতা অবশ্য জানে না — অফিসের সময়ই বেরিয়ে যাই রোজ। লাইব্রেরীর বিশাল লন। যত্নে বেড়ে ওঠা নানা গাছের যেন সাজানো বাগান। পোক্কা মাকড় বাঁচিয়ে সাবধানে বসি ঘাসের ওপর। এই বিশাল প্রান্তরের অসাধারণ সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করে। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে বারান্দায় দাঁড়ালে মনটা আবার সজীব হয়ে ওঠে। তাজা বাতাস মন ভরায়। ক্যান্টিনে এক কাপ চা খেয়ে আবার বসতে উৎসাহিত করে।

এই সবই বলছিলাম শকুন্তলাকে। 'শুকুলবাবু কলকাতার এই জগৎটা আমার অজানাই ছিল। তোমার সাথে পরিচয় না হলে জানতেই পারতুম না হয়ত। প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে আবার পড়াশুনো করি। তুমি সাহায্য করবে তো ?

'এটা প্রশ্ন হ'লো ? জবাব তো তুমি জানোই।'

সময় আমাদের নির্দিষ্ট। কথাবার্তা মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ীর পথে। একটা অদ্ভুত দৃশ্য — চমকে

উঠি। আমার কেরোসিন তেলের দোকান বাড়ী থেকে অনেক দূরে। সেই লাইনে সংগীতা দাঁড়িয়ে টিন হাতে। বিরাট লাইন। শকুন্তলা দেখতে পায় নি। জিজ্ঞেস করে, 'হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে ?' কিছু না, ভাবছি। কোথা থেকে কি হয়ে গেলো।

আমি এই সময় কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি কোচিং সেন্টারে পড়াতে শুরু করি। উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজী পড়াই। অতি দ্রুত আমি একজন জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে পরিচিত হয়ে যাই। সপ্তাহে দু তিন দিন ছ'টা থেকে ছ'টা দশের মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। আমার দরজা খোলার একটা শব্দ হয়। শকুন্তলা পর্দা সরিয়ে একবারটি দেখে। আমি যেন সারাদিনের অক্সিজেন ভরে নিই। সংগীতার প্রতি কিছুটা অভিমানে প্রবল বর্ষাতেও আমি ছাতা নিই না। ছাতা হারানো আমার এক অদ্ভুত প্রকৃতি। বিচ্ছিরীভাবে সংগীতা বকাবকি করে। এদিকে শকুন্তলা ডাইনিং হলের পর্দা সরিয়ে প্রবল ভাবে বোবা অনুরোধ করে ছাতা নিতে। এই ইংরেজী ক্লাশ নেওয়া আমার মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। নিজের ওজন নিজের কাছেই যেন কিছুটা বেড়ে যায়। চার পাঁচটা ছোট ছোট ঘর নিয়ে এই কোচিং সেন্টার। সিমেন্টের পলেস্তারা উঠে যাওয়া দেওয়াল। লোডশেডিং হ'লে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। ছেলেমেয়েদের আলাদা বসার রীতি নেই। ক্লাশের মধ্যেই লক্ষ্য করি, একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আবার হায়ার সেকেণ্ডারী শেষ হতে ফুরিয়েও যায়। পরীক্ষা নেবার নিয়ম চালু করতে গিয়ে ব্যর্থ হতে হয় বারবার। পঁচিশ জনের মধ্যে পাঁচ জনের বেশী হাজির হয় না। পুরস্কার ঘোষণা করতে হয়। অনেক সময় একটু দেরী করে ক্লাশে ঢুকি। কিছুটা নিজের দর বুঝতে। লক্ষ্য করি অধীর আগ্রহে ছাত্রদের প্রতীক্ষা। ক্লাশে ঢুকতেই সকলের মাথা নীচু। আগের দিনের পড়ানো বিষয় নিয়ে নানা ছোট ছোট প্রশ্ন করি। মাত্র কয়েকজনই সুন্দর উত্তর করতে পারে। প্রশ্ন শেষ হলে ঘোষণা, 'নাও এবার পড়াই।' ছাত্ররা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একটা ছোট মৃদু গুঞ্জন। পড়ানো শুরু করতেই আবার ক্লাশ নিস্তব্ধ। বড় মনযোগে আমার পড়া শোনে ওরা। আমি নিজের নতুন পরিচয়ে একটু কি অহংকারী হয়ে উঠি ? বিশেষ কবিতা বা গদ্য পড়াবার সময় অন্য কলেজের ছাত্ররাও ভীড় করে Principal-এর অনুমতি নিয়ে। খুবই উপভোগ করি ছাত্রদের মধ্য থেকে ওঠা নানা প্রশ্ন। রোমান্টিক গল্প খুবই আবেগে পড়াই। সব মিলিয়ে এক নতুন জগৎ, নতুন অভিজ্ঞতা — এই বড় বয়সে।

দেখতে খারাপ হলেও যে ছাত্রী ভাল উত্তর করতে পারে তাকে একটু বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। আপাত ugliness আমার কাছে সৌন্দর্য্য হিসেবে দেখা দেয়। জানি না সংগীতার শারীরিক সৌন্দর্য্যের অভাব এর পেছনে কারণ কি না। বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে — এমন একটা ধারণা তৈরী করে নিজেকে বেশ স্বতন্ত্র ভাবতুম। অযথা smart হতে চেষ্টা করে বোকা বোকা কথা বলাই মেয়েদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শকুন্তলারও সেই চেষ্টা ছিল আমার সাথে সম্পর্কের আগে পর্যন্ত। সম্পর্কের পর সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করে। মাঝে মধ্যেই বলে, কোন আলোচনা হলে, 'সংগীতাদি অনেক বেশি জানে বোঝে। ভাল ব্যাখ্যা করে। ওর কাছে আমি একেবারেই মুখ্যু।' মনে ভাবি হয়ত তাই — তবু তো সংগীতাদি ছেড়ে তোমাতে মজেছি কারণ ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় বুদ্ধির সৌন্দর্য্য নয় — শরীরী মাদকতা ? এই মাদকতায় যখন মজে আছি — শকুন্তলা রেষ্টুরেন্টের কেবিনে বসেই এক বিচিত্র আমন্ত্রণ জানায়।

বাগবাবু দেশের জমি জায়গা দেখতে গেছে। সংগীতা অনেকদিন ধরেই দিদির বাড়ী যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যাওয়া হয় নি। শকুন্তলা কৌশলে মেয়েদের মামা বাড়ী রেখে আসে। আমার রাত্রের খাবার আসে শকুন্তলার বাড়ী থেকেই। খাবারটা পৌঁছে দিতে এসে শকুন্তলা বলে যায় রাত বারোটায় এসো আমার ঘরে।' খুব ছোট একটা টর্চ ওর হাতে। আমাকে শুইয়ে দিয়ে ও পাশে বসে। অন্ধকার। টর্চটা কখনো জ্বালায় নেবায়। নাইটি পরা শকুন্তলা। ধীরে ধীরে কথা বলে আর নানা রকম আদর করে। ভারী সুন্দর আক্রমনাত্মক কোমলতা। এত নরম করে আদর করে। একেবারেই ওর শক্ত শরীরের বিপরীত। আধশোয়া হয়ে অন্ধকারেই আমার মুখখানা নিয়ে নেয় বুকের কাছে। একটিই শব্দ 'খাও'। আমার ক্লান্তিহীন খেয়ে চলাতে ওর এক অদ্ভুত প্রশান্তি বোধ হয়। অবশেষে প্রশ্ন করি 'আজ কি হবে ?' 'তোমার যা খুশী'। শকুন্তলার এই জবাবে — আমার খুশীর অন্ত থাকে না। উদ্দাম খেলায় মেতে উঠি। দুটি গাড়ীর স্নিগ্ধ সংঘর্ষ যেন চলতে থাকে। তীব্রভাবে সাড়া দেয় শকুন্তলা। মেতে ওঠে নানা খেলায়। অবশেষে ওর বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ি। শকুন্তলা আমার এক মাথা কোঁকড়া চুলে বিলি কাটতেই থাকে। নাবতে দেয় না বলে 'শুয়ে থাকো — নাবব না। মাঝে মাঝে টর্চটা জ্বালায় নেবায়। প্রায় যখন রাত্রির শেষ প্রহর ও আমাকে পৌঁছে দেয় আমার ঘরে। যাও এবার ঘুমোও — খুশী তো ? আর একবার চুম্বন

করে ফিরে আসি ঘরে।

এত শান্তিতেও ঘুম আসে না। সংগীতা বাড়ী নেই। বাড়ী নেই আমার একমাত্র সন্তান। কি খেলায় আমি মেতে উঠেছি? কোথায় এর পরিণতি? রেকর্ড প্লেয়ারে ক্যাসেট লাগানোই থাকে। volume ছোট করে চালিয়ে দিই। 'দূরে কোথায় দূরে দূরে / মন বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।' মনে হল সংগীতাই কোন দূর থেকে গাইছে। সংগীতার সাথে কাল্পনিক কথোপকথন চলতে থাকে। কেন আমায় দূরে সরিয়ে রাখছো সংগীতা? কেন আর আগের মতো ডাকো না? কেন আমায় গান শোনাও না আগের মতো? তোমার গানই আমাকে পাগল করেছিল। আমার গভীর আলিঙ্গনের মধ্যেও আমাকে গান শুনিয়েছো বহুদিন। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দ ছিল তোমার গান। আমার ব্যক্তিত্ব নেই — আমার বাড়ী তোমায় অত্যাচার করেছে — আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারি নি, পাহারা দিই নি তোমাকে — তুমি depression এর পেশেন্ট হয়েছো — সে তো আমার জেলে যাবার সময়। ফিরেই আবার নরককুণ্ড থেকে নিয়ে এসেছি তোমাকে — যদিও আমার বিধবা মাকে আমার সঙ্গেই রাখতে হচ্ছে — তার আচরণ ভয়ানক দজ্জাল শাশুড়ীর মতোই — কিন্তু কি করবো বলো। যাদের মদতে এবং স্বভাবে সে আমার সংসারে প্রভুত্ব করে চলেছে তারা তো তাকে আজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? এই সব ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি। উঠেছি বেলায়। প্যাসেজে গলা খাকারি দিতেই জানালার পর্দা সরিয়ে দীর্ঘ ফর্সা বাহু প্রসারিত করে শকুন্তলা দেখায় সমস্ত শরীর ব্যথা করে দিয়েছো। আমি আওয়াজ করেই বলি: 'বেশ করেছি।'

এই সময় কাজী নজরুল ইসলামের ওপর একটা বড় কাজে হাত দিই। নজরুলের ব্যক্তি জীবনের নানা প্রেম কাহিনীও একটা চ্যাপ্টার। মূল ব্যাপারটা অবশ্য অনেক বড়। পশ্চিমবঙ্গ এবং সদ্য গড়ে ওঠা বাংলাদেশে নজরুলের আলোচনার প্রকৃত স্বরূপ কি? রচনাটা তৈরী করতে বাংলাদেশ লাইব্রেরীর সহযোগিতা পেয়েছি খুব। পার্কসার্কাসের এই পাঠাগার আমার খুবই প্রিয় জায়গা। সুযোগ সৃষ্টি করে শকুন্তলাকে এখানেও একদিন নিয়ে আসি। পরিচয় করিয়ে দিই লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে। একেবারে ফাঁকা। টেবিলে বই থরে থরে সাজানো। সবই নজরুল সংক্রান্ত — এবং আমারই বার করা। শকুন্তলা একটু উল্টেপাল্টে দেখে। বিশেষ করে মহম্মদ নাসিরুদ্দিন সম্পাদিত 'সওগাত্' পত্রিকার বিশাল ইতিহাস এবং তার কলেবর দেখে একটু অবাকই

হয়। বিভিন্ন র‍্যাক দেখে ওর বিস্ময় যেন ঘোচে না। 'এত লেখক রয়েছে বাংলাদেশে — যাদের নামও শুনিনি কখনো ?' আমি বলি, 'তুমি কেন — এপার বাংলার বহু লেখকই ওপারের বহু লেখকের নাম শোনে নি। যখন খুব দায়ে পড়ে কিছু লিখতে বা বক্তিমে করতে হয় — তখন একটু খোঁজ খবর করে। এমন কি নজরুল সম্পর্কে যে তথ্য আমি এখানে পেয়েছি — কলকাতার কোন লাইব্রেরীতে তা পাওয়া যায় নি। মুজফ্‌ফর আহমদের বইখানা মনে রেখেও একথা বলা যায়।

সোহারাবর্দী এ্যাভিন্যুর পাশেই পার্কসার্কাস ময়দান। ওপারে লেডী ব্রেব্রোন কলেজ। হাঁটতে ইচ্ছে হলেও হাঁটা সম্ভব নয়। লাইব্রেরীর পাশেই একটি দরগা। লোকে বলে বাবা ভোলে শাহর দরগা। প্রচলিত ধারণা দুশো বছরের ওপর হয়ে গেছে এই দরগার বয়স। এখন চকমকি পাথর আর মোজেক করে চেহারা পাল্টানো হয়েছে। শকুন্তলাকে বলি, আগরবাতি জ্বালাবে ? 'আমার কোন ধারণা নেই — তুমি বললে জ্বালাবো। লোভ হলো ওকে আমার পুরোনো পাড়া দেখাই। সার্কাস এ্যাভিন্যু তখনো বুলেভার্ডের মতো লাগে। দু পাশে উঁচু, অনেক উঁচু কৃষ্ণচূড়া। আমার প্রথম যৌবনের অতীতটা সামনে এসে দাঁড়ায়। পাকিস্তান হাই-কমিশন তথা বাংলাদেশ উপদূতাবাস। হাঁটতে হাঁটতে কি প্রার্থনা করলো কে জানে ! আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অতীত এই দরগার প্রতি অবাঞ্ছিত প্রীতি দীর্ঘদিনের।

লোয়ার রেঞ্জের কাছে চলে আসি। বলতে ভাল লাগছিল কোন বাড়ীতে কোন খ্যাতিমান লোকের বাস। কোথায় বিলায়েত হোসেন খাঁ থাকতেন। কোথায় নাসিরুদ্দিন রোডে শম্ভু মিত্রের ফ্লাট। আমাদের লেখকবন্ধু মাহমুদ আহমদ কোন গলিতে থাকতেন। বস্তী আর বাড়ীর এমন নিবিড় সান্নিধ্য খুব একটা চোখে পড়ে না অন্য কোথাও। এটা পার্কসার্কাসেরই বৈশিষ্ট্য। রাস্তার কলের এক বালতি জলের জন্য মারামারি। আর তারই পাশে অভিজাত ফ্লাটে গীজারে গরম ঠাণ্ডা জল। নানা বিদেশী উপকরণে সাজানো 'বড়লোকের বস্তী'। শ্রেণী পার্থক্যর এত ঘনিষ্ট সান্নিধ্যের মধ্যে থেকে পার্কসার্কাস আমার কাছে খুবই আদরের হয়ে উঠেছিল। আমি যখন এই অঞ্চলের বাসিন্দা — সংগীতাকে নিয়ে যখন খুশীর সংসার — ওকেও আকর্ষণ করাতে পারি নি — অঞ্চলের বিচিত্র চরিত্র সম্পর্কে। বৃথাই বর্ণনা করতে চেয়েছি বেশ কিছু আবেগের সঙ্গে যেহেতু এই বস্তীগুলোই ছিল আমাদের রাজনীতির মূল এলাকা। তীব্র ভালবাসাও ছিল আমাদের সাথে। এই

দুপুর বেলাতেও বস্তীর ঝিমিয়ে পড়া ভাব নেই। শকুন্তলা বলে, 'এবার আমার যেতে হবে — তোমার মনে হচ্ছে তাড়া নেই। ট্যাক্সি ডেকে দাও — আমি ল্যান্সডাউন যাবো।' 'এত ক্ষেপে গেলে কেনো — পার্কসার্ক'স আমার অস্তিত্ব তাই একটু ভাল লাগে এখানে এসে পড়লে।' 'আমি কি কিছু বলেছি?' শকুন্তলার সেই বাঁকা প্রশ্ন। 'বলো নি — বুঝিয়েছো' আমার আরও শান্ত উত্তর। ওর বাপের বাড়ীর একটু দূরেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিই। শকুন্তলা আমার হাতটা একটু ধরে নেবে যায় ট্যাক্সি থেকে। আমি আবার ফিরে আসি বেক্‌বাগানের কাছে। দীর্ঘকাল পরে আমার যৌবনের উপবনে হাঁটতে থাকি। খুবই ধীরে ধীরে এগোই। ঢুকে পড়ি আহিরিপুকুর বস্তিতে। দু'পাশে একদা সারি সারি বস্তি ভেঙ্গে অনেকগুলোই এখন 'হাই রাইজ'। লাইটপোষ্টে ঝাণ্ডা লটকানো। আমার হাসি পেলো। আমাদের ঝাণ্ডা লাগাতে হয় নি। বস্তী আমাদের আপন করেছিলো — বড়ই আপন করে নিয়েছিল। অনেক গোপন মালপত্র রাখার ঠিকানা। রেইড হয়েছে, প্রায় কিছুই পায় নি কখনো। খানিকটা এগোতেই চোখে পড়লো রাস্তার কলে এক মহিলা বাসন ধুচ্ছে। চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ট্রাম শ্রমিক সামাদদার বউ? বাঙ্গালী মুসলমান। সামাদ দা. কায়ুম আমাদের কমরেড। সমস্ত বস্তীটাই তখন প্রায় আমাদের মুস্তাঞ্চল। অনেকগুলো ঘর আমাদের ঠিকানা। তিনজন কমরেড শহীদ হয়েছে এই বস্তী থেকেই।

'বৌদি না?' সজাগ করি।

মহিলা কাপড় ঠিক করে ওপরে তাকায়। একটুক্ষণ তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'শুকুল ভাইয়া?'

'তোমাদের ভুলি কি করে শুকুল-ভাই?'

'এস ভেতরে এস। তোমাদের সামাদদা তো অসুস্থ। ঘরে শুয়ে।' মাথা নীচু করে ঢুকে যাই। প্রায়ান্ধকার। একটা খাটিয়ায় জরাজীর্ণ শরীর নিয়ে শুয়ে আছে সামাদদা। হাত বাড়িয়ে দিয়ে সেই পুরোনো আবেগেই ডেকে উঠি 'কমরেড'। সামাদ দাও ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেয় 'কমরেড'। সকলের খোঁজ খবর নিল। কি করছি এখন — প্রশ্নে মনটা খুবই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। একটা অপরাধবোধ কাজ করে। 'ঐ একটু আধটু লেখালেখি করি আর চাকরি।' সামাদদা কি কোন দীর্ঘশ্বাস চাপলো? পকেটে যা টাকা পয়সা ছিল দিয়ে এলাম পথ্য খাবার জন্য। সামাদ দা দ্বিধা করলো না গ্রহণ করতে। ফেরার পথে যেন আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল কমরেড আমরা আছি।

তোমরা হেরে যেও না। দু হাতের মধ্যে হাতখানা নিয়ে বলে উঠলো। আমার চোখে জল-এল কেন ? বস্তীর ভেতরকার রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গেছে। আরও কিছুটা এগিয়ে রফিক সাহেবের ঘরের সামনে দাঁড়াই। রফিক সাহেব ধরা পড়ার পর নিখোঁজ হয়ে যায়। তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। রফিক সাহেবের স্ত্রী আমাদের সকলের দুলহন ভাবী। কি সুন্দরই না ফিরনী বানাতেন! সামনের একটা কারখানায় কাজ করতেন। অত্যন্ত দক্ষ মেকানিক। দুলহন ভাবীর অনেক বয়স হয়ে গেছে। দেখতে পান না ভাল। পরিচয় দিতে চিনলেন। ছোট মেয়ে বুড়ি মাঝখানে থেকে কথা চালিয়ে গেল। ও আমাকে চিনতেই পারে নি। ওর পাকা পাকা কথায় ওকে বুড়ি বলে ডাকতুম সবাই। সে কান্নাকাটির একশেষ। ও পাল্টা আমায় নাম ধরে ডাকতো। 'তুমি শুকুল — চাচাও নয় ভাইয়াও নয়।' মা বকলে বলতো 'তোমাদের শুকুল ভাই আমাকে বুড়ি বলবে কেন ?' ফেরার সময় রেহানা ওরফে বুড়ি ধীরে ধীরে দরজার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে বলে 'শুকুল চাচা — ফির আনা — জরুর আনা।'

কেমন আত্মগ্লানিতে ভরে যায় মনটা। পাঁউরুটির কারখানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি খানিক্ষণ। ভেতরে যাই না। অনেক বই এই কারখানার ভাটিতে আহুতি দিতে হয়েছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসে। ঘরে ফেরার কোন জোর পাচ্ছি না। লোয়ার রেঞ্জ বেকবাগানের কাছে বহু পুরোনো হোটেল। বেশ নোংরাই। বহু কমরেডকে এখানে 'নেহারী' আর পরোটা খাইয়েছি। নেহারী অনেকটাই টেংরীর ঝোল। বস্তী অঞ্চলের সস্তায় জল-খাবার। অবাঙ্গালী মুসলমানদের ঘরে তৈরী জলখাবারের রেওয়াজ নেই। ক্যানে চা আর কলাই করা বাসনে নেহারী, ঠোঙায় রুটি বা পরটা, বাচ্চারা সকালে ভীড় করে কিনতে আসে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি দোকানটা। যে বাড়ীতে সংগীতাকে নিয়ে আমার দীর্ঘকালের সংসার তাকেই বা এড়াই কি করে।

ঘরের দিকে পা বাড়াতেই শকুন্তলা আবার মনপ্রাণ জুড়ে বসে। আমার কন্যা বাড়ী ফিরতেই হৈ হৈ করে ওঠে। যেন কতদিন পরে বাবাকে দেখলো। বেল টেপার আগেই চটির সামান্য শব্দে বুঝতে পারে বাবা এসেছে। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন : 'এত দেরী ? কি এনেছো-বলো ?'

সামান্য কিছু হলেও ওর জন্য আনা চাই। পরম আগ্রহে ও আদরে তাই গ্রহণ করে — মাকেও তার থেকে ভাগ দেয়। ওর পড়াশুনো সম্পর্কে

কোন প্রশ্ন করতে হয় না। বড় গুছিয়ে লেখাপড়াটা করে। ইংরেজী প্রথম ভাষা হবার কারণে মাঝে মাঝে ইংরেজীটা দেখিয়ে দিতে হয়।

সংগীতা আমার সাথে খুব কমই কথা বলে। যদিও রাতের খাওয়াটা একই সঙ্গে হয়। পারিবারিক জীবনে ছন্দপতনটা বেশ টের পাই। দোষটা পুরোটাই আমারই হয়ত। তবে সেদিন সংগীতা সংসার দেখি না — ছাই-পাশ লিখে সময়ের অপচয় করি — মুরোদ থাকে বড় পত্রিকায় লেখো তো —' ইত্যাদি বলাতে হঠাৎ ক্ষেপে যাই। প্রায়ই এই অনুযোগ শুনি কখনো প্রতিবাদ করি না। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলি — ক্ষমতা থাকলে দু'কলম লেখো তো একটা শব্দও বেরোবে না — সংগীতা অগ্নিশর্মা। এ'টো হাতেই ছুটে আমার ঘরে যায়। ছড়িয়ে রাখা পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। মেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে কেঁদে ফেলে। আমি কোন উত্তর করি না আর। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকি— প্রবলভাবে কাঁদতে থাকি।

শকুন্তলাকে বলে লাভ নেই। তবু বলি একটু হাল্কা হতে। লেখাটা আবার লেখো — তুমি ঠিক পারবে। শকুন্তলা অনুরোধ করে। জানালা দিয়ে বোবা অনুরোধও করে রোজ। সত্যিই লিখলাম। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার বেশী ঘুমোতাম না। এইভাবে নজরুলের ওপর রচনাটা যেটা সংগীতা নষ্ট করেছে — আবার শেষ করি। আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে কোন অনুষ্ঠানে পাঠ করি। বেশ সমাদৃত হয়। একটা গোষ্ঠী অনুরোধ করে পাণ্ডুলিপি কপি দিতে, ওরা অভিনয় করবে। নাট্যরূপ দেবে। একদিন অফিসে এসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলো। নিরঞ্জন সদনে অভিনয়, নজরুল জন্মতিথি অনুষ্ঠানে। আমাকে কয়েকখানা কার্ড দিয়ে গেলো। বাগবাবুদের আমি চারখানা কার্ড দিয়ে আসি।

অনুষ্ঠানের দিন আমার শুধু একটাই লক্ষ্য ওরা এসেছে কি না। ওদের ঢুকতে দেখে আমার ভেতরকার উত্তেজনা প্রশমিত হয়। বেশ দাঁড় করিয়েছে ওরা। মূল রচনাকার হিসেবে আমার নাম কয়েকবারই উল্লেখ করলো। বেরোবার সময় আমি দেখা করি বাগবাবুদের সাথে। ওরাও খুশী। বাগবাবু বলেন 'কখন লেখেন আপনি ? সময় পান কোথায় ?' আমি একটু আসছি। ইউরিনালের দিকে এগিয়ে যান বাগবাবু। শকুন্তলা এগিয়ে এসে দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করে। নিজেই বলে 'হোটেল কিন্তু।' ওর চোখ দু'খানা আনন্দে চিক্‌চিক্ করছে। আমি কিছু বলার আগেই মেয়েদের দিকে চলে যায়।

ওর কথামত হোটেল সুইট বুক করে রাখি। জানালা দিয়ে আবার বোবা ভাষায় সব গুছিয়ে জানিয়ে দিতে ভুল হয় না। রিসেপসনে কয়েক মিনিট বসতে না বসতেই শকুন্তলা উপস্থিত। ওপরে উঠে কিছু বুঝতে না বুঝতেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। খুলে ফেলে জামার বোতাম। বুকের লোমগুলো যেন টেনে ছিঁড়ে দেবে।

'কি হচ্ছে — লাগে না ?'

'লাগুক। আমি ওনার সাথে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করবো — কেন তুমি করতে পারলে না ?

'সময় দিলে কই ?' বলে আমি মুচকি হাসি। শকুন্তলা যেন আজ আমায় নিয়ে খেলা করবে ঠিক করেছে।

'তোমায় আর ওই ভুবন ভোলানো হাসি হাসতে হবে না।' এই কথাটা শকুন্তলাই প্রায় বলে। অবশ্য বন্ধুদের মুখেও শুনেছি কথাটা। কোন গম্ভীর পরিবেশ পাল্টে যায় নাকি আমার প্রবেশে। আর তার কারণ এই হাসি। সবার ওপর একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। আমার অন্তর্বাস প্রায় একটু আধটু ছেঁড়া থাকে। দড়ি প্রায়ই থাকে না। গেরো দিয়ে বাঁধি। শকুন্তলা হঠাৎ টেনে একেবারে ছিঁড়ে দেয়। বলে 'সংগীতাদি তোমার ম্যানাসস্ক্রিপ্ট ছিঁড়েছে আমি তোমার আণ্ডারওয়ার ছিড়লাম।' আমাকে শুইয়ে দিয়ে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিতে থাকে। শরীরের কোন অংশেই বাদ দেয় না। একটু কাশি হয়েছে — খুবই কষ্ট হয় এই রকম কাশি হলে। থামতেই চায় না একবার শুরু হলে। অতি দক্ষ শক্ত হাতে অত্যন্ত কমনীয় ভঙ্গিতে ম্যাসেজ করতে থাকে। হঠাৎ বলে, বাগবাবু তো প্রায়ই অসুস্থ হয় — আমার সেবা করা দেখলে না হিংসে করবে। চাঁপার কলি নয় — ওর আঙুল-গুলো. হারমোনিয়মের রীডের মতো পেলবভংগীতে আনাগোনা করে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে — আমাকে যেন এক নিবিড় ছন্দে-সুরে জাগিয়ে তোলে। সংগীতার অসাধারণ ভাষা — কি কথায় — কি গানে বৃথাই শকুন্তলার মধ্যে খুঁজে বেড়ানো। শরীরী ভাষাতেও যে এমন মুখবন্ধ থেকে উপসংহারে অনেক বাঁকা পথ অতিক্রম করে পৌছলে যাত্রাপথ অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে জানতুম না হয়তো শকুন্তলা জীবনে না এলে। 'তুমি শুয়ে থাকো — আজ তোমার ঐ নাটকের জন্য পুরস্কার দেবো।'ও বলে। ওর দীর্ঘ চুল খুলে গেছে। শুয়ে পড়ে আমার বুকের ওপর। চোখ দুটিতে অসাধারণ আবেশ ছড়িয়ে তাকিয়েই থাকে। বুকের অঞ্জলী নিয়ে আসে মুখের

কাছে। ওর এই এক অদ্ভুত আনন্দ — দীর্ঘ সময়েও ছাড়ে না। হঠাৎ বলে 'এত সুন্দর করে তুমি খাও কি করে? আমার মাথার মধ্যে একটা দুষ্টুমী খেলে যায়। বলি 'এক গ্লাস জল দাও তো তেষ্টা পাচ্ছে।' 'বদমাইসী না?' উঠে পড়ে জল আনতে যায় টেবিল থেকে। এক অসাধারণ সুন্দর নির্লজ্জ দীর্ঘাঙ্গী নগ্নতা হেঁটে যায়। আমিও নেমে পড়ি খাট থেকে। দাঁড় করিয়ে দিই দেয়াল জোড়া আয়নার সামনে। অতি ফর্সা গায়ের রং-এর সাথে ঘন কৃষ্ণকালো উরুসন্ধি এবং ডান উরুতে একটি বেশ বড় তিল সৌন্দর্য্যকে যেন অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিছানায় ফিরে এসে — ওই অপূর্ব দক্ষতায় আমাকে শুইয়ে রেখে খেলতে থাকে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের বিদ্যার সাধনার কথা মনে পড়ছিল। পার্থক্য এই বিদ্যার লজ্জা শকুণ্ডলার ছিল না — "লাজের মাথায় হানিয়া বাজ / সাধয়ে বামা বিপরীত কাজ / ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে / ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্গুর বোলে।" চোখে মুখে শকুন্তলার আবেশ। হাঁপিয়ে ওঠে এক সময়। আমার ভূমিকা ওর নিক্ষিপ্ত অঙ্গ আপাত নিষ্ক্রিয়তায় প্রবল দক্ষতায় ধারণ করা। অবশেষে শুয়ে পড়ে বুকের ওপর। আলিঙ্গন শিথিল করে না একটুকুও। হঠাৎই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলে, 'কেন তুমি আগে এলে না — শুকুলবাবু কেন তুমি আগে এলে না!'

বাড়ী ফেরার পথে আবার হতাশায় ভরে যায় মনটা। এই নেশা কতদিন চলবে? প্রশ্নটা শকুন্তলারও। ও 'স্পষ্ট করে বলে 'একটা কিছু করো। যা কিছু করবো mutually করতে হবে। দু নৌকোয় পা দিয়ে আর বেশিদিন চলা যায় না।'

চলা গেলোও না সেদিন রাত্রে বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছি। মুছে ফেলছি শকুন্তলার সমস্ত শারীরিক চিহ্ন। ওপাশে ওদের ডাইনিং হলের পর্দা সরিয়ে শকুন্তলা মিটিমিটি হাসছে। গভীর তৃপ্তির হাসি। খেয়ালই করে নি পেছনে বাগবাবু দাঁড়িয়ে। পেছন ঘুরেই মুখটা যেন শাদা হয়ে গেল। পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘড়ি ধরে ছাদের দরজা খুলতে আসতেই পেছন পেছন বাগবাবু উঠে এলেন। বামাল সমেত শকুন্তলা ধরা পড়লো। এবং ধরা পড়লাম আমিও কন্যার কাছে। বাথরুমের জানালায়। আমি আছি মনে করে কিছু বলতে শকুন্তলা জানালায় দাঁড়াতেই আমার কন্যার মুখোমুখি।

ঝড় শুরু হয়ে গেল দু বাড়ীতেই। ও বাড়ীতে যেটা চাপা আমার বাড়ীতে উচ্চকণ্ঠ। আমার মেয়ে বউ scandalise করে ছাড়লো। চীৎকার

চেঁচামেচি। সংগীতা জানালায় দাঁড়িয়ে অনির্দিষ্ট মানুষের প্রতি গালাগালি। সংঘমিত্রা আরও একটু ওপরে। ও যে গলায় এত বিষ ঢালতে পারে বুঝতে পারি নি আগে। ওদের চিল চীৎকারে পাশের বাড়ী স্তব্ধ। কোন পাল্টা জবাব নেই। শুধু স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার রেশ ভেসে আসে।

এরই মধ্যেই একদিন শকুন্তলা কলেজের পথে। আমি না জেনেই অনেকটা পেছনে বাস স্টপের দিকে। হঠাৎ দেখি সংগীতা দ্রুতবেগে পেছন পেছন আসছে। ক্রমেই এগিয়ে এসে ঝাপিয়ে পড়ে শকুন্তলার ওপর। কি নাগরকে ডেকে আনা হয়েছে? রাস্তার মধ্যে ওর প্রবল চীৎকার। শকুন্তলা ধৈর্য ধরে বলে 'আমি জানিও না আপনার স্বামী আমার পেছন পেছন আসছে।' 'আহা! ন্যাকামী হচ্ছে? জানালা দিয়ে উঁকি দিতে তো জানো।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলে সংগীতা। আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কোন প্রতিবাদ নেই আমার।

সংগীতা যেন হিপনোটাইজ করে আমায় নিয়ে ঘরে ফেরে। দরজা বন্ধ করে প্রবলভাবে আক্রমণ করে। তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। কোমর জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে "ভালবাসো — আমায় একটু ভালবাসো।"

উচ্চমাধ্যমিকের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী আমার কন্যা। মাকে বলে 'আমার পড়া ছাড়িয়ে দাও মা — আমি চাকরী খুঁজি। তোমার এ অপমান আমি সইতে পারছি না।' সংগীতা দৃঢ় কণ্ঠেই বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না। তুই পড়া চালিয়ে যা। তোর বাবা খরচ দিতে তো বাধ্য। আমরা যদি সঙ্গে নাও থাকি তাতেই বা কি এসে যায়। তবে এত সহজে ওকে ছেড়েই বা দেবো কেন বল?' মা মেয়ে আমার সাথে কথা কথা বলে না। নিজের ছোট্ট ঘরে একেবারে একা হয়ে যাই। শকুন্তলার সাথে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। কখনো কচিৎ দেখা হলেও কথা তো হয়ই না। আমার বাড়ী থেকে অপমান-সূচক কথা ছুড়ে দেওয়া চলেছে অনবরত। তবু এরই মধ্যে শকুন্তলা একদিন appointment করে।

রেষ্টুরেন্টের কেবিন। শকুন্তলা কাঁদে না বলে "ছিঃ ছিঃ কি হল? কি করলাম! তুমি চলে যাও শুকুলবাবু। কিছু একটা করো। এত অপমান আমি আর সইতে পারছি না। তুমি এত ভীরু আমি বুঝতে পারি নি। এই তোমাকে নিয়ে আমি স্বামী-সন্তান ছাড়তে চেয়েছি! সংগীতাদি রাস্তার মধ্যেও এত বাজে কথা বললো তুমি আমাকে এতটুকু protect করার চেষ্টা করলে

না। এই মনের জোর নিয়ে তুমি প্রেম করছিলে ? ছিঃ শুকুলবাবু। শোন তোমার সাথে আমার আর যোগাযোগ থাকছে না। তুমি দাঁড়াবে না। কোথাও দাঁড়াবে না। আমি দেখা দেবো না। পারলে তোমার লেখা চালিয়ে যেও। মনে করো আমি আছি। পর্দা ঢাকা কেবিনে অত্যন্ত শুকনোভাবে চুম্বন করে। একটু হাত ধরে। 'চলি' বলে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে যায় শকুন্তলা।

খানিক্ষন বসে থেকে উঠে পড়ি। সমস্ত খালি হয়ে যায়। কোন কাজ নেই আমার। কোন গন্তব্য নেই। কখনো কোন জানালায় আর দাঁড়াবার দরকার হবে না। কেউ আর ঘড়ি ধরে ঠিক মুহূর্তে পর্দা সরাবে না।

এবং সত্যিই তাই হ'লো। স্নানের সময় পর্দার পাশে শকুন্তলা নেই। ভুল করেও ছাদে নেই অন্তত আমি থাকাকালীন অবস্থায়। বৃষ্টিতে ছাদে দাঁড়িয়ে হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি। ভুল করেও আসে না। আমার উপস্থিতি টের পেলেই অন্য ঘরে চলে যায়। সিঁড়ির জাফরীতে তাকিয়ে থাকি রাস্তায় চলতে চলতে — সরে যায় আমায় দেখতে পেলেই।

কিন্তু আমার শকুন্তলা আচ্ছন্নতা কাটে না। কি ঘোরের মধ্যেই না তিনটে বছর কেটে গেলো। রেষ্টুরেন্টের পর্দা ঢাকা কেবিনেও শকুন্তলা কি ভালবাসায় না গলে গলে যেত। আদর করতো মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে। এলোমেলো করে দিত আমার কোঁকড়া চুলের বোঝা। বেরোবার আগে গোছগাছ করে দিত আবার। বুকের চুল নিয়ে খেলা করা ছিল ওর এক নেশা। মনে পড়ে একবার হোটেলে সংগীতাকে আদর করার বিশেষ ভঙ্গী আছে কি না জানতে চায় — প্রবল কৌতূহল ওর। জোরাজুরিতে বলে ফেলি। নিবিড়তম মুহূর্তে গান গাইতে বাধ্য করা। ওর অসাধারণ সুন্দর কণ্ঠে গান। শকুন্তলা চেয়েছিল আমাকে খুশী করতে সেইভাবে। বড় বেদনাদায়ক হয়েছিল ব্যাপারটা। আমি সাড়া দিতে পারি নি। ফ্রিজিড হয়ে গিয়েছিলাম আরও। ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, একটা স্বাভাবিক চর্চার মধ্যে বড় হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন কর্কশ মনে হয়েছে। বুঝতে পেরে শকুন্তলা থামিয়ে দিয়েছিল গান। ফিরে এসেছিল আপন উন্মাদনায়। সংগীতার নিয়ত সলজ্জ মধুর আড়াল সম্পর্কের নতুন মাত্রা যোগ করলেও তাৎপর্য-হীন যান্ত্রিকতায় অবসিত। ভাবছিলাম এই সব। ভাবছিলাম শূন্যতাকে ভরাবো কি করে। কিছু লিখতেও তো মন চাইছে না। কিছু দিন ঘুরলাম কলকাতার পথে পথে। ঢুকে পড়ি অচেনা-অজানা গলিতে। সন্ধ্যেবেলার কোচিংটাই কোন

রকমে সান্ত্বনা আমার। রাত্রে বাড়ী ফিরি। ক্লান্ত অবসন্ন। বাড়ীতে স্বাভাবিক সুর যেন আর ফেরে না। একসঙ্গে খেতে বসি বটে, ছন্দপতন এমন ভাবেই হয়েছে — আগের স্বাভাবিক মুহূর্ত আর ফিরে আসে না। মাঝে মাঝেই সংগীতা খোঁচা দেয়। অপরাধী মুখ করে খেতে থাকি। ঠিক মতো খাচ্ছো না যে কেউ খাইয়ে দিয়েছে না কি ? প্রশ্ন সংগীতার। সংঘমিত্রা বসে — মা-মেয়েতে হাসি বিনিময় হয়। সংগীতা শকুন্তলার বাড়ী গিয়েছিল — এমন অনেক কিছুই জেনে এসেছে — যা শুধু আমাদের দুজনেরই জানার কথা। বুঝিয়ে দিয়েছে সমস্ত সম্পর্কের দায়টা আমারই। ওর স্বামীকে যেন মুক্তি দেয় — এই অনুরোধ সংগীতা করে এসেছে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে।

সংগীতার ক্ষুব্ধ রাগী বিধ্বস্ত সতত বিরক্ত চেহারা আমার মধ্যে কোন অনুকম্পা সৃষ্টি করে না। অনাবশ্যক ঠেস দিয়ে কথা বলা ওর স্বভাবধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে — বিস্কুট আনতে যাবে না ?' এই প্রশ্নেরও কোন জবাব দিই না। সাড়ে ছটায় বিস্কুট আনতে যেতাম ঠিকই। শকুন্তলা স্নান করে ছাদে তোয়ালে শুকোতে দিতে ওঠে এই সময়। ও জাফরীতে আমি রাস্তায়। ও আলো আঁধারিতে। আমি আলোর বৃত্তে। কয়েক সেকেণ্ডের এই মুখোমুখি সাক্ষাৎ কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দিত। কয়েকগুণ বেশি উৎসাহে কলম চালিয়েছি। এই দু বছরে অনেক কটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রশংসিত-বিতর্কিত-নিন্দিত। শকুন্তলা বুঝুক না বুঝুক আগ্রহে পড়েছে। কোন কোন দিন আমাদের হোটেলের সময়টা শুধুই লেখা পড়ে কাটিয়েছি। আমার হাত থেকে পত্রিকা কেড়ে নিয়ে ও পড়েছে কখনো। বলেছে 'তোমার বাংলা বড় কঠিন অথচ তোমার শরীরটা কি নরম। শরীরের পোষাকের ব্যাপারে ওর কখনো কোন Innihibition নেই। একেবারেই সংগীতার বিপরীত মেরুতে অবস্থান। ওই অবস্থাতেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রশ্ন তুলেছে — দেখো শুকুলবাবু আমি তৈরী। সব ছেড়ে আসার জন্য তৈরী। আমার বর তোমাকে নিয়ে খুবই সন্দেহ করে। সবচেয়ে বড় কারণ ওর কাছে আর তেমন করে যাই না। যেতে পারি না। কোথায় যেন একটা অপরাধও এসে যায়। কাকে ঠকাচ্ছি — তোমাকে না ওকে — না নিজেকে ? অথচ তুমি তো কোন সাহস যোগাচ্ছো না। তোমার ভাবনা কি তাও তুমি বলছো না — হয় চলে আসবো নয়তো ফিরে যাবো — আমার পক্ষে এমন করে দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।"

অনেক ভাবনা চিন্তা করে বলেছি, "দুটো সংসার চালাবার মতো ধনী

আমি নই। ডিভোর্স পাবো কি না জানি না। ছাড়তে ওদের হবে — ছাড়বোও হয়তো — কিন্তু আমার ভয় তোমার আমার মধ্যে দ্রুত অবস্থার অবনতি হবে না তো ?"

মুখে এ কথা বলেছি — বটে, ভেবেছি আরো অনেক কিছু। কোন অপরাধে সংগীতাকে ছাড়বো ? শকুন্তলাই বা কি পাবে আমার কাছ থেকে ? যে শরীরী উত্তাপের অভিজ্ঞতা ওর কাছে নতুন — তাকে কতকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারবো ? আরও একটা ব্যাপার এটা ঠিক যে ওর সাথে পরিচয়ের পর আমার লেখা পরিমাণগতভাবে অনেক বেড়েছে, বেড়েছে গুণগত মানও। কিন্তু এমন করে লিখে যাওয়া সম্ভব হবেই আমিই তো হলপ্ করে বলতে পারি না। আমার কলমে যদি যথাযথ শব্দ না আসে — বিষয় যদি তেমনভাবে মনে সাড়া না দেয় — যদি দীর্ঘ বিরতি দিতে বাধ্য হই লেখায় — সম্পর্কটা দড়কোচা মেরে যাবে না তো ? ওর দিক থেকে ব্যাপারটা আরও মারাত্মক — দুটি সন্তানকে ছেড়ে চলে আসা ? কিসের কি কারণে ? কি পেতে আর কি না পেয়ে ? মূলত সেই শরীরের প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে আসছে। শকুন্তলার জন্য হঠাৎ খুব মায়া হ'ল। অসাধারণ রূপ স্বাস্থ্য প্রতি মুহূর্তেই যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠা শকুন্তলা — স্বামীর যত্ন — আধিক্যে পরিপূর্ণ হয়েও প্রায় উপোসী রয়ে গেল। ওর বিশেষ মুহূর্তে ওর আক্রমণাত্মক রূপকে সামাল দিতে আরও আক্রমণাত্মক হতে হয় এবং অবশেষে সিঞ্চিত করতে হয় বারিধারায় — তাই অত ব্যক্তিত্ব ও সুগঠিত শরীর সত্ত্বেও শান্ত পারাবতের মত বারেবারে মুখ লুকিয়েছে আমার বুকে — চেয়েছে নির্ভরতার আশ্রয়, হয়ত বুঝেছে আমার দ্বিধা — চোখের জলেই শুনিয়েছে নিজেকে 'সেই অন্য অনেক কিছু পেতেই আবার ওর কাছেই ফিরে যাবো।'

কখনো কখনো পথ চলতে চলতে আবার গঙ্গার ধারে বসে ভাবতে থাকি এইসব নানা কথা। শূন্যতা কাটে না কিছুতেই। ঘরে ফিরে কন্যা সংঘমিত্রার সাথে ভাবভালবাসার চেষ্টা করি। ও আমার বড়ই কাছের। কোনদিন কোন কিছু দাবী করে নি। কোন বায়নাক্কা ছিল না কখনো। আজও নেই। আদর করে ওকে অদ্ভুত নামে ডাকি বুটকুরি। কোচিং থেকে ফেরার পথে ফুচ্‌কা খাওয়ানো অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল। আমি হয়ত ইচ্ছে করেই একটু এগিয়ে গিয়েছি। পেছন ফিরে দেখি ও ঠিক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। জানে বাবা ঠিক ফিরবেই। কোন পরীক্ষার ফল যদি কখনো একটু এদিক ওদিক হয়েছে — নিজেই কেঁদে কেটে একশা। যখন সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল শকুন্তলা সংঘমিত্রার চুল বেঁধেও দিয়েছে। আজ শকুন্তলাকে দূর থেকে

দেখলেই অপমানের চেষ্টা করে। আমি সঙ্গে থাকলেও। কিছু প্রতিবাদ করতে গেলে রাস্তার মাঝখানেই হয়ত আমাকে অপমান করবে। তাই আরও চুপ হয়ে যাই। একটা আত্মগ্লানি কুড়ে কুড়ে খায়।

শকুন্তলার সাথে সম্পর্কহীন, সংগীতার সতত ঠেস দিয়ে কথা বলা ও রূঢ়তা, সংঘমিত্রার বয়সের থেকে বড় হয়ে যাওয়া স্বভাবে আকস্মিক 'উদাসীনতা — আমাকে বিপর্যস্ত করতে থাকে।

পুরোনো সম্পর্কগুলো খুঁজে পেতে কফি হাউসে যাতায়াত করতে শুরু করি। দেখাও হয়ে যায় অনেকের সাথে। সত্তরের অনেকেই আড্ডা দিতে আসে। অনেকক্ষণ আড্ডা চলে। নষ্টালজিয়ায় অনেকেই আচ্ছন্ন। সত্তরের শহীদদের নিয়ে একটা একজিবিশানের প্রস্তাব ওঠে। সোৎসাহে আমিও সায় দিই। এরই মধ্যে কোন পুরোনো কমরেড প্রশ্ন করে 'সংগীতাদি গাইছে তো আজও শুকুলদা ?

ধ্বক্ করে ওঠে ভেতরটা। একসময়ের আমার দুর্বলতম জায়গা। মিথ্যে বলতে পারলুম না।

"গাইছে — তবে শ্রোতা আমি নই। মা মেয়েতে অনেক সময়ই গায় একদিন এসো — যদি তোমরা শুনতে পাও।"

তাল যে কেটে গেছে, যতদূর মনে করতে পারি নামটা সুহাস সম্ভবত ও সেটা বুঝতে পারে।

শুকুল দা আমি ও কয়েকজন মিলে একটা Private School করেছি — একটু দূরে কলকাতার কাছেই। পড়াবেন ? আপনার খবর সবই রাখি। Pre-mature retirement নিয়েছেন। যাদবপুরের দিকে কোথায় পড়ান। আমরা ভাল Payment করি। ভাল sponsor পেয়েছি। আপনি উঁচু ক্লাশগুলো নেবেন। Class X অবধি স্বীকৃতি পেয়ে গেছি। এগারো বারো — অনেকটা কোচিং এর মত হলেও — স্বীকৃতি পেয়ে যাবো।

ওর কথা শুনতে শুনতেই আমি ভেবে নিয়েছি। বললাম — যাবো — তোমাদের স্কুল দেখতে যাবো।

'প্রতি মঙ্গলবার আমরা কফি হাউসে আসি। আপনিও আসুন না আগামী মঙ্গলবার। আরও কথা হবে। রাজনীতির কথাও হবে।'

পরের মঙ্গলবার আবার কফি হাউস। নরক গুলজার। বহু পুরোনো কমরেডের সাথে দেখা হ'ল। সমীরণ, একদা আমার লেখার খুব ভক্ত, আমার

ভাষা ও বাঁধুনি না কি ঈর্ষণীয় — দেখেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে — 'শুকুলবাবু অবশেষে আপনি নজরুলের জীবনের কেচ্ছা নিয়ে পড়লেন — আর কোন বিষয় খুঁজে পেলেন না ?' কি বলব ? তবু বলি পাঠকরা যে ওটাই বেশী খেয়েছে ভাই — আজও নানা জায়গায় ওটা অভিনয় হয় ।

'ছিঃ তা ব'লে আপনার ধারাবাহিকতার সঙ্গে ওটা মানায় না ।' 'কথা দিচ্ছি — একটা ভাল কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত করবো ।'

এই সময় আর একটা ভুল করে বসি । নতুন বই বেরিয়েছে আমার । সবকটা লেখাই শকুন্তলার সাথে পরিচয়ের পর । ওরই উৎসাহে লেখা হয়েছে বলা যায় । ইচ্ছে হলো বইটার কথা ওকে জানিয়ে দিই । হয়ত খুশীই হবে । উৎসর্গ করেছি ঘুরিয়ে ওরই নামে । অতি কষ্টে টেলিফোন নম্বর যোগাড় করেছি । অনেক দ্বিধা কাটিয়ে কাঁপা হাতে ফোনটা তুলি । ডায়াল করে একটু থেমে শুরু করি, 'আমি শুকুল উপাধ্যায় বলছি ।' সঙ্গে সঙ্গে কাট্ । কোন কথাই নয় । মনটা আরও খারাপ হয় । আমি তো কিছু চাই নি । শুধু সফলতার স্বাদটুকু ভাগ করতে চেয়েছি তোমার সাথে শকুন্তলা ! তাতেও তোমার এত আপত্তি ! বুঝি নি যে এতেই শেষ হয় নি । বাড়ী ফিরে সংগীতার রুদ্রমূর্তির মুখোমুখি । 'তুমি ফোন করেছিলে শকুন্তলাকে ?'

অস্বীকার করতে পারলুম না । শকুন্তলা এসেছিল দুপুরবেলাতেই । বিষ ঢেলে গেছে সংগীতার কানে, "আপনার হাজব্যাণ্ডের কি বয়স হয় নি ? কি চায় আমার কাছে ? কেন এই ভাবে আমার শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা ? একটু সাবধান করে দেবেন ।" হয়ত আরও অনেক কিছু । সংগীতা এই-টুকুই আমাকে বলে এবং তারপর ওর ভাষা যুক্ত হয়ে কি আকার নিয়েছিল ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় ।

শকুন্তলা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিল । সুহাসদের স্কুলে জয়েন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আর কালবিলম্ব করি না ।

চন্দননগরের কাছে সুহাসদের স্কুল । সকাল আটটা থেকে ক্লাশ । বেশ ভাল লাগছিল । যাদবপুরের কোচিং সেন্টার থেকে একেবারেই আলাদা । ঝকঝকে পোষাকে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায় মেয়েরা টল্‌মল্ করছে । ক্লাশ নিতে শুরু করি — কলকাতা থেকেই যাতায়াত ।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার । ধীরে ধীরে পড়ানোটা অবশেসনে দাঁড়ায় ।

শিক্ষক হিসেবে গুছিয়ে নিয়ে উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হয়। অতি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে পড়ি ছাত্রীদের কাছে। সামনের ডেস্কে বসার জন্য বেশ একটা লড়াই লেগে যায়। উদাসীন চোখে উপভোগ করি। শেসনের মাঝামাঝি সময় এসেছি — মাস ছয়েক পড়ানোর পর ICSE পরীক্ষা আবার মাধ্যমিকও। প্রথম বছরেই স্কুলের ফলাফল অনেকটা ভাল। আমি বুঝতে পারি এই পরীক্ষার সিস্টেমে কয়েকটা ম্যাজিক আছে। ঠিকঠাক কাজে লাগালে ফল পাওয়া যায়। হলোও তাই। বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। অভিভাবকরা যোগাযোগ করতে চায়। মেয়েরাও এগিয়ে আসতে চায় স্যারের কাছে। অসম্ভব এক গাম্ভীর্যের মুখোস পরে থাকি ছাত্রীদের কাছে। কখনো কাছে ঘেঁষতে দিই না। কথোপকথন সামান্যই। Tution এর প্রস্তাবে হিমসিম। দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান : মেয়েরা বাগানের ফুল নিয়ে এসে স্যারকে দিতে আগ্রহী। ফিরিয়ে দিই না। টেবিলে রাখতে বলি। আমার রূঢ়তায় ওরা ব্যথা পায়। আমি লক্ষ্য করতে থাকি ওদের। হেমনলিনী, সুদক্ষিনা, নুরজাহান, শ্বেতা, শিল্পা, সুচিত্রা, প্রমিতা, অন্যপূবা — বাহারী নাম সব। ওরা বড় বেশি মুগ্ধ। আড়ালে আমার নাম রেখেছে তন্দ্রা — তন্দ্রা স্যার, কারণটা আমার চোখ দুটি নাকি সদাই তন্দ্রাচ্ছন্ন। আড়ালে ওরা বলে — অন্য সহশিক্ষকদের মাধ্যমে কানে আসে।

আমার মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়। যত উজাড় করে পড়াই — কিশোরী ছাত্রীরা আমার মানস জগতে পূর্ণ নারীরূপে হাজির হয়। আমার পড়ানো বোঝানো স্কুলের Relevant, সবকিছুই চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির। উপভোগ করি ছাত্রীদের মুগ্ধতা। নির্দিষ্ট কারও দিকে তাকাই না কখনো। সমস্ত ক্লাশটা যেন ওরা দম বন্ধ করে শোনে। রেশ থাকে ক্লাশ শেষ হলেও। আমি আরও গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে আসি ক্লাশ থেকে।

নিজের দাপটে নিজেরই হাসি পায়। সংগীতার সাথে রফা করে এসেছি সপ্তাহে বাড়ী ফিরবো। এরা আমাকে ছোট্ট কোয়ার্টার দিয়েছে এক কামরার। কোন অসুবিধে হয় না। একাকীত্ব নেই। শূন্যতা থাকলেও নিয়ত নিজের সাথে, কখনো বা ছাত্রীদের সাথে কাল্পনিক কথোপকথনে কেটে যায় সময়। শুধু নজরুল সম্পর্কে একটা গবেষণামূলক লেখা কিছুকাল ধরেই মাথায় ঘুরছে। খুবই Relevant কিন্তু এদিকটা কেউ নজর কাড়েনি কেউ। দুই বাংলায় মুসলমান কবি নজরুলেরই প্রাধান্য। সমাজ বিপ্লবের কবি নজরুলের ওপর তেমনভাবে আলো ফেলা হয় নি। স্কুল থেকে দুদিন ছুটি

নিয়ে বাংলাদেশ লাইব্রেরীতে কাজ করেছি। ফিরে এসে — অবাক কাণ্ড। মেয়েরা আমার বদলী শিক্ষকের ক্লাশ প্রায় ভণ্ডুল করেছে। ক্লাশ থেকে সেদিন টীচার্স রুমে যাবার পথে অনুভব করি পেছনে একটা ছায়া। ফিরে দেখি সুদক্ষিনা। সুদক্ষিনা ঠাকুর। ডাক নামটা বড়ই অদ্ভুত — ঠুমরী। ঠুমরী গানের মতই চঞ্চল — দ্রুত ওর আরোহন অবরোহন। খুবই প্রাণবন্ত। উত্তর প্রদেশের মেয়ে। ছাত্রী সাধারণ, চোখ দুটিতে হরিণের চাঞ্চল্য — কখন কোন দিকে ছুটে যাবে কার চোখ চেপে ধরবে, ডেস্কের তলায় লুকোবে — এই বয়সেও দুষ্টুমী যেন ওকে তাড়া করে। ওর সব সময়ের সাথী নুরজাহান। সেও অবাঙ্গালী মুসলমান। কখনো বুঝতে না দেয়া আমার এক পক্ষপাত ওদের প্রতি আছে হয়ত। "আপ দো দিন কীউ নহী আয়ে ?" ওর সোজাসাপটা প্রশ্ন। 'কাজ ছিল — ক্লাশে যাও।' দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হই। ওর চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে সাহস পাই নি।

রাত্রে বিছানায় গা এলিয়ে ভাবতে বসি আমার সব মানস সহচরীদের। সুদক্ষিনা তাদেরই একজন। ওরা আমাকে ভক্তি করে, ভালবাসে। আমি শিক্ষক। আমি প্রাণ ঢেলে পড়াই। কিন্তু ওদের সাহচর্যে এ কি অদ্ভুত উল্লাস আমার। কি উত্তেজনা! ওদের ভাল Result, আমার এক অদ্ভুত তৃপ্তি। না শিক্ষকের তৃপ্তি নয় শুধু। অন্যরকম কিছু। যতই নিজেকে আবিষ্কার করি — ততই দূরে সরিয়ে রাখি নিজেকে। সংযমের কঠিন লৌহবর্ম আমার প্রতিটি আচরণে। এবং এও পাঠ করতে অসুবিধে হয় না — এতকালের অভিজ্ঞতায়, ওদের অনেকের চোখেও ভক্তির বাইরে অন্য কোন ভাষা। কোনদিন ক্লাশে হয়ত কোন কারণে হেসে ফেলি, পেছন থেকে কানে আসে — 'দেখ যেন মোনালিসা' ( মনে পড়ে শকুন্তলার কথা তোমাকে আর ভুবন ভোলানো হাসি হাসতে হবে না। ) বুঝতে অসুবিধে হয় না কণ্ঠস্বর হেমনলিনীর, নামের সঙ্গে কোথাও মিল নেই। ICSE-এ সবচেয়ে উজ্জ্বল আর ডানপিটে ছাত্রী। একটু বেপরোয়া। বড়ই জীবন্ত। যা পড়াই ঠিক ঠিক শুনে নেয়। Between the Lines বুঝতে ওর কোনই অসুবিধে হয় না। Merchant of Vennice-এ Shylock ওর কলমে ভাবী সুন্দর উঠে এসেছিল। শাইলক যে Patrrot এবং champion of oppressed nationality, villain নয় ICSE-র গণ্ডালিকা প্রবাহের বিপরীত মেরুতে থেকে, লিখেছিল।

গায়ের রং 'হেম' তো নয়ই — শ্যামলা বরং কালোই বলা চলে। ওর চাপা ঔদ্ধত্য আমাকে প্রবল আকৃষ্ট করে বলেই সবচেয়ে কম প্রশ্ন করি ওকে।

শৈশব কেটেছে না কি দিল্লীতে। খুব কমই প্রশ্ন করি ওকে। আমার মনে হয় ও সেটা বুঝতে পারে। ঠোঁটে একটা বক্র হাসি সদাই ঝুলে থাকে। আমি যেন আরও ভয় পেয়ে যাই।

খুব আনন্দ মূহূর্ত আসে যখন আমি ওদের খাতা দেখি। রাত বারোটার পর আমার খাতা দেখা শুরু হয়। যে কদিন খাতা দেখি দু ঘণ্টা ঘুমোই — রাত তিনটে থেকে পাঁচটা। প্রতিটি খাতা অতি যত্নে দেখি। ভুল ঠিক করে ঠিক উত্তরটি প্রতিটি খাতায় লাল কালিতে লিখে দিই। অভিভাবকরা খুবই প্রীত হয়।

সেদিন খাতা দেখারই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। গীর্জার ঘড়িতে বারোটা বাজলো। মাটিতে মাদুর পেতে খাতার বাণ্ডিল খুলে ফেলি। নানা নাম। নানা ভঙ্গীতে লেখা। প্রতিটি নাম — নামের পেছনে uniform পরা আপাত এক অথচ বয়ঃসন্ধি পেরোনো কিশোরী / নারী আমার বড়ই পরিচিত। খাতা-গুলিতে হাত রাখি। এক একজনের সম্পূর্ণ চেহারা আমার সামনে ফুটে ওঠে। কখনো কখনো শিহরিত হই বই কি!

পড়ার চাপ কম থাকলে গল্প করার অনুরোধ বা গল্প বলার বায়নাক্কা ছাত্রীদের তরফ থেকে থাকেই। আমিও শুনিয়েছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' নরেন্দ্রনাথ মিত্রর 'চেক' এবং সুবোধ ঘোষের 'চোখ গেল' বা 'শশ্মাণ চাপা।' এবং খুবই আবেগে ও আন্তরিকতায় শেক্সপীয়রের Trageby-র কাহিনী। হয়ত আমার বাচনভঙ্গীতেও আছে কোন চুম্বক শক্তি। এ্যান্টনী যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে. অনুরোধ করে রাণী ক্লিওপেট্রাকে।

One Word Sweet Queen
Of Caesar seek your honour and safety O !

ক্লিওপেট্রার স্পষ্ট উত্তর — They do no go tgather. ভালবাসা ও নিরাপত্তা একই সঙ্গে বৃথাই খুঁজে বেড়ানো। মেয়েরা যেন একটু নড়ে চড়ে বসে। হ্যামলেটের কাহিনী শুনতে শুনতে ওফেলিয়া অনেককেই ভারাক্রান্ত করে। Mrs. Jamson এর ওফেলিয়া সম্পর্কে কথাগুলি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে যাই। এবং বলা বাহুল্য নিজেও রোমাঞ্চিত হই। বেশ নাটকীয় করে বলে যাই — She is too soft, too good, too fair, to cast among the briers of this working day world, ard fall and bleed upon the thorns of life. হয়ত সুদক্ষিনার দিকে তাকিয়ে বলি so exequisitely delicate, it seems as if a touch would profane her. Her

sorrow asks not words, but tears. এতই কোমল ও পবিত্র যে সামান্য একটু ছুঁয়ে দিলেও কালিমালিপ্ত হবে ওফেলিয়া। একটু থেমে আবার তাকাই নূরজাহানের দিকে She says very little and what does she say seems intended to hide than reveal the emotion of her heart. আত্মপ্রকাশের থেকে আত্মগোপনই যেন তার বলা কথাকটির উদ্দেশ্য।

স্তব্ধ হয়ে যায় সমস্ত ক্লাশটা। সুদক্ষিনা কিছু বোঝে — কিছু বোঝে না। ছোট অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটি নামিয়ে নেয়। এরই মধ্যে একদিন করিডোর ধরে এগিয়ে চলেছি। কোথা থেকে হেমনলিনী এসে সামনে দাঁড়ায়। একেবারে মুখোমুখি। দামী পারফিউমের গন্ধ। ওর নিঃশ্বাস আমার শরীরে। খুব ছোট করে ছাটা চুল অবিন্যস্ত। প্রায়ই যেমনটি থাকে। তবে বড়ই বুদ্ধিদীপ্ত। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল — আমি ক্লিওপেট্রা না ওফেলিয়া ? এ আবার কি প্রশ্ন ? হেঁয়ালী ? একটু থেমে ওর দিকে সোজা তাকিয়ে — সেই হাসি হেসে — যাকে ও বলেছিলো মোনালিসা — বলি 'তুমি হেমনলিনী।' — এবার খুশী তো ? ও কোন উত্তর না করে যেমন এসেছিল তেমনই দ্রুত চলে যায়। যাবার আগে আলগোছে ছুঁয়ে গেল !

হুগলী জেলার এই ছোট্ট উপনগরীতে আমার দিনযাপন। সংগীতা থেকেও নেই। শকুন্তলা একেবারেই নেই। সংঘমিত্রা মা'র মেয়ে হয়ে গেছে একেবারেই। আমি শিক্ষকতা — ছাত্রী সামান্য পড়াশুনো এই নিয়ে একটা কৃত্রিম উত্তেজনা বা excitement তৈরী করে নিয়েছি।

প্রায়ই সন্ধোবেলায় বেরিয়ে পড়ি। কাছেই একটি মাজার। সেখানে গিয়ে বসতে আমার বেশ লাগে। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রায় সন্ধ্যে। কে বা কারা মোমবাতি জ্বালিয়ে গেছে। আমি খানিকটা গা এলিয়ে 'বাবা'র কবরের পাশে বসে থাকি। আকাশ, খোলা মাঠ, ঝি ঝি পোকার ডাক আবহকে আরও গম্ভীর করে তোলে। পেছনে পায়ের শব্দে হঠাৎ চমকে উঠি। দেখি সুদক্ষিনা। কি হাসি আমায় দেখে। ওর পেছনে ওর পিতৃদেব। চেঁচিয়ে তাকে বলে 'ম্যয় বাবুকো রোজ কহতি হু কি মুঝে সাথ লে চলিয়ে, পর ওহ নেহি শুনতে হ্যায়। ম্যায় আজ দেখুংগি কি স্যার কহা জাতে হ্যায়। ম্যায়নে খোঁজ নিগলো, বাবু দেখিয়ে, স্যার ইহা হ্যায়।

আমি উঠে দাঁড়াই। আলাপ করি ওর বাবার সাথে। শিক্ষিত, মার্জিত। উত্তরপ্রদেশের ভদ্রলোক। বলেন, "মেরী শাহজাদী হরবকৎ আপহী

কী বাত করতী হ্যায়। আপ জায়সা দুসরা কোই পড়াতাহী নহী।"

'মেয়েরা একটু বাড়িয়ে বলে।' সবিনয়ে ওর স্তুতির জবাব দিই। সুদক্ষিনার দিকে ফিরে বলি 'বাড়ী যাও।'

"আপভী চলিয়ে স্যার, নহী তো ভূত পাকড় লেগা।" "ভূত আমাকে ভয় পায়। আমি আর একটু বসবো।" সুদক্ষিনা যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমন ঝড়ের বেগেই চলে গেল। শুধু যাবার সময় বলে গেল "ভূত কা নিবাস স্থান পিপল হ্যায়, উই দেখিয়ে পিপল — অভী উৎরেগী।"

বসে থাকি আরও কিছুক্ষণ। সুদক্ষিনা কি ঝড় তুলেই না চলে গেল। ও বুঝলো না হয়ত। ছিপছিপে সদা চঞ্চল ওর চলাফেরা। — বাবা যথার্থই ঠুমরী নামে ডাকে। খুবই সাধারণ ছাত্রী। লিখিয়ে লিখিয়ে — special পরীক্ষা নিয়ে ওকে — ওর বন্ধু নুরজাহানকে তৈরী করে চলেছি। ওদের অভিভাবকদের যে কৃতজ্ঞতা, ওদের মধ্যে যে প্রত্যয় লক্ষ্য করি তার পেছনে যে আমারই পরিশ্রম ভেবে একটু আত্মশ্লাঘা হয় বই কি। তবু ভাবনা এসেই যায় আমি কি সত্যিই এত নিঃস্বার্থ। ওরাই বা কেমন ? Excursion Trip এ এগারো বারোর মেয়েরা প্রায় কেউই যায় নি — যখন জানতে পারে আমি যাবো না। যদিও আমি যে যাবো না প্রথম থেকেই স্থির ছিল।

তবে স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিলাম। আমার অনুরোধে একটা বিশেষ গান উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গায় — 'ওগো আলোর পথের যাত্রী / এ যে রাত্রি / এখানে থেমো না। অনুষ্ঠান শেষ হয় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' দিয়ে। সুদক্ষিনা সুরূপা। শ্বেতা কুরূপা। গানে সম্ভবত কিছু অভিভাবক এবং তাদের স্ত্রীরাও ছিলেন। হেমনলিনীও গানে ছিল — ছিল নুরজাহানও। ওদের একক গান বুঝতে অসুবিধে হয় নি। গান শুনতে শুনতে বার বার সংগীতার চিত্রাঙ্গদা ভেসে উঠছিল চোখের সামনে — ওর সেই অসাধারণ অনুষ্ঠান ভোলা যায় না। আমার ছাত্রীদের শরীরগুলি আশ্চর্য নমনীয়তায় দাপিয়ে বেড়ায় মঞ্চ। অতি উজ্জ্বল পোষাক। মাথায় ফুল। চমৎকার প্রশাধন। অনুষ্ঠান শেষে ওই পোষাকে ছুটে আসে সুদক্ষিনা — পেছনে আরও অনেকে। একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় অসংকোচে। কি সুন্দর গন্ধ! তখনো হাঁপাচ্ছে। বলিয়ে তো মেরা নাচ ক্যায়সে লাগা ? চেয়ার ধরে শরীর ঘেঁষে দাঁড়ানো, কেমন অস্বস্তি হয়। শির শির করে। ও চায় বেশ বুঝতে পারি — ওকে স্বীকৃতি জানাই। অবশেষে ফিরি সুদক্ষিনার দিকে

— পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই। সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরেই বলি "ভাল — খুব ভাল।" এতক্ষনে ওর মুখে হাসি ফুটল। ধীরে ধীরে চলে যায়।

দ্রুত কয়েকটা ঘটনা ঘটতে থাকে। আমার কোয়াটারে সেজদা আসে। এবং বলা বাহুল্য দুদিন পরে কামালদাও। ধীরে ধীরে আরও অনেকের যাতায়াত শুরু হল। আমার ছোট কোয়াটার গম্‌গম্‌ করে অনেক রাত অবধি। আড্ডাই নয় শুধু। গভীর আলোচনাও। সত্তরের পুনর্জাগরণ। প্রবল আগ্রহে ওদের উদ্যোগের অংশীদার হয়ে যাই। 'আমাদের রাজনীতি শেষ হয় নি, হতে পারে না। যদি কেউ এমন বলে তবে ইতিহাসটাই ভুল। এস পুরোনো ভুল শুধরে আবার এগোই। প্রস্তুতি অনেকদিন ধরেই নেওয়া চলছে — তোমরা কেউ জানো না। আশা করবো তোমরা — সবাই পুরোনো কমরেড — আমরা তোমাদের সঙ্গে পাবো। মনে রেখো অনেক রক্ত ঝরেছে — রক্তের ঋণ শুধতে হয় ভাই।' প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই সেজদা এতটা বলে থামে। কোন কমরেডের কোন দ্বিধা নেই। আমার ওপর ওঁর কম্যাণ্ড বা ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা এমনই — যে দ্বিধাহীনভাবে গোপন মিটিং-এর আস্তানা ভেবেই নিয়েছে আমার বাসস্থান। কয়েকমাস ধরে যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল আমি জানতেই পারি নি। অন্তত তিনটি জেলায় ওরা সংগঠনকে জোরদার করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। অন্ধ্র কমিটির সাথেও ওদের যোগাযোগ বেশ গভীর।

কয়েকটি লিফলেট লেখার হুকুম হ'ল। লেখা, প্রুফ দেখা, ছাপানো এবং পুরো খরচ বহন করা সবই আমার ওপর দিয়ে সেজদারা চলে যায়। সাতদিনের মধ্যে আমার লেখা তৈরী। সেজদার গোপন ডেরায় গিয়ে পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে আসি। সেজদা কিছু সংশোধন করে। আমি আবার কলকাতায়। ফিরে আসি সব কাজ সম্পূর্ণ করে। কুরিয়র পাঠিয়ে লিফলেট-গুলো নিয়ে যায় সেজদা। আমার হাতেও লিফলেট এসে পড়ে।

সেদিন টীচার্স রুমে একা। গভীর মনযোগের সঙ্গেই শিল্প সংস্কৃতির ওপর মাও সে তুং-এর রচনাটি আবার পড়ছিলাম। পাশের ছাত্রীদের অনেকটা 'কমন রুম' বলতে যা বোঝায় তাই। গুনগুন স্বরে গান ভেসে আসছে — নুরজাহানের গলা, আশ্চর্য গানটাও পঞ্চাশের শিল্পী নুরজাহানের। গান শুনলেই আমি একটু আনমনা হয়ে যাই। 'মেরে বচপন্‌ কা সাথী মেরে ছোড় না জানা'। সম্ভবত সুদক্ষিনা গলা মেলাচ্ছে। সুদক্ষিনার গানের গলা অত মাজাঘষা নয় নুরজাহানের মত। ওদের সখীত্ব আমি দূর থেকে খুবই উপভোগ

করি। শেষ করে আরও গলা ছেড়ে নুরজাহান গায় 'আওয়াজ দো কাহাঁ হ্যায়।' সুদক্ষিনা হেসে ওকে ঝাঁকনি দিয়ে বলে, 'ইহা তো হু নেহি দেখতি ?'

সবাই কলকল করে করিডোরে বেরিয়ে আসে। আমি যে টীচার্স রুমে, টের পায় নি। প্রায় সবাই ICSE-র গ্রুপ। হেমনলিনীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই তন্দ্রা স্যারটা এত গম্ভীর না কিছুই যেন বলা যায় না ওকে।'

উত্তরটা কার ঠিক বুঝতে পারি নি, বলে — তবে পড়ানোটা অদ্ভুত। শেক্সপীয়র এত সহজ করে বোঝায় শাইলক্‌কে যেন নতুন করে বুঝলাম। তবে সত্যিই বড় দূরের কিছুতেই কাছে পৌঁছনো যায় না।

'তোর বুঝি খুব ইচ্ছে ?'

'হাঁ। চাই — ইচ্ছে তো হয়ই অনেক গল্প করুক আমার সাথে।

হেমনলিনী হঠাৎ করে যেন বোমা ফাটায় 'যতই গম্ভীর হোক তোমাদের তন্দ্রা স্যার উনি খুবই প্যাশনেট্ আর aggressive।'

'তুই কি করে বুঝলি ?'

একটা হাসির রোল। দল বেঁধেই ওরা চলে যায়। ওদের দলে সুদক্ষিনা নেই। থাকলেও একটা কথাও বলে নি।

দু'দিন খুব জ্বর হয়। আচ্ছন্নতা কাটে না। এই আচ্ছন্নতার মধ্যেই নানা ভাবনা এবং ঘটনা ঘটতে থাকে। ইনসোমনিয়া থেকে মুক্তি পেতে কড়া ধাচের সেডাটিভ পড়েছিল। অথচ ভেতরেও এক অদ্ভুত উত্তাপ। নিজের মধ্যেই অনুভব করছি সত্তরকে। পড়ানো, জনপ্রিয়তা ছাত্রীদের সাথে বিচিত্র সম্পর্কের বিশ্লেষণ অনেক দূরে সরে যেতে থাকে। জানি আমি, আমার অতি সংযম অথচ নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ওদের কাছে টানা — এ এক বিপজ্জনক অবস্থান। ছাত্রীরা বড় ভাল। আমি অবিচার করি নি ওদের প্রতি। স্কুলের ফলাফলকে একেবারেই অন্য স্রোতে বইয়ে দিয়েছি। সুহাস সেদিন বলছিল "শুকুলদা আর যে জায়গা দিতে পারছি না — আপনার জন্য প্রতিদিন ছাত্রীদের ভীড় বাড়ছে। কি করি বলুন তো ?" আমি কোন জবাবই দিই নি। জবাব দেবার কিছুই ছিলই না। কেন না সেজদা এসেছেন — এসে পড়েছেন — আরও অনেক কমরেড। আমার মধ্যে আবার এবং অনেক উঁচু কণ্ঠে 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ।' তিনটে রাইফেল। দুটো পিস্তল। কোন পুলিশ ক্যাম্প Raid করেছে। অনেক অস্ত্র পাওয়া গেছে। আমাকে তারই একটা অংশ 'স্টোর' করতে হবে। সেজদা ধীরে ধীরে বলে 'রাখ ওগুলো

সাবধানে রাখবি।' আমার বা কামালের চিরকুট পেলে হ্যাণ্ড ওভার করবি — নয়ত নয়। আপাতত তোর কোয়াটার নিরাপদ ষ্টোর হাউস। সেজদা হঠাৎ প্রশ্ন করে সংগীতার কি খবর রে? তুই তো সপ্তাহে যাস্। সম্পর্ক এত শিথিল করেছিস কেন?

সেজদা অনেক কিছু ঘটে গেছে। তুমি জানো না। জানলে এই দায়িত্ব আমায় দিতে কি না জানি না। তবে তোমাকে আমার সব জানানো জরুরী সেজদা। সংগীতার কাছে কি শুনেছো জানি না। ও মিথ্যে বলবে না জানি — তবু। সংগীতাকে দু দুবার আমার বাড়ীতে মানে কাকার বাড়ীতে রাখায় মানসিক অবসাদের রুগী হয়েছে। চিকিৎসা করতে হয়েছে ওষুধ এখনো খায়। ওখানে আমার বাড়ীতে নানাভাবে টর্চার — এটা ঘটনা। কিন্তু আলাদা হয়ে যাবার পর সব যেন আমার দায় — শুধু নির্লিপ্ত বা উদাসীনতা নয় — রাগে ক্ষোভে যেন ফেটে পড়তে থাকে। যে সংগীতার গানের মধ্যেই আমি বেঁচেছিলাম — সে গান গাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিল। গাইলেও আমাকে একেবারেই শোনাতো না। এদিকে আমার মা — ও বাড়ী ছেড়ে এসেছি মাকে তো ছাড়তে পারি নি। বিয়ের পর থেকেই মার ভূমিকা ওর প্রতি শুধু শীতলই নয় — খুব নিষ্ঠুর। এবং অবশ্যই কুটিল। একটা Whispering Camping চালায় মা যে ছেলের বৌর মাথায় দোষ। বাড়ীতে সব সময় চেষ্টা থাকে সংগীতাকে ছোট করার। এমনিতে ঘরের কুটোটি নাড়ে না — কিন্তু কোন আত্মীয় এলেই, তুমি সরো, আমি করি। যেন সংগীতা তাকে কাজ করতে দেয় না। সংঘমিত্রার জন্য কখনো কোন দায় নেয় নি। অথচ স্কুল থেকে আসতে একটু দেরী হলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে — ঠাকুমার নাতনির জন্য কি দুর্ভাবনা! — পাড়ায় এই ধারণা চালু আছে। এবং এই সব সত্ত্বেও আমি সংগীতার পক্ষে দাঁড়াতে পারি নি। মা'র ফিস্‌ফিস্ করে বলা "এত খাডো তুই — কিছুই তো খাও না মাইয়ারে আর মাইয়ার মায়রে খাওয়াইলেই হইবে? অথবা খোড়াইয়া হাডো ক্যান — পাও ডা ব্যথা করে না কি?" আমার প্রতি তার অত্যাধিক টান তা তো তুমি জানো। আমি মা — সংগীতা দ্বন্দ্বে সর্বদাই প্রায় অবিবেচকের মতো মার পক্ষে গেছি। সংগীতা ঠিক জেনেও — একমাত্র শিশুপুত্রকে নিয়ে বালবিধবা মা. আমার দুর্বলতা ও অসহায়তাকে পুঁজি করে — ব্যবহার করেছে সংগীতাকে। ভয়ে ভয়ে রাত্রে ঘরে ঢুকেছি কি অবস্থা দেখবো। এই পারিবারিক অবস্থা। আর তোমরা কোথাও নেই।' যাদের পেয়েছি ঠিক মেনে নিতে পারি নি তাদের। এই

প্রবল আলো আধারিতে শকুন্তলা এবং ছাত্রীরা। তোমরা হয়ত বলবে, Energy diverted, energy perverted. আমি নিজেকে এ ভাবে Justify করতে নারাজ। হয়ত রক্তের মধ্যেই আমার নিহিত কোন প্রবৃত্তি আমাকে ঐ দিকে নিয়ে গেছে। তবে এটা অবশ্যই ঠিক — লড়াই-এর মধ্যে থাকলে এমনটি হয়তো ঘটতো না।' একটু থামি। রাত একটা। আলো নেভানো। সেজদা আর আমি পাশাপাশি শুয়ে। সেজদা প্রশ্ন করে 'তোর বলা শেষ হয়েছে ?"

"না আর একটু শোন। সংগীতা এখন অভিধানের ভাষায় বললে Irritant. morbid, cinic। এক এক সময় এক এক রূপ প্রকাশ পায়। অথচ সেদিনও 'হাজার চুরাশির মা' পড়ে ঘুমোতে পারে নি রাতের পর রাত। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে চলে এসেছে আমার ঘরে। ঘুম ভাঙ্গিয়েছে আমার, এই সেজদা কেমন আছে ? বিপ্লব কি সত্যিই মারা গেছে ? তুমি কোন খোঁজই কর না — স্বার্থপর হয়ে গেছো — কামালদাই বা কোথায় ?" "আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠেছে, চোখে জল এসে গেছে, ও বুঝি আবার আগের মত হয়ে গেল ! কিন্তু ভোরবেলা আবার যে কে সেই। অথচ এই বই শকুন্তলাকেও পড়তে দিয়েছিলাম — শুধু বলেছিল 'ভালই' শুনে মনে হয়েছিল ছুটে পালাই — ওর কাছ থেকে। কিন্তু কিছুই হল না, ভেসে গেলুম শকুন্তলাকে নিয়ে। তবু এটা মানতেই হবে আমার যে কটা ভাল লেখা সম্ভব হয়েছে — শকুন্তলার জন্যই।" সেজদাকে সব বলতে পেরে হাল্কা লাগছিল।

ধীরে ধীরে সেজদা বলে, দেখ আজ কোন পার্টি নেই। পার্টি থাকলে তোর কি শাস্তি হতো জানি না। আমরা একটা গ্রুপ হিসেবে কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। এখনো ব্যর্থ হই নি। এখন অবধি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এগোতে পারছি। আর একটা কথা তোকে সমালোচনা করার আগে তোকে ধন্যবাদ দেবো। সেদিন তোর বাড়ী গিয়েছিলাম। আলাপ হল তিনটে ছেলের সাথে। তোর ঠিকানা নিতে এসেছে — প্রেমকুমার, পৃথ্বী আর সুশোভন। তোর প্রাক্তন ছাত্র। যাদবপুরের নাকি। আমার নাম বোধ হয় শুনেছে তোর কাছে। দেখলাম প্রাথমিক শিক্ষা তোর কাছ থেকে পেয়েছে।" সেজদা জল খেতে উঠল। আমি ভাবছিলাম ওদের কথা। ওরা পাশ করে যাবার পরও প্রতিদিন অপেক্ষা করতো রাস্তায়। এগিয়ে দিত আমাকে বাস স্টপ অবধি। প্রধানতঃ রাজনীতিই বোঝাতাম। ওদেরও অনেক জানার ইচ্ছে। দু / তিনটে বাস ছাড়তে হ'তো ওদের জন্য। কথা ফুরোতো না।

সেজদা এসে আবার শোয়। বলে "ওদের সাথে অনেক গল্প হলো। তিন চার ঘণ্টা ছিলাম। সংগীতার আতিথেয়তার ত্রুটি ছিল না। ওরা নিজেরাই আমার সাথে যোগাযোগ করে। দায়িত্ব দেবো ভাবছি। নতুন ছেলে তো খুবই কম।"

শুধু প্রেমকুমারের পৃথ্বী বা সুশোভনই নয় — অনেকদিনই হয়েছে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে চলে এসেছে বাস স্টপ অবধি। আমার সঙ্গ না কি ওদের ভাল লাগে। ক্লাশের বাইরে সত্যিই আমি ছিলাম ওদের বন্ধুর মতো।

সেজদা আবার—বলতে শুরু করে। "দ্যাখ প্রায় ভোর হয়ে এল। কাজের কথা শোন। আমার বয়স হয়েছে। যদি লড়াই-এর মধ্যে থেকেই মারা যাই তো ভাল। অন্তত ওদের হাতে ধরা পড়তে চাই না। আর শোন তোর পুরোনো পরিচিত এলাকা বেলপাহাড়ী যেতে হবে তোকে। ঝিলিমিলির দিকে যে রাস্তাটা গেছে তারই মাঝামাঝি একটি পাহাড়ী টিলায় ফরেষ্ট বাংলো। কাঁকড়াঝোর। ওই অঞ্চলের কমরেডটা বহুদিন ধরেই সংগঠিত। এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অত্যাচারে শেষ হচ্ছে। ডিটেলস ওদের থেকেই শুনবি। কলকাতা থেকে শুধু তুই যাবি। শুক্রবার বেলপাহাড়ী হাট। তিড়কে রমেশের দোকানে তোর জন্য অপেক্ষা করবে। ওকে তুই ভালই চিনিস। সত্তরের কমরেড পুষ্প মারাণ্ডীও থাকবে। আমার আপত্তির কোন প্রশ্নই ছিল না। নেতা হতে কোন দিনই চাই নি। সে ক্ষমতাও আমার নেই। আদেশ পালনেই আমার তৃপ্তি।

একমাত্র জীপ গাড়ী ছাড়া গোরুর গাড়ীই এ পথে চলে। পশ্চিমবঙ্গে এই অঞ্চলে ছোট ছোট পাহাড় আর শাল গাছের জঙ্গল। শাল গাছগুলো কচি বেশী বড় নয়। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট খুবই সক্রিয়। নিজেরাই গাছ কাটিয়ে পাচার করে। নাজেহাল করে গ্রামবাসীদের। প্রধানভাবে ধরপাকড় করে সাঁওতালদের।

রাস্তা, যথেষ্টই, সমতলের বাঙ্গালীদের কাছে উঁচু নীচু। গোহালবেড়িয়া বেলপাহাড়ীর কাছেই। পুরো অঞ্চলটাই — কাঁকড়াঝোর ফরেষ্ট বাংলো হয়ে ঝিলিমিলি পর্যন্ত আমার নখদর্পণে। শিমুলপালে বহুদিন ছিলাম। কাছা-কাছি সব গ্রামই আমার আত্মীয়।

বেলপাহাড়ী পৌঁছে চায়ের দোকানে তিড়ককে চিনতে অসুবিধে হল না। শহুরে বাবু ও সাঁওতালের বন্ধুত্ব এখনো স্বাভাবিক নয়। খালি টুলে জায়গা পেয়ে বসে পড়ি। চোখে চোখে কথা হয়। তেলেভাজা আর চা দিতে

বলে চারদিক লক্ষ্য করি। খুবই ভীড় রমেশের দোকানে। মুড়িতে জল দিয়ে আলুর চপ দিয়ে শালপাতার ঠোঙায় গভীর তৃপ্তিতে আর ক্লান্তিতে সবাই চিবোচ্ছে। খানিকটা তফাতে থেকে তিড়কে ও আমি উঠে পড়ি। ভেতরে বেশ উত্তেজিত। স্কুলের কথা হেমনলিনী, সুদক্ষিনা, শ্বেতা, শকুন্তলা সবাই হারিয়ে যেতে থাকে। সংগীতা শুধু মাঝে মাঝে ভাবনায় দেখা দেয়। তিড়কে সংগীতাকে শুয়োরের মাংস খাইয়েছে। এতদূর থেকে বুনো শুয়োর মেরে মাংস নিয়ে গিয়েছিল জীপ চালিয়ে। বাজার ফেরৎ মানুষের ভীড়। অন্যদিন সন্ধ্যের আগেই রাস্তা ফাঁকা। অন্ধকার রাস্তায় চলা অনভ্যাস। একটু হোঁচট খাচ্ছিলাম। গোহালবেড়িয়া পৌঁছে রাস্তা আলাদা হয়ে গেছে। আমরা শিমুলপালের পথে। তিড়কে প্রথম নীরবতা ভেঙ্গে প্রশ্ন করে 'বৌদি কেমন আছেন ?' একটু নীরব থেকে বলি ভালই। গত দু'সপ্তাহ কলকাতা যাওয়া হয় নি। আমি তো এখন অন্য জায়গায় মাস্টারী করি।

শিমুলপাল পৌঁছে দেখি এক ঘরে অনেকের জটলা। মিটিং-এর প্রস্তুতি। আসামী শনিবার কাঁকড়াঝোর ডাকবাংলোর মোচ্ছব হবে। দুটি ডিস্ট্রিক্ট-এর ডি. এফ. ও., এ. এফ. ও আসবে। আয়োজক ফরেষ্ট কনট্রাক্টর। বিরাট হৈ চৈ খাওয়া দাওয়া। প্রতি মূহূর্তে ওরা আমাদের জীবন বিপন্ন করছে। বেছে বেছে শুধু আমাদের ধরে নিয়ে যায়। আটকে রাখে। গাছ চুরির দায় চাপায় আমাদের ঘাড়ে — যে চুরি ওরাই করে চলেছে। আমরা কাঁকড়াঝোর বাংলো আক্রমণ করবো। প্রাণে মারবো না। উচিৎ শিক্ষা দেবো। যদি আক্রান্ত হই — খতম করবো।

অনেকদিন পর খতম্ শব্দটায় গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো একটু।

যদি কোন আর্মস হাতিয়ে নিতে পারি শুকুলদা সেগুলো নিয়ে কলকাতা যাবে। "তিড়কে বক্তৃতা শেষ করে। সকলে দৃঢ় মুষ্ঠিতে সমর্থন জানায়। আমি শুধু বলি, কমরেডস্ ওরা কিন্তু প্রবল প্রতি আক্রমণ করবে। কৌশলগত-ভাবে এবং মানসিকভাবে তার মোকাবিলা করার জন্য তৈরী থাকার ব্যাপারে আমরা যেন টানটান থাকি। কোন গোপন ডেরাই যেন পুলিশের কাছে প্রকাশ না পায়। আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে গ্রেপ্তার এড়ানোর এবং তার উপায় অতি দ্রুত আবার আক্রমণ সংগঠিত করা।" মিটিং শেষ হয়।

মাঝখানে তিন দিন। দিনের বেলা যে যার কাজে চলে যায়। আমি একা একা ঘুরে বেড়াই। কাঁকড়াঝোর এখান থেকেও বেশ কয়েক কিলো-মিটার। অনেকদিন পর রাজনৈতিক উত্তাপে খুবই উত্তেজিত বোধ করি।

বেলপাহাড়ী শিমুলপাল আমার অত্যন্ত পরিচিত পুরোনো এলাকা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছি তাদের সাথে এক টেবিলে খাওয়া দাওয়া করতে করতে। একেবারে পুরোনো জমিদারি স্টাইলে ডি. এফ. ও, এ. এফ. ও. এমন কি রেঞ্জাররাও, গ্রামের মানুষদের সাথে, গার্ডদের সাথে, এমন কি ফরেস্টারের সাথেও কি ব্যবহার করে — দাঁতে দাঁত কামড়ে লক্ষ্য করেছি তাও। কলমের এক খোঁচায় on the spot বদলী করছে ফরেস্টারকে। কারণটা ট্রাক ভর্তি কাঠ পাচারে বাধা দিয়েছিল বলে। বহুকালের চাপা ক্ষোভে, যন্ত্রণা যেন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়ে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। নাতিদীর্ঘ শালগুলো যেন হাসছে। আর তারই পাশাপাশি সুগন্ধ ছড়ানো ইউক্যালিপটাসের Plantation — বিষাক্ত হাওয়া ছড়াচ্ছিল চারদিকে। কমরেডরা গুনগুন করে গাইছে বিরশার গান — হাতিয়ার ঝলসায় আমাদের হাতে, / ও বিরশা, আমরা সারি বেঁধে সব তৈরী / বাঁ হাতে ধরেছি ধনুক আমরা / আর ডান হাতে নিয়েছি তীর,··· / বাড়িয়ে দিয়েছি হাত, দুশমন ভাগো আজ / চিতিয়েছি এই বুক, ভয় পাও তুমি দুশমন ! / হাতে ঝলসায় হাতিয়ার — ও বিরশা, আমরা সারি বেঁধে আজ তৈরী।"

কাঁকড়াঝোর বাংলোয় যখন পৌঁছই রাত তখন সোয়া বারোটা। প্রায় সকলেই মাতাল। কুড়ুলের ঘায়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলি। প্রবল প্রহারে ঘায়েল করি সবকটাকে। শক্ত রশি সঙ্গেই এনেছিলাম। বেঁধে ফেলা হল সবকটাকে। ডি. এফ. ওকে আইডেন্টিফাই করে প্রবল ঘৃণায় ফেটে পড়ি চাপা অথচ তীব্র কণ্ঠে বলি, "শোন শালা আমি এখানে পনেরো বছর আগে ছিলাম। তোরা একইভাবে আজও আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার করছিস। যদি কোন ট্যাঁ ফো করিস মেদিনীপুর অফিসের মধ্যে ঢুকে তোকে খতম করবো। আমি নয়তো আমার অন্য কোন কমরেড — নয়তো আরও অন্য কোন কমরেড।" বেশি সময় নষ্ট না করে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি সঙ্গে মূল্যবান আগ্নেয়াস্ত্র এবং অনেক কার্তুজ। জানি না এত রাগ বা ঘৃণা কোথা থেকে আমার মধ্যে জন্মেছিল। ভোর হতে তখনো অনেক দেরী, আগেই জীপের টায়ার পাংচার করে দিয়েছিলাম। বেরোবার আগে একবারই মাত্র স্লোগান দিয়ে দ্রুত জঙ্গলের রাস্তায় এগিয়ে যাই। ঘুর পথে একদিন পরে আমি আমার স্কুলের ডেরায়। জীবনে প্রথম এ্যাকশন। স্থির হতে সময় নেয়। ধীরে ধীরে ক্লাশ নিতে শুরু করি। সেদিন ক্লাশ করে এসে শুয়ে আছি। ভাবছি নানা কথা। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি তিন মূর্তি। স্মার্ট সুট

পরা। কাঁধে 'কিট্‌স' বইবার ব্যাগ। ক্রিকেট ব্যাটের হ্যাণ্ডেল বেরিয়ে আছে। প্রেমকুমার, সুশোভন আর পৃথ্বী। মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকি ওদের কয়েক মূহূর্ত। কিছু বলার আগেই ওরা হুড়মুড় করে ঢুকে ভেতরে। স্যার সেজদা এই চিঠি দিয়েছে বেশি সময় নিতে বারণ করে দিয়েছে। শুধু আমার একটা কথা — অতি মানব-মহামানব শুনেছি এমন মানুষের সম্পর্কে এসেছেন বলেই বোধ হয় আপনি এত ভাল।"

"না প্রেম — আমি অত ভাল নই। সেজদা আমাকে ভালবাসে। হয়ত আমার lapses নিয়েই আমাকে ভালবাসে।"

"স্যার, ব্যাপারটা এই রকম, কাজের কথা বলি, আমরা এখান থেকে টুর্নামেণ্ট খেলতে যাবো। যাবার আগে স্যারের আশীর্বাদ নিতে এসেছি।"

আনন্দ, উত্তেজনা ধরে রাখতে পারছিলাম না। স্কুলের দারোয়ানকে ডেকে দ্রুত রুটি মাংস আনতে বলি। খুব তৃপ্তি করে খায় ওরা। খেতে খেতেই কথা হয়, তোমরা যে দায়িত্ব নিয়েছ, তার দায় বুঝেই নিয়েছো তো? সুশোভন খাওয়া থামিয়ে গান গেয়ে ওঠে, 'বাজে বাজে রম্য বীণা।'

আমি একটু হাসি। বলি — হয়ত তোমাদের হাতেই বীণা বেজে উঠবে। শোন জিনিষপত্রগুলো নিয়ে যাও। কোথায় যাবে কেমন করে যাবে কিছুই জানাবে না আমাকে। সেজদার নির্দেশ মতো করবে। বিদায় দিতে গিয়ে বলি, এবার তোমাদের থেকেই শিখবো কমরেড। লাল সেলাম।

'কি যে বলেন — স্যার! আমরা আপনার ছাত্র।'

আর স্যার নয় — যদি আমাকে সম্মান দাও তো বলো কমরেড শুকুল। বলে হাত বাড়িয়ে দিই।

ওরা হাত মেলায় না, জড়িয়ে ধরে। স্যার আপনাকে আমরা খুব ভালবাসি — খুব ভালবাসি।

ধীরে ধীরে ওরা বেরিয়ে যায়।

নতুন করে ক্লাশে আর মন বসছে না। দু'চারদিন সময় লাগবে, হ্যাংওভারটা কাটতে। ছাত্রীদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে এমনটা যখন ভাবছি এবং ধীরে ধীরে ফিরে আসছি পড়ানোর জগতে — তখনই অঘটনটা ঘটলো।

কোয়াটারের সামনে জীপ দাঁড়ালো একদিন সকালবেলা। কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে হল না। ওরা শুধু জিজ্ঞেস করে আপনি কদিন

CENTRAL LIBRARY

আগে বেলপাহাড়ী গিয়েছিলেন ? অস্বীকার করি নি স্বীকারও নয়। নরেন হাঁসদাকে চেনেন ? "হি ইজ এ্যারেস্টেড।" আমার সব বোঝা হয়ে গেল। টর্চার সহ্য করতে না পেরে নতুন আসা এই কমরেডটি সবই বলে দিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই আমার কোয়ার্টারে হানা। প্রায় কিছুই পেল না 'সার্চ' করে। কোন শারীরিক নির্য্যাতন ছাড়াই জীপে তুললো। ভোর ছ'টা তখন।

কিভাবে খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল। কোয়ার্টারের সামনে অনেক ছাত্রীর ভীড়। কিছু অভিভাবকও দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। স্বাভাবিকভাবেই ওদের চোখে জল। কারও দিকে তাকাচ্ছিলাম না নির্দিষ্টভাবে। প্রণাম করতে কেউ এগোলো না, জানে আমি প্রণাম নিই না। জীপ ছাড়ার আগেই একটা নাটকীয় কাণ্ড করলো ওরা। হেমনলিনী, নুরজাহানকে খোঁচা দিয়ে কি যেন বললো। নুরজাহান আজ আর সলজ্জ নয়। মাথা উঁচু করে শুরু করলো গান। "ওগো আলোর পথের যাত্রী / এ যে রাত্রি / এখানে থেমো না / এ যে বালুচরের বাসা, / তরণী তোমার যেন বেঁধো না। / এই বঞ্চনা দ্বীপ পার হলে পাবে জন-সমুদ্রের ঠিকানা।"

সকলে গলা মেলায়। সুদক্ষিনা, হেমনলিনী, শ্বেতা, শিল্পা, তানিয়া কেউ বাদ নেই। বিদায় মুহূর্তটা অসাধারণ স্মৃতি হয়ে রইল।

জীপ এগিয়ে চলে। স্কুল এলাকা ছাড়তেই হঠাৎ জীপের সিট থেকে আমি নিচে পড়ে যাই। এমন চড় খেলাম, সঙ্গে অকথ্য গালাগাল। কিন্তু তবু আমি যেন এক মুক্তির স্বাদ অনুভব করছিলাম। সংগীতা থেকে — শকুন্তলা থেকে সুদক্ষিনা থেকে এমন কি আমার মা'র থেকেও। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম জীবনের বাকী অংশটা এই কারান্তরালেই যেন শেষ হয় !! ধীরে ধীরে আচ্ছন্নতা কেটে যেতে থাকে।

# বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

## আগমনী

[ চৈতালীকে ভেবে ]

ধূসর পাহাড়ের কাছে ঝক্‌ঝকে সাদা বরফ দেখে
সাত সকালেই আগমনী গান বাজে আকাশে বাতাসে,
শহর ছেড়ে ব্রাভ্‌নীক থেকে নভী-ব্রাভ্‌নীকে
ভিটের্জ থেকে বুসোভাচায়,
সুদূর সদর বানইয়া-লুকায় ।
শীতের হাওয়ায় গাছগুলি সব বোর-পাইন হেন
এক্-হাঠ্ তাই বরফ মেখে স্যাণ্টা যেন,
লার্সভা নদী, বোসনার জল
পথের পাশে অচঞ্চল,
পথ হারাল পথের মাঝে আনন্দ ঝরনাতে
ফেরা হল কুহক বুঝে শীতার্ত এই রাতে

## সুভাষরঞ্জন দাস

### নৈর্ব্যক্তিক ফটোগ্রাফ

রোমন্থন । গোপন—
চশমাহীন ঝাপসা চোখে
রতি চিহ্ন ।
ভেসে আসে — বৈষ্ণব পদাবলী ।
রামী-চণ্ডীদাস — ডানা ম্যালে —
ক্রমশ গ্রাস করে ব্ল্যাক হোল ।
অট্টালিকা ভেঙে পড়ে
অট্টহাস্যে, সিন্থেটিক শাড়ী
উড়ে যায় —

অগাধ সাগরের ঢেউ মুছে দেয় অটোগ্রাফ···
ধরা থাকে
শুধু নৈর্ব্যক্তিক
ফটোগ্রাফ···

## অমরনাথ বসু

### নিরন্তর প্রশ্নের মতো

শুধু সমুদ্রই নিরন্তর প্রশ্নের মতো ঢেউ নিয়ে
আছড়ে পড়ে
কখনো বা প্রচণ্ড অভিমানের মতো ফুলে উঠছে জল
চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে
মানুষ মানুষীর ভালবাসার বাধ্যতামূলক জীবন প্রবৃত্তি
কারো কোনো কান্না পায় নি তখন
জীবনটাই কত এলোমেলো
বাঁচতে চাওয়া তো অপরাধ নয়
অন্ধ চোখ তুলে থাকে আকাশের দিকে
এই দীর্ঘ জীবন নিঃসঙ্গ কাটবে কেমন করে
শুধু সমুদ্রের ঢেউ এর মতো অবিরাম আসছে মানুষ মানুষী
স্মৃতির বালি রেখে চলে যাচ্ছে···

## সুদেব সাহা

### ফর্মূলা

সকলেরই ইচ্ছা
নিজেকে প্রকাশ করতে
পথ জানা থাকলে
কত সহজ হয়
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে।
তবু জানি
ফর্মূলা সব কিছুরই হয় না
পথে নেমেই
আবিষ্কার করতে হয়
কোন পথে যেতে হবে
ফর্মূলার তোয়াক্কা না করে।

# অলোককুমার ঘোষ

## দামোদরের বেড়ি

আধুনিক প্রযুক্তির বেড়ি পরে
দুরন্ত দামোদর শুয়ে আছে স্থির
শরতের মেঘের দল ভাসিয়ে বুকে
রুপোলি চাঁদ কাঁপছে ক্ষীণ বহতা জলে
হলুদ জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ প্লাবনে
শারদীয়া মেঘ হানা দিয়ে যায়
বৈরাগী বাতাসহীন দামোদরের চরে।
অন্তরঙ্গলী যাত্রায় শুয়ে আছে প্রতীক্ষায়
সৌখিন জমিদারের ভগ্ন প্রাসাদ
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে তীরে জাগা
অশ্বত্থ পাকুড়ের শাখায় শাখায়
নির্বিকার দামোদর শুধু সাক্ষি রয়।
নানান মুখের ব্যস্ততার ভিড়ে
সুখের স্বর্ণালী ছটা ছিল একদিন
সুদূরকে করেছিল আন্তরিক কাব্যের পাণ্ডুলিপি
স্বর্গীয় হিল্লোলে মেতেছিল দামোদর সেদিন।

বিপ্লবের স্বপ্নের কাজল কারো চোখে ছিল কিনা
অথবা বিরোধী কোন নেতা
সোচ্চারিত ছিল কিনা জানি না
আমার দু'চোখে আজ কেবল সেসব প্রশ্নমালা
স্থির দামোদর দু'পাড়ে বিবর্ণ ঘাস-মাদুর
আগামী পৃথিবী চুপিসাড়ে বিশ্রাম নেয় সেখানে,
বিশ্রাম শেষে ফুঁসে ওঠে নতুন উন্মাদনায়
স্থির দামোদর ফি বরষায় ভাসায় দু'কূল
কেটে ফেলে প্রগতির বেড়ি।

# অর্কিড-এর গ্রাহক হতে গেলে

## গ্রাহক চাঁদা ঃ

এক বছরের জন্য সডাক ৭৫-০০ টাকা [ পঁচাত্তর টাকা ] মাত্র।
দু' বছরের জন্য সডাক ১৪০-০০ টাকা [ একশ চল্লিশ টাকা ] মাত্র।
আজীবন সদস্য চাঁদা ১০০০-০০ টাকা [ এক হাজার টাকা ] মাত্র।

- ☐ পত্রিকা প্রতি সংখ্যা সার্টিফিকেট অফ্ পোস্টিং-এ পাঠান হবে।
- ☐ গ্রাহকরা অর্কিড প্রকাশনীর যে কোন বই ( সংকলন বাদে ) কেনার সময় শতকরা তিরিশ টাকা হারে ছাড় পাবেন।
- ☐ বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যাবে।
- ☐ মনি অর্ডারেও টাকা পাঠিয়ে যে কেউ গ্রাহক হতে পারবেন।

টাকা পাঠানো বা সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক,

২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে, সাহাপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩৮, পশ্চিমবঙ্গ।
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

---

## অর্কিড-এর পরবর্তী প্রকাশনা

**এই শতাব্দীর শেষ প্রতিনিধিত্বমূলক বাংলা কবিতার সংকলন**

প্রখ্যাত সমালোচকের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত

# স্বাধীনতা-উত্তর শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতা

সম্ভাব্য মূল্য : একশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : নব্বই টাকা [ এককালীন ]

যোগাযোগ :

২৯, এইচ. বি. পাথওয়ে সাহাপুর
কলকাতা - ৭০০ ০৩৮
দূরভাস ঃ ৪৬৮-৮২১৪

Registration No. 32758/77 ARKID 24th Year 2nd Issue 2001

## অর্কিড প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কিছু বই

প্রবন্ধ

### শান্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

**সত্যজিৎ রায় এবং অন্যান্য**

**উপেক্ষিত লেখক অপেক্ষিত অবলোকন**

উপন্যাস

### চণ্ডী মণ্ডল

**অলীক অবন্তর**

কাব্য সংগ্রহ

### পবিত্র মুখোপাধ্যায়

**কাব্য সংগ্রহ : ১**

**কাব্য সংগ্রহ : ২**

গদ্য গ্রন্থ

### সংবর্ত রায়

**মুসোলিনির বিচার ( অনুবাদ )**

কবিতা

### সুব্রত রুদ্র ( সম্পাদিত )

**স্বর্ণকুমারী দেবীর**

**প্রেমের গান আর কবিতা**

কবিতা

### দীপক মুখোপাধ্যায়

**ওক্টাভিয়ো পাজ ( অনুবাদ )**

### প্রদোষ দত্ত

**কাঁগল ভালোবাসা ভিনটেজকার**

### শান্তনু প্রামাণিক

**শিকড় বাকড়**

### রাণা চট্টোপাধ্যায়

**নীল সাময়ানার নিচে**

**আধভাঙ্গা চাঁদের আলোয়**

**বিকেলের আলোর ভিতরে**

### প্রসেনজিৎ বক্সী

**এখন কোরাস**

**জটায়ুর প্রতীক্ষা**

**সমুদ্র ও সারস**

### সুভদ্রা ভট্টাচার্য

**তাপকলের মেয়ে**

**ঘুমের রং**

### অলোককুমার ঘোষ

**নিম ফুলের মধু**

**সময় ধরা শূন্য মুঠোয়**

**স্বজনে বিজনে**

Published From : 29. H. B. Pathway Sahapur Calcutta-700 038
Printed at : G. D. Enterprise, 29, Sitalatala Road, Sahapur
Calcutta-38. ✆ : 468-8214